সূচী

অতিরিক্ত পত্র

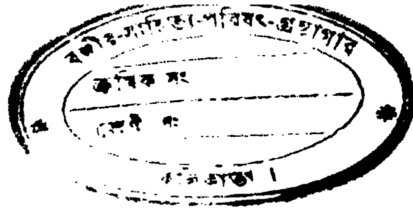
নিম্নলিখিত পুস্তক সকল ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও "নব্যভারত"- কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

দেবীপ্রসন্ন গ্রন্থাবলী

১।	শরচ্চন্দ্র উপন্যাস, তৃতীয় সংস্করণ		১৸০	২।	বিরাজমোহন, তৃতীয় সংস্করণ		১৷০
৩।	সন্ন্যাসী,	" "	১৲	৪।	ভিখারী, দ্বিতীয়	"	১৲
৫।	যোগজীবন, দ্বিতীয়	"	১৲	৬।	অপরাজিতা	" "	১৵০
৭।	মুরলা	" "	১৷০	৮।	নবলীলা,	" "	১৷০

৯। পুণ্যপ্রভা, প্রথম সংস্করণ ১৸০

নব্যভারতের গ্রাহকগণের ডাকমাশুল লাগিবে না।



নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ [১ম ও ২য় সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

পঞ্জিকা অনুসারে অসাময়িক হইলেও বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত নব্যভারতের নূতন বর্ষ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া, আমরা আজ নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ লইয়া পাঠকগণের দ্বারে উপস্থিত হইতেছি।

এই সংখ্যার সহিত নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। এই দীর্ঘ জীবন ইহার একই ভাবে এবং সর্ব্বথা নিরাপদে অতিবাহিত হয় নাই; নানা অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়া ইহাকে পথ করিয়া আসিতে হইয়াছে। মতের স্বাধীনতার জন্য অন্ততঃ দুইবার ইহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে এবং যে পথে গ্রাহক সংখ্যা সহজে বর্দ্ধিত হইয়া ব্যয়সঙ্কুলন সহজ হয়, আদর্শের অনুরোধে সে পথ জ্ঞাতসারেই বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইয়াছে। আর যে বিপদ ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে আমাদের গ্রাহকবর্গ তাহা অবগত আছেন। যিনি এই সকল বিঘ্ন বিপদের মধ্যে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ এবং প্রণাম করিতেছি। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে নানা ত্রুটি সত্বেও এই পত্রিকাখানিকে পরিত্যাগ করেন নাই, আজ তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং তাঁহাদের শুভকামনা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইতেছি।

গত কয়েক বৎসর বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া নব্যভারতকে চালাইতে হইয়াছে বলিয়া এবৎসর ও ঐভাবে ইহার জীবন রক্ষা করিতে পারিব কিনা, সে বিষয়ে আমরা নিতান্ত সংশয়াকুল ছিলাম। এই সংশয়ের অবস্থাই ইহার বর্ষারম্ভে প্রকাশিত হইবার পক্ষে বাধা হইয়াছিল। অবশেষে কতিপয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর উৎসাহে আমরা পুনরায় আশা ও উদ্যম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

নব্যভারতের বিশিষ্টতা পাঠকেরা অবগত আছেন। বঙ্গের মাসিক পত্রিকা সমূহে

লঘু সাহিত্যের—বিশেষ গল্প সাহিত্যের অভাব নাই, সুতরাং সেই দিকের প্রাচুর্য্য বর্দ্ধনে আমাদের বিশেষ চেষ্টা নাই। ইহাতে আমাদের লোকরঞ্জনপটুতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইলেও আমরা স্বেচ্ছায় এই পথ বাছিয়া লইয়াছি। জ্ঞানের সহিত বিশুদ্ধ রুচি এবং বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশপ্রীতির সহিত সকল দেশের সকল জাতির মহত্ব স্বীকার ও তৎপ্রতি ভক্তি, চিন্তার প্রসারের সহিত কর্ম্মের জন্য উদ্যোগিতা শিখিতে এবং শিখাইতে পারিলেই এই পত্রিকা সম্পাদন সার্থক হইবে। এদেশের সকল দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, নানা স্থান হইতে আহৃত জ্ঞানের বিনিময়বিপণি রূপে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের শুভ প্রচেষ্টার ও শিল্পকলাদির প্রেরক হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আমরা কোন বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে কেবল সত্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিরই অনুসরণ করিব। সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই সে সম্বন্ধে দেশের কৃতকর্ম্মা চিন্তাশীল পুরুষ ও নারীগণের লেখনীপ্রসূত সারবান্ প্রবন্ধসকল ও কবিতাদি এই নব্যভারতের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিবে। আবশ্যক হইলে দুইটি বিরুদ্ধ মতও বিচারের জন্য পাশাপাশি স্থান লাভ করিতে পারিবে।

যেখানে জীবন সেখানেই নিত্য নবীনতা। একটা জাতি অথবা দেশ তাহার নব নব আশা ও আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম চেষ্টার ভিতর দিয়াই আপনার এই চির নূতনত্ব প্রকাশ করে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম চেষ্টার অভাব সেখানেই জীবনের দৈন্য ও নির্জ্জীবতা : নবীনতার প্রকাশ সেখানে অসম্ভব।

দেশের নাড়ীর সহিত যাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় যে সাড়া দেয় না, বর্ত্তমানের শুভ চেষ্টার সহিত যাহার যোগ নাই, নূতনত্বের দাবী তাহার কিছুতেই চলে না। দেশের নব নব অনুভূতি চিন্তা ও চেষ্টার সহিত যোগ রক্ষা নব্যভারতের একটি ব্রত। যেদিন এই যোগসূত্র ছিন্ন হইবে সেদিন নব্যভারত নামের সার্থকতা আর থাকিবে না। তাই, যাহাদের লইয়া দেশ, বর্ত্তমান যুগের সেই অগণ্য ভাই ভগিনীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও সাধনা, তাহাদের জীবনের নানা সমস্যা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যাহারা, যাহাদের ভিতর দিয়া এই প্রাচীন দেশ নবীনতর মূর্ত্তিতে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইবে, সেই তরুণদলের সহিতও চিন্তাগত যোগ স্থাপনে আমরা সর্ব্বদা উন্মুখ ও উৎসুক থাকিব!

ভগবান এই শুভসংকল্পসাধনে আমাদের সহায় হউন।

সুপ্তশক্তির জাগরণ।*

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে একটা ঘূর্ণীবায়ু (বা tornado) ঢাকা সহরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তখন বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে একটি বিচিত্র জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল, নদীর কিয়দংশ কিছুক্ষণ জলশূন্য ছিল, সেখানে নৌকা জলে না ভাসিয়া কর্দ্দমে বসিয়াছিল। পাগল বাতাস নদীর কাদা সহরের কোন কোন পাকা বাড়ীর গায়ে লেপিয়া, নদীতীরস্থ নবাবের সুন্দর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া, সিড়ীর লোহার রেইলিং মুচড়াইয়া, জীবন্ত মানুষকে উড়াইয়া লইয়া এক স্থানে তাহার মাথা অন্যত্র তাহার দেহ ফেলিয়া কোথায় গিয়া অদৃশ্য হইল। এই আকস্মিক ব্যাপারের বর্ণনা খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম ও লোকের মুখে হয়তো কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত আকারে শুনিয়াছিলাম।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রংপুরে আর একবার ঘূর্ণী বায়ুর পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে দিন কোথাও কিছু নাই, দ্বিপ্রহরে হঠাৎ দূরে একটা কলরব শুনিলাম। তাহার পর শুনিলাম চাকরেরা বলাবলি করিতেছে বাজারের দিকে আকাশ লাল দেখা যাইতেছে। একজন আর্দ্দালী আসিয়া বলিল—"হুজুর! ঘূর্ণি আসিতেছে, সাবধান হউন।" জিজ্ঞাসা করিলাম কি করিতে হইবে? সে বলিল ফাঁকা জায়গায় যেখানে নীচু জমী বা গর্ত্তের মত আছে সেখানে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকা নিরাপদ। দেখি হঠাৎ কাছারী ভাঙ্গিয়া উকীল মোক্তার, হাকিম আমলা ও মামলাকারীর দল নিজ নিজ বাটীর দিকে ছুটিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের জন্য সকলেরই মুখে ভয় ও ভাবনা। ঘূর্ণীবায়ু আমাদের দিকে না আসিয়া অন্যদিক দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার আকৃতি দেখিতে পাইলাম না) কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম। একঘণ্টা যাইতে না যাইতে দেখি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আহত ও মৃতপ্রায় লোকদের লইয়া গোরুর গাড়ী সব হাসপাতালের দিকে চলিয়াছে। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও মাথা ফাটিয়াছে, কাহারও নাক, কাহারও কান, কাহারও পা কাটা গিয়াছে। যে গ্রামের উপর দিয়া ঘূর্ণী গিয়াছে, তাহার ঘরগুলির বেড়া কত চাল খুঁটী টেউটিনের [corrugated iron sheets] আর, বাঁশ সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে, এবং যাইবার পথে যে মানুষ পড়িয়াছে ঐ সকল জিনিষের আঘাতে তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন

* এই প্রবন্ধটী ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রচিত ও কোন সভায় পঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও ইহার সার্থকতা আছে বলিয়া অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া ও সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক

করিয়া দিয়াছে। রাজপথের যে দিক দিয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল, পরদিন গিয়া দেখিলাম পথের ধারের গাছগুলির কেবল সেই দিকের ডালগুলি ভাঙ্গা।

এই আকস্মিক উৎপাত কোথা হইতে আরম্ভ হইল, কেন হইল পরে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যাহারা বায়ু বিদ্যুৎ উত্তাপাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা জানেন তাঁহারা তাহাদের মত ও অনুমান ব্যাখ্যা করিলেন—কোন জলময় স্থানে তড়িৎ মণ্ডলে কি বিক্ষোভ (disturbance) হইয়াছে—সাধারণ লোকে ইহাকে আকস্মিক ও দৈব ঘটনা বলিয়াই মানিয়া লইল।

ঘূর্ণী বায়ু সকল সময়েই এমন ভীষণভাবে দেখা দেয় না। কালবৈশাখী যাহাকে বলে আমরা প্রতিবৎসরই দেখি। ভয়ানক গ্রীষ্ম, বাতাস নাই, চারিদিকে তাপ যেন জমাট, সবাই বলিতেছে এবার একটা বৃষ্টি হবে। সত্যই কোথা হইতে হু হু শব্দে ধূলা বালু আর শুষ্ক পাতা উড়াইয়া প্রবল বেগে বাতাস ছুটিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে কাল মেঘে আকাশ ছাইল,—প্রথমে বড় বড় ফোঁটা তাহার পর মুষল ধারে বৃষ্টি, বিদ্যুতের চমক পরে বজ্রনাদ ও শিলাপাত। সকাল বেলা চারিদিক শুষ্ক, গাছগুলি ধূলায় ধূসর, বিকালে বৃক্ষলতা স্নাত ও নির্ম্মল। ইহা সকলের কাছে পরিচিত। গরম ও গুমট হইলে অনেকেই বৃষ্টির আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও করিতে পারেন। তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বঙ্গসমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে কি না এবং কতক্ষণে ভিতরে আসিয়া পৌঁছিবে Port Commissioners এর আফিস হইতে তাহার খবর পূর্ব্বেই বাহির হয়।

আমাদের হিসাবে আগ্নেয়গিরি সহসা অগ্নি উদ্গীরণ করে, সহসা ভূমিকম্প হয়। ইহাদের আকস্মিকতা, জ্ঞানবৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উৎকর্ষের সহিত, ক্রমে দূর হইবে। মানুষ হয়তো পূর্ব্ব হইতে ইহাদের অভিযানের সংবাদ পাইয়া আত্ম রক্ষার উপায় করিবে পারিবে। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় তাই সেখানে হালকা কাঠের বাড়ী। ভারী ইমারত ভূমিকম্পে পড়িয়া যাইবার ভয়। হালকা জিনিষ যথা স্থানে থাকে।

এই যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যাহাকে পূর্ব্বে নিতান্ত আকস্মিক দৈব ঘটনা বলা হইত সেগুলি দেবতার প্রেরিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক ক্রোধের চিহ্ন নহে। জড় জগতে আকস্মিক তো কিছুই নাই। যাহা নির্দ্দিষ্ট কারণের অপরিহার্য্য ফল তাহাকে আকস্মিক বলা সঙ্গত হয় না। এই জড়জগতে নানা অদৃষ্ট শক্তি আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই শক্তিগুলি কখন কি ভাবে কাজ করে আমরা হিসাব রাখি সে সাধ্য নাই। আমাদের চক্ষে ইহাদের রূপ ধরা পড়েনা; আমাদের কর্ণের পক্ষে ইহারা নীরব; আপনার স্থিরতার মধ্যে ইহারা সুপ্ত অথবা লুপ্ত ভাবে অবস্থিত। হঠাৎ একদিন অকালে নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত ইহারা আপন ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ

করে, তখন ভয়ে বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আমরা তাহাদের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হই।

মানবজাতির শৈশবে প্রাকৃতিক শক্তিকে সে অমঙ্গলের দেবতা বলিয়া ভয়ে ভয়ে পূজা দিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির রুদ্র শক্তি সকলের মধ্যে সে মঙ্গলের আবিষ্কার করিতে লাগিল। মহাবনে দাবানল রূপে অগ্নি তাহাকে ভীত করিয়াছে, অসহ্য শীতে তাহাকে তাপ দিয়া তাহার আহার্য্য পশুপক্ষীর মাংস সুপক্ক ও সুস্বাদু করিয়া তাহাকে প্রীতও করিয়াছে। নদীর জলে পান ও স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলেও উহা যতদিন তাহার উত্তরণীয় ছিল না ততদিন তাহাকে পথরোধকারী শত্রুই মনে হইত, যেদিন সে তাহার ভেলাখানি বুকে করিয়া তাহাকে সহজে অপর পারে লইয়া গেল সেদিন হইতে সে পরম মিত্র। যত জড় রাজ্যের বিধিবিধান বুঝিয়া প্রচণ্ড শক্তিগুলিকে স্ববশে আনিতে পারিল, ততই সে কল্পিত দেবতাদিগকে আপনার হিতকারী বলিয়া বুঝিতে ও আনন্দের সহিত পূজা দিতে আরম্ভ করিল। দেবতাদের অমঙ্গল শক্তিকে সে একেবারে অস্বীকার করিলনা, কিন্তু মনে করিতে লাগিল যে তাহার পূজায় প্রসন্ন হইয়া দেবতা আপনার রুদ্র মূর্ত্তি তাহার শত্রু পক্ষের দিকেই রাখিবেন।

মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া জড়শক্তিকে দেবতার পদ হইতে মিত্র এবং ভৃত্যের পদে নামাইয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির কত শক্তি এখনও অনাবিষ্কৃত অচিন্তিত ও স্বপ্নেরও অগোচর। ভূগর্ভে বিশ্বকর্ম্মার তপ্ত কটাহে নিয়ত কত ধাতুদ্রব্য দ্রবীভূত হইতেছে। সমুদ্র জলের ভারে তলের কর্দ্দম কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইতেছে, জলমধ্যে অতি ক্ষুদ্র কীটানুকুলের মৃতদেহে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হইতেছে; এত ধীরে হইতেছে যে মানুষের আয়ু অযুত গুণে বৃদ্ধি হইলেও সে দেখিয়া কিছু বুঝিবে না। তাহার জন্মের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ভূমিকম্পে যে বনভূমি ভূতলে প্রোথিত হইয়াছিল আজ প্রস্তরীভূত সেই বনরাজ্য তাহাকে রন্ধনের ইন্ধন, প্রদীপের বাষ্পরূপী তৈল, আর কত কাজের সরঞ্জাম, রোগের ঔষধ ও ভোগের উপকরণ যোগাইতেছে। কয়লার মধ্যে যে তাপদায়িনী শক্তি, যে তৈলাদি সঞ্চিত আছে তাহার সমুদয়ই ভূমিতলে লুপ্ত ছিল অথবা সুপ্ত ছিল। অগ্নি সংযোগে কত গ্যাস, কত তৈল, কত সুগন্ধ দুর্গন্ধ দ্রব্য পৃথক হইয়া আসিতেছে। সেই সুপ্তশক্তি জাগিয়া কলকারখানা, রেলগাড়ী ষ্টীমার চালাইয়া লইতেছে।

জড়জগৎ হইতে নরজগৎ অনেক আধুনিক—যেন এই সেদিনকার সৃষ্টি। কিন্তু এই আধুনিক জগতেও আমাদের জড় চক্ষুর সম্মুখে অনেক অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। কোথাও নীরবে সঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রকাশের সময়ের অপেক্ষা করিতেছে।

মানবের আদিম ইতিহাস কেহ জানেনা জানিবেনা, কল্পনা ও অনুমানে কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইলেও তাহা ইতিহাস হইবেনা। অনেক যুগান্তরে ও পরিবর্ত্তনের

পর কতগুলি প্রাচীন দেশ ও জাতির উত্থান-পতনের বিবরণ আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়া থাকি। অনেক আনুমানিক কথাও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের মধ্যেও সুপ্ত বা সঞ্চিত শক্তির প্রবল প্রকাশ বারংবার মানুষ দেখিয়াছে।

অগ্ন্যুৎপাতের মত, ভূমিকম্পের মত, ঘূর্ণীবায়ুর মত প্রবল প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহিংসা, বিজয়াভিলাষ, ধনলালসা, ভূমিলালসা, বিজাতিবৈরিতা, পরধর্ম্মবিদ্বেষ ইত্যাদি নানা আকারের এবং নানা প্রকারের মানবীশক্তি এক জাতির মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অনেক সুখদুঃখ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতার সৃষ্টি অসভ্যতার মৃত দেহ কঙ্কালের উপর। যখন দুই শক্তিতে সংঘর্ষ, তখন একের দুর্ব্বলতা অপরের বিকাশের অনুকূল অবস্থা।

রোমের বিলাসিতা তাহাকে ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য করিয়াছিল বলিয়াই গথ অ্যাষ্ট্রোগথ ও ভ্যাণ্ডেল (Goths, Ostrogoths and Vandals) দের হস্তে তাহার দুর্গতি সম্ভব হইয়াছিল। বিলাসিতা রোগ এক ঘোর অমঙ্গলশক্তি; তাহাও কালে উপচিত হয় ও দুর্গতির পথ দিনে দিনে প্রশস্ত করে। দেশের অতিরিক্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি যদি আলস্য ও নিশ্চিন্ততা আনিয়া দেয়, যদি স্বদেশ রক্ষার জন্য অর্থের দ্বারা বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করায়, তবে দেশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়, শত্রুরোধ করিবার শক্তি তাহার লোপ পায়।

রাজা ও রাজবল্লভগণ ব্যসনাসক্ত ও প্রজার হিতকামী না হইয়া যদি প্রজাপীড়ক হয় তবে নীরবে সঞ্চিত প্রজামণ্ডলীর বহুদিনের অসন্তোষ একদিন প্রলয়বন্যার মত প্রবাহিত হইয়া রাজসিংহাসন ভাসাইয়া লইয়া যায়। ফরাসী বিপ্লব তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নীরবে অত্যাচার সহিতে সহিতে মানুষ শক্তি হারায় এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল। কিন্তু শক্তির সুপ্তি তাহার লুপ্তি নহে। অতিশয় আঘাতে সে দৈত্যের মত জাগিয়া উঠে। আপাতঃ দৃষ্টিতে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, কিন্তু আঘাতের অপরিহার্য্য প্রতিঘাতরূপী অবস্থাবিপর্য্যয় ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে। সেই প্রতিঘাত এই প্রকারের নিদ্রাভঙ্গজনিত। অনেক অত্যাচারী রাজার পুত্র বা পৌত্র স্বয়ং নিরপরাধ হইয়াও পূর্ব্ব পুরুষের প্রাপ্য দণ্ড ভোগ করিয়াছে।

বিধাতাপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার চলিবার নিয়ম প্রণালী স্থির করিয়া দিয়া, অনন্ত শয্যায় গিয়া ঘুমাইয়া পড়েন নাই। তিনি জড়ে ও জীবে শক্তিস্বরূপ ও প্রাণস্বরূপ হইয়া আপনার বিধাতৃত্ব অহরহঃ প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সনাতন একথা সত্য এবং বিধি ও ধর্ম্মের সনাতনত্বও সত্য, কারণ প্রকৃতির বিধি আজও যাহা কালও তাই। কিন্তু সনন্ত কাল ধরিয়া যে অনন্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে, যে ভাঙ্গা গড়া চলিয়াছে, তাহাও বিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মূলে বিধি এক হইলেও অবস্থার সঙ্গে তাহার প্রকাশ ভিন্নতর হইবে। অবস্থার মত ব্যবস্থা তাহাও মূল বিধির অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক নিয়মে ও আধ্যাত্মিক নিয়মে নরসমাজে নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে একদিন সকলে বসিয়া নিজেদের সুবিধা মত ও সংস্কার সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি আচার ও অনুষ্ঠান রচনা করিয়া তাহার উপরে সনাতন ছাপ দিয়া উহা চিরকালের জন্য স্থায়ী করিয়া যাইবেন, তাঁহারা ভুল করিতেছেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও গতি আছে, বৃদ্ধি আছে, রূপান্তর আছে, জরা ও ক্ষয়ও আছে। কোন প্রাচীন ধর্ম্ম চিরদিন আপনার আদিম রূপ অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে পারে নাই, পারিবে না। জগতের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া এখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম কলুষিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের বিপুল প্রবাহ বহু মঙ্গল সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার আদর্শ এখন কি? উৎস স্থানে নদীর জল নির্ম্মল ও ও স্বচ্ছ হইলেও নিম্নতর প্রবাহ হইতে উহা সংকীর্ণতর। পর্ব্বত-নিঃসৃত নদীর গতি বৃদ্ধি ও প্রসার তাহার উৎস স্থানে বসিয়া নির্ণয় করা যায় না। সে সমতল ভূমিতে আসিয়া যখন বিপুল ধারায় কুল ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতে থাকে তখন তীরভূমি রক্ষার জন্য উহা স্থানে স্থানে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এমন স্থান আছে যেখানে বাঁধ কিছুতেই দাঁড়ায় না। পদ্মার তীরের অনেক লোকালয় সরাইয়া লইতে হইয়াছে, আগে যেখানে মহকুমা ও রেলওয়ে ষ্টেষণ ছিল এখন সেখানে জলরাশি। কেন স্থল বিশেষে নদীর বেগ বাড়িতেছে সাধারণ লোকের তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। কিন্তু যখন ভাঙ্গন ধরে, যখন ফাটার রেখা দেখা যায়, যে সুবুদ্ধি ও সাবধান সে ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া নিরাপদ স্থানে গিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করে।

আমাদের এই আলস্য প্রধান দেশে অস্থাবর জিনিষকে স্থাবর এবং সাময়িককে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা প্রবল। কারণ স্বয়ং চিন্তা করিয়া কোন বিশেষ লক্ষ্যের অনুসরণ, পুরাতনের শোধনবর্জ্জন লোকের অপ্রীতি উৎপাদন করে। পুরাতন বিধির ও ঋষি বাক্যের দোহাই দিয়া কোন প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা দেওয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে যখন নিদ্রা সহজে আসেনা, তখন নিয়ম পূর্ব্বক জপতপ নিয়মাদি রক্ষা করাই স্বভাবিক। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে দেশের লোক যেন জাগিয়া উঠিতেছে। সমস্ত দেশের নিদ্রিত অবশ অঙ্গে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পর্ব্বত পৃষ্ঠে সঞ্চিত তুষার গলিয়া নদীধারারূপে নামিয়া আসিতেছে।

যখন দেশপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার রব প্রথমে এদেশের আকাশে উঠিল, তখন উহার সহিত 'তথাকথিত' সনাতন ধর্ম্মের বিরোধ কেহ অনুভব করেন নাই। [আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না, আমি সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী নই কিন্তু বর্ত্তমান সনাতন শব্দের ব্যাখ্যার বিরোধী।] স্বাদেশিকতা বিদেশের আমদানী হইলেও উহা আমাদের লজ্জার আবরণ বস্ত্রের মত, আমাদের দৈনিক অন্নের সঙ্গে বিলাতী লবনের মত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য,—না হইলে চলে না।

স্বদেশপ্রীতি কি পূর্ব্বে দেশে ছিল না?—ছিল বই কি। লবণ ও তো ছিল এবং আছে।

কিন্তু আমাদের তাঁতির দল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, আমরা কাপাসের চাষ করিতে ও সূতা কাটিতে ভুলিয়া গিয়াছি; সমুদ্র জল হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে লবণ সংগ্রহ করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা আজ বিদেশীর হাত হইতে আমাদের স্বদেশপ্রীতির শিক্ষাও গ্রহণ করিতেছি। আমরা অনেক কাল দেশকে চিনি নাই, আপনার বলিতে শিখি নাই। সম্প্রতি চিনিতে ও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি।

স্বাদেশিকতা কেন সনাতন সামাজিক বিধির উচ্ছেদ বা রূপান্তর ঘটাইবে তাহা বলি। পুরাতন সনাতন ধর্ম্মের এক প্রধান দুর্গ জাতিভেদ—জাতি বিশেষের প্রাধান্য ও অকারণ সম্মান এবং নিম্ন জাতির মনুষ্যত্বের অকারণ অবমাননা। পাশ্চাত্য শিক্ষার কামানে এই দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ হইয়াছিল; স্বাদেশিকতার প্রবাহ যদি সত্য সত্যই বহে, ইহার মূল নিশ্চয়ই শিথিল হইবে, Homerule বা স্বরাজের ভূমিকম্পে উহা ধূলিসাৎ হইবে। জন সাধারণের সুপ্ত শক্তির জাগরণে ধর্ম্মের রূপ, সমাজের রূপ, সামাজিক আচার ব্যবহারের রূপ পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না। এই পরিবর্ত্তনের বীজ বহুদিন হইল উপ্ত হইয়াছে।

আমি আবার বলি, আজ যাহাকে সনাতন বলা হইতেছে তাহা সনাতন বলিয়া ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে না। **সনাতনের ভিত্তি আরও গভীরতর, আরও প্রশস্ততর হওয়া চাই।** বন্ধুর পর্ব্বতপৃষ্ঠের বিধিনিষেধ সমতলপ্রবাহিনী ভাগিরথী মানিয়া চলিবেনা।

পৃথিবীপৃষ্ঠের যুগব্যাপী পরিবর্ত্তনের মত মানব সমাজেও যুগান্তর আছে। সমস্ত মানবসমাজের উপর দিয়া অল্পাধিক পরিমাণে তাহার প্রভাব ও চিহ্ন সে রাখিয়া যায়। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক পুরাতন জীব ও উদ্ভিদের ক্রমপরিবর্ত্তন ঘটে, অনেকে ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হয়। পৃথিবী তথাপি জীব ও উদ্ভিদে পরিপূর্ণা থাকে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরও সমাজ থাকিবে, নীতিধর্ম্ম থাকিবে, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচার থাকিবে। কারণ নীতি ও ধর্ম্ম ছাড়া সামাজিক জীবন হয় না এবং সমাজবদ্ধ না হইয়া মানুষ থাকিতে পারে না।

স্বাদেশিকতা দৃঢ় করিতে হইলে হিন্দু-ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা দূর করিতে হইবে। স্বর্গীয় ভূদেব বাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিরোধ নাই, কোন জাতির সঙ্গেই আর কোন জাতির বিদ্বেষ বা দ্বন্দ্ব নাই। কেহ কাহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান ও জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির কর্ম্ম ও অধিকার পাইবার জন্য ব্যগ্র নয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা একথা অপ্রমাণ করে। কোনো মানুষ ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে অপর হইতে হীন মনে করিতে বা অপরের দ্বারা হীন রূপে আচরিত হইতে চাহে না। সেরূপ করিতে চাওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। বহু কালের অভ্যাসে হীনত্বের ধারণা এদেশের নিম্ন শ্রেণীর মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই'

কিন্তু ভিন্নজাতীয় রাজার শাসনে এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন এই হীনতাবোধ তাহাদের লজ্জা ও ক্রোধের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। হীন যাহাদিগকে বলা হয় তাহারা আর হীন থাকিতে প্রস্তুত নহে। শুনিয়াছিলাম পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রেরা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষাল ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে এবং কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিতেছে।

স্বরাজ সম্ভব করিতে হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার এবং সেই সঙ্গে নারীদেরও শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষাই মানুষে মানুষে সমতাবিধান করিতে সমর্থ। মৈত্রী ও স্বাধীনতাও শিক্ষাবিহীন হইলে দলাদলি ও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইবে। শিক্ষার উপরেই ধনবৃদ্ধি, আত্মসম্ভ্রম ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

কেহ কেহ বলেন এদেশে কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জেতা-বিজিত সম্বন্ধ হইতেই জাতিগত বৈষম্য এত কষ্টদায়ক হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "জাতিভেদ ইউরোপ আমেরিকায় কি নাই ?" আছে সত্য, কিন্তু জাতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া উন্নত জাতিতে যাইবার বাধা সেখানে নাই। সেখানে ছোট বড় হইতে পারে, এখানে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কিন্তু কালে পারিবে। জাতির কঠিন বন্ধন শিথিল হইতেছে। যখন জন্মগত জাতিভেদ দূর হইবে তখন যদি কর্ম্মানুসারে ও গুণানুসারে জাতিভেদ আসে, আসুক। আজ উপরের দিকে গতিরোধ করিবার আমরা কে ?

উপরের দিকে উঠিবার পথরোধ করিয়া আমরা দেশের শক্তি নিষ্ক্রিয় রাখিয়াছি, আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছি। অনেকে এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে কায়স্থের উপবীতগ্রহণ এবং 'বর্ম্মন' উপাধিগ্রহণ উপরের দিকে উঠিবারই অতি স্বাভাবিক চেষ্টা এবং সেই হিসাবে দূষণীয় নহে। বঙ্গের নমঃশূদ্রাদির এবং মান্দ্রাজে পঞ্চমদিগের চেষ্টায় কেন কেহ বাধা দিবে ?

জাতিভেদ কথাটার আর একটা দিক্ আছে। সবর্ণবিবাহ জাতিভেদ প্রথার এক অভেদ্য প্রাচীর ছিল। হিন্দুনামধারী কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অসবর্ণ বিবাহকেও হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রসার এবং উদারতা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই তো পদ্মার এককূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর ভিক্ষুব্রত গ্রহণে একান্ত আকাজ্ক্ষা জানিয়া এবং বুদ্ধদেবের সে বিষয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি ভিক্ষুত্ব ও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ কি না। সত্যের অনুরোধে মহাপুরুষ নারীর সে সামর্থ্য অথবা অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নারীর উচ্চশিক্ষা একদিকে তাহাকে কুমারী ব্রহ্মচারিণী থাকিবার, অপর দিকে আপন রুচি অনুসারে ভিন্নজাতীয় কিন্তু অন্যথা সুযোগ্য পাত্রকে বরমাল্য দিবার অধিকার দিবে।

নারীর শিক্ষা কতখানি হওয়া সম্ভব, নারীজাতির মধ্যে সেক্ষপীয়র ও গেটে (Shakespeare ও Goethe) সদৃশ বড় কবি, থ্যাকারে ও ডিকেন্স এর (Thackeray ও Dickens) মত ঔপন্যাসিক, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলোর (Raphael ও Michael Angeloর) মত বড় চিত্রকর, বাক ও বিথোন এর (Bach ও Beethoven) মত বড় বাদক হইতে পারে কিনা সে তর্কের প্রয়োজন এখানে নাই। পুরুষের মস্তিষ্ক হইতে নারীর মস্তিষ্ক কত কম, দেহের ওজনের অনুপাতে পুরুষ নারীর মস্তিষ্কের সমানুপাত কিনা, গুণ ও মাত্রায় উভয় মস্তিষ্কের কত তারতম্য, এ সকল বিচার করিবারও সময় এখনও আসে নাই। আমাদের প্রয়োজন সুস্থসবল কর্ম্মিষ্ঠ জাতীয়জীবন, অকপট উদার ধর্ম্মজীবন। নারীকে বাদ দিয়া, নারীশিক্ষা অবহেলা করিয়া সে জীবন গড়িতে পারে না। যাহা কিছু আজকাল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও শিক্ষার মঙ্গল প্রভাবে, এই কথাই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এবারকার কংগ্রেসে নারীপুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে বৈদিক গান

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্

সমানঃ মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী ইত্যাদি।

তথাকথিত সনাতন ধর্ম্ম কি নারীকে বেদোচ্চারণে অনধিকারিণী করে নাই? আমাদের দেশে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রের বহুলচর্চ্চা এই যুগেই তো আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধারের পথ দেখাইল কে?

দেশের লোক সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। যাহা কেবল সময়ে আসে, তাহা বিদেশের ঝড়বাতাসে আসে। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির মতই দিগ্‌বিদিক না দেখিয়া আসে, কিছু ছাড়ে না, কিছু রাখে না, কাহাকেও নির্দ্দোষ বলিয়া বাঁচায় না, সম্মুখের সমুদয় ভাঙ্গিয়াচুরিয়া, ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, চলিয়া যায়। প্রকৃতি দেবতার অজ্ঞান বলিষ্ঠ ভৃত্য, মানুষ দেবতার সহকর্ম্মী—হৃদয়বান্ ও চক্ষুষ্মান্। প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায়, সে আপনার বিনাশের মুখে দাঁড়ায়। বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া যে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করে, সে ভাঙ্গন-ধরা কূল ছাড়িয়া দৃঢ় ভূমিতে বাসা বাঁধে।

শ্রীকামিনী রায়।

জাগরণী

(গীত)

জাগরে আমার আমি,
জাগরে দেহের স্বামী,
নূতন আলোকে স্ফূর্ত্ত,
জাগো—জাগো !

জাগরে শকতি সুপ্ত,
জাগরে চেতনা গুপ্ত,
আজিরে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত,
জাগো, জাগো !

কি আছে তোমার মাঝে
লাগুক ভবের কাজে
বোলোনা কিছুই নাই
বো'ল না গো।

এ চিত্ত অথবা দেহ
নিষ্ফলে যাবেনা কেহ
আসেনা স্নেহ মিছাই—
জেনো তা গো।

মোর ভিতরের আমি
বিশ্বের আনন্দকামী
নিখিল মঙ্গল মাগো
আজি মাগো।

অল্পে করিয়া তুচ্ছ,
দৃষ্টি করিয়া উচ্চ,
অক্ষয় আলোকে জাগো—
আজি জাগো।

শ্রীকামিনী রায়

ভারতবর্ষীয় অর্থনীতির বিশেষত্ব

অনেকের মতে ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সকল দেশে ও সকল সময়েই প্রয়োজ্য সুতরাং পৃথক্‌ভাবে ভারতবর্ষীয় অর্থনীতি (Indian economics) বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান এক এবং সার্ব্বভৌম, দেশ ও কালভেদে বিজ্ঞানের রূপান্তর হয় না। বিজ্ঞানের কোন জাতি নাই ; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান. প্রত্যেক জায়গায়ই বিজ্ঞানের নিয়ম (law) সমভাবে পালিত হইয়া থাকে। অর্থনীতিকে বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করিলে তাহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না, সুতরাং ভারতের ধন উৎপাদন ভোগ ও আদান প্রদান বিষয়ক কার্য্যকলাপ এই বৃহত্তর বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে, এবং পৃথক্‌ভাবে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান বলিয়া কোনো অধীতব্য বিষয়ের আবশ্যকও সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়।

শুধু ভারত বলিয়া নহে, প্রত্যেক দেশেরই ধন উৎপাদন, ভোগ ও আদান প্রদান বিষয়ে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যদি প্রত্যেক দেশই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া পৃথক অর্থনীতির দাবী করে, তাহা হইলে এই দাবীর কোলাহলে ধনবিজ্ঞান নামক শাস্ত্র, যাহা মানবের অর্থবিষয়ক চিরন্তন বৃত্তিসমূহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রতি অবিচার ও অনাস্থা প্রদর্শন করা হয়।

এই সকল কারণে কোন কোন লেখক ভারতীয় অর্থনীতি নামক এক পৃথক্ বিষয়ের সত্তা মানিয়া লইতে পরাঙ্মুখ। ইঁহাদের মতবাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে সত্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি যদি দেশভেদে বিভিন্নমুখী হয় তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে এক সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী করার চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। যে স্থলে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে, সে স্থলে ঐ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করা সদ্বিবেচনার পরিচায়ক নহে, ঐ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাতে যে অদৃশ্য নিয়ম ও শক্তি আছে তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয়গণের আচারব্যবহার, কর্ম্মপ্রণালী ও জীবনযাপনের প্রথার মধ্যে অনেক দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও ভারতের প্রত্যেক গ্রাম ধনোৎপাদন ও ভোগ বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল ছিল। গ্রামের লোকজন প্রাচীন গ্রীশের নগররাষ্ট্রের (City state) অধিবাসীর মত জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য গ্রামের মুখাপেক্ষী ছিল না। ভারতে গোষ্ঠী (Community) এবং পরিবার (Family) চিরকাল ব্যক্তির (individual) উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। এদেশে ব্যক্তি পরিবারের অঙ্গ, অংশ মাত্র, পরিবারচ্যুত ব্যক্তি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় (economic

unit) নহে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি প্রত্যেক ব্যক্তির ধনোপার্জ্জন ও ভোগক্ষেত্রে স্বাধীন সত্বা স্বীকার করিয়া লয়। ভারত পরিবার ও গোষ্ঠীকে বড় করিয়া দেখে, পাশ্চাত্য ব্যক্তিকে বড় করিয়া দেখে। ভারতের বর্ণবিভাগও এতদ্দেশীয় ধনবিজ্ঞানকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের সহিত বৈশ্যের, বৈশ্যের সহিত শূদ্রের, ক্ষৌরকারের সহিত তন্তুবায়ের, তন্তুবায়ের সহিত কুম্ভকারের, কুম্ভকারের সহিত মৎস্যব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা নাই। প্রত্যেকে ঐ পিতৃপিতামহের জীবিকা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, অন্য কোনো পথ অবলম্বন করিলে বেশী অর্থাগম হইতে পারে কিনা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। অবাধ প্রতিযোগিতা—এই ধারণার উপরে পাশ্চাত্যের ধনবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে, ভারতে এই অবাধ প্রতিযোগিতার অত্যন্ত অভাব।

দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বিশাল আয়োজন, ইহাও দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এই দৃষ্টান্ত প্রণোদিত হইয়া মোরল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন—"সাধারণতঃ অর্থনীতি ধনসম্পত্তির আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ধনসম্পত্তি নহে, ধনসম্পত্তির অভাব।"

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন, ভারত চিরকাল ধন উৎপাদন ভোগ ও বণ্টন বিষয়ে তাহার কৌলীন্য, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে, সুতরাং পৃথকভাবে ভারতীয় অর্থনীতি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তাও চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। এ বিষয়ে সহসা মত প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ রেল ও ষ্টীমারের প্রচলনের পরে গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা চলিয়া যাইতেছে, জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে একান্নবর্ত্তী পরিবারও ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃ প্রতিযোগিতা সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইতেছে। জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, তন্তুবায়, রজক, মুসলমান, শিখ, চাকরী কিম্বা আর যে কোন উপায়ে ধনোপার্জ্জনের জন্য লালায়িত হইতেছেন। এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, ভারতবর্ষ আজকাল একটী বৃহৎ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পরিবর্ত্তনের পরে দেশ যে কি অবস্থায় উপনীত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। যদি ভারতবর্ষ কোনো প্রকারে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে তাহা হইলেই এ দেশে পৃথকভাবে অর্থনীতি অধ্যয়নের উপযোগিতা থাকিবে, নচেৎ কালক্রমে ভারতীয় অর্থনীতি বৃহত্তর ধনবিজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে ধীরে ধীরে মিশাইয়া ফেলিবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

ভারতবর্ষের মূর্ত্তিশিল্প

হিন্দুর মূর্ত্তিতত্ত্ব হিন্দুর ধর্ম্ম ও শিল্পকলার অভিব্যক্তিরই একটি বিশেষ প্রকাশ। এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিতে হইলে হিন্দুর সাধারণ ঐতিহাসিক ধারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ঐতিহাসিক রীতিকে বর্জ্জন করা যেমন অসঙ্গত, সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক ধারণা লইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়াও তেমনি অসমীচীন। একজন পরম উৎসাহী লেখক বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পকলা একটি অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রূপের সমুদ্র ; রূপ সেখানে অলক্ষ্যে পরস্পর মিলিত হইতেছে ও রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। অথচ যে অসীম জ্ঞানাতীত চিরন্তন সত্তা বহু-বিচিত্র বিশ্বসত্তাকে চিরকাল অবিরাম রূপ হইতে রূপান্তর দান করিতেছেন, ইহা তাঁহারই লীলার প্রতীকস্বরূপ। পক্ষান্তরে আরেকজন বিজ্ঞ ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সুলভ ধীরতার সহিত বলিয়াছেন, মোটের উপর একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ভারতীয় শিল্পকলা ধর্ম্মভাবের দাসমাত্র, অতএব বেশ বলা যায় যে ভারত বর্ষে যথার্থ চারু শিল্প নাই !

উদ্ধৃত উক্তি দুইটি হইতে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক ধারণা লইয়া সহসা এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও তেমনি বিপজ্জনক। অতএব এই উভয় পন্থাই সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তবে ভারতীয় শিল্পের স্বরূপনির্ণয়ের প্রকৃত পথ কি ? সে পথ হইতেছে হিন্দুর ইতিহাসের বহু বিচিত্র দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুর শিল্পের বিচিত্র উপাদান ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী নিরূপণের চেষ্টা করা। এই উদার প্রশস্ত ঐতিহাসিক আলোচনা রীতির জটিলতা ও সর্ব্বাঙ্গীণতা সম্বন্ধে মঁসিয়েঁ সিলভ্যাঁ লেভি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এমন সুন্দর করিয়া আর কেহই বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, নানা দেশ ও সভ্যতার সহিত নানাভাবের যোগ রহিয়াছে বলিয়া ইতিহাসের দিক দিয়া ভারতবর্ষের স্থান অতি উচ্চ এবং মহিমামণ্ডিত। প্রাচীন আর্য্যগণের সহিত ভাষা ও ধর্ম্মে ইহার যোগ—ইরাণের সহিত ভাষা ও ধর্ম্মবন্ধনের নিবিড়তর যোগ ;—Achemenian বিজয়ের জন্য পারস্যের সহিত, আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের জন্য গ্রীসের সহিত, বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য চীনের সহিত এবং তিব্বত, হিন্দুচীন ও মালয় উপদ্বীপে আপন সভ্যতা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষ আপন যোগ অব্যাহত রাখিয়াছে ; সুতরাং বর্ত্তমানে পরম্পরবিচ্ছিন্ন প্রাচীনজগতের দুই অংশের ভারতবর্ষই অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করিতেছে।

ভারতীয় শিল্পে আর্য্য উপাদান

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে গেলে প্রথমেই ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, কখন, কিরূপে, কাহাদের প্রতিভাগুণে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল? ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হইতেছে বেদ। সেই বেদে কোন দেবতার মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ বা ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, এমন কি প্রধান প্রধান ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্যভাষাগুলির শব্দবিশ্লেষণ করিয়াও আর্য্যদের মধ্যে ব্যক্তিত্বশালী সগুণ ঈশ্বরের ধারণা ছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ এই ব্যক্তিত্বশালী সগুণ ঈশ্বরের ধারণা ব্যতীত মূর্ত্তিশিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক মেইয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম্ম নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, প্রাগ্ ঐতিহাসিক ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় আমরা মূর্ত্তিপূজার পরিচয় পাই না; যেখানেই ইন্দোইরোপীয় যুগের সভ্যতার স্বল্পঅগ্রসর কোন জাতির কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি - তাহা হইতে ব্যক্তিত্বশালী সগুণ দেবতার অস্তিত্ব ছিল না ইহাই মনে হয়। ইন্দোইয়োরোপীয় ভাষার 'নাম'গুলি আলোচনা করিলেও এই মতই প্রমাণিত হয়।

বৈদিক দেবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই তিন মণ্ডলে স্থাপিত করা হইয়াছে; প্রতি ভাগে এগারো জন করিয়া দেবতা। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের একেকটি বিকাশকে খানিকটা কল্পনা ও খানিকটা অধ্যাত্ম-ধারণার সাহায্যে দেবত্বদানের দ্বারাই এই বৈদিক দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে। আপাততঃ বৈদিক ধর্ম্মকে বহুদেববাদী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' প্রভৃতি অতি মহান ছন্দোবাক্যের দ্বারাই বোঝা যায় যে ঐ বহুদেববাদের ভিতরেও একটি অতি গভীর একেশ্বরবাদের ধারণা নিহিত রহিয়াছে।

বৈদিক মন্ত্রসাহিত্যের পরে ব্রাহ্মণসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে বহুদেববাদ হইতে একদেববাদে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে। মন্ত্রসাহিত্যের শেষ দিকে "পুরুষের" ধারণা হইতে মনে হয় যে বহুদেবের ক্রমশঃ একদেবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িতেছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণসাহিত্যে এই একদেবত্বের ধারণা যজ্ঞের ধারণার নিকট অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরোহিতগণ ব্যক্তিত্বশালী সগুণ দেবগণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কারণ ব্যক্তিত্বহীন যজ্ঞের আদর্শই তাঁহাদের সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া ছিল। আদর্শ যজ্ঞই ক্রমে পুরোহিতগণের নিকট একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখা দিল; যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গের যথোচিত সমাবেশই পুরোহিতগণের চক্ষে ঐ সত্তাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিল। এইরূপে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগেই ভারতবর্ষের মন বিশ্বের আদি

কারণের স্বরূপধারণার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল; এই আদিকারণের স্বরূপসন্ধানের প্রয়াস হইতেই আরণ্যক ও উপনিষদের নিগুর্ণ ঈশ্বরের উপলব্ধির পথ পরিষ্কার হইয়া রহিল। ভারতবর্ষের মন যে পরবর্ত্তী কালে সগুণ অথচ গুণাতীত ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অবিরাম প্রয়াস করিয়াছে, এই সময় হইতেই তাহার সূচনা হয়। ইহার হিন্দুর ধর্ম্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু এই উচ্চ আদর্শ কখনও হিন্দুর মূর্ত্তিশিল্পের বিষয়ীভূত হয় নাই।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে দেখিতে পাই যে তপস্যা এবং যোগের আদর্শ যজ্ঞের আদর্শকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারিত, এমন কি সময় সময় দেবগণকেও বশীভূত করিতে পারিত! এই নূতন আদর্শ ও প্রক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন যোগীরা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা লাভ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি ভেল্কি, যাদু ও ঘোরতর কুসংস্কারের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তপস্যা কিংবা যোগ—কোন আদর্শই মূর্ত্তিশিল্পের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও প্রেরণা দান করে নাই।

যখন মহাবীর ও বুদ্ধদেব নবজাগরণ ও মুক্তির বার্ত্তা লইয়া এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে একদিকে যাগযজ্ঞ ও অন্যদিকে কঠোর তপশ্চর্য্যার আদর্শ বিদ্যমান ছিল; এই তথ্যের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক অর্থ নিহিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ প্রথম হইতেই যাগযজ্ঞের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন; অথচ সম্বোধিলাভের পূর্ব্বে তাঁহাকেও কিছুদিন তপশ্চরণ করিতে হইয়াছিল; তপস্যার আদর্শকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু দেবতা বা দেবতার ধ্যান তাঁহার চিত্তকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। দেবতার মূর্ত্তিকল্পনা যদি তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একটি অত্যাজ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে যাগ-যজ্ঞের সঙ্গে মূর্ত্তিপূজাও তাঁহার কঠোর আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইত না। বৌদ্ধধর্ম্মের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোকও সর্ব্ব বিষয়েই বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিকের নিকট নিরর্থক নহে। সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহে আমরা যজ্ঞের নিন্দা দেখিতে পাই, কিন্তু দেবতা বা দেবমূর্ত্তিসম্বন্ধে তিনি কোথাও কিছুই বলেন নাই। সম্রাট্ অশোক ভারতে প্রস্তরশিল্পের পথপ্রদর্শক; তিনি স্বীয় রাজত্বকালে বহু প্রকারের শিল্প প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অথচ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ধর্ম্মগুরু ভগবান্ তথাগতের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মান করাইতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না! ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের ইতিহাসে এই তথ্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।

বৈদিক যুগের ঐতিহাসিক আনুপূর্ব্বিকতার সমস্যা ছাড়িয়া দিয়া আমরা সম্পূর্ণ রূপে প্রাত্নতাত্বিক নিদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ

প্রাচীন নিদর্শন হইতে আমরা কি দেখিতে পাই? এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত এঙ্গোরার নিকটবর্ত্তী বোগাজকোয় নামক স্থানে একটি প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐ প্রত্নলিপি হইতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্র বরুণ মিত্র ও নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) নামক কয়েকজন বৈদিক আর্য্য দেবতার পরিচয় পাই। বোগাজকোয় লিপির সময় হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুর দেবকল্পনার অভিব্যক্তি অনেক পর্ব্ব অতিক্রম করিয়াছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও হিন্দু রাজারা কিম্বা শিক্ষিত হিন্দুগণ তাঁহাদের দেবকল্পনাকে প্রত্যক্ষ রূপদান করার প্রেরণা একটুও অনুভব করিলেন না। এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদের জ্ঞাতি ইরাণী আর্য্যগণও বহুদিন পর্য্যন্ত সরূপ ঈশ্বরের উপাসনার প্রেরণা অনুভব করেন নাই; তাঁহারাও বৈদিক আর্য্যগণের মত দ্যাবা পৃথিবী, অপ্যন্নপৎ (অগ্নি ও জল) প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তির বিকাশকে পূজা করিতেন। অবশেষে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুষ্ট্র আসিয়া ইরাণীদের মধ্যে অহুর মজদার উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন; সেই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে একদেববাদ চলিয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পার্শীদের অগ্নি উপাসনার মধ্যে প্রাচীন যজ্ঞপ্রথার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। ইন্দো-ইরাণ ইতিহাসের এই সমগ্র যুগটার মধ্যেই মূর্ত্তিশিল্পের বা ধ্যানকে রূপ দান করার প্রয়াসের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না, সুতরাং এই যুগকে মূর্ত্তিহীন যুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সময়ের অর্থাৎ অশোকের রাজত্বের পরবর্ত্তী পাঁচ শত বৎসরের (খৃঃ পূঃ ২০০—খৃষ্টিয় ৩০০) মধ্যে এই অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল এবং মৌর্য্যবংশের পতন ও গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্ত্তী কয়েক শত বৎসরে ভারতবর্ষে মূর্ত্তিশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে দ্রাবিড় উপাদান

মূর্ত্তিহীন যুগ হইতে মূর্ত্তির যুগে প্রবেশ করার পূর্ব্বে এই গোড়ার কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল আর্য্যইতিহাসই নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষত্বই এই যে, ভারতবর্ষের মনন শক্তি ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানসমূহকে কখনো বৈচিত্র্যহীন ও একাকার করিয়া ফেলে নাই, বরঞ্চ ইতিহাসের বিচিত্র উপাদানকে যথাস্থানে রাখিয়াই তাহাদের মধ্যে যথোচিত সমাবেশ ও সমন্বয় সাধনের দ্বারা এক অপূর্ব্ব নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতা ও শিল্প বিদ্যার মধ্যে যত অনার্য্য উপাদান গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড় উপাদানই সর্ব্বপ্রধান। আর্য্য প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগঠনের অভ্যাসহেতু স্বভাবতঃই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অলক্ষ্যে আর্য্যগণের প্রতি

পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্রাবিড় অনুষ্ঠান ও দ্রাবিড় শিল্পকলার সম্যক্ আলোচনার দ্বারাই আর্য্যগণের প্রতি এই অন্ধ অনুরাগ অপনীত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দ্রাবিড় সভ্যতার যথেষ্ট আলোচনা করার সুযোগ এখনও হয় নাই। তথাপি ক্রুক্ উত্তর ভারতের দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন এবং ফ্রেজার দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আর্য্য দ্রাবিড়সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ঘটনাপরম্পরার আনুপূর্ব্বিক বিবরণই সভ্যতার ইতিহাসের বিষয় নহে; পরন্তু এক সমাজের উপর আরেক সমাজ, এক ধর্ম্মের উপর আরেক ধর্ম্ম, এক নৃসম্প্রদায়ের উপর আরেক নৃসম্প্রদায় যে সূক্ষ্ম ও গূঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং তাহাতে পরস্পরের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহারই যথোচিত বিশ্লেষণ ও আলোচনার দ্বারা সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে। সুতরাং কেবল অতীতের সংগৃহীত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যথার্থ ইতিহাসের পরিচয় পাইব না; আমাদিগকে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানের আলোকেই অনেক সময় অতীতের যথার্থ অর্থটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আর্য্যসভ্যতার উপর দ্রাবিড়গণ অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দ্রাবিড়গণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজেদের ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার ও বুদ্ধি হইতে এক স্বতন্ত্র দেবসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল,—সূর্য্যদেব, চন্দ্রদেব, বৃক্ষদেব, সর্পদেব প্রভৃতি অদ্ভুত অন্-আর্য্য দেবপূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এই সমস্ত পূজার মধ্যে পৃথিবীমাতার পূজাই ছিল সর্ব্বপ্রধান, আর এই পৃথিবীমাতার পূজা হইতেই পরবর্ত্তী কালের হিন্দুধর্ম্মের শক্তিপূজার উদ্ভব হইয়াছে। ফ্রেজার বলিয়াছেন, "আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেক আবর্জ্জনাই দ্রাবিড়-দেবতা ও দ্রাবিড়ধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে।" নৃতত্ত্ববিদ্গণ সর্ব্বদাই এমন সব অদ্ভুত গ্রাম্য দেব দেবীর সন্ধান পাইতেছেন যাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম এখনও ভালরকম আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব্বপুরুষপূজা, বীরপূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্য করিয়া অতি আদিম অবস্থাতেই দ্রাবিড় ধর্ম্মে মানুষের মূর্ত্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। প্রতীকের আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম-ভাব প্রকাশ করার প্রথা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। সুতরাং হিন্দুর মূর্ত্তিশিল্পের উদ্ভবের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, বৈদেশিক আমদানি ও দেশী অনুকরণের অতি সুবিধাজনক মতটি গ্রহণ করিবার আগে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত মূর্ত্তিশিল্প এদেশেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইতে পারে কি না। আমাদের দেশে দেবদেবীর যে সমস্ত প্রতীক রহিয়াছে, গৃভীরভাবে সেগুলির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকটি প্রতীকের একটি অতি সুদীর্ঘ ইতিহাস

আছে, মানুষের মন হইতে এই সমস্ত প্রতীকের সৃষ্টি হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল; অথচ উহাদের আদিম উৎপত্তির কাহিনী গভীর জটিলতা ও দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের মূর্ত্তিশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সহসা কোন মত প্রকাশ করা নিরাপদ নহে। তথাপি একথা বলিতে পারি যে, যে সময়ে আর্য্য ও দ্রাবিড়-প্রতিভার পরস্পর সমন্বয় ঘটিয়াছিল সে সময়ে আর্য্যপ্রতিভা ছিল প্রধানতঃ ধ্যান-পরায়ণ ও অধ্যাত্ম-মুখীন, আর দ্রাবিড়-প্রতিভা ছিল কলাকুশল। আর্য্য-প্রতিভাই ভারতবর্ষের দর্শন ও সাহিত্য দান করিয়াছে, পক্ষান্তরে দ্রাবিড়-প্রতিভা হইতে দেবতা বিষয়ক আখ্যানাদি ও শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছে; এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যেরা যদিও দ্রাবিড়দিগকে অন্য সকল রকমে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, তথাপি দ্রাবিড়েরা শিল্পকলা সম্বন্ধে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড়গণ সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পারিলেও শিল্পবিদ্যা ও শিল্পব্যবসায়কে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। কলাবিদ্যাসম্পর্কে দ্রাবিড়েরাই সম্ভবতঃ আর্য্যদের শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কলাবিদ্যায় দ্রাবিড়গণ আর্য্যদের অপেক্ষা নিপুণ ছিল বলিয়াই অনার্য্য শিল্পীরা বিশেষ পারিশ্রমিক পাইত এবং রাজশক্তি তাহাদের স্বার্থকে বিশেষভাবে রক্ষা করিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শিল্পব্যবসায়ীদিগকে হত বা আহত করার অপরাধের জন্য বিশেষ গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আর্য্যপ্রভুরা অনার্য্য-শিল্পীদিগকে রীতিমত সম্মান করিতেন, কারণ অথর্ব্ব বেদে দেখিতে পাই যে ব্রাত্যপূজা নামক অনুষ্ঠানে অনার্য্য শিল্পীদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

আর্য্যদ্রাবিড় সঙ্গতি

এই আর্য্য ও দ্রাবিড়-প্রতিভার সঙ্গতি হইতে, এই উভয় জাতির মানসক্ষেত্রে দর্শন ও কলার পরিণয় হইতেই মহান্ হিন্দুশিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল। এই হিন্দুশিল্প, জগতের ইতিহাসে সভ্যতার সমন্বয়ের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! হিন্দুশিল্পে রূপ এবং অরূপের, প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয়ের এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে; এই শিল্পে আমরা একটা বিরাট্ প্রতীকের আদর্শ দেখিতে পাই, একটা অদম্য অধ্যাত্মপিপাসার সহিত আরেকটা দুর্ণিবার নিসর্গপ্রবণতার সম্মিলন হইতে এই মহান্ প্রতীকাত্মতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রতীকাত্মক শিল্পই আর্য্য ও দ্রাবিড় এই দুই জাতির মনোজগতে আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময়ের সংযোগসূত্ররূপে কার্য্য করিয়াছিল। এই সংযোগই ছিল প্রাচীন হিন্দু শিল্পসৃষ্টির স্বরূপ। হিন্দুশিল্পের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে কেবল প্রাচীন প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহের আলোচনা করিলেই চলিবে না, সেই প্রত্যক্ষের

ভাবকে অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে শিল্পীর স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, শিল্পের শুধু মূর্ত্তপ্রকাশের পরিচয় পাইলেই চলিবে না, তাহার অন্তর্নিহিত অমূর্ত্ত ভাবময় রূপকেও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যিনি হিন্দুর এই প্রতীকাত্মক শিল্পের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন তিনি এখনও আবির্ভূত হন নাই।

এই আর্য্যদ্রাবিড় শিল্প শুধু মনের কল্পনা নহে, উহা একটি বাস্তব সত্য। এই আর্য্য-দ্রাবিড় শিল্পের আদি নিদর্শনসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ এই শিল্পের আদি বাহন ও উপাদান ছিল কোনও নশ্বর বস্তু। সার জন্ মার্শাল অতি সুনিপুণভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পের প্রথম প্রেরণা আসিয়াছিল বিদেশ হইতে; কিন্তু মথুরা, বুদ্ধগয়া, বরহুত, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি প্রাচীনতম শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই, উহা বাহিরের আমদানি নহে। ডাক্তার গেম্বার্ড্নারের মত শিল্পের দক্ষ সমালোচকগণ বলেন যে ভারতীয় শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে তন্মধ্যে মৌর্য্যশিল্পই প্রাচীনতম, অথচ এই মৌর্য্যশিল্প যে ভারতীয় শিল্পবিদ্যার প্রাথমিক অবস্থার পরিচায়ক নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, বরঞ্চ এই নিদর্শনসমূহে শিল্পবিদ্যার পরিণত অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের প্রথম উদ্ভব হইল কি প্রকারে? মঁসিয়ে ফুশে এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বরহুত এবং সাঁচীর শিল্পকলা যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রতিভা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।......প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা প্রথমত কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, ও স্বর্ণের ভিতর দিয়াই আপনাদের শিল্প-প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই ভাবেই প্রথম ভারতীয় শিল্পীদের হাত পাকিয়াছিল। এই সমস্ত আদিম শিল্পীদের বংশানুগত দক্ষতার মধ্যেই ভারতীয় শিল্পের প্রথম উদ্ভবের অনুসন্ধান করিতে হইবে! অতএব দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমজদার নিজেই অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিকতা স্বীকার করিয়া লইতেছেন। কাজেই বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও ভারতে শিল্পবিদ্যা ছিল একথা বলা অসঙ্গত তো নহেই, বরং একথা না মানিলে পরবর্ত্তী ভারতীয় শিল্প-প্রকাশের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। ডাক্তার গ্রুন্‌ওয়েডেল বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ প্রভাব হইতেই ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে; তাঁহার এই কথা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না।

আর্য্য-দ্রাবিড় শিল্পকলার যে সমস্ত প্রাচীনতম নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকল হইতে বেশ বোঝা যায় ঐগুলি নির্ম্মিত হওয়ার সময় ভারতীয় কলাবিদ্যা প্রকাশভঙ্গীতে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। (কাষ্ঠাদি) নশ্বর বস্তুর পরিবর্ত্তে প্রস্তরকে

শিল্পের বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া সম্রাট অশোক এই সমস্ত অমর সৌন্দর্য্যের নিদর্শনসমূহকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং চিরকালের শিল্পবিদ্যার্থীদের অক্ষয় কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কোন সম্রাটের একটি অনুশাসনের দ্বারাই সহসা দেশে এক নূতন শিল্পবিদ্যা প্রবর্ত্তিত করিয়া ফেলা যেমন অসম্ভব, কোন এক বৈদেশিক শিল্পবিদ্যার ধারা সহসা অন্য এক জাতির মধ্যে চালাইয়া দেওয়াও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং সম্রাট অশোকই ভারতীয় শিল্পকলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন একথা বলা যেমন অসঙ্গত, বৈদেশিক গ্রীক্‌জাতি ভারতবর্ষে মূর্ত্তিশিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল একথা বলাও তেমনি অযৌক্তিক। বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু রামায়ণ, পাণিনি, অর্থশাস্ত্র ও মনুস্মৃতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী সাহিত্যে স্থানে স্থানে দেবমূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাকডোনেল এবং কুম্ভকোণমের অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর এই দুই জনের মধ্যে হিন্দু মূর্ত্তিশিল্পের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে যে তর্ক হইয়াছিল তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। এই বিতণ্ডার ফলে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে "বৈদিক যুগের শেষ দিক হইতেই ভারতবর্ষের দেবতার মূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে; এ সম্বন্ধে সাহিত্যে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়"। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে এই বোঝা যায় যে দেবতাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রতি আর্য্যহৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রবণতা তাহা, দেবতাকে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিদান করিবার প্রতি দ্রাবিড়ের সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। এই উভয় প্রকার হৃদয়বৃত্তির সংযোগের ফলে একটা উচ্চতর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে দেবতাকে প্রতীক প্রতিমূর্ত্তি দান করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। প্রাথমিক বৌদ্ধযুগের শিল্পকলায় এই প্রতীকাত্মক রূপের অক্ষয় নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রতীক-দেবমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ধারাও অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। তাহার ফলে বহুসংখ্যক ছোট খাট লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবী প্রধান প্রধান দেবতার পার্শ্বেই স্থান পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নাগ এবং যক্ষরূপে বৌদ্ধ দেবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভর্ত্তি হইয়া গেল। এই হেতুই মঁসিয়ে ফুশে এই সমস্ত দেবদেবীকে এক প্রকার সামাজিক পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ নীচ স্তরে বিন্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; এইরূপে তিনি দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যেও জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু বৌদ্ধ শিল্প ছাড়িয়া হিন্দু শিল্পের অভিব্যক্তির আলোচনা করিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ভারতীয় শিল্পের বহুবিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গী ও রূপবৈচিত্র্যের আসল অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে দেবমূর্ত্তিসমূহকে কেবল সামাজিক স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিলেই চলে না, তাহাদের ভিতরকার নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিটিকেও অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়।

দেবতাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলার প্রতি দ্রাবিড়চিত্তের সে সহজ আকাঙ্ক্ষা, আর্য্যগণ সে আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত না করিয়া পারিলেন না। কিন্তু তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। এই দুই বিভিন্ন নৃসম্প্রদায়ের দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতার সাযুজ্যের ফল হইল এই যে ধ্যান ও বাক্-এর সাহায্যে দেবতাকে প্রকাশ করার রীতির পরিবর্ত্তে মূর্ত্তির ভিতর দিয়া দেবতাকে প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত হইল; অর্থাৎ মূর্ত্তিশিল্প আসিয়া বাক্‌শিল্পের স্থান অধিকার করিল। সেইজন্য "বৈদিক যুগের শেষ ভাগ হইতেই মূর্ত্তিব্যবহারের অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়" অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে আর্য্যগণ বরাবরই মূর্ত্তিশিল্পের অপেক্ষা বাক্‌শিল্পকেই প্রাধান্য দিতেন; এই জন্যই বেদের পরবর্ত্তী রামায়ণ মহাভারতের যুগ ও প্রাথমিক বৌদ্ধযুগের দেবমূর্ত্তির নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। পাণিনির সূত্রের (৫ম অধ্যায় ৩য় পাদ ৯৯-১০০তম সূত্র) ভাষ্য করিতে গিয়া পতঞ্জলি লৌকিক মূর্ত্তিপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই লৌকিক মূর্ত্তি পূজার উপলক্ষে অর্থলোভবশতঃ শিবস্কন্দ প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কথাও বলিয়াছেন; পতঞ্জলির এই উল্লেখের মধ্যে প্রচুর ঐতিহাসিক অর্থ রহিয়াছে। কৌটিল্যেশাস্ত্রেও পতঞ্জলির কথার অনুরূপ বিধান দেখা যায়। কারণ কৌটিল্য উক্ত গ্রন্থে সরলভাবেই একথা বলিয়াছেন যে, লৌকিক দেবমূর্ত্তি ও পাষণ্ড ও লোকায়তদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা রাজকোষ পূর্ণ করার একটি অতি প্রকৃষ্ট উপায়। আর্য্যসমাজের অন্ততঃ এক শ্রেণীর লোক মূর্ত্তিপূজাকে কিরূপ সমালোচনার চক্ষে দেখিতেন তাহা এই উক্তি হইতে বেশ বোঝা যায়।

প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ সম্ভবতঃ মূর্ত্তিপূজাকে ধর্ম্মসাধনার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিতেন না, বরং মানবমনের দুর্ব্বলতামাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আর্য্যেরা রূপকেই ধ্যানের বহির্বিকাশ বলিয়া মনে করিতেন। মূর্ত্তি ধ্যানকে রূপ দিতে পারে কিনা এ বিষয়ে তাঁহাদের মনে সংশয় রহিয়া গিয়াছিল। সুতরাং অনন্তকে সংজ্ঞা দান করিতে, অবর্ণনীয়কে বর্ণ, আকার ও মূর্ত্তির ভিতর দিয়া বর্ণনার বিষয়ীভূত করিয়া তুলিতে আর্য্যের মন সর্ব্বদাই দ্বিধা বোধ করিয়াছে। বুদ্ধের একটি যথোচিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গিয়া তৎকালীন শিল্পীদের ব্যর্থমনোরথ হওয়া সম্বন্ধে দিব্যাবদানে যে যে গল্প আছে তাহা হইতেই আর্য্যমনের উক্ত দ্বিধার অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ শিল্পীকে তথাগতের প্রতিমা চিত্রিত করিতে আদেশ করেন। কিন্তু শিল্পী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ভগবান্ তথাগতের অবর্ণনীয় মূর্ত্তিকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না! কিন্তু বরহুতের শিল্পীদের মনে ঐরূপ কোন দ্বিধা ছিল না, প্রচলিত রূপশিল্পের প্রতি তাঁহাদের অধিকতর সহানুভূতি ছিল। অতএব তাঁহারা বরহুতের

স্তূপগাত্রে ধর্ম্মচক্রসহ ভগবান্ বুদ্ধের সঙ্গে প্রসেনজিতের প্রতিমূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; আর এই ধর্ম্মচক্রই ছিল বুদ্ধপ্রচারিত নূতন বাণীর প্রতীক। বৌদ্ধযুগের প্রাথমিক প্রস্তরশিল্পসমূহ হইতেই বেশ বোঝা যায় যে ঐসময়েই বুদ্ধ ও তাঁহার অবদান মালার প্রতীকাত্মক প্রতিরূপ দেওয়ার রীতি এদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য বরহুত বা সাঁচী, বুদ্ধগয়া বা অমরাবতী সর্ব্বত্রই একই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাই ; যথা বোধিলাভের প্রতীক বোধিবৃক্ষ, সারনাথে প্রথম প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মবাণীর প্রতীক ধর্ম্মচক্র, কুশীনগরে বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের প্রতীক পরিনির্ব্বাণ স্তূপ ইত্যাদি। আদিম বৌদ্ধ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এই প্রতীকসমূহ কেবল যে ভারতীয় ধর্ম্মভাব ও সৌন্দর্য্যবোধেরই পরিচায়ক তাহা নয়। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারত-বাসীরা বিশেষত আর্য্যেরা যে অমূর্ত্ত সাধনাই করিয়াছিলেন এই প্রতীকগুলি হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালিদাস নাগ।

নীড় ও দূর

ভীরু আমার মন
চাহে গোপন গৃহ-কোণ
আঁকড়ি রহে প্রাচীন পরিচিতে ;
চিরদিনের ঘরে
সে যে সহজ-বাসা করে,
বাহির পানে তাকায় ভীত চিতে।

নিবিড় পাশে বাঁধি আপন জনে
বদ্ধজীবন কাটায় সঙ্গোপনে
চল্‌তি পথের সহজ আচরণে
আবরি আপনারে ;

ছিদ্রপথে আলোক যদি পশে,
চিত্ত অধীর দূরের পরশরসে ;
আঁধারে টানি তাহারে আনি বশে
বুঝায় বারে বারে
"হেথায় মিলন, নিবিড় পরিচয়
সুখের অন্ধকারে ।"

চির উদাস মন—
ভাবে বৃথাই আয়োজন
মিছা এ ঘর মিছা এ বাঁধাবাঁধি ;
ক্ষুদ্র ঘরের পাকে
ভুলে' বিপুল আপনাকে
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদ ফাঁদি ।

টুটিয়া বাধা উড়িয়া যেতে চায়
পিছন করে পিছনে "হায় হায়,"
দূরের ডাকে আগল ভেঙে যায়
ঘরের কারাগারে,
সুদূরে ধায় অধীর পাখা মেলি
ক্ষুদ্র ঘরের বাধা বাঁধন ফেলি
দূরের সাথে সুরের খেলা খেলি'
সুদূর আকাশ পারে ;
শিহরে ভেবে কেমনে ছিল বাঁধা
ঘরের অন্ধকারে ।

গোপন হিয়াতলে
মোর এমনি দ্বন্দ্ব চলে
নীড় ও দূরে নিত্য টানাটানি ;
ঘরের আঁধারেতে
কাঁদি দূরের আলো পেতে
দূরে শুনি ঘরের কাণাকাণি !

ঘর কহিছে 'দূর যে নহে জানা—
বিপথ সে পথ কোথা তার ঠিকানা,'
দূর কহিছে 'হেথায় নাইরে মানা
অসীম এ বিস্তারে'।
দূর কহিছে 'বিরাট তব প্রাণ
ঘরের কোণে কোথায় তাহার স্থান'
ঘর কহিছে—'হেথায় কল্যাণ
তোমার গৃহদ্বারে'।
এমনিতর দ্বন্দ্ব অহর্নিশি
আলোয় অন্ধকারে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ন্যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে উপাঙ্গ বলে। ন্যায়শাস্ত্রই দ্বিতীয় উপাঙ্গ। তবে এই ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা (১) গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্র ও (২) কণাদকৃত বৈশেষিকদর্শন এই উভয়কেই গ্রহণ করা উচিত। এই দুইখানিই ন্যায়শাস্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং এই দুইখানি গ্রন্থকেই একরূপ মূলরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতের গৌরব ন্যায়শাস্ত্রের সুগভীর গবেষণাপরিপূর্ণ ভাষ্য, টীকা, পত্রিকা প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। এই দুইখানি গ্রন্থকে ন্যায়দর্শণ ও বৈশেষিকদর্শন নামে অভিহিত করা হয়। দর্শনশব্দের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ যাহাই হউক না কেন, শাস্ত্রবিশেষেই ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে শাস্ত্রবিশেষে যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। কেহ কেহ বলেন যে চাক্ষুষজ্ঞানই দৃশ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও ইহার অপর অর্থ, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে দৃশ্ ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের

সাধন তাহাই দর্শনশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহা শাস্ত্র নহে। আবার শাস্ত্রমাত্রেই, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি কাব্য, সকলই জ্ঞানের সাধন বটে কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে দর্শন বলা যায় না। জ্ঞান সামান্য ও জ্ঞানবিশেষ এই দুই অর্থেই জ্ঞানশব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষে আছে

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। প্রকৃতস্থলে দৃশ্ ধাতুর জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আর এরূপ কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। দর্শনশাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র সাধারণ জ্ঞানের সাধন হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে, কাজেই তাহাদিগকে দর্শন বলা যাইতে পারে না। ন্যায়দর্শনকার গোতমের নামে কেহ কেহ 'গৌতম' বলিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে আমরা চার্ব্বাকের যে উপহাসপরিপূর্ণ উক্তিটী দেখিতে পাই তাহা দ্বারা মনে হয় যে ন্যায়দশনকর্ত্তার নাম গোতমই ছিল উক্তিটী এই

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে যে, মুনি সুখদুঃখবিহীন মুক্তির জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম যে তোমরা 'গোতম' বলিয়া জান—তিনি গোতমই বটে, দ্বিতীয় গোতমের অর্থ গরুশ্রেষ্ঠ। চার্ব্বাকের এইরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে মুক্তি যদি সুখদুঃখবিহীন হয় এবং তখন যদি সুখ দুঃখের জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকে তবে তাহা কাহার কাম্য হইবে? মানুষ চায় সুখ—পাহাড়ের মত জড় হইয়া থাকায় কি লাভ? কাজেই এইরূপ শাস্ত্রকার অতি নির্ব্বোধ ইত্যাদি। বাস্তবিক সুখ থাকিলেই দুঃখ আছে, গোলাপ ফুল ছিঁড়িতে গেলে মাঝে মাঝে কাঁটার খোঁচা খাইতেই হইবে, কাজেই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হইয়াছে।

এই উক্তি দ্বারা মনে হয় যে তিনি সেই সুদূর কালে 'গোতম' নামেই পরিচিত ছিলেন নতুবা শেষ হইতে পারে না। কেহ কেহ ধর্ম্মসূত্রপ্রণেতা গৌতম ও ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম একজন বলিয়া মনে করেন—কিন্তু তাহাদের পক্ষে যুক্তি বিশেষ না থাকিলেও বিপক্ষে যুক্তি এই যে ধর্ম্মসূত্রপ্রণেতা গৌতম বোধায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, আপস্তম্ব বোধায়ণের পরবর্ত্তী। তিনি তাঁহার ধর্ম্মসূত্রে পূর্ব্ব মীমাংসার ও উত্তর মীমাংসার নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ন্যায় দর্শনের কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং ন্যায় শব্দের দ্বারা জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্বারা অনুমান করা হইয়া থাকে যে হয় এই ন্যায়দর্শন আপস্তম্বের পরে প্রচলিত হইয়াছিল অথবা অন্ততঃ তখনও বিস্তৃতি লাভ

করে নাই, এবং এই হেতু ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাই স্বীকার করা যাইতে পারে। তারপর অহল্যার স্বামী গৌতমের নাম উপাখ্যান বলিয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় গ্রহণ করিতেই অনেকে অস্বীকার করেন। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমের আমরা আরও দুইটী নাম দেখিতে পাই— অক্ষপাদ এবং অক্ষচরণ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে গৌতমের প্রত্যক্ষবিষয়ে নূতন মতবাদের জন্য তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল।

এই জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদদর্শনও বলা হইয়া থাকে। এই দর্শনের তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই দর্শনের যথাবদনুশীলন করিলে তর্কশক্তির সবিশেষ সমুন্মেষ হয় বলিয়া ইহাকে তর্কশাস্ত্রও বলে। ইহার অপর নাম আন্বীক্ষিকী। অণু শব্দের অর্থ "পশ্চাৎ", ঈক্ষা শব্দের অর্থ দর্শন বা আলোচনা। শ্রবণের পর আত্মার আলোচনা বা মনন "অন্বীক্ষা" শব্দের অর্থ। ন্যায়দর্শন বা ন্যায়বিদ্যা এই "অন্বীক্ষা" সম্পাদন করে বলিয়া তাহার নাম আন্বীক্ষিকী। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকারের নাম বাৎস্যায়ন, তিনি আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে অতি উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—
"সেয়মান্বীক্ষিকী—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

বিদ্যোদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপরূপে, সমস্ত কর্ম্মের উপায়রূপে, এবং সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বনরূপে কথিত হইয়াছে। "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" স্থলে কেহ কেহ "বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সী" এইরূপ পাঠও করিয়া থাকেন। এই আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা স্মৃতি ও পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত হইয়াছে। এমন কি মোক্ষধর্ম্মে ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন যে গরীয়সী আন্বিক্ষিকী অবলোকন করিয়া আমি উপনিষদের সারোদ্ধার করিতেছি।

বৈশিষেকদর্শনের প্রণেতা কণাদ নামেই প্রসিদ্ধ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার এই অর্থে আরও দুইটী নাম আমরা দেখিতে পাই যথা কণভূজ এবং কণভক্ষ। অনেকেই মনে করেন যে তাঁহার বিশিষ্ট মতের জন্য তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া "কণাদ" নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে কৃষকেরা শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কর্ত্তন করিয়া লইলে শস্যক্ষেত্রে যে ধান্য কনিকাসমূহ পড়িয়া থাকিত, তাহা এক একটী করিয়া তুলিয়া নিয়া তাহা দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন বলিয়া জীবিকার কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। শ্রীধর স্বকৃত ন্যায়কন্দলীগ্রন্থে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ বলেন তাহার প্রকৃত নাম ছিল "উলূক" কিন্তু প্রশস্তপাদাচার্য্যের মতে তাঁহার বংশগত নাম ছিল "কাশ্যপ"—এবং শিব তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া "উলূক" অর্থাৎ পেচকরূপে

তাঁহার নিকট এই দর্শন প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার দর্শনের নাম ঔলূক্যদর্শন বলা হইয়া থাকে। তাঁহার নাম উলূক ছিল বলিয়াই যে তাঁহার দর্শনের নাম "ঔলূক্য" দর্শন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ন্যায়বার্ত্তিককার বৈশেষিকদর্শনকে ঐ নামে উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে অক্ষপাদ, কণাদ এবং উলূক এই তিনজন ব্যাসদেবের পুত্র ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়।

অবশ্য একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে গোতম কি কণাদ কেহই একটা নূতন মত প্রবর্ত্তন করেন নাই; বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই দ্বিবিধ মতবাদ সুধী সমাজে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল, কণাদ ও গোতম সেই মতানুযায়ী সূত্রসমূহ গ্রথিত করিয়াছিলেন মাত্র, এবং সংক্ষেপে বিষয়গুলি মনে রাখিবার পক্ষে এই সূত্রগুলি বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সূত্রগুলিকে মূল করিয়াই স্বকীয় গবেষণা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাই কালক্রমে তাঁহারা বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের প্রচারকস্থলে প্রবর্ত্তকরূপেই সুধীগণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

গোতম ও কণাদের পৌর্ব্বাপর্য্য

সে বিষয়ে যাহাই হউক গোতম এবং কণাদ যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তখন স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন সকলের মনে উদিত হয়— ইহাদের মধ্যে কে প্রথম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কে কোন সময়ে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমরা বহির্নিদর্শন একরূপ কিছুই পাই না যাহাদ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান করা যাইতে পারে। স্বল্পমাত্র নিদর্শন যাহা পাওয়া যায় তাহা কেবল পুস্তকের আলোচনার উপর নির্ভর করে। কে কোনস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক দূরে থাক কোনরূপে নির্দ্ধারণ করাও সাধ্যাতীত, তবে তাঁহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য এবং সময় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে উভয়েই ন্যায়সূত্রভাষ্যপ্রণেতা বাৎস্যায়নের নিকট সুপরিচিত, তিনি প্রসঙ্গক্রমে ন্যায়ভাষ্যেই বৈশেষিক সূত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বলিয়াই অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইঁহারা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কে কাহার পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। ভিন্ন মতগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি আমরা স্বীকার করি যে যিনি কোন বিষয়ে অপর অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতভাবে বুঝাইতে গিয়াছেন তিনিই পরবর্ত্তী (কারণ পরবর্ত্তী লেখকগণ জিনিষ ভালরূপে বুঝাইতে চাহেন) তাহা হইলে বৈশেষিকের অনুমানের কারণ প্রভৃতি বিষয়ে সমধিক আলোচনা দেখিয়া তাহা পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

যদি আমরা স্বীকার করি যে যদি কেহ কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন না করিয়া কোন স্থলে সেই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অপরের পুস্তকে যদি সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় তবে পূর্ব্বোক্তলেখক পরবর্ত্তী, কারণ পূর্ব্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহা আর তিনি না লিখিয়াও পারেন, তাহা হইলে কণাদ

যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদশ্বোরিতি চানৈকান্তি কস্যোদাহরণম্" ৩।১।১৭

এই সূত্রে সেইরূপ অনৈকান্তিক কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া এবং গোতমের ন্যায়সূত্রে

"অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ"

এই সূত্রে উহার ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় বলিয়া বৈশেষিক দর্শনই পরবর্ত্তী এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত hypothesisগুলি কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার করিলে এবং নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন মনে হয় যে বৈশেষিক দর্শনই পূর্ব্ববর্ত্তী।

(১) আত্মার বিষয়ে অনুমানের হেতুর উল্লেখসময়ে গোতম কেবল

"ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্ন সুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্"

এই সূত্রদ্বারা কেবল মানসিক ভাবগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কণাদ নিশ্বাস প্রশ্বাস নিমেষ প্রভৃতিকেও আত্মবিষয়ক অনুমানের হেতু বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে এ বিষয়ে গোতমের উক্তিই দার্শনিক দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত এবং যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তার দোষ পরবর্ত্তী গ্রন্থকার সংশোধন করিয়া থাকেন অনেকের মতে বৈশেষিক দর্শনই পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(২) তারপর অনেক সময়েই দেখা যায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার যাহা ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যান বা স্বল্প আলোচনা করেন পরবর্ত্তী গ্রন্থকার তাহাই বিশদরূপে আলোচনা করিয়া থাকেন। এ স্থলেও আমরা দেখিতে পাই শব্দের নিত্যত্ব, আত্মার প্রকৃতি, অনুমানের আকৃতি এবং হেত্বাভাস প্রভৃতি বিষয়ে কণাদ স্বল্পই বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু গোতম তাহা বেশ বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও অনুমিত হয় যে বৈশেষিক দর্শনই পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৩) তারপর গোতমের ন্যায়সূত্রে "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত" নামে একটা কথা বলা হইয়াছে যদিও বাৎস্যায়ন তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তথাপি বেশ অনুমান করা যাইতে পারে ইহা বৈশেষিককেই লক্ষ্য করিতেছে। বাৎস্যায়ন কিন্তু সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র লক্ষিত হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) তারপর এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে গোতমের ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের কার্য্যাবলি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু সৃষ্টি প্রভৃতি মূল বিষয় তাহাতে কিছুই বলা হয় নাই—

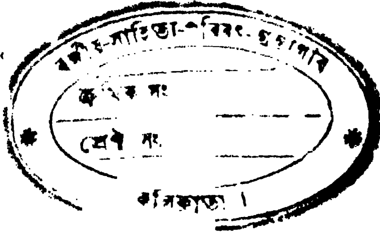
আর সেগুলি বৈশেষিক দর্শনে বেশ সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও বোধ হয় অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে বৈশেষিকদর্শনই ন্যায়দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী—এবং ন্যায়দর্শনও ঐ সকল বিষয়ে এক মত তাই ও বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই।

ন্যায়দর্শন যে বৈশেষিকের অনুমানের হেতুবিভাগ স্বীকার করেন নাই তাহার কারণ বৈশেষিক পরবর্ত্তী ইহা না বলিয়া; বৈশেষিকের এবং ন্যায়দর্শনের এই সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে, এবং ন্যায়দর্শনে তাই ইহা গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ বলা যাইতে পারে।

(৫) বৈশেষিকদর্শনে সবই এলোমেলো ভাবে সংবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ন্যায়দর্শনে বিষয়গুলি বেশ ভালরূপে সজ্জিত দেখা যায় ইহাও তাহার পরবর্ত্তিতার নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

(৬) তারপর বৌদ্ধমতগুলি যেরূপ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে দেখা যায় তাহাদ্বারাও ও মনে হয় বৌদ্ধদিগের মতগুলি যখন প্রসারলাভ করিতেছিল তখনই ন্যায়দর্শন রচিত হয়। কিন্তু বৈশেষিকে কিন্তু সেরূপ কোন আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।



ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চ্চের অবস্থা সম্বন্ধে গত অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা তিন দিক দিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিব স্থির করিয়াছি—প্রথমতঃ, চর্চ্চের অন্তঃপ্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গঠনের আলোচনা; দ্বিতীয়তঃ চর্চ্চের সহিত রাজশক্তি বা ঐহিক শাসনশক্তির সম্বন্ধ বিচার; এবং তৃতীয়তঃ জনসাধারণের সহিত চর্চ্চের সম্বন্ধবিচার। ইহার মধ্যে আমরা প্রথম দুইটি বিভাগেরই আলোচনা শেষ করিয়াছি। এখন প্রজাসাধারণের সহিত চর্চ্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সেই আলোচনা অবশিষ্ট আছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ বিচারের পর আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করিতে

পারিব। সর্ব্বশেষে, আমাদের যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তগুলি তথ্যের সহিত, চর্চ্চের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইব।

আপনারা সহজেই বুঝিবেন যে জনসাধারণের সহিত চর্চ্চের সম্বন্ধ বিচারে, আমাকে বাধ্য হইয়া কেবল স্থূল ও সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আমি এখানে চর্চ্চের ক্রিয়ানুষ্ঠানের অথবা যাজকবর্গের সহিত প্রজাবর্গের দৈনন্দিন কারবারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। চর্চ্চের শাসন পদ্ধতি ও জনবর্গের প্রতি চর্চ্চের আচরণ—ইহার মূলনীতি ও স্থূল পরিণামের কথাই আপনাদের সমক্ষে উত্থাপিত করিব।

চর্চ্চের শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ও মূলগত দোষই হইল এই যে ইহাতে শাস্তা ও শাসিতের একান্ত পার্থক্য। শাসন ব্যবস্থায় শাসিতবর্গের কোনই প্রভাব ছিল না। খৃষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় উপাসকবর্গের সম্পর্কে একেবারে স্বাধীন!

নিশ্চয়ই তখনকার মানুষের ও সমাজের অবস্থার মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাহা হইতে এই দোষের উদ্ভব ঘটিয়াছে কারণ অতি প্রাচীনকালেই খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে এই দোষ প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাই। আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি, তখনও যাজকবর্গ ও উপাসকবর্গের পরস্পরস্বাতন্ত্র্য পূর্ণপরিণতি লাভ করে নাই; তখন কোন কোন ক্ষেত্রে—যথা বিশপনির্ব্বাচন ব্যাপারে—ধর্ম্মশাসনব্যবস্থায় সাধারণ উপাসকমণ্ডলীকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অধিকার ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বিরল হইয়া আসিতে লাগিল; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সুস্পষ্টরূপে ও দ্রুতবেগে ইহা লোপ পাইতে থাকে। যাজকবর্গের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতাইতিহাসই একরূপ চর্চ্চের ইতিহাস। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের আলোচ্য যুগে এবং আরও বেশী পরিমাণে পরবর্ত্তী যুগে যে সমস্ত দুর্নীতি ও দুষ্টাচার চর্চ্চকে অনেক দুর্ভোগ ভোগাইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই এই স্বাতন্ত্র্যনীতি হইতে উদ্ভূত। তাই বলিয়া একথা বলা ঠিক হইবে না যে এই স্বাতন্ত্র্যনীতিই ইহাদের একমাত্র মূল বা এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা কেবল খৃষ্টীয় যাজকবর্গেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্ম্মসমাজের স্বভাবই এই যে তাহার মধ্যে শাসকবর্গকে শাসিত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিবার দিকে একটা প্রবণতা থাকে; শাসকবর্গের মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৈব অধিকার আরোপ করিবার দিকে ঝোঁক থাকে। তাঁহারা যে দৈব কার্য্যে নিযুক্ত, লোকনয়নে তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ দিব্যবিভূতিমণ্ডিত হইয়া প্রতিভাসিত হয় তাহাতেই এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মসমাজে এই স্বাতন্ত্র্যনীতির ফল যত বিষময়, তেমন আর কোন সমাজে নহে। কারণ এক্ষেত্রে শাসন ব্যাপারের উপর শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনের কতখানি শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের বুদ্ধিবিবেক, তাহাদের ভাবী নিয়তি, অর্থাৎ যাহা কিছু তাহাদের অন্তরের বস্তু, যাহা কিছু তাহাদের একান্ত নিজস্ব, যাহা কিছু তাহাদের মধ্যে স্বাধীন ও মুক্ত, তাহাই নির্ভর

করিতেছে। আমরা বরং এটা বেশ ধারণা করিতে পারি, যে প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিলেও মানুষ বাহিরের একটা প্রভুশক্তির হাতে তাহার সমস্ত ঐহিক ব্যাপার পরিচালনার ভার দিয়া থাকিতে পারে। একজন দার্শনিককে সংবাদ দেওয়া হইল যে তাঁহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তিনি বলিলেন "যাও, আমার স্ত্রীকে সংবাদ দাও; আমি গৃহস্থালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না।" এই দার্শনিকের মনের ভাব আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এই বৈরাগ্যের ভাব যদি বিবেক পর্য্যন্ত গড়ায়, মানুষের চিন্তা ও অন্তর্ব্যাপারেও যদি ইহা প্রসার লাভ করে, মানুষ যদি এক্ষেত্রেও আত্মশাসনের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া বাহ্যশক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে ইহা নৈতিক আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ দাসত্ব শারীরিক দাসত্ব বা ভূমিসম্পর্কীয় দাসত্ব অপেক্ষা শতগুণ হেয়। অথচ খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে যাজক—উপাসক সম্পর্ক ক্রমশঃ এই দুর্নীতি দ্বারাই আক্রান্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য এই দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। আপনারা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে চর্চ্চের গণ্ডীর মধ্যেই যাজকদিগের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। চর্চ্চের বাহিরে সাধারণ লোকসমাজের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। যাজকবৃন্দের মধ্যে অন্ততঃ বিচারবিতর্ক আলোচনা ছিল, ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্য প্রকাশের একটা ক্ষেত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু বিচারবিতর্কের উত্তেজনাই কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতার স্থান পূরণ করিত। কিন্তু যাজকবৃন্দের সম্পর্কে সাধারণ লোকসমাজের এরূপ কোন স্বাধীনতা ছিল না। সাধারণ লোক চর্চ্চের শাসনকার্য্যে কেবল দর্শকভাবেই যোগদান করিত। এইরূপে অতি প্রাচীনকালেই এই ধারণাটী অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে ধর্ম্মমত, ধর্ম্মসমস্যা ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই যাজকসম্প্রদায়ের একচেটীয়া অধিকারভুক্ত; ধর্ম্মালোচনায় শুধু চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার নহে, যোগদান করিবার অধিকারও যাজকবর্গ ভিন্ন আর কাহারও নাই! সাধারণ লোকের এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রকার অধিকার নাই। আমাদের আলোচ্য যুগের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে তৎপূর্ব্বেই এই ধারণাটী সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; ইহার পরাভব ঘটাইতে, অর্থাৎ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানকে লোকসাধারণের বিচারক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল, বহু ভীষণ বিপ্লবের আবশ্যক হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল তত্ত্বের দিক দিয়াও বটে, তথ্য হিসাবেও বটে, যাজকসম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রাচীর দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা এ কথা মনে করিবেন না যে এই শেষোক্ত সময়েও ধর্ম্মশাসন ব্যাপারে খৃষ্টীয় জনমণ্ডলীর কোনই প্রভাব ছিল না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অবশ্য তাহাদের আইন-গত কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু তাহাদের প্রভাব

কিছু না কিছু ছিলই। শাসনতন্ত্র যেমনই হউক না কেন, লোকসাধারণের এই প্রভাব কিছুতেই একেবারে লুপ্ত হইতে পারে না, বিশেষতঃ যেখানে শাসনতন্ত্র শাসক ও শাসিতের সাধারণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানেই উভয় পক্ষের মত ও বিশ্বাসের এই সমতা গড়িয়া উঠিয়াছে, অথবা যেখানে শাসনতন্ত্রের ও প্রজাবর্গের মধ্যে একইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেখানেই শাসনব্যাপারে প্রজাবর্গের প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী; শাসনব্যবস্থার কোন দুর্নীতিই এ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে না। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একটা নিকট দৃষ্টান্ত লইব। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালে শাসনব্যাপারে প্রজাসাধারণের আইনগত বা প্রতিষ্ঠানগত অধিকার যত অল্প ছিল ফ্রান্সের ইতিহাসে আর কোন যুগেই তত অল্প ছিল না।

সকলেই জানেন যে এই সময়ে শাসনব্যাপারে দেশের প্রজাবৃন্দের অধিকার খাটাইবার আইনানুমোদিত সরকারী ব্যবস্থাগুলি প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে দেশের প্রজাবৃন্দ অন্যান্য যুগ অপেক্ষা এই যুগেই শাসনতন্ত্রের উপর বেশী করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি যে সমস্ত যুগে সাধারণ প্রজাসঙ্ঘকে ঘন ঘন আহ্বান করা হইত, যখন পার্লিয়ামেণ্ট্ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, যখন শাসনশক্তিপরিচালনায় জনসাধারণের বৈধ অধিকার আরও অনেক বেশী ছিল, সে সমস্ত যুগ অপেক্ষাও এই যুগে প্রজাদিগের যথার্থ প্রভাব অধিক ছিল।

ইহার কারণ এই যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা আইন দিয়া ঘিরিয়া রাখা যায় না, যাহা আবশ্যক হইলে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। সে শক্তি চিত্ত-শক্তি, সাধারণমনের ও সাধারণমতের শক্তি। ফ্রান্সের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সাধারণ মত অন্যান্য যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল ছিল। যদিও এমন কোন উপায় ছিল না যাহা দ্বারা এই সাধারণ মত আইনের জোরে শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত, তথাপি ইহা রাজা-প্রজা-সাধারণ যে চিন্তার সাম্রাজ্য তাহারই বলে গৌণভাবে কাজ করিত। শাসকবৃন্দ বেশ বুঝিতেন যে শাসিতবর্গের মত একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে এইরূপ ব্যাপারই দাঁড়াইয়াছিল। যদিও খৃষ্টীয় জনবর্গ আইনগত অধিকারে দরিদ্র ছিল তথাপি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তখন সাধারণলোকসমাজে বেশ একটা আন্দোলন ছিল। এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে যাজক-উপাসকের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এবং এই উপায়েই সাধারণ লোক যাজকবৃন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

• • •

ইতিহাস চর্চ্চাকালে সর্ব্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে এই গৌণ প্রভাবগুলি অবহেলনীয়

নহে পরন্তু ইহাদের মূল্য ও কার্য্যকারিতা, এবং অনেক স্থলে ইহাদের উপকারিতা, সাধারণতঃ যাহা মনে করা যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। মানুষ অবশ্য স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতে চায়, সে শীঘ্র শীঘ্র স্বীয়কার্য্যের সুফল ভোগ করিতে চায়, সে কৃতকার্য্যতার দরুণ আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে চায়, কর্ম্মার্জ্জিত শক্তি সম্ভোগ করিতে চায়, বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে চায়! ইহা কিন্তু সব সময়ে সম্ভব হয় না, সব সময়ে সুফলপ্রদও হয় না। এমন অনেক সময় ও অবস্থা আসে যখন কেবলমাত্র গৌণ ও অপ্রত্যক্ষ উপায়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয় ও সম্ভবপর। আমি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত লইব। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট একাধিকবার (বিশেষতঃ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে) প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিনির্ব্বাচনের অধিকার দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে রাজশাসন ব্যাপারে এইরূপ মুখ্য অধিকার থাকিলে প্রজাবর্গের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত থাকিবে। পার্লামেণ্ট কখনও কখনও এ অধিকার কাজেও খাটাইয়াছেন, কিন্তু কখনই ইহার ফল ভাল হয় নাই! কোন সময়েই নির্ব্বাচন সুসিদ্ধ হয় নাই, রাজ্য সুশাসিত হয় নাই। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের অবস্থা কিরূপ? এখন কি পার্লামেণ্টের প্রভাবেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় না, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় না? নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু এ প্রভাব বিশেষ কোন আইনের প্রভাব নহে; এ প্রভাব একটা অনির্দ্দিষ্ট অপ্রত্যক্ষ প্রভাব। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া যে উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে; প্রথমে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে সুফল ফলে নাই।

ইহার একটা কারণ আছে, এবং সেই কারণ সম্বন্ধে এই স্থলে একটা কথা বলিব। আইনগত মুখ্য অধিকার যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহাদের অনেকখানি বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। তাহারা যখন যাহা সঙ্কল্প করে তখনই অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, সুতরাং এটা নিশ্চয় থাকা আবশ্যক যে তাহারা সংকল্পগঠনকালে কোন ভুল করিবে না। অনির্দ্দিষ্ট গৌণ প্রভাব কিন্তু অন্য ভাবে কাজ করে; তাহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হয়, অনেক পরীক্ষাদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া তবে সে কাজ করিবার অবকাশ পায়; শক্তিশালী হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বিচারবিতর্কের বাধাবিরোধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; তাহারা ধীরে ধীরেই জয় লাভ করে, এবং তাহাও সমগ্রভাবে নহে। এই জন্য, যখন সাধারণ লোকের মন এমনভাবে গঠিত হয় নাই যে তাহাদের হাতে মুখ্য অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ, তখন সাধারণ লোকমতের যে গৌণ প্রভাব তাহা যথেষ্ট না হইলেও শ্রেয়স্কর। এইরূপেই খৃষ্টীয় জনমণ্ডলী তাহাদের ধর্ম্মশাসনব্যাপারে কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিতে, সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এ প্রভাবের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ছিল, ইহার ক্ষেত্রও অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল, কিন্তু তথাপি ইহাকে চর্চ্চ

একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, চর্চ্চ যে এ প্রভাবের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শাসিত হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চর্চ্চ ও জনবর্গের মধ্যে সান্নিকর্ষসাধনের পক্ষে আর একটি কারণ ছিল। সমাজের উচ্চনীচ সর্ব্ববিধ স্তরের মধ্যে খৃষ্টীয় যাজকবর্গের বিন্যাস—ইহাই সেই দ্বিতীয় কারণ। প্রায় সর্ব্বত্রই, যেখানেই উপাসকসমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে যাজকসংঘ গঠিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রায় সমবস্থ লোক লইয়াই যাজকসমাজ গঠিত হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য একেবারেই ছিল না তাহা নহে, তবে মোটের উপর ধর্ম্মশাসনের অধিকার একাশ্রমবর্ত্তী যাজকসংঘের হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহারা মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তাঁহাদের শাসনভুক্ত লোকমণ্ডলীকে শাসন করিয়া আসিয়াছেন। খৃষ্টীয় চর্চ্চের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ফিউড্যাল ভূস্বামীর দুর্গপাদমূলে যে দাসবর্গের কুটীর সেখান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একজন করিয়া যাজক থাকিতেন। মানবসমাজের সকল প্রকার অবস্থার সহিতই যাজকবর্গের সংযোগ ছিল। খৃষ্টীয় যাজকবর্গের অবস্থানের এই যে বৈষম্য, সকল প্রকার অবস্থার লোকের সহিত তাঁহাদের এই সংযোগ, সাধারণ লোকসমাজের সহিত যাজকবর্গের মিলনসাধনপক্ষে ইহা একটা প্রধান যোগসূত্র। শাসনশক্তিসম্পন্ন অনেক চর্চ্চের মধ্যেই এই সূত্রের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আপনারা দেখিয়াছেন যে বিশপ প্রভৃতি খৃষ্টীয় চর্চ্চের নেতৃগণ ভূম্যধিকারসূত্রে ফিউড্যাল শাসনতন্ত্রেও স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহারা এককালেই ঐহিক ও পারত্রিক শাসনশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত ছিলেন। এই কারণে এই দুই সমাজের মধ্যে একই প্রকার রীতিনীতি আচারপদ্ধতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। বিশপ্‌গণ যুদ্ধে গিয়াছেন, যাজকগণ সাধারণ বৈষয়িক লোকের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এ লইয়া অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছে, এবং এ সকল অভিযোগের যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণও আছে। বাস্তবিক পক্ষে এটা একটা ঘোর অনাচার, কিন্তু অন্যান্য সমাজে যে যাজকবর্গ মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সাধারণ সমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা অপেক্ষা এ অনাচারও ভাল। যে যাজকসমাজ সাধারণলোকসমাজের জীবনযাত্রা রীতি নীতি সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিতেন তাহা অপেক্ষা বৈষয়িক বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত এই সকল খৃষ্টীয় বিশপ্ দ্বারা সমাজের কাজ বেশী হইত। এই যোগসূত্র ধরিয়া যাজকসমাজ ও লোকসমাজের মধ্যে যে অবস্থাসাদৃশ্য ও নিয়তিসাদৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল তাহা শাসকশাসিতের মূলগত ব্যবধান একেবারে লুপ্ত না করুক, অন্ততঃ হ্রাস করিয়াছিল।

যাহা হউক এই ব্যবধানের অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিয়া লইয়া এবং এই ব্যবধানের দৌড় কতটুকু ছিল তাহাও বিচার করিয়া লইয়া দেখা যাউক খৃষ্টীয় চর্চ্চের শাসনপ্রণালী

কিরূপ ছিল, তাহার শাসনাধীন জনবর্গের উপর সে কি ভাবে কাজ করিয়াছে। একদিকে দেখিতে হইবে ব্যক্তিমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সে কিরূপে সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে দেখিতে হইবে কিরূপে সে সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে।

আমার মনে হয় আমাদের আলোচ্য যুগের চর্চ্চ ব্যক্তিমানবের পুষ্টি ও উন্নতি লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় নাই। সমাজের মধ্যে যাহারা পরাক্রমশালী তাহাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে কোমলতর ভাব জাগাইয়া তুলিতে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির সম্পর্কে ন্যায়পরতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চর্চ্চ চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের মধ্যে একটা নৈতিক জীবন জাগাইয়া রাখা এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে কতকগুলি মহত্তর ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখা এ বিষয়েও চর্চ্চ সচেষ্ট ছিল। তথাপি আমি মনে করি না যে মানবব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিস্ফুরণকল্পে, মানবের ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিকাশ ও বিস্তারকল্পে চর্চ্চ এ সময়ে বড় বেশী একটা কিছু করিয়াছিল। অন্ততঃ সাধারণলোকসমাজের মধ্যে করে নাই। এ দিক দিয়া চর্চ্চ যাহা করিয়াছিল তাহা যাজকসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাজকদিগের শিক্ষা, যাজকবর্গের মানসিক উন্নতি, এ বিষয়ে চর্চ্চ বেশ সচেষ্ট ছিল; তাহাদের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠান সমাজের তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল চর্চ্চ সমস্তই জোগাইয়াছিল। কিন্তু সে বিদ্যালয়গুলি সমস্তই ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয়, যাজকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাহারা গঠিত। ইহা ছাড়া চিন্তা ও রীতিনীতির উন্নতিকল্পে চর্চ্চ যাহা করিয়াছিল তাহা কেবল গৌণভাবে এবং বিলম্বিত উপায়ে। অবশ্য সমাজের সম্মুখে চর্চ্চ যাজকবৃত্তিরূপ যে একটা নূতন কর্ম্মপথ খুলিয়া দিয়াছিল তাহাতে লোকসাধারণের মনের মধ্যে একটা উদ্যম ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু এ সময়ে সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতির জন্য চর্চ্চ আর কিছুই করে নাই।

ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের উন্নতির দিকে চর্চ্চ অধিক পরিমাণে ও অধিকতর সফলতার সহিত কাজ করিয়াছিল। সমাজের মধ্যে দাসত্বপ্রথার ন্যায় যে সমস্ত বড় বড় পাপ ছিল তাহার বিরুদ্ধে চর্চ্চ যে দৃঢ়সংকল্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। একথা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে আধুনিক জাতিগণের মধ্যে দাসত্বপ্রথার বিলোপ কেবল খৃষ্টপন্থীদিগের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহা অতিশয়োক্তি মাত্র। দাসত্বপ্রথা বহুকাল ধরিয়া খৃষ্টপন্থী সমাজের অন্তঃস্থলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজ তাহাতে বিশেষ কোন বিস্ময় বা বিরক্তিপ্রকাশ করে নাই। এই নিকৃষ্ট পাপাচারের বিলোপ সাধনে বহু বিভিন্ন কারণের সংযোগ আবশ্যক হইয়াছিল, সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের, অন্যান্য নীতির বহুল বিকাশ আবশ্যক হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে সন্দেহ নাই যে

এই প্রথাকে দমন করিবার জন্য চর্চ্চ স্বীয় শক্তি ও প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছিল। ইহার একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইতে পারি। বিভিন্ন যুগের দাসবর্গকে যে সকল মুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলিতেই ধর্ম্মনীতির দোহাই দেখা যায়। প্রায় সব সময়েই ধর্ম্মের নামে, পরকালের নামে, ধর্ম্মের চক্ষে মানুষে মানুষে যে কোন বৈষম্য নাই এই নীতির দোহাই দিয়া দাসগণের মুক্তি ঘোষণা করা হইয়াছে।

এ ছাড়া অনেক বর্ব্বর প্রথা দমন করিবার জন্য এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধির উন্নতিকল্পেও চর্চ্চ সমান উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিয়াছে। আপনারা জানেন তখনকার সেই আইন কি ভয়ানক, কি অদ্ভুত ছিল; আপনারা ইহাও জানেন যে বিচারক্ষেত্রে কেবল বাহুযুদ্ধ বা দুই একটি লোকের শপথবাক্যই সত্যনির্দ্ধারণের পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইত। চর্চ্চ এই সকল বিচারপ্রণালীর পরিবর্ত্তে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রধানতঃ টোলেডো হইতে প্রচারিত বিসীগথদিগের আইন এবং অন্যান্য বর্ব্বর আইনের মধ্যে যে একটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই আইনগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে আইন ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এবং সত্যানুসন্ধানসম্পর্কিত সকল বিষয়েই চর্চ্চের ধারণা কত শ্রেষ্ঠ ছিল। অবশ্য এই সকল ধারণার মধ্যে অনেকগুলি রোমীয় আইন হইতে ধার করা হইয়াছিল; কিন্তু চর্চ্চ যদি সেগুলিকে রক্ষা ও সমর্থন না করিত, তাহাদের বহুলপ্রচারের জন্য চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেগুলি লোপ পাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারপ্রণালীতে শপথপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেখুন; বিসীগথদিগের আইন খুলুন, দেখিবেন কি বিচক্ষণতার সহিত এই শপথগ্রহণ প্রথার ব্যবহার করা হইয়াছে :—

"বিচারক বিবাদের বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য প্রথমে সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিবেন, পরে আরও নিশ্চয়তার সহিত সত্যনির্দ্ধারণকল্পে এবং যাহাতে বৃথা কাহাকেও শপথ গ্রহণ করান না হয় সেই উদ্দেশ্যে লিখিত দলিলপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সত্যনির্দ্ধারণের পক্ষে উভয় পক্ষের দলিল ভাল করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক, এবং শপথ গ্রহণের প্রয়োজন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আসা আবশ্যক। বিচারক যখন দলিল বা অন্য কোন নিশ্চয় প্রমাণ না পাইবেন তখনই কেবল শপথ গ্রহণ করাইবেন।"

ফৌজদারী ব্যাপারে অপরাধ হিসাবে দণ্ডের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে ধর্ম্মনীতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল আইন পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যেন একজন মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানী বিধিপ্রণেতা বর্ব্বর রীতিনীতির নৃশংসতা ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাদের নরহত্যা সম্বন্ধীয় আইন দেখুন। অন্যান্য বর্ব্বর জাতির আইনের মধ্যে ক্ষতির মাত্রাদ্বারাই

অপরাধের পরিমাপ হয়। আর্থিক ক্ষতিপূরণই অপরাধের দণ্ড। বিসীগথদের আইনে কিন্তু অপরাধের যে যথার্থ নৈতিক মূল অর্থাৎ উদ্দেশ্য, তাহা লইয়াই অপরাধের মাত্রা বিচার করা হইয়াছে। পাপের যে সমস্ত সূক্ষ্ম ক্রম আছে, যথা একেবারে অনভিপ্রেত নরহত্যা, অসাবধানতাজনিত আকস্মিক নরহত্যা, উত্তেজনার বশে নরহত্যা, পূর্ব্ব হইতে অভিসন্ধি করিয়া নরহত্যা, পূর্ব্বাভিসন্ধিব্যতিরেকে নরহত্যা—নরহত্যার এই সমস্ত ক্রম প্রায় বর্ত্তমানকালের আইনের মতই বিশুদ্ধ ও যথাযথভাবে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুবিভক্ত হইয়াছে, এবং অপরাধের গুরুত্বানুপাতে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। আইনের চক্ষে বিভিন্ন লোকের মূল্যবিচারে যে বৈষম্য অনেক বর্ব্বরজাতির আইনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বিসীগথ আইনে সে বৈষম্য বিলোপ করিতে না পারুক, হ্রাস করিবার একটু চেষ্টা আছে। কেবল একটা বৈষম্য বজায় রাখা হইয়াছে, সেটা দাস ও স্বাধীনব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য। স্বাধীনসমাজের মধ্যে কিন্তু নিহতব্যক্তির বংশ বা পদমর্য্যাদা হিসাবে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কেবল হত্যাকারীর নৈতিক অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়। দাসদিগের জীবন মরণের উপর তত্তৎ প্রভুর যে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল বিসীগথ আইন তাহা কাড়িয়া লইতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইহাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আইনের কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

"যে কোন অপরাধী বা তাহার সহযোগীকে বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নহে—একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে যাহারা কেবলমাত্র জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া হেলায় নরহত্যা করে তাহাদিগকে দণ্ডিত করা কত বেশী কর্ত্তব্য! অতএব, প্রভুগণ যে অনেক সময়ে বিনা অপরাধে কেবল মাত্র দর্প চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের দাসদিগের প্রাণহরণ করিয়া থাকে, এই যথেচ্ছাচার একেবারে সমূলে উৎপাটিত করাই ন্যায়সঙ্গত, এবং তজ্জন্য আমরা বিধান করিতেছি যে এই আইন চিরকাল ধরিয়া সকলে মানিয়া চলিবেন। কোন প্রভু প্রকাশ্য বিচারব্যতিরেকে কোন দাসদাসী বা কোন অধীনস্থ ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারিবে না। যদি কোন ক্রীতদাস বা ভৃত্য এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহার শাস্তি প্রাণদণ্ড তাহা হইলে তাহার প্রভু বা অভিযোক্তা অবিলম্বে স্থানীয় বিচারক বা কাউণ্ট বা ডিউকের নিকট সংবাদ দিবে। তদন্তের পর যদি অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে অপরাধী বিচারকের হাত দিয়াই হউক বা তাহার নিজের প্রভুর হাত দিয়াই হউক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু বিচারক যদি নিজে প্রাণদণ্ড দিতে স্বীকার না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং তারপর তাহার প্রাণহরণ করা হইবে কি না হইবে সে বিষয়ে তাহার প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার। এদিকে আবার ক্রীতদাস যদি দুঃসাহসের বশংবর্ত্তী হইয়া প্রভুকে অস্ত্রদ্বারা বা লোষ্ট্রদ্বারা

আঘাত করে বা আঘাত করিতে চেষ্টা করে, এবং প্রভু যদি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে তাহা হইলে প্রভু নরহত্যার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা চাই যে বাস্তবিকই এইরূপ ঘটিয়াছিল; এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য দাসদাসীর এবং হত্যাকারীর নিজের শপথবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হওয়া চাই। যে কেহ শুদ্ধমাত্র বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তে বা পরহস্তদ্বারা বিনা প্রকাশ্যবিচারে তাহার দাসকে হত্যা করিবে সে দুষ্কৃতকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে, সে কখনও বিচারালয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে না, অবশিষ্ট জীবন তাহাকে নির্ব্বাসন বা প্রায়শ্চিত্তে কাটাইতে হইবে, এবং তাহার ধনসম্পত্তি তাহার নিকটতম ন্যায্য উত্তরাধিকারীর হস্তে ন্যস্ত হইবে।"

চর্চ্চের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি ব্যবস্থা আছে যাহা সচরাচর তেমন লক্ষ্য করা হয় না। সেটি প্রায়শ্চিত্তপ্রথা। বর্ত্তমানকালে বরং এই প্রথার আলোচনা অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক হওয়া উচিত, কারণ দণ্ডবিধিক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তপ্রথার যে ভাবে প্রয়োগ হইত তাহার সহিত আধুনিক চিন্তার অনেকটা মিল আছে। চর্চের দণ্ডবিধি ও প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে অপরাধীর মনে অনুতাপের উদ্রেক করা এবং দৃষ্টান্তদ্বারা দর্শকবৃন্দের মনে নৈতিক ভীতির সঞ্চার করিয়া দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য। ইহার সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্য মিশ্রিত ছিল—অপরাধীর পাপক্ষালন। দণ্ডবিধিমাত্রেই অনুতাপ উদ্রেক ও ভীতিসঞ্চার ছাড়া এই পাপক্ষালনের ধারণা অনুস্যূত আছে কি না, এই দুইটি তত্ত্বের পৃথক্‌করণ সম্ভব কি না—সাধারণভাবে এ প্রশ্নের উত্তর কি হইবে জানি না। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রাখিয়া এটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে চর্চ্চ তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থার মধ্যে দুইটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াছে—অপরাধীর পক্ষে অনুতাপ, অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত। যথার্থ বৈজ্ঞানিক দণ্ডবিধিরও কি ইহাই লক্ষণ নহে? বর্ত্তমান ও বিগত শতাব্দীর প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ইউরোপীয় দণ্ডবিধির সংস্কার প্রস্তাব করিতে গিয়া এই দুইটি নীতিরই কি দোহাই দেন নাই? তাঁহাদের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, যথা বেন্থামের গ্রন্থ দেখুন,—তাহার মধ্যে যে সকল দণ্ডপ্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার সহিত চর্চ্চের দণ্ডপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই চর্চ হইতে সেগুলি ধার করিয়া লন নাই, চর্চ্চও কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই যে ভবিষ্যকালের একজন নিষ্ঠাভক্তিহীন জড়বাদী দার্শনিকের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমর্থনের জন্য চর্চের দৃষ্টান্ত টানিয়া আনা হইবে।

সর্ব্বশেষে সমাজের উন্নতি সম্পর্কে চর্চের আর একটি চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সমাজের মধ্যে পশুবলের অবাধলীলা এবং যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি দমন করিবার জন্য

চর্চ্চ সর্ব্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছে। "দৈবরাজ্যের শান্তি এবং ঐরূপ" যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা চর্চ বাহুবল প্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল এবং সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও নম্রতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই জানেন। এ তথ্য এত সুপরিচিত যে এ বিষয়ে বিস্তার করিয়া বলিবার কোন আবশ্যক নাই। চর্চ্চের সহিত লোকসমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রধান কথাগুলি এখন বলা হইল। যে তিন দিক দিয়া চর্চ্চের বিচার করিব বলিয়াছিলাম তাহা করা হইল; এবং চর্চ্চের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও বাহ্যগঠন দুই বিষয়েই কিছু জ্ঞানলাভ করা গেল। এখন বাকী রহিল অনুমান ও যুক্তি সাহায্যে বিচার করা যে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চের সাধারণ প্রভাব কিরূপ ও কতখানি। আমার মনে হয় এ কাজটাও প্রায় সম্পন্ন করা হইয়াছে; কারণ চর্চের প্রধান প্রধান নীতি ও ব্যবস্থার উল্লেখ করিবামাত্র চর্চের প্রভাব সম্বন্ধেও একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। আপনারা কারণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যফলেরও আভাস পাইয়াছেন। তথাপি যদি সংক্ষেপে এই সকল কার্য্যফলের পুনরুল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে দুইটি সাধারণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমটি এই যে আধুনিক ইউরোপের চিন্তারাজ্যে ও নীতিরাজ্যে, সামাজিক ভাব, সামাজিক চিন্তা ও সামাজিক রীতিনীতি ক্ষেত্রে চর্চ্চ প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এ ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার; ইউরোপের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ আসলে ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়াই ঘটিয়াছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে ধর্ম্মতত্ত্বই তখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া আছে ও পরিচালন করিতেছে; সমস্ত মতবাদেই ধর্ম্মতত্ত্বের ছাপ; দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রশ্ন—সমস্তই ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার হইতেছে। চিন্তারাজ্যে চর্চের এমন অখণ্ড প্রকোপ যে গণিতবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানকেও চর্চের ধর্ম্মমতের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে। বেকন ও দেকার্ত্তের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজের শিরায় শিরায় ধর্ম্মতত্ত্বের রক্তই প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে দেকার্ত্তে মানববুদ্ধিকে ধর্ম্মতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়াছিলেন।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই একই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়; পদে পদে ধর্ম্মতত্ত্বসুলভ সংস্কার, ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোটের উপর এই প্রভাব কল্যাণপ্রদই হইয়াছে। ইহা যে শুধু ইউরোপের চিন্তাজগতে সজীবতা ও উর্ব্বরতা দান করিয়াছে তাহা নহে, যে সকল মতবাদ ও উপদেশ লইয়া সে দাঁড়াইল তাহা প্রাচীন জগতের শিক্ষা অপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ। ইউরোপের চিন্তা শুধু যে গতিবেগ লাভ করিল তাহা নহে, সে গতি উন্নতির দিকে ধাবিত হইল।

তাহা ছাড়া চর্চ্চের অবস্থানবৈশিষ্ট্যের গুণে আধুনিক জগতে মানবচিত্তের বিকাশ এমন একটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লাভ করিল যাহা পূর্ব্বে তাহার ছিল না। প্রাচ্যদেশে মানবচিত্ত কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ছাঁচে গঠিত ছিল; গ্রীকসমাজে তেমনি কেবলমাত্র মানবিকতারই আধিপত্য। প্রাচ্যচিন্তায় মানুষের বাস্তবপ্রকৃতি ও বাস্তবনিয়তির কথা একেবারে লুপ্তপ্রায়; গ্রীক চিন্তায় তেমনি কেবল মাত্র প্রাকৃত মানব, মানুষের বাস্তবপ্রবৃত্তি, বাস্তবভাব, বাস্তবস্বার্থই সমগ্র রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক জগতের চিন্তায় ধর্ম্মভাব সমস্ত ব্যাপারের সহিতই জড়িত হইয়া আছে, কিন্তু মানবজীবনের কোন ব্যাপারকেই একেবারে বাদ দেয় নাই। আধুনিক মানবিকতার মধ্যে মানবিকতার ছাপ আছে, দেবত্বেরও ছাপ আছে। আধুনিক সাহিত্যে মানুষের প্রাকৃতমনোভাব, ও প্রাকৃতআশাআকাঙ্ক্ষার কথা অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে; তথাপি এদিকে আবার মানুষের ধর্ম্মপ্রকৃতি, মানুষ যে অংশে অন্য একটা নিত্যলোকের সহিত সম্পৃক্ত, তাহারও সন্ধান প্রতিপদে পাওয়া যায়; এইরূপে মানুষের বিকাশ ও উন্নতির যে দুইটি প্রধান মূল প্রস্রবণ মানবিকতা ও ধর্ম্ম, এই দুইটিই একসঙ্গে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং চর্চ্চের সহিত যত দুর্নীতিদুরাচারই জড়িত থাকুক না কেন, চিন্তাজগতে বারবার সে যতই অত্যাচার উৎপীড়নে লিপ্ত থাকুক না কেন, সে সমস্ত সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে চর্চ্চের প্রভাবে ইউরোপের চিন্তাস্রোত বরং পুষ্টিই লাভ করিয়াছে, নিপিষ্ট হয় নাই,—ব্যাপ্তিই লাভ করিয়াছে, আবদ্ধ হয় নাই।

রাজনৈতিক হিসাবে কিন্তু চর্চ্চের প্রভাব অন্যরূপ। ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে লোকসমাজের মনোভাব ও আচারব্যবহারে কোমলতা ও শিষ্টতা আনিয়া এবং বহু বর্ব্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতঃ তাহাদের বিলোপসাধন করিয়া চর্চ সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শাসকশাসিতের পরস্পরসম্বন্ধনির্ণয়বিষয়ে, রাজক্ষমতা ও জনস্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্যসাধনবিষয়ে, আমি মনে করিনা যে চর্চ্চের প্রভাব মোটের উপর কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে চর্চ্চ সর্ব্বদাই দুইটি বিভিন্ন শাসনপদ্ধতির ব্যাখ্যাতা ও সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছে—একটি যাজকতন্ত্র, অপরটি রোমীয়-সাম্রাজ্য। দুইটিরই মূলনীতি যথেচ্ছশাসন, একটি ধর্ম্মের নামে, অপরটি ঐহিক অধিকারের নামে। চর্চ্চের সমস্ত অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা দেখুন; চর্চ্চের আইনকানুন ও কার্য্যপ্রণালী দেখুন; সর্ব্বদাই দেখিবেন হয় যাজকতন্ত্রনীতি না হয় সাম্রাজ্যনীতি, মূলে এই দুইএর একটি আছে। চর্চ্চ যখন দুর্ব্বল, তখন সে সম্রাট্‌দিগের অখণ্ডপ্রতাপের আশ্রয় লইয়াছে; যখন সে সবল, তখন নিজেই আধ্যাত্মিক অধিকারের দোহাই দিয়া সেই অখণ্ডশাসনাধিকার দাবী করিয়া বসিয়াছে।

আমরা কোন বিশেষ ঘটনা বা দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকিব না। চর্চ্চ অবশ্য অনেকবার রাজগণের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় প্রজাদিগের ন্যায্য অধিকারের দোহাই দিয়াছে; এবং অনেক সময় প্রজাবিদ্রোহে উত্তেজনা ও সম্মতি প্রদান করিয়াছে; রাজাদিগের মুখের সম্মুখে অনেকবার প্রজাদিগের অধিকার ও স্বার্থ লইয়া তাহাদের পক্ষসমর্থনও করিয়াছে। কিন্তু যখনই প্রজাদিগের স্বাধীন অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিয়াছে যাহাতে করিয়া প্রজাদিগের স্বাধীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা রাজশক্তির পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব হইয়া পড়ে,— তখনই চর্চ্চ সাধারণতঃ যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই, এবং যাজকসমাজের উপর অত্যধিক মাত্রায় মানবদৌর্ব্বল্য আরোপ করার বা এটাকে খৃষ্টীয় চর্চ্চেরই একটা অনন্যসাধারণ দোষ মনে করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার একটা গভীরতর কারণ আছে। ধর্ম্ম কি দাবী করে? ধর্ম্ম বলে "আমি মানুষের কামনাপ্রবৃত্তি, মানুষের ষড়রিপুকে শাসন করিব, দমন করিব, নিয়ন্ত্রিত করিব।" ধর্ম্মমাত্রই একটা সংযম, একটা শক্তি, একটা শাসন। ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য দৈববিধি, দৈবঅধিকার লইয়া অবতীর্ণ হয়। মানুষের স্বাধীনতা লইয়াই তাহাকে নাড়াচাড়া করিতে হয়; মানুষের স্বাধীনতাই তাহাকে বাধা দেয়, এবং এই স্বাধীনতাকেই সে অতিক্রম করিতে চায়। ইহাই ধর্ম্মের কার্য্য, ইহাই তাহার লক্ষ্য ও আশা।

একথা অবশ্য সত্য যে মানুষের স্বাধীনতা লইয়াই যদিচ ধর্ম্মের কারবার, যদিচ মানুষের ইচ্ছাপ্রবৃত্তির সংস্কারসাধনই ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা, তথাপি মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই তাহাকে স্বীয় প্রভাব খাটাইতে হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোন নীতিসঙ্গত উপায় তাহার হাতে নাই। ধর্ম্ম যখন মানুষের স্বাধীন সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া বলপ্রয়োগ, প্রবঞ্চনা, বা অন্য কোন্ বাহ্য উপায় অবলম্বন করে, যখন সে মানুষকে জলবায়ুর ন্যায় জড়শক্তিরূপে গণনা করে, তখন সে নিজের লক্ষ্য হইতেই ভ্রষ্ট হয়, সে তখন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শাসন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না। ধর্ম্ম যদি স্বলক্ষ্য সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এমন ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই তাহাকে বরণ করিয়া লয়; মানুষ তাহার শাসন মানিয়া লইবে ইহা আবশ্যক বটে, কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে মানুষ তাহাকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে বরণ করিয়া লইবে, মানুষ তাহার অধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতা বজায় রাখিবে। ধর্ম্মকে এই দ্বৈতসমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ধর্ম্ম কিন্তু অনেক সময়েই এদিকে দৃক্‌পাত করে নাই; সে মানুষের স্বাধীনতাকে বাধাই মনে করিয়াছে, সহায় মনে করে নাই। মানুষের আত্মা যে একটা জড়শক্তি নহে,

সে কথা অনেকবার ভুলিয়াছে। এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই সে মানবস্বাধীনতার বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। স্বাধীনতাকে সে শত্রু মনে করিয়া দমন করিতেই চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করে নাই। ধর্ম্ম যদি নিজের যথার্থ উপায়উপকরণ ভাল করিয়া কাজে লাগাইত, সে যদি একটা স্বাভাবিক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে স্বাধীনতাকে নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক; বুঝিত যে ধর্ম্ম নৈতিক উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না; ধর্ম্ম তাহা হইলে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শাসন করিতে গিয়া তাহাকে সম্মান করিতে শিখিত। এ কথা ধর্ম্ম অনেকবার ভুলিয়াছে, এবং পরিণামে স্বাধীনতারও যেরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ধর্ম্মেরও সেইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে চাহিনা। আমি এই প্রভাবের দুইটী দিক দেখাইয়াছি—একদিকে সামাজিক ও নৈতিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর প্রভাব, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভকর প্রভাব। এখন আমাদের যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের তথ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। এখন পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চ্চের ভাগ্যনিয়তির ক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক আমরা যে সকল তত্ত্বের যে সকল পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ইতিহাসের মধ্যেও সেই সকল পরিণামের সন্ধান পাই কিনা।

এ পর্য্যন্ত চর্চ্চের প্রকৃতির যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, ও তাহাদের যে যে পরিণাম সিদ্ধান্ত করিয়াছি সেগুলি সমস্তই যে একই সময়ে সমানভাবে প্রকট হইয়াছে তাহা মনে করিবেন না। বহুশতাব্দীর অন্তরালে যে কোন প্রাচীন যুগের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ইতিহাসে একটা ক্রমবিন্যাস আছে, ইতিহাসের ঘটনাবলী কালক্রমে পরে পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রমোয়েল বা গষ্টেবস্ আডল্‌ফাস্ বা কার্ডিনাল রিশলিয় বা যে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী ধরুন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন ও উন্নতিলাভ করেন; তাঁহার প্রভাবে বড় বড় ঘটনা ঘটে, তিনিও আবার ঐ সকল ঘটনাদ্বারা প্রভাবান্বিত হন; শেষে তিনি লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। তখন আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই; কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে সমগ্রসম্পূর্ণভাবে দেখি, বিধাতার কারখানায় গড়াপেটা হইয়া তিনি যেরূপে বাহির হইলেন আমরা তাঁহার সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাই। কিন্তু যাত্রাপথের আরম্ভে তিনি কিন্তু এমনটি ছিলেন না; তাঁহার জীবনের কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে তিনি কখনই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে দেখা দেন নাই; তিনি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছেন। মানুষের শরীর যেমন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও সেইরূপ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে; সে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার অন্তরাত্মা অনবরত স্বতঃই রূপান্তরিত হইতে থাকে; ১৬৫০ অব্দের

ক্রমোয়েল আর ১৬৪০ অব্দের ক্রমোয়েল নহেন। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের একটা পাকা ভিত থাকে; সর্ব্বদা একই ব্যক্তি অধ্যবসায় করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার ধ্যানধারণা, আশাআকাঙ্খা, চিন্তা-চেষ্টার কি পরিবর্ত্তন! তিনি কত জিনিষ হারাইয়াছেন, আবার কত জিনিষ নূতন পাইয়াছেন! মনুষ্যজীবনের যে কোন মুহূর্ত্তেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, কাল পূর্ণ হইলে সে জীবন কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কখনই দেখিতে পাই না।

এইখানেই কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; মানুষ সম্বন্ধে তাঁহারা একটা সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহার জীবনেতিহাসের সর্ব্বত্রই তাঁহারা সেই সুপরিণত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ১৬২৮ অব্দে পার্লামেণ্টে প্রবেশকালেও যে ক্রমোয়েল, ত্রিশবৎসর পরে হোয়াইটহল প্রাসাদে মৃত্যুশয্যায় শয়ান সেই একই ক্রমোয়েল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ ব্যাপক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা অনবরত এই একই ভুল করিয়া থাকেন। আমরা যেন সে ভুল না করিয়া বসি; আমি চর্চের যে সমস্ত লক্ষণ ও পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা চর্চ্চের সমগ্র ইতিহাস ধরিয়া। কিন্তু মনে রাখিবেন যে এ চিত্র ঐতিহাসিক হিসাবে নির্ভুল নহে; আমি যাহা একত্র অখণ্ডভাবে দেখাইয়াছি ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহা খণ্ডিত ও ক্রমবিন্যস্ত, বিভিন্ন দেশকালের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এই শৃঙ্খলা, কার্য্যকারণের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখিতে প্রত্যাশা করিবেন না। দেখিব এখানে এক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে, ওখানে অন্য লক্ষণ; সমস্তই অসম্পূর্ণ, অসমান, বিক্ষিপ্ত। চর্চের ইতিহাসের শেষসীমায়, অর্থাৎ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আসিয়া না পড়িলে তাহার সমগ্র পরিণাম দেখিতে পাইব না। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়াছে এখন আমি সেইগুলি আপনাদের নিকট বিবৃত করিব। আমার সমস্ত উক্তির প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া দিতে পারিবনা, কিন্তু যাহা দিব তাহা হইতে এটা বেশ ধারণা হইবে যে আমার সিদ্ধান্তগুলি অযৌক্তিক নহে।

প্রথম যখন পঞ্চম শতাব্দীতে চর্চ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন সে সাম্রাজ্য-গৌরবে মণ্ডিত, চর্চ্চ তখন রোমীয় সাম্রাজ্যের চর্চ্চ। রোমীয় সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ, তখন চর্চ্চ ভাবিতেছিল সে তাহার জীবনলীলার চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাহার বিজয়যাত্রা সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে চর্চ তখন রোমের প্রাচীনধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মানুসারে রোমের সম্রাটগণ প্রধান পণ্টিফ বা পুরোহিত আখ্যা ধারণ করিতেন। সর্ব্বশেষ যে সম্রাট এই পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রাসিয়ান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অবসানকালে প্রাণত্যাগ করেন। অগষ্টস ও টাইবেরিয়াসের ন্যায় গ্রাশিয়ান প্রধান পণ্টিফ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। খৃষ্টপন্থীদিগের মধ্যে যে সমস্ত বিকৃত পাষণ্ডীমত প্রচলিত হইয়াছিল সেই সকল পাষণ্ডীসম্প্রদায়ের পরাজয়সাধনও তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীর

শেষভাগে সম্রাট থিওডোসিয়স "আরিয়ান" নামক প্রধান পাষণ্ডী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক কঠোর আইন প্রণয়ন করিলেন। চর্চের দুই প্রধান শত্রুপক্ষ তখন চর্চের পদানত ও শাসনাধীন। এমন সময় চর্চ অকস্মাৎ দেখিল রোমীয়সাম্রাজ্য আর তাহাকে আশ্রয় দিতে অক্ষম, সে নিজেই ধ্বংসমুখে পতিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে গথ, ভ্যাণ্ডাল, বর্গণ্ডিয়ান, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি নানা বর্ব্বরজাতি, নানা নূতন বিধর্ম্মীসম্প্রদায়, নানা নূতন নূতন পাষণ্ডী মত চর্চের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। চর্চ একবারে অতলজলে পড়িয়া গেল। চর্চের মধ্যে রোমসাম্রাজ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বহুদিন ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল—অর্থাৎ পৌরতন্ত্র ও যথেচ্ছশাসনতন্ত্র—চর্চ তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিল। এবং সে যখন বর্ব্বর জাতিগুলিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল তখন পুনরায় রোমসাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করিতে লাগিল। চর্চ বর্ব্বররাজগণকে সম্বোধন করিয়া সম্রাটপদবী ধারণের জন্য বারবার আহ্বান করিতে লাগিল। সে বলিল— "তোমরা সম্রাট্‌পদবী ধারণ কর, সম্রাট্‌দিগের সমস্ত অধিকার গ্রহণ কর এবং রোমসাম্রাজ্যের সহিত চর্চের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন কর।" পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ইহাই ছিল বিশপদিগের প্রধান কার্য্য। এই গেল চর্চের প্রথম অবস্থা।

এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বর্ব্বরবৃন্দ লইয়া রোমীয়রাষ্ট্র গঠন করার কোন উপায় ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় চর্চও বর্ব্বরতার পঙ্কে ডুবিয়া গেল। ইহাই চর্চের দ্বিতীয় অবস্থা। অষ্টম শতাব্দীতে যাজকতন্ত্রের পক্ষ হইতে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ইতিবৃত্তকারদিগের রচনা তুলনা করিলে দেখিবেন কত বিষম পার্থক্য। রোমীয় সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে; সমস্তই যেন বর্ব্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। একদিকে বর্ব্বরগণ যাজকসমাজে প্রবেশ করিয়া যাজক ও বিশপ হইতেছে; অন্যদিকে বিশপগণ বর্ব্বরোচিত জীবনযাত্রা অবলম্বন করিতেছেন; তাঁহারা নিজ নিজ এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই দল সংগ্রহ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছেন, যুদ্ধাদি করিতেছেন, ও দেশের মধ্যে উপদ্রব অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন। তুর (Tours) বাসী গ্রেগরীর গ্রন্থে সালোনস্, সাজিটারিয়স প্রভৃতি কতকগুলি বিশপের উল্লেখ পাইবেন, যাঁহারা এই ভাবেই জীবন যাপন করিতেন।

বর্ব্বর চর্চের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যাপার সংঘটিত হইল। প্রথমটি হইতেছে ঐহিক ও পারত্রিক শাসনশক্তির পার্থক্যসাধন। এই সময়েই এই নীতির উদ্ভব হয়। এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চর্চ যখন রোমীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার পরাক্রমের অংশীদার হইতে পারিল না, তখন সে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার

জন্য স্বাধীনতালাভ করিতে উৎসুক হইল। তখন তাহার চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদাশঙ্কা, সেইজন্য চারিদিক হইতে তাহাকে তখন আত্মরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক যাজক, প্রত্যেক বিশপ দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বর্ব্বর প্রতিবেশীগণ কেবলই চর্চের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে, কেবলই জোর করিয়া চর্চের ভূমিসম্পদ ও ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চর্চের তখন আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় এই কথা বলা যে "ধর্ম্মজগৎ বৈষয়িকজগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তোমাদের নাই।" বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পক্ষে এই নীতিই ছিল চর্চের প্রধান অস্ত্র।

চর্চের ইতিহাসে এই যুগের দ্বিতীয় প্রধান ব্যাপার হইতেছে প্রতীচ্য ইউরোপে মঠধারী ভিক্ষুসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও পুষ্টি। ইহা সকলেই জানেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সেণ্ট বেনেডিক্‌ট্ প্রতীচ্য ইউরোপের ভিক্ষুদিগের মধ্যে নিজের নিয়মপ্রতিষ্ঠা করিয়া সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তখন ভিক্ষুসংখ্যা অতি সামান্যই ছিল, যদিও পরবর্ত্তী কালে তাহাদের অত্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে ভিক্ষুদিগকে যাজকসমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইত না, তাঁহারা তখন সাধারণ লোকের ন্যায়ই পরিগণিত হইতেন। অবশ্য বিশপ বা যাজক নিয়োগকালে অনেক সময় ভিক্ষুসমাজের মধ্য হইতেই যোগ্য লোক অনুসন্ধান করিয়া লওয়া হইত, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর অবসান ও ষষ্ঠশতাব্দীর প্রারম্ভকালেই সাধারণভাবে সমস্ত ভিক্ষুকেই যাজক সমাজের অন্তর্গত বিবেচনা করা হইতে লাগিল। তখন আমরা দেখিতে পাই যাজক ও বিশপগণ ভিক্ষু হইতেছেন ও মনে করিতেছেন যে এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মজীবনে নূতন করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। এইরূপে ইউরোপে ভিক্ষুসম্প্রদায় অসামান্য বিকাশলাভ করিল। সাধারণ যাজক অপেক্ষা এই সকল ভিক্ষুরাই বর্ব্বরদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনপ্রণালীও যেমন অসাধারণ, তাঁহাদের সংখ্যাও সেইরূপ অপরিসীম। সাধারণ যাজক ও বিশপ বর্ব্বরদিগের কল্পনায় কোন বিশেষ ছাপ দিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মধ্যেত কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই; বর্ব্বরগণত বরাবরই তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের উপর কত অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে, কতবার তাহাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। এদিকে ভিক্ষুদিগের একটা মঠ আক্রমণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নহে; সেখানে কত কত সাধুপুরুষ একত্র দল বাঁধিয়া থাকেন। বর্ব্বরযুগে এই মঠগুলি চর্চের আশ্রয়-স্বরূপ ছিল; যেমন চর্চ আবার সাধারণ লোকসমাজের আশ্রয়স্থল ছিল। প্রাচ্যখণ্ডে যেমন কনষ্টাণ্টিনোপলের বিলাসপ্রলোভন ও বৈষয়িক জীবনের গণ্ডগোল হইতে পলায়ন করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ থিবাইডের মরুভূমিতে আশ্রয় লইতেন, প্রতীচ্যখণ্ডে সেইরূপ তাঁহারা এইসকল মঠের মধ্যে আশ্রয় পাইতেন।

বর্ব্বরযুগে চর্চের ইতিহাসে এই দুইটি প্রধান ব্যাপার—একদিকে ধর্ম্মশাসন ও ঐহিকশাসনের স্বাতন্ত্র্যস্থাপন, অপর দিকে প্রতীচ্য ইউরোপে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ।

বর্ব্বরযুগের শেষভাগে শার্লমেন কর্ত্তৃক রোমীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার দিকে একটা নূতন চেষ্টা হয়। চর্চ ও রাজশক্তির মধ্যে পুনরায় একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এসময়ে পোপ-শক্তি সম্রাটের সহিত মিত্রভাবে চলিয়া অনেক পরিমাণে উন্নতি ও পুষ্টি লাভ করিল। এ চেষ্টাও কিন্তু ফলবতী হইলনা, শার্লমেনের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল, কিন্তু এই সন্ধিসূত্রে চর্চ্চ যে সুবিধা ও শক্তি লাভ করিল তাহা রহিয়া গেল। পোপশক্তি এখন খৃষ্টপন্থী সমাজের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া বসিল।

শার্লমেনের মৃত্যুর পর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিল; সাধারণ সমাজের ন্যায় চর্চ্চ ও এই আবর্ত্তে নিপতিত হইল, এবং কালক্রমে ফিউডাল পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়া তবে উদ্ধার পাইল। এই হইল চর্চ্চের তৃতীয় অবস্থা। শার্লমেনের সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার ফলে সাধারণ সমাজের ভাগ্যে যাহা ঘটিল, চর্চ্চের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল; সমস্ত একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সমস্ত ব্যাপারই এখন স্থানীয়, খণ্ডিত, ব্যক্তিগত হইয়া পড়িল। তখন যাজকসমাজে, অবস্থা-বৈগুণ্যে এমন একটা বিরোধের সূত্রপাত হইল যাহার তুল্য কিছুই এতদিন দেখা যায় নাই। একদিকে ফিউড্যাল ভূস্বামীর স্বার্থ ও মনোভাব, অন্যদিকে সাধারণ যাজকের স্বার্থ ও মনোভাব, এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাজকতন্ত্রের অধিনেতৃবর্গ এই দুই প্রতিকূল পক্ষের মাঝখানে পড়িলেন, কখনও একপক্ষ কখনও অপরপক্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। যাজকসমাজের ঐক্যসূত্র তেমন প্রবল ছিল না; ব্যক্তিগত স্বার্থই এখন প্রবল হইয়া উঠিল; স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা ও ফিউড্যালসমাজসুলভ স্বাতন্ত্র্যমুখী রীতিনীতি অভ্যাসের ফলে যাজকসমাজের শৃঙ্খলাবন্ধন এখন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় এই শিথিলতার প্রতিরোধকল্পে চর্চ্চের মধ্যেই একটা চেষ্টার সূত্রপাত হইল। যাজকেরা নানা স্থানে সভাসমিতির সাহায্যে এক একটা জাতীয় চর্চ্চ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এই সময়ে ভূস্বামীতন্ত্রের আমলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সংসদ, সঙ্গীতি, প্রাদেশিক ও জাতীয় যাজকসম্মিলনী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া ফ্রান্সেই এই একতাবন্ধনের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম ও উৎসাহের সহিত চালান হয়। র‍্যাঁ-নগরীর আর্চবিশপ হিঙ্কমার এই চেষ্টার প্রধান প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ফরাশী চর্চ্চকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দিকেই তাঁহার প্রধান যত্ন ছিল। বিভিন্ন যাজকসম্প্রদায়ের পরস্পর

একদিকে তিনি যেমন সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্যই সাধারণ সমাজকে চর্চের শাসনে এবং চর্চকে পোপশক্তির শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঠিক এই সময়ে এইরূপই একটা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়। কঠোর নিয়ম

অন্যদিকে পোপের সম্পর্কেও জাতীয় চর্চ্চের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। যখন পোপ ফ্রান্স আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও ফরাসী বিশপদিগকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় দেখাইলেন তখন হিঙ্কমারই বলিয়াছিলেন—"তিনি যদি সমাজচ্যুত করিতে আসেন তাহা হইলে নিজেই সমাজচ্যুত হইবেন।" কিন্তু পূর্ব্বে সাম্রাজ্য সম্পর্কে চর্চ্চকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন নিষ্ফল হইয়াছিল, ফিউড্যাল চর্চ্চ গড়িবার এই চেষ্টাও সেইরূপ নিষ্ফল হইল। এ চর্চ্চের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কোন উপায় ছিলনা। ইহার ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল। প্রত্যেক বিশপ ও মঠধারী মোহন্ত নিজ নিজ এলাকা বা মঠের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে চর্চ্চের মধ্যে যাজকপদ বণ্টন বিষয়ে এত অধিক মাত্রায় অন্যায় পক্ষপাত ও আত্মীয়কুটুম্বপোষণের ভাব প্রবেশ করিল, এবং যাজকবৃন্দের জীবনে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার এত প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল যে এরূপ আর কখনও হয় নাই। এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনেও ধর্ম্মপরায়ণ যাজকদিগের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এই জন্য অনতিবিলম্বেই চর্চ্চের মধ্যে একটা সংস্কারের আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিল; চর্চের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া সকলকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এমন একটা কর্ত্তৃত্বশক্তির জন্য ব্যাকুলতা জন্মিল। তুরীনের বিশপ ক্লোদ এবং লিয়ঁর বিশপ আগোবার্ড তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার মধ্যে এইরূপ কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু এরূপ একটা কার্য্য সাধন করিবার মত তাঁহাদের অবস্থা ছিল না। সমস্ত চর্চ্চের মধ্যে কেবল একমাত্র শক্তি এই কার্য্য সাধনে সক্ষম ছিল, সে রোমের পোপ। সুতরাং পোপের প্রভাব বাড়িয়া উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। একাদশ শতাব্দীতে চর্চ্চ তাহার চতুর্থাবস্থায় পদার্পণ করিল—চর্চ্চ এখন রীতিমত ভিক্ষুপ্রধান যাজকতন্ত্র চর্চ্চ। পোপ সপ্তম গ্রেগরীকে এই রূপান্তরিত চর্চ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে সপ্তম গ্রেগরী একজন উন্নতিবিরোধী, তিনি সমস্ত জিনিষকে স্থাবর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সামাজিক উন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির তিনি বিরোধী, সমস্ত জগৎকে নিশ্চল বা পশ্চাদগামী করিয়া রাখাই তাঁহার কামনা ছিল। ইহা অপেক্ষা অসত্য আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি শার্লমেন ও জার পিটারের ন্যায় যথেচ্ছাচারতন্ত্রের পরিপোষক হইয়াও সংস্কারক ছিলেন। তিনি চর্চকে, এবং চর্চের মধ্য দিয়া সমাজকে সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সমাজের মধ্যে আরও সুনীতি, আরও [illegible]ধর্ম্ম, আরও নিয়মসংযম আনিতে চাহিয়াছিলেন। পোপশক্তির সাহায্যে ও পোপশক্তির শ্রীবৃদ্ধি কল্পেই তিনি এ কার্য্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। —

[illegible]বাবানর্ম্মের যত প্রকার উপায় অনুষ্ঠান ছিল তাহা তিনি সন্ধান করিয়া বাহির করিতেন [illegible] কাজে লাগাইতেন, যেন এই উপায়ে ফিউড্যাল চর্চ্চের মধ্যে একটা একতাবন্ধন [illegible]ফিরাইয়া [illegible]না যায়। হিঙ্কমার একদিকে রাজশক্তির সম্পর্কে চর্চ্চের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেন,

সংযমের দিকে, নৈতিক শাসনের দিকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবল উদ্যম দেখা দেয়। এই সময়েই রোবেয়ার দ্য মোলেম সিটো-বিহারে একটা কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এই সময়েই সেণ্ট নর্‌বেত্মার, সেণ্টবেরনার প্রভৃতি বড় বড় ভিক্ষুসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। মঠগুলির মধ্যে তখন একটা প্রবল আন্দোলন চলিতে ...ক; প্রাচীন ভিক্ষুগণ প্রাচীন প্রথা সমর্থন করিতে লাগিলেন, বলিলেন কালধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া চর্চের আদিম বিশুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, এই সকল সংস্কার দ্বারা কেবল আমাদের স্বাধীনতাই খর্ব্ব করা হইবে ইত্যাদি। সংস্কারকদিগকে তাঁহারা উন্মাদগ্রস্ত বাতুলের মত মনে করিতেন। অডেরিক ভিটাল প্রণীত নর্ম্যাণ্ডীর ইতিহাস খুলিলে পদে পদে এই সকল অভিযোগ দেখিতে পাইবেন।

সুতরাং সমস্তই এখন চর্চের ঐক্যের পক্ষে ক্ষমতাবৃদ্ধিরপক্ষে সুবিধাজনক হইয়া পড়িল। পোপ যখন এইরূপে নিজের ঐহিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ভিক্ষুগণ যখন মঠের মধ্যে নৈতিক সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর, এমন সময়ে কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি প্রত্যেকে একক ভাবে ব্যক্তি-মনবের পক্ষ হইতে এইদাবী তুলিলেন যে মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিরও একটা অস্তিত্ব আছে এবং মানুষের মতামত গঠনের পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সর্ব্বজনগৃহীত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস আক্রমণ করেন নাই, তাঁহারা কেবল বলিলেন এগুলিকে যাচাই করিবার অধিকার মানুষের আছে, মানুষের বিচার বুদ্ধি নিঃশব্দে এগুলিকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

(শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

স্বপ্ন ও সত্য

(এমার্সন হইতে)

নিশায় ঘুমের ঘোরে দেখিনু স্বপন
হেসে খেলে কেটে যায় সুখের জীবন।
প্রভাত হইল ভেঙে গেল ঘুমঘোর
দেখিনু জীবন শুধু কর্ত্তব্য কঠোর ॥

শ্রীহিরণ কুমার সেন।

তখন দিলে দেখা

সম্পদেতে কোনমতে পাইনি তোমায় সখা!
দুঃখ যখন ঘনিয়ে এল, তখন দিলে দেখা।
আমার বলতে এজগতে
যা'ছিল, তা' নিতে নিতে
নিঃস্ব করে বিশ্বমাঝে ছাড়িয়ে দিলে একা!
সেই হতে আর তোমার আমার
নেইক বাধা দেখা শোনার
শূন্য মনের গোপন পুরে
আপনা হ'তে উঠল গড়ে
তোমার পূজার মন্দিরটি একেবারে পাকা!
বিপদ যখন ঘনিয়ে এল তখন দিলে দেখা।

শ্রী চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

বাংলা উপন্যাস

উপন্যাস কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। কথাসাহিত্য বলিতে কবিতা, উপন্যাস, গল্প ও কাহিনী সকলই বুঝায়—এককথায় বলিতে গেলে কল্পনাপ্রসূত, সুকুমার ও চিত্তবিনোদক সাহিত্যমাত্রই কথাসাহিত্য। মানুষের অন্তরকে আনন্দদান করিতেই কথাসাহিত্যের সৃষ্টি। কথাসাহিত্য তাই সম্ভবঅসম্ভব, বাস্তবঅবাস্তব সকলকে অতিক্রম করিয়া আনন্দের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে। তাই আমরা বিজন রাক্ষসপুরীতে লোকহীন বিরাট রাজপ্রাসাদে ঘুমন্ত রাজকন্যার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠি, দুঃখিনী দুয়োরাণীর সন্তান কেমন করিয়া সপ্তসাগরমন্থনধন গজমতি আনিল, সেই বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন পথিক, চিরশিশু, চিরউৎসুক, চিরপিপাসু নিদ্রিত রহিয়াছে, কথাসাহিত্যে তাহারই ছবি ফুটিয়া উঠে। আমাদের বুভুক্ষু হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনার ছায়া দর্পণের প্রতিবিম্বের মত দেখিতে পাই বলিয়াই কথাসাহিত্যের এত আদর। আমাদের মধ্যে যে সহস্রমুখী দ্বন্দ্বপরায়ণ এবং যুগান্তের শোণিতধারায় প্রবাহিত বিশ্বের অতলরহস্যসন্ধিৎসা ঘুমাইয়া রহিয়াছে, আমাদের সেই চিরবন্য চিরদুর্দ্দান্ত প্রকৃতিটী কথাসাহিত্যের মায়ায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে।

উপন্যাসও তাই, আমাদের অন্তর্নিহিত যে বৃত্তিসমূহ অপরিস্ফুট বা অর্দ্ধপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের বিভিন্নমুখী ও বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু কথাসাহিত্যের অন্যান্য রূপের সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ এইখানে যে উপন্যাসে আমরা অবাস্তব দেখিলেও অপ্রাকৃত দেখিতে পাইনা, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে **transcendental** অথবা **supernatural** অর্থাৎ অতিলৌকিক বলে, উপন্যাসে তাহার অভিব্যক্তির স্থান নাই।

আর একটী পার্থক্য এইখানে যে, উপন্যাসের রাজ্য মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাহিনী ও কবিতা মানবরাজ্য অতিক্রম করিয়া, বাস্তব ও প্রাকৃতকে লঙ্ঘন করিয়া, জীব ও অজীব জগতে, অতিপ্রাকৃত ও অতিলৌকিকে ছুটিয়া গিয়াছে। মানুষের কল্পনা ও বিস্ময়বৃত্তিতে আঘাত করিতে সে কিছুতেই কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই মানবমনের সুন্দর ও ভীষণ সৃষ্টি মিলিয়া কথাসাহিত্যের এই প্রদেশটীকে ভীতিমধুর করিয়া তুলিয়াছে। কাল্পনিক ভূতের ভয়ে যেমন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমরা বার বার ছায়াঘন আম্রবনের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহি, তেমনি কথাসাহিত্যের এই রাজ্যটী তাহার ভীতির অপরূপ আকর্ষণেই আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

চিত্তবিনোদনই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য — ঘটনাসজ্ঘাতে মানুষের চরিত্রের কিরূপ বিকাশ ও পরিবর্ত্তন হয়,—তাহা দেখিয়া, ঘটনার পর ঘটনা পুঞ্জীভূত করিয়া আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া আনন্দদান ঔপন্যাসিকের একটি প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঔপন্যাসিকের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল আমোদ দিবার জন্য উপন্যাস নয়—আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষাপ্রদানই উপন্যাসের চরম উদ্দেশ্য। সত্য ও সৌন্দর্য্যের মিলনেই শিক্ষা, তাই Keats বলিয়াছেন—

> "Beauty is Truth, truth beauty," that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know.

ঔপন্যাসিকও যদি তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া বিশ্বের কোন চিরন্তন সত্য প্রকাশ

করিতে পারেন, তবেই তাঁহার শিল্প সার্থক—সুন্দর হইয়া উঠে। সত্যের আনন্দ চরম আনন্দ, চিরস্থায়ী শাশ্বত আনন্দ। তাই উপন্যাসিক যেখানে সত্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, সেইখানেই তাঁহার শিল্পসাধনার চরম বিকাশ।

জীবনের এই সত্যকে নানা লেখক নানাভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। একই আলোককে যেমন সবুজ কাচের মধ্য দিয়া সবুজ, লালের মধ্য দিয়া লাল এবং সাদার মধ্য দিয়া সাদা দেখায় তেমনি জীবনের অনুভূতির বিভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন ঔপন্যাসিক তাহাকে বিভিন্নরূপে দেখিয়াছেন এবং বিভিন্নপথাবলম্বী ঔপন্যাসিক হওয়ার কারণও তাই। কেহ বস্তুর মধ্যে সত্য খুঁজিয়াছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য পারিপার্শ্বিক বহির্জগতের ঘটনাবলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়াই তাঁহারা পরিতুষ্ট, কেহবা তাহার উপর কল্পনার তুলি ফলাইয়া যেমনটী-হইতে-পারিত, তাহাকেই আর্টের সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই মতাবলম্বী লেখক কি ঘটিয়াছে, না ঘটিয়াছে, সে কথা স্মরণ রাখিলেও তাহার উপর অনেক অঘটিত অথচ ঘটনসম্ভব বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিশেষত্ব এইখানে যে জীবনের পুরাতন রাজপথের ধূলির মধ্যেও তাঁহারা রহস্যের আভাস পাইয়াছেন, জীবনের দুঃখদৈন্যের কণ্টকবনের মধ্যেও তাঁহারা পুষ্পিত তরুর সন্ধান পাইয়াছেন। পৃথিবীতে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, সেই প্রতিদিনের পুরাতন জীর্ণজীবনপ্রবাহের মধ্যে তাঁহারা অসাধারণত্ব দেখিতে পাইতেছেন। তাই তাঁহারা বীরচরিত্র আঁকিয়াছেন, পাপীর ঘৃণ্য জীবননাটিকার পট দৃশ্যের পরে দৃশ্যে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, নরঘাতক, বিশ্বাসঘাতক, অথবা প্রেমিকের ছবির অভাব তাঁহাদের লেখায় নাই—কিন্তু দোষেগুণেমেশা মানুষ, প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ মানুষ তাঁহাদের লেখায় বিরল।

তৃতীয় দলের লেখকেরা বাস্তবকে বর্জ্জন করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কি ঘটিয়াছে, বা কি ঘটিতে পারিত, সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা মানুষের কল্যাণের আদর্শ চিত্রিত করিয়য়াছেন।—তাঁহারা মানুষের মধ্যে নিদ্রিত স্বর্গ দেখিয়াছেন, তাহাকে জাগ্রত করিতেই তাই তাঁহারা সকলে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের অন্তরের মধ্যে নগ্ন যে আত্মা জাগ্রত রহিয়াছে, তাহার উদ্বোধন করিতেই তাঁহারা তৎপর—বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে তাহা পরিণতির পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, সেই চিত্রই তাঁহাদের লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বস্তুপন্থা, কল্পপন্থা, ও শ্রেয়ঃপন্থা—ঔপন্যাসিকেরা প্রধানতঃ এই তিনটি রাজপথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও একেবারে কোনও ভাগে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, কারণ বস্তুপন্থীর লেখার মধ্যেও শ্রেয়ঃপন্থার ধ্রুবজ্যোতিঃপাত হইয়াছে। শ্রেয়ঃপন্থীও তাঁহার লেখায় বস্তুপন্থানুসরণ করিয়া তাহাকে জীবনদান করিয়াছেন। কল্পপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থীর মধ্যে ব্যবধান আরও কম, একে অবলীলাক্রমে

অন্যের লেখপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

অন্যান্য দুইটী রচনানীতির উপর শ্রেয়ঃপন্থার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে শ্রেয়ঃপন্থীরা অনিত্যকে ছাড়িয়া ধ্রুবকে অনুসরণ করিয়াছেন—সাময়িক দ্বন্দ্ববিদ্বেষের ছায়া তাঁহাদের রচনায় নাই, চিরদিনের মতন জীবনের মহত্তর আদর্শ বিশ্বমানবের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থাপিত করিয়াছেন, একটী উন্নত পবিত্র সংযমের ভাবে তাঁহাদের সকল লেখা অনুপ্রাণিত। তাঁহারা মঙ্গলের পবিত্র উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জীবনরচনার ধারা চালিত করিয়াছেন—মহত্বের আদর্শ তাঁহাদের লেখার প্রতিছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যেও উপন্যাসের এই তিনটি রচনাধারা অল্পাধিক পরিমাণে ফুটিয়াছে—সেই ধারার আলোচনা করিবার আগে উপন্যাসের পরিণতির বিষয় কিছু বলা দরকার।

বাঙ্‌লার সাহিত্যে উপন্যাস বিদেশী আমদানী। ইয়োরোপীয় সাহিত্য আলোচনার ফলেই বাঙ্‌লা-ভাষা উপন্যাসসাহিত্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতে যে সকল কাহিনী আছে (যেমন কাদম্বরী, হর্ষচরিত) অন্ততঃ অনুবাদ পড়িয়া আমার বোধ হয় যে তাহারা উপন্যাস-পদবাচ্য নহে। তাহারা যে উপন্যাসের চেয়ে অপকৃষ্ট, তাহা বলা হইতেছে না—কেবল উপন্যাসের সহিত তাহাদের কয়েকটী মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ মানবমনের বিচিত্র গতিভঙ্গির দিকে তাহার কোনই দৃষ্টি নাই, কোনো মানুষের চরিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতি-ঘাতে কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, সে বিষয়ে তাহারা অন্ধ। মানুষের অপেক্ষা ঘটনার প্রতি, চরিত্রচিত্রণের অপেক্ষা গল্পলেখার প্রতি তাহাতে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরে, তাহাতে অতিলৌকিক অনেক জিনিষ স্থান পাইয়াছে, যাহা আমাদের জীবনের অভি-জ্ঞতায় সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও মানুষাতীত চিত্র তাহাতে স্থান পাইয়াছে—কিন্তু উপন্যাসে তাহারা গৃহীত হয় না। তাই আমরা তাহাতে গল্প পাই, কল্পনা ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পাই,—কিন্তু **উপন্যাস** পাই না।

অথবা বাঙলার প্রাচীন রূপ কথা—যেমন কাঞ্চনমালা, মালঞ্চ মালার কাহিনী,—তাহাতেও উপন্যাসের এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে হৃদয়বিদারণ কারুণ্য আছে, বাঙ্‌লার প্রাণের সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের বিশেষত্ব, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এ মিশ্রণ তাহাতে পাই না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাজি শিক্ষার ফলে যখন বাঙালীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—তখনই বাঙ্‌লা ভাষায় উপন্যাসের আবির্ভাব। বাঙ্‌লা সাহিত্যে সে হিসাবে প্রমথ শর্ম্মা লিখিত "নববাবুবিলাস"কে প্রথম উপন্যাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাহাতে যে খুব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নহে; উপন্যাস বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, সে আদর্শের সঙ্গে তাহা মোটেই খাপ খাইবে না, উপন্যাসপদবাচ্য বলিয়া গ্রাহ্যই হইবে না, তবু যেমন বিবর্ত্তনের ধারায় সেই আদিম যুগের amoeba হইতে

মানুষের উৎপত্তি, তেমনি ইহাকেই বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ইহার পূর্ব্বের অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে, যে ইহার লেখক সাধারণ মানুষকেই তাঁহার রচনার বিষয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—তাৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কারসাধনার্থই ইহা ইংরাজি নভেলের ছায়ানুসরণে লিখিত। অপ্রাকৃত অথবা অতিলৌকিক ঘটনা ইহাতে নাই বলিলেই চলে—ইহাকে আমরা বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম ব্যঙ্গছবি বলিতে পারি। সুইফ্‌টের অনুকরণে ইহার লেখক বাঙ্‌লার তাৎকালীন সমাজকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যেও লক্ষ্যের বিষয় এই যে লেখক তাঁহার পাত্রগণকে জীবনের উচ্চতম স্তর হইতে গ্রহণ করেন নাই—এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার লেখায় heroic চরিত্র নাই।

"আলালের ঘরের দুলাল", "হুতুম প্যাঁচার নক্সা" প্রভৃতি ইহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই সময়কার বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাঙলার স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব হইয়াছিল। তখনকার বাঙালীর প্রাণ দুইটী বিপরীত স্রোতোবেগে সংশয়ে দুলিতেছিল। তাই এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় দেখি যে পুরাতন বাঙালীর সভ্যতা ও আগন্তুক ইয়োরোপীয় সভ্যতা দুইই তাঁহার বিদ্রূপভাজন হইয়াছে। আসল কথা এই যে বাঙালীর **অন্তরমুখী, সৌন্দর্য্যতৃপ্ত** এবং গ্রামকেন্দ্র আদর্শকে এই সময় ইয়োরোপের বহির্মুখী সভ্যতা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, এবং বাঙালীর মন সংশয়ে দুলিতেছিল বলিয়া সাহিত্যেও এই অস্থায়ী ভাব ফুটিয়াছে। তবু তাঁহাদের লেখায় একটী ইয়োরোপীয় আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী সমাজ সংস্কারের চেষ্টা।

এই সকল ক্রমবিবর্ত্তণের দ্বারা অতিক্রম করিয়া আমরা যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই, তখনও বাঙলার উপন্যাসসাহিত্য টেকচাঁদপ্রদর্শিত সেই পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। সেই সকল লেখাকে আমরা দুই ভাগ করিতে পারি—এক অসম্ভব কল্পনা ও আদিরসভারাক্রান্ত গল্প, আর এক টেকচাঁদের পন্থানুসরণের ব্যর্থ চেষ্টা। সে সকল লেখকদের মধ্যে টেকচাঁদের বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটে নাই, কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গরসের অনুকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। এই যুগের সকল লেখারই একটী বিশেষত্ব যে তাহারা নিতান্ত ঘরোয়া। লেখকের অসাধারণত্ব কল্পনা করিবার প্রয়াসসত্ত্বেও গ্রাম্যজীবনধারার ঘরোয়া কথা ছাড়া কিছুই ফুটে নাই।

তারপরে বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" যেদিন প্রকাশিত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্‌লা উপন্যাসের আধুনিক যুগ আরম্ভ হইল। বঙ্কিমের লেখার প্রায় ছত্রে ছত্রে আমরা Sir Walter Scotএর প্রভাব দেখিতে পাই। সেই মধ্যযুগের প্রতি একটী প্রগাঢ় আকর্ষণ, সেই বীরত্বপ্রীতি, সেই অসাধারণত্ব-সন্ধান দুইয়ের লেখায়ই সমান ফুটিয়াছে। 'Strangeness added to beauty'—কল্পপন্থার এ আদর্শ তাঁহার লেখার অক্ষরে অক্ষরে রহিয়াছে।

ইতিহাসের শুষ্ক নীরস কঙ্কালের উপর তুলির লিখনে তিনি অপরূপ কাহিনী সাজাইয়াছেন—কিন্তু "কপাল-কুণ্ডলা" বোধ হয় তাঁহার রচনায় কল্পপন্থার পূর্ণতম বিকাশ! সেখানে মন স্বতঃই অসাধারণত্বের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—একটা অব্যক্ত রহস্যের ধারা সমস্ত বইখানির মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমের শেষবয়সের রচনায়ও তাঁহার লেখার এই বিশেষ ভঙ্গিটী ফুটিয়াছে। যাহা কিছু সাধারণের বাহিরে—তাহাই তাঁহার রহস্যগভীর হৃদয়কে বিপুল বলে আকর্ষণ করিত—তাই সীতারামেও অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী! শ্রীও মানবচরিত্রের দুর্জ্জেয় ও দুর্ব্বোধ্য সৃষ্টি।

বঙ্কিমকে আমরা বাঙলার প্রথম কল্পপন্থী লেখক বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারি।

বঙ্কিম ও তাঁহার পরবর্ত্তীযুগের উপন্যাসের বিকাশের ধারা আজ আর বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করা সম্ভব নহে। কেবল এইটুকু বলিলেই চলিবে যে বঙ্কিমই আবার বাঙলায় বস্তুপন্থা আনিয়াছেন। তাঁহার বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে তাঁহার লেখার এ নূতন রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে বঙ্কিম ইতিহাসের আবেষ্টন—কল্পনার মায়াপুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া বাস্তবজগতে নামিয়া আসিয়াছেন। তাই এখানে জগতসিংহ, ওসমান, আয়েষা ও প্রফুল্লকে দেখিতে পাই না, গৈরিকবাসা কপালকুণ্ডলা তাহার বায়ুসঞ্চালিত কেশজাল লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায় না—এখানে গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্র, কমলমণি ও রোহিণী আসিয়া আপনার সুখ দুঃখের কথা বলিয়া যায়—কিন্তু এখানেও বঙ্কিম তাঁহার অসাধারণত্বপ্রীতিকে একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই—প্রমাণ ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী।

তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ বস্তুপন্থা ও শ্রেয়ঃপন্থা মিশাইয়া নিজের এক নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার প্রথম জীবনের "বৌঠাকুরাণীর হাট" কল্পপন্থানুসরণের ব্যর্থ চেষ্টা সূচিত করিতেছে। নৌকাডুবিতে কল্পপন্থা বস্তুপন্থার সহিত মিশিয়া গিয়াছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বই এইখানে যে তাঁহার উপন্যাস ঘটনাবৈচিত্র্য লইয়া নহে—মানবমনের বিচিত্র গতিভঙ্গির নিখুঁত ছবি বলিয়াই তাঁহার উপন্যাস প্রীতিকর। "চোখের বালি" অথবা "গোরা"য় গল্পাংশ খুবই সামান্য—কিন্তু ভাব ও চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে, মানুষের মনের বিচিত্র খেলার বিকাশে, ও হৃদয়ের পরিণতিতে তাহা অপূর্ব্ব! এক একখানি উপন্যাস মানুষের মানসিক জীবনের নিখুঁত ইতিহাস—এই রচনাভঙ্গীই বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান।

তাঁহার শিষ্য শরৎচন্দ্রের রচনায় উপন্যাসের আরও পরিণতি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ব আলোচনার ধারা তিনিও নিজের লেখায় অনুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব এইখানে যে উপন্যাসকে তিনি আরও democratic করিয়াছেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লইয়াই তাঁহাদের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ছেন কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় দরিদ্রের বাণীই বিশেষ করিয়া ফুটিয়াছে। সমাজ যাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের কাছেও যে সমাজের অনেক শিখিবার

আছে, একথা তাঁহার মত করিয়া কেহই বলিতে পারে নাই। আর বাঙলার পল্লীজীবন তাঁহার রচনায় যেমন ফুটিয়াছে—আর বাঙলার পল্লীজীবন তাহার রচনায় যেমন ফুটিয়াছে এমনটি আর কোথাও নয়। তাঁহার লেখার অক্ষরে অক্ষরে বাঙলার প্রাণধারা ঝরিয়া পড়িতেছে—কিন্তু তাঁহার বিষয় বিশেষ করিয়া বলিবার সময় আজও আসে নাই, কারণ তিনি এখনও সাহিত্য সৃষ্টিতে রত, আর তাঁহার লেখা লইয়া এত বাদবিসম্বাদ চলিতেছে যে এখন কিছু বলা কঠিন।

তারপর বাঙ্গলার তরুণ লেখকেরা বাঙলা উপন্যাসে আর একটি নূতন সুর আনিয়াছেন—সেটি বিদ্রোহের সুর। তাহা আজও ভাল করিয়া ফুটে নাই—এখন কেবল তাঁহার বিকাশ হইতেছে কাজেই তাহার বিষয় আজ কিছুই বলা চলে না।

শ্রীহুমায়ুন কবির

বিশ্ব মানব

ইউরোপের মহাপ্রাণ কবি-সম্রাট সেক্সপীয় তাঁহার "ভেনিস নগরের বণিক" নামক নাটকে ইহুদি সাইলকের মুখদিয়া—"ইহাদের কি চক্ষু কর্ণ নাই? ইহুদি কি সুখদুঃখ বোধ করে না?"—এই কথা কয়টী বলাইয়া তৎকালীন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ইহুদির মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করাইয়াছেন। মানব জাতির প্রত্যেকেই যখন একই প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, একই প্রকার বৃত্তিসমূহ, ও একই প্রকার অনুভূতি লইয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছে, যখন প্রত্যেক মানবই একই প্রকার স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিয়া জীবনযাপন করে এবং পরিণামে একই মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়—তাহা হইলে কেন একজন আর একজনকে ভিন্নজাতীয় জীবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও হৃদয়হীনতার সহিত আচরণ করে? বাস্তবিকই, মানবজাতির মধ্যে সমাজে সমাজে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সতত যেরূপ বিরোধ চলিতেছে, তাহা ভাবিলে প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিই কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত একমত হইয়া বলিবেন যে একমাত্র মানবই প্রকৃতির

শান্তির বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃতি-রাণীর শান্তিময় রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে কিন্তু সেদিনকার ইউরোপীয় মহাসমরের ভীষণ রণ-ঝঞ্ঝার ভিতরে এই কঠোর সত্যটী কি ভৈরবনাদে ধ্বনিত হয় নাই যে মানবগণ স্ব স্ব গণ্ড একান্তরূপে আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বৈরিতাপ্রদর্শন করিয়া চলিলে কাহারই শুভ নাই, আজিকার দিনে বিশাল ধরাধামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাহারও কাহারও সম্বন্ধে বা কোনও বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকিবার আর যো নাই। যখন একই জীবন-সংগ্রামের বন্যা সমভাবে সর্ব্বত্র প্লাবিত করিয়াছে—তখন পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে কোনও তরঙ্গ উত্থিত হইলে সেই তরঙ্গের বিক্ষোভ সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের সৃজন করিবেই। কাহারও আর নিজের মনে নিজের ভাবে স্থির হইয়া থাকিবার উপায় নাই—নিজের শুভাশুভের নিমিত্ত পৃথিবীর অপর সকলের কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। ইউরোপের কয়টা দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া সমগ্র পৃথিবীকে আন্দোলিত করিয়াছে এবং সুদূর দেশসমূহের ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, ভদ্র, ইতর নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে কঠোর অভিজ্ঞতাদ্বারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিয়াছে যে কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারও চলিবেনা—যাহাকে জানিনা, চিনিনা, সেই অদৃষ্ট অজ্ঞাত জনের শুভাশুভের সহিত আমার শুভাশুভ একই সূত্রে গ্রথিত। অন্যের সহিত সম্পর্কসংশ্রবশূন্যভাবে জীবনযাত্রা কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার কাহারও শক্তি নাই। বিশ্বব্যাপী মানবসঙ্ঘের মধ্যে স্বীয় স্বীয় ইষ্টের নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিতে হইবে এবং তন্নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের বিভিন্নস্বার্থের সামঞ্জস্যসাধন করিতে হইবে। করুণাময় বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময় বিশ্ববিধানই এই যে একের জন্ম অপরের জন্ম, পরিপোষণ, বা সৌষ্ঠবের নিমিত্ত, এবং একের জীবনের আনুকূল্যসাধনেই অপরের জীবনের সফলতা। আর পরস্পরের যোগ, সংশ্রব সহায়তার মধ্য দিয়া এক সাধারণ মহাসিদ্ধিসাধনের নিমিত্তই বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্রতা, নানাত্ব ও বিভিন্ন জাতিবিভাগ। অতএব প্রত্যেকের প্রকৃত কল্যাণের নিমিত্ত বিরাট মানবসমাজে ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করিয়া পরস্পরের সহিত সাম্যমৈত্রীর সম্বন্ধস্থাপন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

একের সহিত অপরের সাম্যমৈত্রীর সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে বিষম অন্তরায় মানুষের ভেদভাবপূর্ণ বিশিষ্টতা। ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার—এই চারিটী ভেদের প্রাচীররূপে মানবসমাজকে পৃথক পৃথক গণ্ডীতে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে এক এক গণ্ডী বা সম্প্রদায় সমূহের মানবকে যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কার যে দেশকালের বিভিন্নতার ফলমাত্র এবং অনিত্য ও আকস্মিক—ইহা আমরা দীর্ঘকালের অভ্যাসের প্রভাব বশতঃ বুঝিতে পারিনা বলিয়াই মনুষ্যগণ পরস্পরের মধ্যে শত ব্যবধানের সৃজন করিয়া সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্রতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আপনাকে আবদ্ধ রাখে। মানবশিশু অসংখ্য অনির্দ্দিষ্ট

সম্ভাবনা লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়—ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে শিশু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনীমধ্যে লালিতপালিতবর্দ্ধিত হইবে, তাহার ভাষা, পরিচ্ছদ, আচারব্যবহার ও সংস্কার তদ্রূপ গঠিত হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইবার পরই একজন বাঙ্গালী শিশু কোনও বিশুদ্ধ ইংরাজ পরিবারে বরাবর প্রতিপালিত হইলে শিশুটি কালে ষোল আনা রকম না হউক, অন্ততঃ পৌনে ষোল আনা রকমের ইংরাজে পরিণত হইবে। আবার ইংরেজশিশু উক্তপ্রকারে প্রায় খাঁটি বাঙ্গালীতে পরিণত হইতে পারে।

বাসস্থান, জলহাওয়া, দৃশ্য, প্রাপ্তব্য পদার্থ প্রভৃতির প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচারব্যবহার ও সংস্কারের বিভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছে। একজাতীয় লোকের মধ্যেই বাসস্থানের ও জলহাওয়ার প্রভাবানুযায়ী শব্দোচ্চারণে তারতম্য ও তৎকারণে ক্রমশঃ ভাষার বিভিন্নতা ঘটে। দেশ শৈত্যপ্রধান কি গ্রীষ্মপ্রধান, আহার্য্য সুপ্রাপ্য কি দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি কারণে বিভিন্নদেশে পরিচ্ছদ, আহার ও আচারব্যবহারে পার্থক্য জন্মে। ভাষাগত সাদৃশ্য, জীবনধারণের উপায় ও উপকরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী মানুষের রুচি সংস্কার ইত্যাদি গঠিত হইয়া থাকে। ভাষা, পরিচ্ছদ, আচারব্যবহার এবং সংস্কার এ সকলের সহিত দেশকালের সম্বন্ধ যদি মানব বুঝিতে ও মনে রাখিতে পারিত, তাহা হইলে মানবগণের পরস্পরের মধ্যে অতশত পার্থক্যের প্রাচীর গড়িয়া উঠিত না এবং মানবগণ পরস্পরকে এক পরিবারবর্ত্তী জ্ঞান করিতে পারিত। দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে বলিয়াই মানব একদেশ হইতে দেশান্তর যাইয়া বাস করিলেও তদ্দেশের অনুপযোগিতা সত্ত্বেও অভ্যস্ত বেশভূষা, আহারপ্রণালী, ভাষা, রুচি, আদব-কায়দা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা, ও স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে। শীতপ্রধান ইউরোপদেশবাসিগণ ভারতাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া অভ্যস্ত পরিচ্ছদের আবরণের মধ্যে দারুন গ্রীষ্মে ছটফট করিতে থাকে অথচ দেশকালোপযোগীভাবে বেশের পরিবর্ত্তন করে না, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের দেশকালোপযোগী পরিচ্ছদকে অসভ্যতাজ্ঞাপক মনে করিয়া থাকে। অভ্যাসের দাস বলিয়াই মানবগণ দেশকালোপযোগী জীবনধারণপ্রণালী অবলম্বন করিতে একান্ত অক্ষম হয় এবং স্বীয় স্বীয় অভ্যাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপনকারীদিগকে তাচ্ছিল্য, ঔদাসীন্য বা ঘৃণারচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল অনিত্য বিষয়সমূহের অভ্যাসের দাস না হইয়া দেশকাল ও পারিপার্শ্বিকের সহিত জীবনযাপনপ্রণালীর সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক চলিতে পারিলে মানবগণের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্যের প্রাচীর বা ভেদের ব্যবধান থাকিতে পারে না। অপরের অভ্যাস ও জীবনযাপনপ্রণালীকে যতই উদারতার সহিত দর্শন ও গ্রহণ করা যায়, মানবগণের পরস্পরের অন্তরবর্ত্তী ব্যবধান ততই অল্পপরিসর হইয়া আসে। তজ্জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন :—"উদারচরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকং।"

মানুষের বাহিরটা যাহার যেরূপই হউক না কেন, মানুষের ভিতরটা সর্ব্বত্রই এক প্রকার ও এক সাধারণ ভিত্তিবিশিষ্ট। তাই, মানুষ যতই পরস্পরের সহিত মিশিবার ও ভাবের আদানপ্রদান করিবার সুযোগ পায়, ততই মানুষে মানুষে নৈকট্য স্থাপিত হয়। সত্য সর্ব্বত্রই এক—ভাব সর্ব্বত্রই এক—কেবল প্রকাশপ্রণালী বিচিত্র। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার যেরূপই হউক না কেন, যদি ভাষায় শ্লীলতা ও বিনয়, পরিচ্ছদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ব্যবহারে সৌজন্য ও সুবিবেচনা, পানভোজ ও অবস্থানে শুচিতা, এবং রুচি সংস্কার ইত্যাদিতে সারল্য আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নানারূপ পার্থক্যসত্ত্বেও উদারচেতাব্যক্তিগণের পরস্পরের সহিত সামাজিক সম্মিলনের ও বান্ধবতা স্থাপনের পথ সর্ব্বথা সুগম হইয়া থাকে। ভারতে শাক্ত বৈষ্ণবাদি পরস্পরবিরোধীধর্ম্মমতবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যে পানভোজন ও যৌনসম্বন্ধস্থাপন চলে, তাহার কারণও অনেকটা ঐপ্রকার।

ধর্ম্মবিশ্বাস যাহার যেরূপই হউক না কেন, অপক্ষপাত বিচারদ্বারা শরীর ও মনের স্বাস্থ্যজনক সর্ব্বজনানুমোদিত সার্ব্বজনীন পবিত্র সদাচার নির্ণীত ও অবলম্বিত হইতে পারে। আচারব্যবহার ইত্যাদির সমতা ও সাদৃশ্য সংঘটিত হইলে পরস্পরের সহিত মিলামিশা করিবার পক্ষে তেমন কোনও বাধা থাকিবে না এবং মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত যতই মিলামিশা করিতে থাকিবে, তাহাদিগের পরস্পরের সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাসগত পার্থক্য ততই কমিয়া আসিবে। মানবগণ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, তাহারা সকলেই একই মনোবিজ্ঞানের আইনের অধীন। তন্নিমিত্তই ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজ বা সম্প্রদায়ের নীতি ও ধর্ম্ম একই সাধারণ ভিত্তির উপর অবস্থিত এবং সকল নীতি ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলি মূলতঃ এক বা একই প্রকার। বাহিরের উপাধি ও কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের খাঁটি মানুষটীর সহিত যোগ স্থাপনের জন্য সতত যত্নবান হইলে শুদ্ধ মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রেম জন্মিবে সেই প্রেমের আলোকে দৃষ্টির বিশালতা ও উদারতা বাড়িয়া যাইবে এবং তখন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতির সভ্যতা, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে এক মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার সহায়ক মানবের ঐকান্তিক পবিত্রতম চেষ্টাজনিত বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূর্ণতালাভের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত গ্রহণ করিবেই। তাহা হইলে, অনন্ত বিচিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়াও মানবগণ পরস্পরের সহিত সাম্যমৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইবে এবং পরস্পরকে বিশ্বমানবপরিবারভুক্ত বিশ্বমানবজ্ঞানে সমগ্র বসুন্ধরার মানবমণ্ডলীর সহিত আত্মীয়কুটুম্ববৎ ব্যবহার করিবে। তখন পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, শান্তি, সৌন্দর্য্য সহ স্বর্গলোক নামিয়া আসিবে, এবং সর্ব্বত্র পরম শান্তি ও আরামের হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

গোপালন

"গাবঃ পবিত্রা ম্যাঙ্গল্যা গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ" (অগ্নিপুরাণ)

প্রাচীনকালে আমাদের জীবনযাপনের জন্য গরু অপরিহার্য্য ছিল। প্রায়শ্চিত্তাদিতে পঞ্চগব্য, গৃহ ও পূজার স্থান ইত্যাদি লেপনে গোময়, হোমে ঘৃত, আহারে দুধ, দই, মাখন, ঘোল, ইত্যাদির কথা যদি বাদও দিই, তাহা হইলেও ভূমিকর্ষন করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে, উৎপন্ন শস্য ঘরে বহিয়া আনিতে, কাটা ফসল মাড়াইয়া শস্য পৃথক করিতে, বীজ পিষিয়া তৈল বাহির করিতে,উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থলপথে বহনাবহন করিতে গরুই প্রধান অবলম্বন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজকুমার হইয়াও গরু চরাইতেন,— বিরাট রাজের গোগৃহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সাধারণ গৃহস্থেরও গরুই অন্যতম প্রধান সম্পদ বিবেচিত হইত। গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগী মুনি ঋষির আশ্রমেও গরুর স্থান একান্ত নগণ্য ছিল না। বর্ত্তমানকালে রেল, জাহাজ, মোটর প্রভৃতির প্রচলন সত্ত্বেও গরুর উপযোগিতা হ্রাস পায় নাই। কিন্তু সংখ্যা এবং উৎকর্ষে এদেশের গোকুল ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব্বে সকল গৃহস্থের বাড়িতেই ২।৪টি করিয়া গরু থাকিত। যাহার থাকিত না, পাড়াপ্রতিবেশীর কল্যানে তাহারও দুধের অভাব হইত না। আজকাল একে গরু দুর্লভ, তার উপর যাহা আছে তারও অনেক দুগ্ধদানপটুতায় হৃষ্টপুষ্ট ছাগেরও অধম। যেখানে লোকে ঘিটুকু উঠাইয়া ঘোলের ভাগ যথেচ্ছ পরিত্যাগ করিত সেখানেও আজ দুধের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। গরীবেত দুধের মুখ দেখিতেই পায় না, মধ্যবিত্তেরা যা পান তারও অনেকটাই বাহিরের জল। লোকে বলদের অভাবে এখন অনেক জায়গায় গাভী দিয়া হাল বাহিতেছে। ইহাতে যেমন একপক্ষে দুগ্ধবতী গাভীকুলের অবনতি ঘটিতেছে অপর পক্ষে উৎকৃষ্ট ষণ্ডের অভাবে হাল বা ভারবাহী ষণ্ড দ্বারা যথেচ্ছ বৎস উৎপাদনের জন্যও গোবংশের অবনতি ঘটিতেছে। বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ সহরে, শিশুমৃত্যুর হার এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে ভাবিতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞগণ দুগ্ধাভাবকেই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির জন্যও যে দুগ্ধ ও এবং দুগ্ধজ দ্রব্যের অভাবই অনেকটা দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুগ্ধাভাব সমস্যার সমাধান কিরূপে হইতে পারে সেই প্রশ্নের একটা দিক লইয়া আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক কারণ আছে। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদিতে উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ হইত, যথেচ্ছ আহারবিহারপুষ্ট এই সকল বৃষের দ্বারাই গোবংশ রক্ষা হইত। এখন এই প্রথা লোপ পাইতে বসিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত বৃষের অভাব পরিপূরনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। পূর্ব্বে গ্রামে গোচরণের ভূমি পৃথক নির্দ্দিষ্ট থাকিত, উহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না, এখন একদিকে সামাজিক শাসনের লোপে, ও অপর দিকে শিক্ষিতসমাজের গ্রাম্যজীবনবিরাগের ফলে গ্রামের সামাজিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে এই সকল গোচরভূমি দ্রুতঃ অন্তর্হিত হইতেছে। কৃষিগোপালনে শিক্ষিত সমাজের অবহেলা জনসাধারণের ভিতর দ্রুতঃ সংক্রামিত হইতেছে। গোপালনের ইচ্ছা যাহাদের আছে দীর্ঘ অনভ্যাস প্রযুক্ত কাজের কোন 'হদিস' তাঁহারা পাইতেছেন না। পাশ্চাত্য পুস্তকাদি হইতেও গ্রাম্য গার্হস্থ্য জীবনে প্রযোজ্য কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। সরকারী কৃষিবিভাগও গ্রাম্যজীবনের উপযোগী কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এতগুলি অসুবিধার উপরে বিষপ্রয়োগকারী চামার আছে, বছরে বছরে গোমড়ক আছে।

এর সকলগুলির প্রতিকার ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু অনেকগুলি অসুবিধা ব্যক্তিগত চেষ্টায় দূর হইতে পারে। গরুর যত্ন একটা প্রধান জিনিষ; উপযুক্ত যত্ন পাইলে সাধারণ দেশী গরুও প্রচুর পরিমান দুধ দিতে পারে তাহা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে। গোগ্রাসের অভাব দ্রুতবর্দ্ধনশীল নানা প্রকার গোভক্ষ্য তৃণের চাষ ও মিশ্র খাদ্য প্রভৃতি দ্বারা দূর হইতে পারে। গোশালার উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও গোচারন সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন দ্বারা গোমড়কের সম্ভাবনা দূর হইতে পারে। গোবসন্ত প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও অনেক গরু মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিতে পারে।

অনেকে বলেন আহারের জন্য গোহত্যাই গোবংশ হ্রাসের কারণ, কিন্তু ইউরোপে আহারের জন্য এদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গোহনন করা হয়। গোরাবারিক ও ইউরোপীয় অধ্যুষিত বড় বড় সহরগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব ভিন্ন অপর সময়ে এদেশে অল্পই গোহত্যা হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও সে দেশ গোসম্পদে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে নিম্নভূমিকে (হল্যাণ্ড) বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়, লোকসংখ্যায় যে দেশ বাঙ্গলার অনেক জেলারও নিম্নে, সেই ক্ষুদ্র দেশ গোমাংসভোজী হইয়াও প্রতিবৎসর প্রায় ৩৷৷০ কোটী টাকার দুধ ও পনীর বিক্রয় করে। সেই দুধ এবং পনীরের একটা বড় অংশ আমরাও টাকা দিয়া গ্রহণ করি।

গরুর উপযুক্ত যত্ন লইলে শুধু যে আমরা ঘরের দুধ ঘি খাইতে পারিব তাই নয়,

জমাট দুধ ইত্যাদির জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা বিদেশে প্রেরণ করি তাহারও অনেকটা ঘরে থাকিয়া যাইবে, এমন কি হয়ত আমরা বিদেশ হইতেও প্রভূত ধন আহরণ করিতে সক্ষম হইব।

শ্রীবাণেশ্বর সিংহ

ভারতে রেলের ইতিহাস

ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রেললাইন খোলা হয়। ষ্টকটন হইতে ডারলিংটন অবধিই রেললাইন বিস্তৃত ছিল। ১৮৩০ সাল হইতে ইংলণ্ডে রেললাইনের প্রসার হইতে থাকে, তাহার অনতিদীর্ঘকাল পরে ড্যালহাউসি ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। লর্ড ডালহাউসি প্রতিভাশালী, কর্ম্মঠ শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ভারতে আসিয়া রেলনির্ম্মাণের দিকে মনোযোগ প্রদর্শন করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে থানা অবধি, এবং ১৮৫৩ সালে কলিকাতা হইতে হুগলি অবধি রেললাইন খোলা হইয়াছিল। ইতোমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে দ্রুতগামী লৌহযানের অভাবে সুচারুরূপে সেনানিবেশ ও পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। বিদ্রোহ থামিয়া গেলে ভারতসরকারের রেলের প্রভূত উপকারিতার দিকে নজর পড়ে।

ভারতবর্ষে রেললাইন বিস্তৃতির ইতিহাস মোটামুটী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১৮৫০ হইতে ১৮৬৯; ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ ও ১৮৭৯ হইতে বর্ত্তমানকাল।

সিপাহিবিদ্রোহের পরে বড় বড় রেললাইন নির্ম্মাণ ও পরিচালনা করার মত অর্থ ভারতসরকারের রাজকোষে ছিল না। এই দেশে রেলের জন্য ক্রোড় ক্রোড় টাকার মূলধন সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। ভারতবর্ষে রেলপরিচালনা লাভজনক ব্যবসায় হইবে কিনা ইহা সন্দেহ করিয়া বিদেশী ধনিকগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে

ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকা সুদের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে রেলনির্ম্মাণ ও পরিচালনা করিতে আহ্বান করেন। এতদ্ব্যতীত এই সকল কোম্পানী রেললাইনের জন্য বিনামূল্যে জমি প্রাপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে রেলের কার্য্য সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে এবং ২৫ বৎসর বা তদধিক সময়ের পরে এই সকল রেললাইন গবর্ণমেণ্টের কিনিয়া লইবার অধিকার থাকে।

কিছুকাল ধরিয়া এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য চলে কিন্তু সুদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার দরুন রেলকোম্পানীর খরচ কমাইবার বা উন্নতি করিবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। বিদেশ হইতে আনিত এঞ্জিনিয়ারেরা ভারতের অবস্থা সম্যক অবগত না থাকাতে অনেক সময়ে ব্যয়বাহুল্য করিত। রাজকর্ম্মচারিগণ সকল সময়ে নিয়ন্ত্রন ও পরিদর্শনের কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না।

এই জন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট রেললাইন নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং পরিচালনা করিবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু কয়েকটি অভাবনীয় কারণে ১৮৭৯ সালে এই পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ও একাধিক দুর্ভিক্ষে অনেক খরচ হইয়া যায়। সুতরাং রেলের জন্য উপযুক্ত পরিমানে অর্থব্যয় করিতে গভর্ণমেণ্ট অশক্ত হন। এই সময়ে রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় টাকার দাম পড়িতে থাকে। বিলাতের বাজারে কোনো সামগ্রী ক্রয় করিতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ টাকা লাগিত এখন তদপেক্ষা বেশী টাকা প্রয়োজন হয়, এদিক দিয়াও গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। সেইজন্য কোম্পানীর উপরে রেলপরিচালনার ভার পুনরায় গবর্ণমেণ্ট ন্যস্ত করেন। নবনির্ম্মিত রেললাইন অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের টাকায় তৈয়ারী হইয়াছিল, কোম্পানী পরিচালকমাত্র ছিলেন। এইযুগে যে সব কোম্পানী বিলাতে গঠিত হইয়াছিল তাহাদের নিকট বাৎসরিক শতকরা ৩, ৩।০ অথবা ৪৲ টাকা হিসাবে সুদের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন, যে সকল কোম্পানী ভারতে গঠিত হইয়াছিল, তাহারা বাৎসরিক শতকরা ৩৲ টাকা সুদের অঙ্গীকার পাইয়াছিল। এই সকল কোম্পানী সরকারের নিকট হইতে অন্যান্য নানাপ্রকারে সাহায্য পাইত।

১৮৫০ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ অবধি (মাত্র এক বৎসর বাদে) গভর্ণমেণ্টের রেললাইন হইতে কোনো লাভ হয় নাই; বরং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অঙ্গীকৃত সুদ বরাবর যোগাইতে হইয়াছে। বিংশতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই রেললাইন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতোমধ্যে সরকার প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত আটটী রেল লাইন কিনিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বৃহৎ রেল সমুদায় গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে।

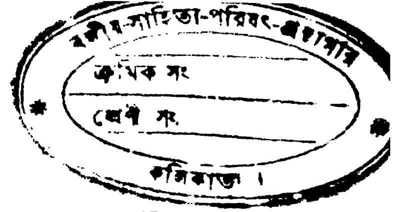
ভবিষ্যতে রেলপরিচালনা কোম্পানী অথবা গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে এই লইয়া এক প্রশ্ন ওঠে। এই প্রশ্ন সমাধান করিবার জন্য এ্যাকওয়ার্থ সাহেবের সভাপতিত্বে ১৯২০ সালে একটী কমিশান নিযুক্ত হয়। এই কমিশান দুভাগে বিভক্ত হইয়া দুরকম মন্তব্য প্রকাশ করে। সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ সদস্যগণ গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয়দল গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার নানারূপ অযোগ্যতা দেখাইয়া কোম্পানী-পরিচালনা সমর্থন করেন। প্রথম দল ইহাদের অনেক যুক্তি খণ্ডন করেন। সভাপতি প্রমুখ সভ্যগণের মতে ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট রেলের সহিত যেরূপ নিবিড়ভাবে জড়িত তাহাতে অবিমিশ্র কোম্পানী পরিচালনা এদেশে অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত ভারতবাসিগণের একবাক্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেলপরিচালনার জন্য সম্মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করা অসঙ্গত। এই সকল ব্যাপার বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সরকার স্বয়ং রেললাইন পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তদনুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া ও গ্রেটইণ্ডিয়া পেনিনসুলার লাইনের কার্য্যনির্ব্বাহভার গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

২। চিত্তশুদ্ধি

বিপ্র কন—"চিত্ত মোর দহে তুষানলে,
মৃণ্ময়ী চিন্ময়ীরূপে দেখা নাহি দিলে!"
"মনে যার মলিনতা আবিলতা ঢাকা"
দেবী স্বপ্নে কন—"সে যে নাহি পায় দেখা
দেবতার কোন দিন। সেদিন যখন,
আমারি করিতেছিলে ধ্যান আবাহন,
চাহিনু পশিতে তব পূজার মন্দিরে
চণ্ডালিনী বেশে,—দিলে তাড়াইয়া মোরে!"

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য



নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

২য় খণ্ড] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ [১ম ও ২য় সংখ্যা

পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিধেয় *

কতিপয় পরিবর্ত্তনবিরোধী সাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমি পাইয়াছি :—

"কংগ্রেসকে মুখ্যতঃ একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সমগ্র প্রতিষ্ঠানটী স্বরাজীদের হাতে ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে অধিকাংশ 'পরিবর্ত্তন বিরোধী'ই চমকিত হইয়াছেন। রাজনৈতিক কার্য্যতালিকা মানে কি? অসহযোগের যে কার্য্যতালিকা আপনি গত বৎসর স্থগিত করিয়াছিলেন উহা কি রাজনৈতিক কার্য্যতালিকা নহে? লর্ড বার্কেনহেডের বক্তৃতায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে উহার প্রতিকারের জন্য, প্রয়োজন হইলে ভিন্ন আকারে, আপনি আবার উহার প্রবর্ত্তন করুন না কেন? গত বৎসর স্বরাজীদের সহিত আপনার একটা চুক্তি হইয়াছিল, উহারা কি বেল-গামের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে ঐ চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন? উহাদের কি বাধা ছিল? আপনি জানেন যে পরিবর্ত্তনবিরোধীগণ এই চুক্তির অনুরাগী ছিলেন না। নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল আপনার খাতিরেই উহারা ঐ চুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন উহাদিগের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া স্বরাজীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়া এবারেও আপনি আবার উহাদিগকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি একবার স্বীকার পাইলে উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও পরিবর্ত্তনবিরোধীগণকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি উহাদিগকে এক রকম টানিয়াই লইয়া চলিয়াছেন।

"কাউন্সিলের কার্য্যতালিকাই কি একমাত্র কর্ম্মপন্থা? কাউন্সিল কি দেশকে আইন অমান্য অথবা কর বন্ধের বল দিবে? আপনার নেতৃত্বে কংগ্রেস একটা কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, এখন আপনিই আবার উহাকে সৌখীন রাজনীতিকের গলাবাজীর আড্ডায় পরিণত করিতে চাহেন। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসকমিটীসমূহ অন্ততঃ-

* Why not Surrender Completely Young India. 20. 8. 25,

পক্ষে সুতাকাটা সমিতি, খদ্দরডিপো বা খদ্দরের দোকান, কিন্তু এখন হইতে উহারা আলোচনাসভামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

"আপনি সভ্যগণকে চাঁদা অথবা সুতাকাটা, এই উভয়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় দল ইহার অনুমোদন করেন না। উহারা খদ্দর ব্যবহারেরও অনুরাগী নহেন। উহারা ইহাতে আপত্তি তুলিবেন, এবং এবৎসর না হইলেও পর বৎসর অবশ্যই সফলকাম হইবেন। উহারা সুতাকাটা সমিতির অনুরাগী নহেন। কংগ্রেসের বাহিরে উহার সূচনা করিয়া স্বরাজীদের নিকট আপনি পূর্ণভাবেই আত্মসমর্পণ করুণ না কেন?"

পত্র লেখকেরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে অন্ততঃপক্ষে বাহ্যদৃষ্টিতে আমি অনবরত মত পরিবর্ত্তন করিতেছি বলিয়াও আমার কোন দল নাই বা কোন দলের নেতৃত্বের দাবী আমি করি না। আমার মনে হইতেছে আমি ক্রমাগতঃ বিকাশ পাইতেছি। পরিবর্ত্তমান অবস্থানিচয়ের সহিত যোগরক্ষা করিয়াও আমাকে ভিতরে অপরিবর্ত্তিত থাকিতে হইবে। কাহাকেও টানিয়া লইয়া চলিবার অভিপ্রায় আমার নাই। আমার আহ্বান সকল সময়েই লোকের হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিকট। আগামী অধিবেশনে আমি অবাধ এবং মুক্ত আলোচনারই প্রত্যাশা করি, যে আলোচনায় আমার মতামত অন্য দশজনের মতামতের মতই গণ্য হইবে। আমি জানি অনেকেই ইহাকে নেহাৎ বাজে কথা মনে করিবেন, কিন্তু আমি যদি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে নিরত থাকি, যাহারা মনে করেন আমি উহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছি, উহারা সত্বরেই আমার প্রতিরোধ করিবেন। সে যাহাই হউক, শিক্ষিত ভারতবাসীর মন আমি যথার্থ বুঝিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত এমন আর কি আমি করিয়াছি? আমি শিক্ষিত ভারতবাসীর হাত হইতে কংগ্রেসকে ছিনাইয়া লইতে প্রস্তুত নহি। নূতন ভাবপ্রবাহের উদ্ভব হইয়া থাকিলে উহাতে উহাদেরও অভ্যস্ত হইতে হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যে আকারে অসহযোগ গৃহীত হইয়াছিল, যাহারা উহাতে বিশ্বাস হারাইয়াছেন উহার পুনঃ প্রবর্ত্তন, বা নূতন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ উহাদের কাজ নহে। আমার মত যাহারা এখনও ঐ আকারে অসহযোগে আস্থাবান, উহার উপস্থিত সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া অবিশ্বাসীগণের মতপরিবর্ত্তন করা তাহাদেরই কাজ। যাহারা অদূরবর্ত্তী মুক্তির আশায় অসহযোগব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একান্ত আন্তরিক বিশ্বাস হইতে করেন নাই, উহাদিগকে যে আমি বিস্ময়কর অভিনব কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিব সে সম্ভাবনা অল্প। যে ভাবে মুক্তির আগমন প্রত্যাশা করা গিয়াছিল সে ভাবে মুক্তি আসে নাই, সুতরাং সময়োচিত পরিবর্ত্তন সহকারে সঠিক কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করায় উহাদিগকে দোষ দিতে পারা যায় না, যাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে কর্ম্মময় রাজনৈতিক জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন, আমার মত ভাবরাজ্যবাসী ব্যক্তি চরকার মত একটা নির্দ্দোষ ক্রীড়নক হইতে কবে প্রবলক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন কোন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিবে সেই আশায় যে উহারা

বসিয়া থাকিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। কংগ্রেসের স্রষ্টা উঁহারা, কাজেকাজেই কংগ্রেস নিছক সুতাকাটাসমিতিতে পরিবর্তিত হইবার পূর্ব্বে উঁহাদের মত পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা আমাকে করিতে হইবে।

মহারাষ্ট্রীয় দল কি করিবেন না করিবেন আমি জানি না। উঁহারা অথবা আর যে কেহই ভোটাধিকারের অন্যতর যোগ্যতা হিসাবে সুতাকাটার, অথবা ভোটাধিকারের অঙ্গস্বরূপে খদ্দর পরিধানের প্রতিবাদ করিতে পারেন, সে অধিকার উঁহাদের আছে; পক্ষান্তর সুতাকাটা ও খদ্দর পরিধানের ব্যবস্থা রাখিবার জন্য জেদ করিবার অধিকারও অপর পক্ষের আছে। আমরা যদি চরমে কার্য্যতঃ একমত না হইতে পারি তাহা হইলে কানপুর কংগ্রেসের পূর্ব্বে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবেনা। লোকের মতামতে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু উহা অসহিষ্ণুতারই নিদর্শন হইবে মাত্র। নিজের কর্ম্মপন্থায় শ্রদ্ধাবান থাকা ও প্রয়োজন হইলে একে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

আমি অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি দেশে ব্যবস্থাপকসভাপ্রবেশ ও সুতাকাটা, উভয়বিধ কর্ম্মপন্থারই অবসর আছে। অতএব ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে আমার নিজের মতপার্থক্য সত্ত্বেও যে সকল ব্যবস্থাপকসভাপ্রবেশকামী আমার আদর্শ শ্রেষ্ঠতরূপে সার্থক করিতে পারিবেন সম্ভাবনা আছে, বাধাদানের ক্ষমতা যাহাদের প্রবলতর, খদ্দর ও চরকায় যাহারা অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন —উঁহাদিগের সমর্থন করা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করি, এবং স্বরাজীগণ এই শ্রেণীর লোক।

নূতন পন্থায় সুতাকাটাসমিতি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত কংগ্রেস উহার সমর্থন করিবে, সে পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে কংগ্রেসের অধীন হইয়াই কাজ করিতে হইবে। কংগ্রেসের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রহিয়াছে, আমি উহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই। এই প্রতিষ্ঠানটিই বহু বিরুদ্ধঅবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত সহিয়া আসিয়াছে। ইহা শিক্ষিত ভারতবাসীর দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ের ফল। উহার কার্য্যকারিতা যাহাতে হ্রাস পাইতে পারে এমন কিছুই আমি স্বেচ্ছায় করিব না।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে নিখিলভারতকংগ্রেসকমিটীর আগামী অধিবেশনের ফলাফল সম্বন্ধে কেহ যেন সুনিশ্চিত না থাকেন। দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, নির্ভীকভাবে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প লইয়া প্রত্যেক সভ্যেরই মুক্তান্তঃকরণে ইহাতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য

মো, ক, গান্ধী

বারওয়ারী তহবিল *

কোন কোন সমালোচক আমার সকল কথা ও কাজেই ক্রটী দেখিতে পান। পক্ষান্তরে এমন বন্ধুলাভের সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছে যাহাদিগকে আমার গুণাবলীর অভিভাবক বিবেচনা করা যাইতে পারে। উহারা আমাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে চান, তাই আমার ভ্রম, অথবা ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে মনে হইলেই উহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন। এইরূপ একজন হিতৈষী, যাঁর উপদেশে আমি পূর্ব্বেও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, লিখিতেছেন :—

"আমার অভিজ্ঞতাকালের মধ্যে আপনি জালিয়ানওয়ালা, সত্যাগ্রহ সভা, স্বদেশী, স্বরাজ, প্রভৃতি কয়েকটী ভাণ্ডারের ধনসংগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এখন আবার আপনি বাঙ্গালায় দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অন্যান্য তহবিলগুলি যে সুপরিচালিত হইয়াছে, এবং দেশবন্ধু ভাণ্ডারও যে সুপরিচালিত হইবে, সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত আছেন? সাধারণের নিকট এ বিষয়ে পুরা কৈফিয়ৎ দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য।"

লেখক তিলকস্বরাজ্যতহবিল এবং দক্ষিণ ভারতের বন্যাসাহায্য তহবিলেরও উল্লেখ এখানে করিতে পারিতেন।

প্রশ্নটী অনুচিত নহে। দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহকালে যাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন তাঁহারাও আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ যে সকল তহবিলের ন্যাসরক্ষকগণের সহিত আমি পরিচিত নহি বা উহাদের সততায় আমি নির্ভর করিতে পারি না সে সকল তহবিলের সহিত আমি কোন সম্পর্ক রাখি না। প্রথম তহবিল তিনটী আমাদ্বারা অথবা আমার প্রতিপত্তির বলে সংগৃহীত হয় নাই, শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কারের চেষ্টায় হইয়াছিল।—শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কারকে তখনও আমি জানিতাম, এবং আমার নাম ব্যবহারেরও পূর্ণ অধিকার উহার ছিল। তাঁহার সেবা ও প্রতিপত্তির বলেই তিনি সমস্ত টাকাটা তুলিতে পারিতেন তাহাতেও আমার কোন সংশয় নাই। জমা খরচের বিস্তারিত হিসাব রাখা ও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই আমার মনে পড়ে। যাই হউক, এই তহবিলগুলি খুব বড় ছিল না।

পত্র লেখক উহার উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও আমি তিলকস্বরাজ্য তহবিলের কথা বলিয়াছি। উহার সম্বন্ধে আমি পুনঃ পুনঃ অভিযোগ শুনিয়াছি। এত বড় তহবিল আর কখনও উঠান হয় নাই। উহার সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকুও সঙ্কোচ নাই। এই তহবিলের হিসাব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহার পরিচালন ব্যাপারে কোনরূপ অমনোযোগ ঘটে নাই, এবং ব্যবসায়ে যে হারে ক্ষতি হয়, উহাতে ক্ষতির পরিমাণ তাহার তুলনায় অল্পই হইয়াছে। মহাজনেরা সাধারণতঃ শতকরা ১৲ টাকা ক্ষতির হিসাবে জমা করেন। দক্ষিণে আফ্রিকার কোন বড় বড় ব্যবসায়ী

---

* Public Funds. M. K. Gandhi, Young India. 20. 8. 25.

শতকরা ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লোকসানের খাতায় জমা করেন। তিলকস্বরাজ্যভাণ্ডারে ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০৲ টাকার কাছেও যায় নাই। মোট ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ২৲ টাকা হইবে কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। একটিনি ধনাধ্যক্ষ প্রত্যেক বিষয়েই রসিদের দাবী করিতেন। সময়ে সময়ে হিসাব পরীক্ষা ও প্রকাশ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মীর হাতে টাকার ভার ছিল, উহারা যে সময় সময় "তছরূপ" করেন নাই, এমন নহে। যেখানে শত শত বিভিন্ন ধারায় অর্থনিয়োগ করিতে হয় সেখানে এরূপ হওয়া অনিবার্য্য। শুধু উপরওয়ালার শৈথিল্য বা অমনোযোগেরই প্রতিকার সম্ভবপর। আমরা এ ব্যাপারে যতটা উৎকর্ষ দেখাইতে পারিয়াছি তাহাই আমার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তারপর জালিয়ানওয়ালবাগের কথাই ধরুন। এক্ষেত্রেও পরিষ্কার হিসাব পত্র রাখা হইয়াছে, এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানটী সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উহার প্রাণস্বরূপ। উহা সুন্দররূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। গোবরগাদা হইতে উহাকে উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। সেখানে উপযুক্ত একটী স্মৃতিস্তম্ভ গঠন না করিয়া যে টাকাটা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এজন্য মাঝে মাঝে অনুযোগ শোনা যায়। ইহাই যদি অভিযোগ হয় তজ্জন্য অপর অপেক্ষা আমিই অধিক দায়ী। স্মৃতিস্তম্ভের চিত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু আমি অনুভব করিলাম যে অর্থসংগ্রহকালীন অবস্থার পরিবর্ত্তন অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছে। বাগটী লইয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ কতকটা আছে উহার অবসান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই স্তম্ভ সুদৃঢ় সাম্প্রদায়িক বন্ধনের নিদর্শন হওয়াই উচিৎ, এবং উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সেই ১৩ই তারিখে সম্মিলিত প্রবাহে প্রবাহিত হিন্দুমুসলমানের রক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনেরই সূচক হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আজ কোথায় সেই একতা? যখন আমরা আবার একত্রিত হইব তখন স্মৃতি রক্ষার কথা ভাবিবার অবসর পাওয়া যাইবে। আমার মতে আপাততঃ অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, বক্রগলিপূর্ণ, জনবহুল অমৃতসরে সামান্য নিঃশ্বাস ফেলিবার যায়গা থাকুক, এই যথেষ্ট।

এখন দেশবন্ধুস্মৃতিভাণ্ডারের কথা কিছু বলি। ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ একাই একশত। কিন্তু ইহা তাঁহার হাতে থাকিবে না, চরমে ইহা ন্যাসরক্ষকগণে বর্ত্তিবে। মূল ন্যাসরক্ষক পাঁচজন পরলোকগত দাসেরই মনোনীত। সমাজে সকলেরই বিশিষ্ট স্থান এবং খ্যাতি আছে। উহাদের কেহ কেহ অর্থশালী। এই মূল পাঁচজন অন্য দুই জনকে গ্রহণ করিয়াছেন। উহারাও একাধিক ন্যাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহাদের মধ্যে স্যার নিলরতন সরকার কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক, এবং অপর জন শ্রীযুক্ত এস্, আর, দাস দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠতাত ভাই, এবং বাংলার এডভোকেট জেনারেল। ইহারাও যদি এই ভাণ্ডার সুপরিচালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে ভারতের কোন ভাণ্ডারই টিকিতে পারিবে না। বাড়িটীও গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং প্রথম

শ্রেণীর চিকিৎসক ও অন্যতম ন্যাসরক্ষক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উহাকে উদ্দিষ্ট ব্যবহারে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কানাঘুষা শুনিয়াছি অ্যাডভোকেট জেনারল বলিয়া শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস সম্ভবতঃ ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন না। এ বিষয়ে আইন কি জানি না। ন্যাসের দায়িত্বগ্রহণকালেও তিনি বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ভ্রমপ্রমাদ যদি ঘটিয়া থাকে তবে তুল্যখ্যাতিসম্পন্ন অপর কেহ যে তাঁহার স্থলে নিয়োজিত হইবেন তা নিশ্চয়। যদি তিনি ন্যাসরক্ষক থাকিতে পারেন, তবে উহার সম্বন্ধে যাহা জানিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে তাহা হইতে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে ন্যাসের কৃতকার্যতার জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটী করিবেন না। ইংলণ্ডে রওনা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বিষয় তাঁহার অখণ্ড মনোযোগের বিষয় ছিল। মূল ন্যাসরক্ষকগণের সকলেই মৃতের স্মৃতিরক্ষায় যথাসম্ভব মনোযোগী হইবেন, এবং প্রস্তাবিত হাস্পাতাল ও সেবিকাশিক্ষালয়কে উহার স্মৃতির উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। নিখিলবঙ্গ স্মৃতিভাণ্ডার সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

নিখিলভারত স্মৃতিভাণ্ডারের আমিও একজন ন্যাসরক্ষক। এই স্মৃতির উদ্দেশ্য আমার আন্তরিক কামনার বস্তু। আমার সহযোগীগণও সাধারণ্যে সুপরিচিত। সম্পাদক এবং ধনাধক্ষ কংগ্রেসেও ঐ পদেই অভিষিক্ত আছেন, এবং উভয়েই পাকা লোক।

যাহাই হউক, প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি জনসাধারণকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে বারোয়ারী তহবিলের নৈরাপত্য পরিচালকের সততা অপেক্ষা সাধারণের সুবিবেচনাপ্রসূত তত্ত্বাবধানের উপর অধিক পরিমানে নির্ভর করে। ন্যাসরক্ষকগণের সততা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণের শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়। অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা, এবং বিবেচনাপ্রসূত তৎপরতা এক নহে। সাধারণতঃ অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনারই বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা চাই হিসাবরক্ষণে অভিজ্ঞ জননায়কগণ বারোয়ারী তহবিলের নিয়মণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং কোন ত্রুটী পাইলেই পরিচালকগণের কৈফিয়ৎ তলব করিবেন।

মো, ক, গান্ধী

স্বরাজের আলেখ্য*

(জামসেদপুরের ভারতসভা মহাত্মাজীকে একটা অ্যাটহোম দিয়াছিলেন। মহাত্মাজী উহাতে যে বক্তৃতা দেন নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল)

আপনারা অবগত আছেন আমি নিজেও একজন শ্রমজীবি। নিজেকে বস্ত্রয়ক ও সূত্রকর্ত্তক, কৃষক, ঝাড়ুদার ইত্যাদি মনে করিতে আমি গৌরব বোধ করি, এবং যদিও এর কোন কোনটীতে আমার কৃতিত্ব আদৌ নাই, তাহাতেও আমি লজ্জিত নই। কাজ ভিন্ন আমাদের গতি নাই, তাই শ্রমজীবিগণের সহিত একাত্মতা প্রতিষ্ঠায় আমি আনন্দ অনুভব করি। একটি লাটিন প্রবাদবাক্যে বলে 'কাজ ও প্রার্থনায় অভেদ'। জনৈক শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিয়াছেন যে যে কাজ না করে তাহার খাইবারও অধিকার নাই, এবং শ্রম অর্থে তিনি মানসিক শ্রমের কথা বলেন নাই, কায়িক শ্রমের কথাই বলিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেও ঐ একই ভাব অনুস্যূত রহিয়াছে। 'শ্রম না করিয়া যে আহার করে, সে তস্কর মাত্র'—ইহাই ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকের শব্দার্থ। এই জন্যই আমি সমগ্র জগতের শ্রমিকের সহিত নিজের একাত্মতায় গৌরব অনুভব করিতে পারি।

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ না হইলেও অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান দেখিবার ও উহার শ্রমজিবীগণের অবস্থা অধ্যয়ন করিবার বাসনা আমার ছিল। কিন্তু আমার কোন কাজই একদেশদর্শী নয়, সত্য ও অহিংসা আমার ধর্ম্ম, সুতরাং শ্রমিকের সহিত আমার একাত্মতা মূলধনিকের সহিত প্রীতির বিরোধী নহে। আপনারা বিশ্বাস করুন, এই ৩৫ বৎসরব্যাপি সমাজসেবায় অনেক স্থলেই আমি বাহ্যদৃষ্টিতে মূলধনের বিরুদ্ধে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও পরিণামে মূলধনিকেরাই আমাকে উহাদের প্রকৃত সুহৃৎ বিবেচনা করিয়াছেন। আমি যথোচিত দীনতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে এখানে আমি তাতাদিগের বন্ধুরূপে মূলধনিকেরও বন্ধু হইয়া আসিয়াছি। 'তাতা'দিগের সহিত আমার বন্ধুতার সূত্রপাত কিরূপে হইল তাহার পরিচয় যদি আমি এখানে না দিই উহা আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন আমি অন্যান্য ভারতবাসীর সহিত আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার্থ সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলাম তখন পরলোকগত স্যার রতন তাতাই সর্ব্বপ্রথমে সাহায্য লইয়া উপস্থিত হন। তিনি আমার নিকট বড় একটা চিঠি লিখেন, ২৫,০০০৲ টাকার একটী চেক পাঠাইয়া দেন, এবং প্রয়োজন পড়িলে আরও অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই সময় হইতে তাতাদের সহিত আমার সম্পর্কের একটা

* Miniature Swaraj, Young India. 20. 8. 25.

সুস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে অঙ্কিত আছে, সুতরাং আপনাদের সঙ্গলাভ যে আমার পক্ষে কতদূর সুখের কারণ হইয়াছে. আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। কাল যখন আমি এস্থান ত্যাগ করিব তখন আমার বস্তুতঃই কষ্ট হইবে, কারণ অনেক জিনিষই আমার দেখা হইবে না। দুইদিন এখানে থাকিয়াই যে আমি সবজান্তা হইয়াছি এমন মনে করা বাতুলতা হইবে। এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান যিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে চাহেন তাহার সম্মুখে যে কত কাজ রহিবে তাহা আমি ভালরূপই জানি।

এই সুবৃহৎ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং সাফল্য আমি কামনা করি। এই প্রতিষ্ঠান এবং উহার কর্ম্মিগণের মধ্যে সর্ব্বদা সদ্ভাব বিরাজ করিবে, এই আশাও আমি করিতে পারি কি? আহমেদাবাদেও মূলধনিক এবং শ্রমিক সমস্যা লইয়া আমাকে অনেক কিছু করিতে হইয়াছে, এবং আমি সর্ব্বত্রই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে ধনী ও শ্রমিক পরস্পরের সহায়তা করিবেন ইহাই আমার আদর্শ। সুবৃহৎ পরিবারের মত একতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উভয়কে থাকিতে হইবে। কেবল শ্রমিকের শারীরিক মঙ্গলের দিকে দেখিলে চলিবে না, উহাদের নৈতিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও ধনীর কর্ত্তব্য, কারণ উহাদের অধীনস্থ শ্রমিকগণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ধনীরাই দায়ী।

আমি শুনিলাম এখানে এত অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয় ও ভারতবাসী থাকা সত্বেও উভয় সম্প্রদায়ে পূর্ণ সদ্ভাব বিরাজমান। আমি আশা করি এই সংবাদ কথায় কথায় সত্য। এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একযোগে কাজ করার সৌভাগ্য উভয় সম্প্রদায়েরই ঘটিয়াছে, এবং ভারতকে সৌভ্রাত্র শিক্ষা দেওয়া আপনাদের পক্ষেই সম্ভবপর। আমি আশা করি আপনাদের সৌভ্রাত্র কেবল কারখানা প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহার বাহিরেও সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিবেন, পরস্পরকে ভ্রাতাভগিণীর মত জ্ঞান করিবেন এবং কখনও একে অপরকে অথবা নিজে নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবিবেন না। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই আপনারা ক্ষুদ্রায়তন স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি।

আগামী চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কণ্ট্রাক্টে নব্যভারতের জন্য নিম্ন লিখিত হারে বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে।

মলাট	২য় পৃষ্ঠা	প্রতিবার	৮৲
মলাট	৩য় পৃষ্ঠা	,,	৮৲
সাধারণ পৃষ্ঠা		,,	৫৲
অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		,,	৩৲
সিকি ,, বা অৰ্দ্ধ ,,		,,	১৸০
⅛ ,, বা সিকি ,,		,,	১৲

পুরাতন বিজ্ঞাপন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বহারেই চলিবে। ⅛ পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিশেষ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন।

জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুস্তক, স্বদেশী শিল্প, কুটীর শিল্প ও উন্নত প্রণালীর কৃষিযন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পঠিতব্য বিষয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রতি ⅛ কলম প্রতিবার ।০ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ কোন বিজ্ঞাপন ¼ কলমের বেশি হইবেনা, বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভাউচার পাইবেন না, এবং মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে। এই সুযোগের বহুলব্যবহার হইবে আশা করা যায়।

গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি।

আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারত ভাদ্রের শেষে, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা আশ্বিনের শেষে, ও কার্ত্তিক হইতে প্রতি সংখ্যা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যদি কেহ কাগজ না পান, আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ পাইতে অযথা দেরী হইলে মোড়ক বুকপোষ্টে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা, নব্যভারত,

২১০।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখকগণের প্রতি

১। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে। লেখা ভাল হইলে নূতন লেখকগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।

২। সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক রচনা গৃহীত হইবে না।

৩। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত মোড়ক বা লেপাফা পাঠান প্রয়োজন।

৫। প্রবন্ধ হারাইয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৬। প্রবন্ধ, ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকানা।

সম্পাদক, নব্যভারত

২১০।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজাবকাশ

৺শারদীয়া পূজার জন্য নব্যভারত কার্য্যালয় আগামী ৭ই আশ্বিন হইতে ১৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ১২ দিন বন্ধ থাকিবে। ১৯শে আশ্বিন হইতে আবার নিয়মিত কাজ আরম্ভ হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, নব্যভারত

সূচী

অতিরিক্ত পত্র

নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩২ [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৬ই জুন, বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়ে, দার্জ্জিলিং পাহাড়ে স্বরাজদলের অধিনায়ক, কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্ব প্রথম মেয়র, কবি ও কর্ম্মী, দানবীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এই সংবাদ কলিকাতা নগরে ও মফঃস্বলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান সকলকে প্রথমে স্তম্ভিত এবং পরে শোকার্ত্ত করিল। তাঁহার দেশবাসীরা—কেবল বঙ্গের নহে সমস্ত ভারতবর্ষের—এবং বিদেশী রাজপুরুষেরাও কিরূপে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারের সহিত সমবেদনা এবং তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ১৮ই জুন তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক কি অপূর্ব্ব স্নেহ ও সমাদরে সেই দেহ শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক লইয়া আসিয়া, কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছে, সে কথা কলিকাতাবাসীরা জানেন; দূরের পাঠকবর্গও তাহার সংবাদ পাইয়াছেন। বাঙ্গালার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রে দুই মাস ধরিয়া চিত্তরঞ্জনের জীবনের নানা কথা তাঁহার এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রতিকৃতিসহ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য, মহত্ব ও মধুরতা নানাদিক্ হইতে আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

শোক মানুষকে কখনও স্তব্ধ ও মূক করে, কখনও চঞ্চল ও মুখর করে। বাঙ্গালীজাতি অতিশয় ভাবপ্রবণ, শোকের উচ্ছ্বাস তাহাকে নীরব থাকিতে দেয় না। সমুদ্র হইতে নদীমুখে যখন জোয়ারের জল সবেগে প্রবেশ করে তখন বাণ ডাকে। শোকসিন্ধুর উচ্ছলিত প্রবাহ বাঙ্গলার ভিতরে এক বিপুল হাহাকার তুলিয়া গেল। কেন এ শোক?

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে সমস্ত ভারত ক্ষতিগ্রস্ত। শক্তির সহিত ভক্তির, কথার সহিত কর্ম্মের, ভাবুকতার সহিত সেবাব্রতের যে সমাবেশ এদেশে ও সর্ব্বদেশেই বিরল, তাহা তাঁহার জীবনে দেখা গিয়াছিল। আজ তাঁহার শূন্য স্থানে কে দাঁড়াইবার যোগ্য, তেমন কেহ আছে কি না, সেই বিপুল-ভার-সহ স্কন্ধে তিনি যে সেবাভার লইয়াছিলেন, দৃঢ়মুষ্টিতে যে হিন্দুমুসলমানমিলনের পতাকা ধরিয়া চলিতেছিলেন, কে তাহা বহন ও

ধারণ করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ও অনুচর দল আজ সংশয়াকুল। যাঁহারা তাঁহার সকল মতের ও সকল পথের অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অকপট দেশপ্রীতি ও বিপুল ত্যাগের নিকট সম্ভ্রমে মস্তক আনত করিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ ধীর মত-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর ঐক্যের আশায় আশ্বস্ত হইতেছিলেন, তাঁহারাও নৈরাশ্য এবং বিষাদে আজ মগ্ন।

পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁহাদের শ্রদ্ধা যে না দিতে পারে সে নিতান্তই দীন।

চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে নব্যভারতের নবসাধনার সাধক, বর্ত্তমানের নব্যতর দলের নায়ক ছিলেন। তাই সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল না থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু কথা উক্ত ও লিখিত হইলেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি তাঁহার উদ্দেশে অর্পণ করিতেছি।

কিন্তু শ্রদ্ধা কেবল বাক্য নহে। উহা অন্তরের আলোক ও চালক। কর্ম্মীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রশস্ত পথ কর্ম্মেরই ভিতর দিয়া। নিঃস্বার্থ ভাবে দেশবাসীর অভাবদুঃখ মোচন করিতে শিখিলেই দেশবন্ধুর আত্মোৎসর্গের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাইতে পারিব।

জোয়ারের পর ভাঁটা আসে, আত্যন্তিক উচ্ছ্বাসের পর শুষ্কতা আসে। উৎসব আনন্দের মত, সমাদর-সম্বর্দ্ধনার মত, শোকসঙ্গীত বিলাপ-পরিতাপ এবং সংকল্পেরও শেষ আছে। শেষ নাই কর্ম্মের। কর্ম্মের বীজ দূরদূরান্তে নীত হইয়া নূতন নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করে।

অদ্যকার গীত, কবিতা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ কিছুকাল স্মৃতিতে গ্রথিত থাকিলেও ইহাদের উদ্দীপনা শক্তি হ্রাস হইবে; ক্রমে এ সমুদয় বিস্মৃতিতে বিলীন হওয়াও অসম্ভব নহে। কেবল কথায় স্মৃতি রক্ষা হয় না। স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি কিম্বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক। বঙ্গবাসিগণ সেইরূপ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পেই অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত সাত লক্ষ টাকার অধিক চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা তাঁহার দরিদ্র দেশবাসীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও উৎসাহ ভিন্ন এই সংগ্রহ ব্যাপার সুসাধ্য হইত না।

দেশবন্ধুর হৃদয় দুঃস্থ ও দুর্ব্বলের জন্য চিরদিন সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাই তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একটী নিয়োপত্র দ্বারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মাতৃমন্দির স্থাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ভারতবাসীর সাহায্য প্রভৃতির জন্য সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন।

জীবনে তিনি যেমন বহু লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়াছেন তেমনই অকাতরে ব্যয় ও বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভেই তাহার পিতৃদেব দেউলিয়া বলিয়া স্থিরীকৃত হইবার পর আইনানুসারে পিতৃঋণ শোধের জন্য তাঁহার উপর দাবী চলিতনা, কিন্তু অক্লান্ত উদ্যমে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের পর যখন উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জিত হইল,

তখন তিনি কড়ায় ক্রান্তিতে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া আপনার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবোধকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় বহু পরিজনের তিনি প্রতিপালক ছিলেন, অনেক ছাত্র তাঁহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবার ফলে জীবিকাসংগ্রহে অসমর্থ অনেক যুবকও তাঁহার সাহায্যে সৎপথে থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। সঞ্চয়ের দিকে আসক্তি থাকিলে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা স্ত্রীপুত্রের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিতেন; তাহা পারা দূরে থাকুক ঋণের জন্য তাঁহাকে বসতবাটীখানি বিক্রয় করিতে দিতে হইয়াছে। এক সময়ে তিনি বহু ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করিয়াছেন, কিন্তু ত্যাগের আহ্বানে অকস্মাৎ আইনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া, একেবারে ফকীর সাজিলেন। ভোগ বিলাসের সমুদয় উপকরণ, এমন কি তামাক সেবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। ব্যবসায় ছাড়িলেন, বহুকালের অভ্যস্ত অনেক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিলেন, আর সেই সঙ্গে দেশের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে আরম্ভ করিলেন। এত পরিশ্রম, এত কৃচ্ছ্র সাধন শরীরে সহিল না। আত্মাজয়ী হইল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল!

তাঁহার গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের কথা সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত সুতরাং এক্ষণে এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার বৈচিত্র্যময় সমগ্র জীবনের একখানি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ছবি পাঠকবর্গকে দিবার বাসনা রহিল।

তিনি ত্যাগের দ্বারাই দেশবাসিগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন, আমরা সেই তেজস্বী পুরুষের ত্যাগের কথাই বার বার স্মরণ করি।

শ্মশান পথে

(শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের শ্মশানযাত্রা দর্শনে)

১

দেশবন্ধু, দেশ তব আজ মূর্ত্তি ধরি
শোকাতুর জনতার, ভক্তিনম্র চিতে,
বাড়াইয়া লক্ষ বাহু, আসিয়াছে নিতে
প্রাণহীন দেহ তব। দ্বিধা পরিহরি
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী পথ ঘাট ভরি
দাঁড়াইয়া। ব্যাকুলতা আঁখিতে আঁখিতে,
জন্মশোধ আস্য তব বারেক দেখিতে;
তাই উদ্বেলিত অশ্রু রাখিছে সম্বরি।

মুদিত প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়ন,
ওমুখে নাহি সে ভাষা উদ্দীপনাময়ী,
দেশহিত-তপস্যায় ভগ্ন দেহ খানি
পুষ্পস্তূপমাঝে আজ করিয়া শয়ন
চলেছে শ্মশানপথে। দেশচিত্তজয়ী
কোন্ মন্ত্রে লক্ষ প্রাণী আনিলে আহ্বানি?

২

নিঃশেষে তোমারে তুমি, ওগো মহাপ্রাণ
দেশজননীর পদে যবে সঁপে দিলে,
পূজার নৈবেদ্য রূপে, কিছু না রাখিলে
লুকাইয়া কোন খানে—সে অপূর্ব্বদান
তোমারে ভিখারী করি বাড়াইল মান
কুলের, দেশের তব। যবে ধনী ছিলে
ছিলে দূরে, দারিদ্র্যেরে যবে বরি নিলে
লক্ষ দেশবাসীবক্ষে করে নিলে স্থান।

অকস্মাৎ মৃত্যু তোমা নিয়ে যায় ছিনে,
তাইতো বিষম ব্যথা লক্ষ বুকে আজ,
আশাসূর্য্য অস্তমিত হেরি মধ্যদিনে,
মেঘশূন্য নীলাম্বর হানে গুরুবাজ।
প্রাণহীন দেহ তব লবে চিতানল,
তবু দেশচিত্তে তুমি রবে সমুজ্জ্বল।

শ্রীকামিনী রায়

দেশবন্ধুর নিয়োগপত্র

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন ৪॥০ বিঘা জমির উপরস্থিত স্বীয় আবাসবাটী সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীদাস গোস্বামী, সত্যমোহন ঘোষাল ও নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়গণ ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্পত্তির আয় বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যয়িত হইবে—

১। স্ত্রী-শিক্ষা, ২। মন্দির-নির্ম্মাণ, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, এবং দৈনিক ও সাময়িক সেবার ব্যবস্থা, ৩। হিন্দু-বালকগণের ধর্ম্মশিক্ষা, ৪। মাতৃমন্দির স্থাপন; ৫। দরিদ্র ও দুঃস্থের সাহায্য বা এইরূপ কোন সৎকাজ।

চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—চম্পারণের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া। চম্পারণের জমি দুই প্রকারের—সিকরহনা নদীর উত্তরাংশে স্থিত অংশ ধান্যের চাষের অনুকূল ; নদীর দক্ষিণাংশে স্থিত অংশ বালুময় হওয়ায় রবিশস্যের বিশেষ উপযোগী। চম্পারণের জলবায়ু বিহারের অন্যাংশ হইতে খারাপ ; উত্তরাংশে তরাইএর নিকটবর্ত্তী স্থান ম্যালেরিয়াপীড়িত। এই জেলায় ভোজপুরী—হিন্দিভাষার রূপান্তর—প্রচলিত। চম্পারণের ইতিহাস—পুরাণে উল্লেখ আছে এককালে লিচ্ছবী বংশ এইস্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল; এখনও প্রাচীন গড়, পরিখা ইত্যাদি দেখা যায়। খৃষ্টিয় ১২শ শতকের পূর্ব্বে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরে দেখা যায় ইহা ত্রিহুত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান আমলে এখানে মুসলমানগণ প্রাধান্য বিস্তার করেন। বেতিয়ারাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান ও ইংরাজদের সহিত বিরোধ। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে বেতিয়া রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইংরেজ আমলে তিনটি বড় বড় জমিদার চম্পারণের অধিকাংশে জমিদারী ভোগ করিতেছেন—(১) বেতিয়া (২) রামনগর (৩) মধুবন। নীল ও তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত—বেতিয়া রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ঠিকাদারদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল ; ক্রমে ইংরেজগণ ঠিকাদারী গ্রহণ করে ও কুঠী প্রতিষ্ঠিত করে। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশের মধ্যে নীলচাষের অনুকূল হওয়াতে এই অংশেই বেশী কুঠী স্থাপিত হয়। ঋণগ্রহণব্যাপারে রাজ্যের শাসনভার অনেক পরিমাণে ইংরেজদের হাতে আসায় নীলকরদের খুব সুবিধা হয়। বর্ত্তমানে বেতিয়া রাজ্যে ৩৬টি ঠিকাদারের মধ্যে ২৩জন নীলের ব্যবসায় করে। নীলের চাষ—দুইভাবে করা হয় (১) জীরাত (২) আসামীবার প্রথা। জীরাত প্রথা—কুঠিয়ালের জমিতে কুঠিয়াল নিজের গরুবলদ দ্বারা নীলের চাষ করে ; কিন্তু প্রয়োজনমত চাষীকে কুঠিয়ালের জমিতে মজুরের কাজ করিতে বা গরুবলদ দিতে বাধ্য করে। এই পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প হয়। সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ স্বীনী চম্পারণ অনুসন্ধান সমিতিতে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন কোন কুঠিবালই চাষীর সহায়তা বিনা নিজের সমগ্র জমি চাষ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে চাষী-দিগের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই সহায়তা লওয়া হয় তাহা

অত্যন্ত অল্প হওয়ায় চাষীগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়। আসামীবার প্রথা—এই প্রথায় কুঠিয়াল চাষীদ্বারা নীলের চাষ করায়। এইভাবে চাষের তিনটি প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে তিনকাঠিয়া প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত; অপর দুইটী খুশ্‌কি ও কুর্ত্তাবলী প্রথাও রাইয়তের অনুকূল নহে। তিনকাঠিয়া প্রথার কুঠিয়াল রাইয়তের জমির এক অংশে তাহা দ্বারা নীল চাষ করাইত; উৎপন্ন নীলের দাম স্থির করা থাকিত এবং সেই দামে নীল কিনিয়া লইবার চুক্তি থাকিত। প্রথমে বিঘা প্রতি ৫ কাঠায় রাইয়তকে নীল চাষ করিতে হইত, পরে ইহা তিন কাঠায় পরিবর্ত্তিত হয়। রাইয়তের জমির কোন অংশে নীল চাষ করা হইবে তাহা ঠিক করিয়া দিবে কুঠির কর্ম্মচারীগণ। নীল ভাল হইলে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কুঠিয়াল কিনিয়া লইবে কিন্তু যদি নীল খারাপ হয় তবে, সে কোন কারণে হোক না কেন, দাম কম হইবে। প্রথম আমলে প্রতি একরে উৎপন্ন নীলের জন্য ৬॥০ দেওয়া হইত কিন্তু প্রজাগণের ও সরকারের চেষ্টায় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ১২॥০ ১৩॥০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নীলের জমির কোন খাজনা না লওয়ার ব্যবস্থাও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এত নীলের চাষ বিহারের অন্য কোথাও হয় না। ১৯১৬ সালে ২১৭০০ কর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে; ইহার ⅓ অংশ আসামীবার ও ⅔ অংশ জীরাতপ্রথার আবাদ হইয়াছে। জার্ম্মানীর কৃত্রিম নীল বাজারে দেখা দিলে নীল চাষ কিছু কমিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর তাহা আবার বাড়িয়াছে; ব্যবসায়ে ক্ষতি নীলকরগণ প্রজার উপরেই চালাইয়া দিয়াছে।

নীল দুই প্রকার—সুমাত্রা ও জাভা নেটাল। সুমাত্রা নীল ফাল্গুনে ও জেভানেটাল কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে বোনা হয় এবং উভয়েই আষাঢ় মাসে কাটা হয়। ১০০মণ নীল গাছ হইতে ১০ সের নীল হয়।]

চতুর্থ অধ্যায়

রাইয়তের কষ্ট।

উপরে তিনকাটিয়া প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে এই প্রথাই চম্পারণের চাষীর দুঃখের প্রধানতম কারণ। এ সম্বন্ধে যত কিছু চেষ্টা করা গিয়াছে তিন কাটিয়া প্রথা কোন না কোন রূপে আসিয়া আবার দেখা দিয়াছে।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে বাংলায় নীলের ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন; এবিষয়ে British India Association তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে প্রজাদের দুঃখ দেখিয়া অনেক খৃশ্চান মিশনারী, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিরও সহানুভূতি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে (William Herschell) উইলিয়ম হার্শেল পরে স্যার উইলিয়ম ও এসলি ইডেন পরে বঙ্গের ছোটলাট সার এসলি ইডেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন বসান। নীল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারের অনুসন্ধানের ভার ও অধিকার ইহার উপর ন্যস্ত হয়। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন বাংলা গবর্ণমেণ্টের ভাবী সেক্রেটারী মিঃ সেটনকার এবং সদস্য ছিলেন মিঃ রিচার্ড টেম্পল (পরে যিনি সার রিচার্ড টেম্পল হইয়া বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হন) নীলকর মিঃ ফার্ডসন, মিশনারী মিঃ জন সেল এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সে আমলের প্রধান সদস্য মিঃ চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জ্জি। যশোর ও নদীয়া জেলার রাইয়তগণ (তখন এই দুই জেলাতেই নীলের চাষ বেশী পরিমাণে হইত) হরিশ মুখুজ্যের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষ্য দিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁহার Bengal Peasant Life নামক পুস্তকে সে আমলের নীলকর ও রাইয়তদের একটি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদিবার সময় ফরিদপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, ডব্‌ল্যু, এল, টাওয়ার্ (E W. L. Tower) বলেন—

There is one thing more I wish to state; that considerable odium has been thrown on the missionaries for saying that—' not a chest of indigo reached England without being stained with human blood! That has been stated as an anecdote.* That expression is mine and I

adopt it in the fullest and broadest sense of its meanings, as the result of my experience as magistrate in the Fareedpore District. I have seen several ryots sent to me as a magistrate, who have been speared through the body. I have had ryots before me who have been shot down by Mr. Forde (a planter). I have put on record how others have been first speared and then kidnapped ; and such a system of carrying on indigo, I consider to be a system of bloodshed.

অর্থাৎ "আমি আর একটী কথা বলিতে চাই ; মিশনারীরা "এমন এক বাক্স নীলও ইংলণ্ডে যায় না যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়" এই কথা বলাতে অপবাদের ভাগী হইয়াছেন। বলা হইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কথাটা আমারই এবং আমি ইহার সম্পূর্ণ ব্যাপক অর্থেই উহার প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ফরিদপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটী করিবার কালে ইহাই আমার অভিজ্ঞতা।

ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আমি কয়েকটি প্রজাকে দেখিয়াছি যাহাদের বর্শার আঘাতে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। এমন অনেক প্রজাকে আমি দেখিয়াছি যাহারা নীলকর মিঃ ফর্ড কর্তৃক বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি লিখিয়া রাখিয়াছি কোথায় প্রথমে বর্শাঘাতে আহত করিয়া রাইয়তদের পরে গুম্ করা হইয়াছিল। সুতরাং এ ভাবে নীলের ব্যবসায় চালানকে আমি রক্তপাতের ব্যবসায় বলিয়া মনে করি।"

এই কমিশনের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে রাইয়তগণ এই এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিল—

(১) নীল সম্বন্ধে যে চুক্তিনামা নীলকরগণ তাহাদের সহিত করে তাহা তাহাদের বাধ্য করিয়া করা হয় ; তাহারা স্বেচ্ছায় কিছু করিতে পারে না।

(২) নীলের চাষের জন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সামান্য দাদন দেওয়া হয়।

(৩) প্রজাকে নীলের চাষেই তাহার বহুমূল্য সময় দিতে হয় ; তখন তাহার নিজের কাজে সময় দেওয়া লাভজনক হইলেও তাহারা অনন্যোপায়।

(৪) যেটা সব চেয়ে ভাল জমী তাহাই নীলের জন্য লওয়া হইত ; কখনও কখনও যে জমিতে হয়ত অন্য ফসল দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও নীলের চাষ করিতে হইত।

(৫) নীলের উৎপন্নের কোন স্থিরতা ছিল না, ফলে নীল না হইলে দাদনের টাকা ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হওয়ায় প্রজা ঋণে ডুবিয়া যাইত।

(৬) কুঠির আমলাগণ প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত।

(৭) কুঠিয়ালেরাও তাহাদের উপর অত্যাচার করিত।

কমিশনের নির্দ্দেশে সকল অভিযোগই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তাঁহাদের মতে নীলের চাষে প্রজার কোন লাভই ছিল না; জমী নির্ব্বাচনের অধিকারও নীলকরদের হাতে ছিল এবং সময়ে সময়ে অন্য ফসল নষ্ট করিয়াও জমিতে নীলের চাষ করিতে হইত। কুঠির আমলাগণ বহুপ্রকারে অত্যাচার করিত; একবার দাদন লইলে আর কোনমতেই প্রজা নীলকরের হস্ত হইতে মুক্তি পাইত না। কমিশন রায় দিলেন যদি নীল উৎপন্ন করাইতে হয় তবে প্রজা যাহাতে খুসী হয় এমন মূল্যে নীল উৎপন্ন করান হউক। যদি চুক্তি করিয়া নীলের চাষ করিতে হয় তবে সে চুক্তি অল্পদিনস্থায়ী হউক এবং প্রতিবৎসর হিসাব মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক, এবং যে জমিতে নীল চাষ করান হইবে তাহা চুক্তিনামায় লেখা থাকিবে। জমি হইতে কারখানায় নীল লইয়া যাইবার খরচ নীলকর দিবে। প্রজা যদি চায় তবে নীলের পরে অন্য ফসল বপন করিবার বা নীলের বীজ রাখিবার অধিকার দেওয়া হইবে। নীল ও খাজনার হিসাব আলাদা আলাদা রাখা হইবে। *

এই সঙ্গে কমিশন এই মত দিলেন যে প্রজাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হউক। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট Sir John Peter Grant কমিশনের সকল নির্দ্ধারণই স্বীকার করেন।

এই রিপোর্টের পর বাংলা গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে চেষ্টা করেন তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা হইতে নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গেল; কারণ অত্যাচার ব্যতীত নীলকরের লাভ রাখা সম্ভবপর নহে।

এই অনুসন্ধানের সময় বিহারের নীলের সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল কিন্তু এখানে হরিশ মুখুজ্যের মত এমন প্রজাদুঃখকাতর লোক কেহ ছিলেন না এবং প্রজাদের মধ্যেও এমন কেহ ছিল না যে কলিকাতার কমিশনের খবর রাখে। বিহারের কতকগুলি নীলকর কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; তাহাতে বোঝা যায় যে বাংলায় যে ভাবে নীলের চাষ করা হইত বিহারেও সেইভাবেই নীল চাষ হইত। শুধু এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল যে বাংলার প্রজা দাদনের ভারে যতদূর পীড়িত হইত বিহারের প্রজা ততখানি হইত না। কিন্তু আর সকল দুঃখই উভয়ক্ষেত্রে সমান ছিল।

যদিও চম্পারণের প্রজারা ঐ সময় হইতেই আপনাদের দুঃখ নিবারণ করিবার

* এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৺ললিত চন্দ্র মিত্র প্রণীত History of Indigo Disturbances in Bengal নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

চেষ্টা মাঝে মাঝে করিয়াছে তথাপি দুঃখের মূলোৎপাটনের চেষ্টা ১৯১৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কখনও করা হয় নাই। এমন পর্য্যন্ত হইয়াছিল যে ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন চম্পারণে গিয়া প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, কুঠিয়ালরা বলিল, প্রজাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধই নাই বাহিরের লোক আসিয়াই ঝগড়া বাঁধাইয়া দিতেছে। কিন্তু একথা পরে কমিশনের সম্মুখে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অনারেব্‌ল মিঃ মড কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন—

I have gone at what I am afraid is rather wearisome length into the past history of what may perhaps best be described as the indigo difficulty, because it is constantly asserted and I have myself often heard it said that there is in reality nothing wrong or rotten in the state of affairs, that every one concerned is perfectly happy so long as they are left alone and that it is only when outside influences and agitators come in that any trouble is experienced. I submit that this contention is altogether untenable in the light of the history of past fifty years of which I have endeavoured to present to the council a brief sketch.

অর্থাৎ—নীল সমস্যা সম্বন্ধে আমি এত বেশীক্ষণ বলিয়াছি যে আপনারা হয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু আমার এত বলিবার কারণ—অনেক সময়েই একথা বলা হয় এবং আমিও শুনিয়াছি যে ইহার মধ্যে সত্য সত্যই কোন গোলমাল বা মন্দ কিছু নাই এবং এ ব্যাপারে লিপ্ত সকলেই বেশ সুখেই আছেন; কেবল যখন বাহিরের লোক আসিয়া উত্তেজনা জাগাইয়া তোলে তখনই গোলমালের সৃষ্টি হয়। আমি বলিতে চাই গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের যে মর্ম্মটুকু কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি তাহা দেখিলে বোঝা যায় যে একথা কতদূর ভিত্তিহীন।

প্রজার এই দুঃখের কাহিনী নিম্নে বর্ণিত হইল। চম্পারণে নীল সম্বন্ধে প্রথম যে গোলমালের ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় তাহা ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ঘটে। ইহার আরম্ভ লাল সরৈয়া কুঠীতে হয়।* জোকাটিয়া গ্রামের প্রজাগণ নীলের চাষ বন্ধ করিয়া নীলের

* এই কুঠী সম্বন্ধে Champaran District Gazetteer লিখিয়াছে—At one time it was the most renowned indigo factory in Bihar, being the home of Mr James Mcleod, who was known as the king of planters. His stable contained 120 horses.—অর্থাৎ ইহাই এক সময়ে বিহারের সবচেয়ে বিখ্যাত কুঠী ছিল। ইহার অধিকারী মিঃ জেম্‌স্‌ ম্যাক্লাউড নীলকরের রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার আস্তাবলে ১২০টী ঘোড়া ছিল।

জমিতে অন্য ফসল বোনে। দেখাদেখি অন্যান্য গ্রামের প্রজারাও এইরূপ করে; কুঠির বাংলা আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নীলকরেরা ১৯১৭ সালের মত তখনও সমস্ত দোষ প্রজার উপর দিতে চায়, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না যে আগুন কেমন করিয়া লাগিল। ১৯১৭ সালের প্রজাদের যে সকল অভিযোগ ছিল, ১৮৬৭ সালেও ঠিক্ সেই অভিযোগগুলি ছিল। এই গোলমালের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিতে গিয়া পাটনার কমিশনার লেখেন নীলেব চাষে প্রজার যে শুধু লাভ নাই এমন নহে, সমূহ ক্ষতিই হয়।

নীলের চাষের জন্য চুক্তিনামা তাহাদের দিয়া জোর করিয়া লিখাইয়া লওয়া হয়, প্রজার সবচেয়ে ভাল জমিই নীলের চাষের জন্য লওয়া হয়, এবং নীলের চাষ অত্যন্ত কষ্টকর। কুঠির কর্ম্মচারীগণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে। এই হাঙ্গামায় নীলকরদের মধ্যে অত্যন্ত গোলমালের সৃষ্টি হয়; নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয় এবং মনে হয় নীলের চাষ চম্পারণ হইতে বুঝি একেবারেই উঠিয়া গেল। নীলকরগণ গবর্ণমেণ্টে খুব গোলমাল বাধায়, গবর্ণমেণ্টও তাহাদের যথেষ্ট সহায়তা দেন। তাহাদের অনুকূল প্রস্তাবমত গবর্ণমেণ্ট মোতিহারীতে একটী ছোট আদালত স্থাপিত করিলেন; তাহাতে দুইজন জজ থাকিলেন, তাঁহাদের কাজ হইল চুক্তিনামা ভঙ্গের জন্য নীলকরেরা প্রজাদের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করিবে তাহার শীঘ্র শীঘ্র বিচার করা। ইহার ফল হইল যে মোকদ্দমা না করিয়াই নীলকরদের অভীষ্ট পূরণ হইল এবং বেচারী অশিক্ষিত অসহায় প্রজাদের নীলকরদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা বিফল হইল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কারণ চাষীরা সাধারণতঃ ভীরু হয়। বিশেষ করিয়া চম্পারণের চাষীরা একান্ত সাদাসিদা। নীলকরদের চেষ্টায় একটা নূতন আদালতের সৃষ্টি হওয়াই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে হইল। কে বলিতে পারে যে তাহারা বোঝে নাই যে সরকার নীলকরদের পক্ষ হইয়াই এই নূতন আদালতের সৃষ্টি করেন?

এই অসমযুদ্ধে তাহাদের জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যে অল্প কয়েকটী মোকদ্দমা আদালত পর্য্যন্ত গেল তাহাদের রায় প্রজার বিরুদ্ধেই হইল। গবর্ণমেণ্টের এই কাজ নীলকরদের সহায়তার জন্য না করা হইলেও প্রজারা যে এমনি বুঝিয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি যতই সহানুভূতিসম্পন্ন হউন না কেন, যখনি যখনি প্রজারা গোলমাল করিয়াছে তখনি গবর্ণমেণ্ট এমন সব ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহার ফলে নীলকরদেরই সুবিধা হইয়াছে। নিম্নে লিখিত Special Registerএর ব্যাপারে তাহা ভাল করিয়া বোঝা যাইবে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে Champaran Districal Gazetteer লিখিয়াছে—

The dispute between the ryots and the planters had at one time

threatened to become very serious. The local officers almost unanimously reported that the cultivation of indigo had become very unpopular, and that there was not a ryot who would not abondon the cultivation if he could—and this state of things was ascribed as much to the insufficiency of remuneration which the ryots received as to the exactions, oppressions and annoyance to which they were exposed at the hands of factory servants." •

অর্থাৎ একসময়ে রাইয়ত ও নীলকরদের বিরোধ অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন নীলচাষ প্রজাগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; এবং এমন একটী চাষীও নাই যে পারিলে নীলের চাষ ছাড়িয়া না দেয়। অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ শুধু নীলের চাষের মজুরি কম বলিয়াই নহে, ইহাতে কুঠির কর্ম্মচারীগণের হাতে প্রজাকে এত অত্যাচার ও অন্যায় সহিতে হয় যে তাহার পক্ষে নীলের চাষ এরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দিতে গিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট লেখেন—

The time had passed when it could be hoped to carry on indigo concern profitably by forcing on the ryots a cultivation and labour which was to them unprofitable. The necessity of giving adequate remuneation had been recognised by the planters, although they had too long refused to recognise the necessity of making such an advance in price, but the managers of the concerns now saw clearly the danger which they had so narrowly escaped and would, in their own interest, be careful to guard, against falling into such an error again."

অর্থাৎ সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন প্রজার ক্ষতি করিয়াই অত্যাচারের সাহায্যে তাহাদিগকে দিয়া নীলের চাষ করাইয়া নীলের কারবার চালান যাইবে। প্রজাদের মজুরি বেশী করিবার প্রয়োজনীয়তা নীলকরগণ এখন বুঝিতে পারিয়াছে। যদিও বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু এখন কুঠিয়ালরা বুঝিতে পারিয়াছে যে দাম না বাড়ানর দরুন কত বড় সমূহ বিপদ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল; ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আবার না ঘটে সেদিকে তাহারা যেন দৃষ্টি রাখে।".

নীলকরেরা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ধমকানিতে ও নীলের দাম না বাড়াইলে

[illegible]

বাড়াইয়া দেয়; অর্থাৎ প্রতি একর নীলের দাম ৬॥০ টাকার পরিবর্ত্তে ৯ টাকা করা হয়। এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর বেশী দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিন্তু ভারত সরকার এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করেন—

The evils of the system were so great that the interposition of Government might become unavoidable unless measures were taken to remove such elements of the system as were unjust and oppressive."

অর্থাৎ—এপ্রথায় এতদূর অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যে যদি ইহার মধ্যে যে অন্যায় ও অত্যাচার আছে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না হয় তবে হয়ত গবর্ণমেণ্টের এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

ভারতসরকার যে কথা বলিয়াছিলেন সে সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইল এবং নীলের দাম বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ১৮৭২ সালে প্রজাদের মধ্যে অশান্তির আভাষ ফুটিয়া উঠিল। নীলের দাম বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল সত্য কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক আরো যে বহু দোষ ছিল তাহা দূর করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৮৭২ সালে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর পাটনার কমিশনারের রিপোর্ট আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"The practice under which the ryots ware compelled to give up a portion of their land for indigo is the compulsory feature of the system to which his Honour has more especially alluded as contrary to free trade principles. Again, the practice of forcing the cultivators to exchange such of their lands as may be arbitrarily selected from time to time by the planter or his servant is an intolerable grievance as is well set forth by Mr. Forbes, even where there is what purports to be an agreement. In these cases it is obvious that the character of the agreement is such that no person of power and influence equal to that of the planter himself would think, as a mere matter of business, of entering into it."

অর্থাৎ প্রজাকে যে বাধ্য হইয়া নীলের চাষের জন্য তাহার জমির এক অংশ ছাড়িয়া দিতে হয়। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বিশেষ করিয়া তাহাকে স্বাধীন ব্যবসায় নীতির বিরোধক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে একটা নামমাত্র চুক্তিনামা আছে সে ক্ষেত্রেও, মিঃ ফর্বেস যেমন বলিয়াছেন যে নীলকর বা তাহার কর্ম্মচারী

প্রজাকে জমির কোন অংশ স্বেচ্ছামত নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে সে অংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন ইহা প্রজার পক্ষে অসহ্য অভিযোগ। এ সকল ক্ষেত্রেও চুক্তিনামা এরূপ হয় যে ক্ষমতা বা আধিপত্যে নীলকরের সমকক্ষ কোন লোকও স্বেচ্ছায় ব্যবসায়ের জন্য এরূপ চুক্তিনামায় বদ্ধ হইতে রাজি হয় না।

তদানীন্তন সংবাদপত্রসমূহে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৭২ সালে পাটনার কমিশনার প্রস্তাব করেন যে নীল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটী প্রতিষ্ঠিত হউক্। তখন স্যর রিচার্ড টেম্পল বাংলার ছোটলাট। তিনি বলিলেন কমিশন বসাইলে অত্যন্ত অশান্তির সৃষ্টি হইবে, সুতরাং জেলার কর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ হইল তাঁহারা যেন নীলকর প্রজাদের মধ্যে যে সকল মকদ্দমা হইবে তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন।

যখন অশান্তির কারণ যেমন ছিল তেমনি থাকিতে দেওয়া হইল, তখন কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। ১৮৭৭ সালে পাটনার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেলী লিখিলেন "যদিও কমিশন নিযুক্ত করা ঠিক হইত না, তথাপি স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ অশান্তির কোন হ্রাস দেখিতে পাইতেছেন না।"

এই সময়ে স্যর রিচার্ড টেম্পল চলিয়া যাওয়ায় স্যর আস্‌লি ইডেন (Sir Ashley Eden) বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হয়েন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ইনি নীলকর হাঙ্গামার সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নীলকরদের কার্য্যকলাপের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন কোন গোলমাল না করিয়া নীলকরদের ডাকাইয়া একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই জন্য তিনি নীলকরদের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে আসামীবার প্রথায় নীলের চাষে প্রজার স্বার্থের সমূহ হানি হয় সুতরাং নীলের দাম আরো কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। নীলের ব্যবসায়ে উভয় পক্ষের লাভ থাকিলে নীলকর ও প্রজার মধ্যে শান্তির ভাব রক্ষিত হইতে পারে। তিনি একথাতেও খুব জোর দেন্ যে প্রজাকে বাধ্য করিয়া মজুরী করানও অন্যায়। ছোটলাটের এরূপ মনোভাব দেখিয়া নীলকরেরা ভাবিল যে যদি তাঁহার মতে কাজ না করা যায় তবে গোলমাল হইতে পারে। এই জন্য তাঁহার মতামত কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা ১৮৭৮ সালে বিহার প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েসন নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিল। এ সভা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রথম সভাতেই তাহারা প্রতিএকর নীলের দাম ৯৲ হইতে ১০৲ টাকা বাড়াইতে স্বীকার করিল। ইহা ছাড়া এটাও ঠিক্ করা হইল জমির যে অংশে প্রজা নীল চাষ করিবে তাহার খাজনা লওয়া হইবে না। এ সম্বন্ধে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে অন্য অনেক নিয়মের ন্যায় এ নিয়মগুলিও অনেকে পালন করা কর্ত্তব্য মনে করে নাই। অন্যান্য অভিযোগ সম্বন্ধেও নীলকরেরা

সভায় অন্য যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহাও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল। তাহাতে বোঝা যাইবে যে সে সময়ে কোন কোন অভিযোগ ছিল এবং এই সকল নিয়ম করা সত্বেও ১৯০৯ সালে মিঃ গুর্লে সেই অভিযোগগুলি কিরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালেই মহাত্মা গান্ধীও পূর্ব্বোল্লিখিত অভিযোগ গুলি পূর্ব্ববৎ আকারেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে সময়ে যে সকল নিয়ম করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান ছিল যে ৬৷৷০ হাতি বাঁশের মাপের বিঘা প্রতি নীলের দাম ৯৲ টাকা দেওয়া হইবে। পাট্টায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকিলেও নীলকর প্রজার অনুমতি ব্যতীত নীলের জমি বদল করিতে পারিবেন না এবং বদল করিলেও এক প্রজার জমি অন্য প্রজার জমির সহিত বদল করিবেন না। এসোসিয়েশনের কোন সদস্যের কোন অভিযোগ থাকিলে এসোসিয়েশনের সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিল এবং যদি কোন সদস্য এসোসিয়েশনের নির্দ্ধারণ না স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে সদস্যপদ হইতে বিচ্যুত করা হইবে। সরকারের পক্ষ হইতে অনেক লেখালেখির পর তাঁহারা আর একটী নিয়ম করেন যে, যে প্রজা বিঘা প্রতি তিন কাঠায় নীল চাষ করিবে, তাহার কোন খাজনা লওয়া হইবে না।

এই সকল নিয়ম দেখিয়া প্রাদেশিক সরকার মনে করিলেন এখন আর অশান্তি থাকিবে না, সুতরাং তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই সময়েই ছোটলাট স্যার এসলি ইডেনের একথা মনে হইল যে প্রজার দুঃখের প্রধান কারণ অনেক সময়ে জমিদারেরা নীলকরদের ঠিকা দেওয়ায় তাহাদের প্রজাদের উপর অধিকার জন্মিয়া যায় এবং তাহারা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ পায়।

কিন্তু এ বিষয়ে সে সময়ে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

বরং নীলকররা বেতিয়া রাজ্যে আপনাদের অধিকার আরো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল। বেতিয়ার রাজার খুব ঋণ হওয়ায় ১৮৮৮ সালে বিলাতে ৮৫ লক্ষ টাকার ঋণের ব্যবস্থা করা হইল। তাহা উঠাইবার জন্য নীলকরদের বহু গ্রাম মৌরসী সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই বন্দোবস্ত ২৪টি কুঠির সহিত করা হইল; তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল তিনটী—তুর্কৌলিয়া, পীপরা ও মতিহারী। ইহা ছাড়া কুঠিগুলির সঙ্গে অল্পদিনের জন্য গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থাও রহিল। এই জন্য যদিচ কিছুদিনের জন্য বাহিরে সব শান্ত হইয়া গেল কিন্তু প্রজার দুঃখের আগুণ তলায় তলায় জাগিয়াই রহিল। ১৮৮৭ সালে বিহারে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়; ইহাতে চম্পারণবাসীর বিশেষ কষ্ট হয়। এই সময়ে নীলকরেরা নীলের দাম ১০৷৴০ আনা হইতে বাড়াইয়া ১২৲ করিয়া দিল; ইহাতেও প্রজারা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না

এবং সময়ে সময়ে তাহাদের অসন্তোষের আগুণ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ১৯০৬ সালে তেলহড়া কুঠির প্রজারা ম্যানেজার মিঃ ব্লুমফিল্ড্‌কে হত্যা করিল। কয়েকজন প্রজাকে ধরিয়া বিচার করা হইল; জজ তিন জনের ফাঁসীর আজ্ঞা দিলেন কিন্তু হাইকোর্টের আপিলে সে আদেশ রদ হইয়া ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

মা

চিত্র *

উমা,
প্রভাত,
কিরণ,
ললিত,　　　উমার পাঁচ পুত্র
অনুপম,
খোকা বা বিমল,
শান্তি,　　উমার কন্যা
মোক্ষদা,
সন্ন্যাসী।

মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি—উমা কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা এবং ভদ্র গৃহস্থের বধূ; স্বামীর অকালমৃত্যুতে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় হইয়া পড়েন কিন্তু কেবল নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় পাঁচটি পুত্র ও একটি কন্যাকে মানুষ

* এই কাহিনীতে উপন্যাস বা নাটকের আদর্শ ও নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, অতএব ইহা না উপন্যাস, না নাটক। ইহাতে কেবল কতগুলি সত্য ঘটনার সংযোগে একটি বঙ্গীয় জননীর চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা হইয়াছে। সেই জন্যই ইহাকে চিত্র আখ্যা দেওয়া হইল। ইহার প্রথমার্দ্ধ ১৩৩০ সনের কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

করিতে ছিলেন। জমীদার তাঁহার একটি পুত্র পোষ্য রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উমা এই পুত্রের বিনিময়ে অনেক টাকা পাইতে পারিতেন, কিন্তু সন্তান বিক্রয় করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত এম-বি পাশ করিয়া এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইল, দ্বিতীয় কিরণ শিক্ষকতা করিতে করিতে ওকালতী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই ইয়োরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ভারত সরকার অনেক আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনকে I. M. S. ভুক্ত করিয়া সেনাদিগের সঙ্গে যুদ্ধস্থলে পাঠাইতেছিলেন। মাতার সম্মতি লইয়া প্রভাত ঐ চাকরী লইল। এদিকে বাংলা হইতে বাঙ্গালীদের সৈনিক দলে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই চন্দননগর হইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের সৈনিক দলভুক্ত হইবার অধিকার দিলেন। কিরণ ঐ দলে প্রবেশ করিবার জন্য উৎসুক হইল।

উমার এক বাল্য সখী ছিলেন বিরজা, তিনি ধনীর গৃহিণী ; উমার দুরবস্থার সময় তাহার কোন সংবাদ লয়েন নাই ; কিন্তু যখন সংবাদ পাইলেন উমার এক বিবাহযোগ্য পুত্র আছে, তখন তাহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিবার জন্য উমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। প্রভাত যুদ্ধস্থলে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত সুতরাং উমা বা প্রভাত এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না।

প্রভাত ডাক্তার রূপে ও কিরণ ভলাণ্টিয়াররূপে চলিয়া যাইবার পর, দেশের কোন একস্থানে বিষম বন্যা ও তদনন্তর অন্নকষ্ট ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। পীড়িতদের সাহায্যের জন্য উমার অপর দুই পুত্র ললিত ও অনুপম উমার অনুমতি লইয়াই সেবক দলের নেতা এক সন্ন্যাসীর সহিত কিছুদিনের জন্য বাহির হইল]

শান্তি বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া

শান্তি। মা, স্বামীজি আস্‌ছেন।

ভিতর হইতে দ্রুতবেগে উমার প্রবেশ

উমা। কৈ ? কৈ ?

শান্তি। ঠাকুর একলা আস্‌চেন যে, মা ? সেজদা আর অনুকে ত দেখ্‌ছিনা !

উমা। কি বলচিস্! [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিবর্ণমুখে] হে ভগবান, হে মা বিশ্বজননী, বল দাও, বল দাও, (শক্ত করিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা)

শান্তি। ঐ যে বাউরী পাড়ার দিকে কারা যাচ্চে! বোধ হয় অনু আর সেজদা মঙ্গলকে বাড়ী পৌঁছতে গেল। হ্যাঁ মা তাই হবে।

উমা। (স্বগত) স্থির হও মন, স্থির হও।

[দূর হইতে স্বামীজীরকণ্ঠে]

বাবা বিমল, মা শান্তি !

স্বামীজীর প্রবেশ

উমা। ওরা কোথায় ঠাকুর ? সব ভালতো ?

উমার স্বামীজীকে প্রণাম।

স্বামীজী। সব ভাল। আসচে, সবাই আস্‌চে। খুব ছেলে তয়ের করেছ, মা! ওরা খুব খেটেছে।

উমা। কারও অসুখ বিসুখ নেই ত?

স্বামীজী। নাঃ। আমাদের তো কারু অসুখ করেনি। তোমার করেছিল তা দেখ্‌ছি। বড় শীর্ণ হচ্ছে মা। বড়ই দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে—না?

উমা। আজ ভগবানের কৃপায় সব দুর্ভাবনা কেটে গেল। শান্তি, ছেলেদের আর স্বামীজীর জন্য জল খাবার ঠিক কর্। তার পর রাঁধতে যা।

শান্তির প্রস্থান

স্বামীজী। ওরা আস্‌বার আগে একটা দরকারী কথা আছে মা। শোভনা বলে একটি মেয়েকে মা জান্‌তে?

উমা। কে শোভনা? আমার সইএর মেয়ে? তার কি হয়েছে ঠাকুর?

স্বামীজী। তাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসেছি। তোমার ঘরে তার স্থান হবে, মা?

উমা। আমার ঘরে তার স্থানের অভাব হবে না। কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া কি রকম?

স্বামীজী। হ্যাঁ মা, তাকে কুড়িয়েই পেয়েছি। সে অনেক লম্বা ইতিহাস। তবে কথাটা সংক্ষেপে এই—

দুবছর আগে এক দুশ্চরিত্র, ব্যাধিগ্রস্ত জমীদারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার আর এক স্ত্রী বর্ত্তমান। কিন্তু সে বন্ধ্যা বলে এই দ্বিতীয়বার খুব ঘটা করেই বিয়ে হ'ল। পূর্ব্বের স্ত্রী শোভনার মার সঙ্গে গোপনে দেখা করে এ বিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ধনী জামাতার লোভ ছাড়তে পারলেন না।

উমা। মেয়েটীর বয়স হয়েছিল বলে সমাজে নিন্দার ভয়ও ছিল।

স্বামীজী। লোভে হোক ভয়ে হোক, মেয়েটীর দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তার বিয়ে দিলেন।

উমা। তারপর?

স্বামীজী। সে স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে সম্মত হয়নি। একবার সতীনের সাহায্যে সে পালিয়ে বাপের বাড়ী আসে। মা তাকে ধরেবেঁধে ফিরে পাঠান। তাঁর বিশ্বাস ছিল শোভনার সতীন নিজে পোষ্যপুত্র নেবে বলে এ সব কচ্চে।

উমা। তারপর?

স্বামী একরাত্রে শোভনাকে ভীষণ প্রহার করে। বোধহয় তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অজ্ঞান দেখে মরে গিয়েছে ভেবে ওকে শেষ রাত্রে নদীর ধারে ফেলে দিয়ে আসে। তখন চারদিকে কলেরা লেগেছিল।

কত শব লোকে শেষরাত্রে এমনি করে ফেলে যেত। কে কার খোঁজ করে?

উমা। জমিদার বাড়ীর বৌ ম'লেও খোঁজ হয় না?

স্বামীজী। পরের দিন বিকালে বাড়ীর আর কোন স্ত্রীলোকের শব জমীদারের নূতন স্ত্রীর বলে পুড়িয়ে ছিল। জমীদার বাড়ীতে অমন ঢের ঢের হয়। বিশেষ গ্রামের মধ্যে। আমরা তো ভোরে মড়া পোড়াতে গিয়ে মেয়েটীকে পেয়েছিলাম। তুলতে গিয়ে দেখি কিনা একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। বাঁচলে বাঁচতেও পারে বলে তাকে ছাউনিতে নিয়ে গেলাম। শেষে নিজে গিয়ে সহরের হাঁসপাতালে দিয়ে এলাম।

উমা। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি? প্রশ্ন করেনি?

স্বামীজী। সে সময় শরীর ক্ষতবিক্ষত, মুখ কেটে ফুলে বিকৃত—চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে ছিল। আমরাও তাকে বড় ঘরের বৌ বলে মনে করিনি। এ জানা কথা ছোট লোকদের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামী মারে; আর এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, গহনার লোভে দুষ্ট লোকেরা তাদের দুর্দ্দশা করে। তারপর হাঁসপাতালের ডাক্তারদের কৌতূহল তৃপ্তির অবসর কম।

উমা। তারপর কি করে পরিচয় পেলেন?

স্বামীজী। দিনকতক পরে সে একটু ভাল হতে লাগল। কিন্তু সে ভাল হতে চাইতনা। মরবার চেষ্টাও করেছে। আমি একদিন অমুকে সঙ্গে নিয়ে হাঁসপাতালে গিছ্‌লাম। অমুকে দেখে সে যেন চিন্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকলে। এই সূত্র ধরে তার সব কথা আমি টেনে টেনে বার করলাম। সে অনেক কষ্টে।

উমা। এখন কি করবেন ভাবচেন?

স্বামীজী। শ্বশুরবাড়ী সে যাবেনা। বাপের বাড়ীতেও তার স্থান হবে না। বলে, হাঁসপাতালে গিয়ে তার জাত গিয়েছে। মেয়েটী বড় সুশ্রী, শান্তস্বভাব; প্রতিজ্ঞায় তেমনি দৃঢ়। বলছে যদি বাঁচতে হয় তো নাম বদলে গরীব দুঃখী ছোট জাতের সঙ্গে থাকবে, কারও গলগ্রহ হবে না—খেটে খাবে।

উমা তা ও কি হয়? তাকে কোথায় রেখে এলেন? আমার বাড়ীতেই নিয়ে আসুন। ওযে আমার সইয়ের মেয়ে, ওকি আমার পর? ও আমারই মেয়ে হবে। (স্বগত) ওতো আমার বউ হতে পারতো—যদি প্রভাতকে যুদ্ধে না চলে যেতে হ'ত। এমন যে হবে কে জান্‌তো।

স্বামীজী। কিন্তু এখানে কি বেশীদিন তাকে গোপনে রাখা যাবে?

উমা। না। ওর পিসীমা সহরে থাকেন। যদিও আমার বাড়ীতে তাঁর বাড়ীর

লোকের যাওয়া আসা নেই তবুও ঘুর্ণাক্ষরে জানতে পারলে ওর স্বামী ওকে নিশ্চয়ই আবার নিয়ে যাবে।

স্বামীজী। তার মৃত্যু হয়েছে। সে জমিদার ছিল। তার গ্রামের কাছেই আমাদের রোগীনিবাস আর সেবাশ্রম খুলে ছিলাম। সে যে মেরে মেরে স্ত্রীকে হত্যা করেছে, একথা নিয়ে ওখানে কাণাকাণি চল্‌ছিল। বেঁচে থাক্‌লে পুলিসের হাতে সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না। অনেক ঘুষ দিতে হ'ত। ইনফ্লুয়েঞ্জা তাকে বাঁচালে।

উমা। ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে সেবার কাজ শেখালে কেমন হয়?

স্বামীজী। সে কি রকম করে হতে পারে বলতো মা?

উমা। কলকাতায় যে এখন 'নার্স' তয়ের করা হয়। তবে সেখানে ওর একজন অভিভাবক কি অভিভাবিকা থাকা চাই।

স্বামীজী তাতো চাই ই। নইলে বিপদে পড়তে পারে।

উমা। এখানকার সরকারী ডাক্তার মণীন্দ্রকে ডেকে আমি সব বন্দোবস্ত করব। মনীর মার কাছেই না হয় পাঠিয়ে দেব। আর আপনি ও তো মাঝে মাঝে খোঁজখবর করতে পারবেন।

স্বামীজী। সে বেশ কথা। আমি ওদের ডেকে আনি। মঙ্গলের বাড়ীর দাওয়ায় সকলকে বসে থাকতে বলেছি। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] মঙ্গল তোমার আর তোমার ছেলেদের বড় ভক্ত। ছেলেরা আবার ওকে ঢের গান আর কীর্ত্তন শিখিয়েছে—জান?

৮

পীড়িতা উমা ভূমিতলে মাদুরের উপর শয়ান।

নিকটে তাঁহার তিন পুত্র।

অনু। মা, খাটে যদি নাই শোও, খানকতক তোষক দিয়ে বিছানাটা অন্ততঃ একটু নরম করে দিই।

উমা। না বাবা, আমার শক্ত মাদুরে শোয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছু কষ্ট হয়না তো।

ললিত। এমন রোগা হয়ে গেছ—একেবারে অস্থিচর্ম্মসার। নিশ্চয়ই হাড়ে লাগ্‌ছে। মা, তুমি এমন করে পড়ে থাক্‌লে আমরা কি করে ভাল বিছানায় শুই বলতো? শান্তির নীচে শুয়ে অসুখ করবে যে!

উমা। শান্তিকে আমার কথা শুন্‌তে হবে। সে অবাধ্য হতে পারবে না। সে

১০

উমার প্রকোষ্ঠ। উমা ও স্বামীজী কথোপকথনে নিমগ্ন

উমা। যে একটা দরকারী কথার জন্য আপনাকে আনিয়েছি এখন তাই বলি। মণীন্দ্রের সঙ্গে আমার শান্তির বিয়ে দিতে চাই।

স্বামীজী। কোন মণীন্দ্র?

উমা। ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত—প্রভাতের বন্ধু। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিল, এবার সিবিল সার্জ্জন হয়েছে।

স্বামীজী। মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত? গুপ্ত তো বৈদ্য? বদ্দির ছেলে?

উমা। বদ্দির না হয়ে বেদের হলেই বা কি? ছেলেটির মন বড়। যেমন বিদ্বান তেমনি নম্র—সচ্চরিত্র। তারপর আমার শান্তিকে সে নিজে পসন্দ করেছে। আপনার এ সম্বন্ধ ভাল মনে হয় না?

স্বামীজী। তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠি আত্মীয় কুটুম্বেরা এটা ভাল মনে করবেন কি না সেইটে ভাবতে হবে।

উমা। আমি তো তাদের কথা ভাববার দরকার দেখিনা।

স্বামীজী। মা, সমাজে বাস করতে গেলে এমন কথা বলা ঠিক হয় না। সমাজের বিধিনিষেধ যে না মেনে চলে, সমাজ তাকে বাইরে ফেলে রাখবে—তখন?

উমা। সমাজ আমাকে ভিতরে রেখেইবা আমার জন্য কবে কি করেছে? আমার বিপদ আপদের সময় কেউ খবরটা নেয় নি—কিভাবে এই শিশুগুলি নিয়ে দিন যাচ্চে। যখন এরা বড় হল, এদের নাম হল, চাকরী হল, তখন একটু খোঁজ হল। কাজ কি আমার এ আত্মীয়তায়?

স্বামীজী। তোমার স্বজাতিসমাজে কেউ কি আত্মীয়তা করে নি?

উমা। না। বরং বাউরী বাগ্দী ডোমেরা সহানুভূতি দেখিয়েছে।

স্বামীজী। সে কি রকম?

উমা। জমীদারের গোমস্তা তো একদিনের জন্য খাজনা বাকী রাখতে দেয়নি। রেহাই দেওয়া তো দূরের কথা। নানা ফন্দী করে চাষের জমী হাতছাড়া করে নিয়েছে। কিন্তু কাঠ কুটো নেই বলে উনুনে হাঁড়ী চড়েনি জান্‌তে পেলে, বাউরীর মেয়েরা আপনাদের বাড়ী থেকে ঝুড়ী করে ঘুঁটে বয়ে এনে দিয়েছে; কোনদিন নিজেদের ক্ষেতের তরী-তরকারী এনেদিয়েছে; হারু বাগ্দীর ছেলে আঁটি আঁটি কাঠ কেটে দিয়েছে, ছেলেদের জন্যে মাছ ধরে এনেছে। ডোমের বউরা সস্তায় ডালা কুলো বেচেছে, লাভ চায় নি।

মাটী তোলা, ঘর ছাওয়া, আমার যখন যা দরকার হয়েছে, ওদের ছেলেরা সামান্য মজুরীতে করে দিয়ে গেছে।

স্বামীজী। তুমি কি তাদের জন্য কিছু করনি মা?

উমা। তাদের অসুখ বিসুখের সময় তাদের খোঁজ খবর একটু করেছি। কখনও ঔষুধ একটু আধটু যা জানি তা দিইচি। ওদের ছেলে পুলেদের আমার পুরোনো কাপড় দিয়ে কাঁথা সেলাই করে দিইচি। এই সব ছোট খাট যা, তাতেই কত কৃতজ্ঞ।

স্বামীজী। ভদ্রলোকের জন্যে কিছু করলে তারাও কৃতজ্ঞ হয়।

উমা। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা বেশী দেখিনি। উনিতো আত্মীয় স্বজনের জন্যই নিঃস্ব হয়ে গেলেন। পাবার প্রত্যাশা রেখে অবিশ্যি কিছু করেন নি। কিন্তু উনি যখন গেলেন, ওদের ব্যবহারে মনে হতো, পাছে আমাদের জন্য কিছু করতে হয় বলেই সবাই যেন গা ঢাকা দিলেন। একটা মুখের কথা, একখানা চিঠী দিতে পর্য্যন্ত কার্পণ্য এসেছিল।

স্বামীজী। সেই দুঃখ আর অভিমানে কি বাগ্দীকে মেয়ে দিতে পার?

উমা। না তা পারিনা, কল্পনাও করতে পারিনা।

স্বামীজী। জাতটা কিছু নয় বলতে পার?

উমা। বর্ত্তমানে তাও পারি না; শিক্ষাদীক্ষায় যে অনেক পার্থক্য। ওদের চাই কয়েক পুরুষ ধরে শিক্ষা, আমাদের চাই কয়েক পুরুষ ধরে চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তি। আর নয়তো একটা আকস্মিক বিপ্লব।

স্বামীজী। একটা বিষম ওলট্ পালট্ কিন্তু কাছেই আস্‌চে।

উমা। দুষ্ক্রিয় ব্রাহ্মণের চেয়ে সদাচারী বাউরী ভাল প্রতিবেশী, একথা কিন্তু আমি বলি।

স্বামীজী। বংশের দোষগুণ, রুচি প্রবৃত্তি সহজে এড়ান যায় না; অনেক ভাববার কথা আছে, মা।

উমা। আমিও তা স্বীকার করি, তবুও কুলের চেয়ে শীল, শিক্ষার চেয়ে দীক্ষা, জাতের চেয়ে ধাত বড় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এক্ষেত্রে বর কন্যার শিক্ষা আর স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈদ্য-কায়স্থ কিসে ব্রাহ্মণের চেয়ে ছোট ঠাকুর!

স্বামীজী। তুমি নিজে যখন চিরাগত সংস্কারের পাশ কাটিয়ে উঠেছ, তখন এ বিবাহের আপত্তির কারণ আমি তো দেখি না। তবে বরকন্যা ভবিষ্যতে কষ্ট না পায়, তাদের সন্তানেরা নীতি বা আইনের চক্ষে হীন না হয়, সেটা দেখা দরকার। সমাজকে তো তুমি ভয় করই না।

উমা। কেন করব? সমাজকে যে পথ দেখাতে হবে। সমাজের গোটাকত মানুষ এগোলে, ক্রমে সমস্ত সমাজ এগোবে।

স্বামীজী। তোমার সঙ্গে অধিকাংশ লোক যদি না এগোতে পারে, তারা তোমায় বর্জ্জন করবে। সেইটুকুর জন্য প্রস্তুত থেকো।

উমা। এ বর্জ্জন মানে তো এগোতে দেওয়া। আমার দুই ছেলে বিদেশে। তারা জাতের সংস্কার বর্জ্জন করেই গিয়েছে। এ এদেশেও তো ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান আর্য্যসমাজী বিলেত ফেরত কম নয়। কে কাকে বর্জ্জন করবে?

স্বামীজী। তবে জাত বর্জ্জন করে তুমি এগোও। কোন দ্বিধা তোমার নাই তো?

উমা। কেবল রেজেষ্টারী করে বিয়েটা কেমন যেন ভাল লাগে না। কিন্তু এ অবস্থায় তাও করতে হবে।

স্বামীজী। না করলে ক্ষতি কি? দশজন ভদ্রলোক কে ডাকালে বিবাহের একটা সাক্ষ্য থাক্‌বে।

উমা। বিবাহ সভায় দশজন ভদ্রলোককে ডেকে তাদের সাম্‌নে কন্যা সম্প্রদান করা যেতে পারে, কিন্তু ধরুন যদি আইনের প্রশ্নই ওঠে, তার উত্তর তো হাতে রাখা দরকার।

স্বামীজী। দশজনকে ডাক্‌লে তারা আস্‌বে, কিন্তু শেষে স্বার্থের জন্য হোক্, শত্রুতা করে হোক্, তারা এসেছিল সেকথা স্বীকার নাও করতে পারে। তুমি মা ভাল সংকল্প করেছ।

উমা। তাহলে উপস্থিত থেকে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়ে যান। আপনি থাকবেন তো?

স্বামীজি। আমি থাক্‌ব। সন্ন্যাসী মানুষের জাত নাই।

১১

উমা শয্যায় আসীনা

সম্মুখের আসনে স্বামীজী উপবিষ্ট। সুসজ্জিতা শান্তির প্রবেশ

শান্তি স্বামীজীকে প্রণাম করিতে যাইতেছে।

স্বামীজী। না, না, আগে মাকে প্রণাম কর দিদি, মার চেয়ে গুরু কেউ নেই।

মায়ের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শান্তির ক্রন্দন।

উমা। কেন কাঁদচিস্ মা? শুভদিনে চোখের জল ফেল্‌তে নেই। কে সাজিয়ে দিলে আমার দুর্গা প্রতিমা! বড় সুন্দর দেখাচ্চে। (মুখ চুম্বন)

[স্বগতঃ] উনি বোধ হয় দেখছেন, আশীর্ব্বাদ করছেন।

ওগো কে কোথায় আছ, আমার শান্তিকে আশীর্ব্বাদ কর ! [পুনরায় চুম্বন]

শান্তি। [চক্ষু মুছিয়া] মা, শোভনাদি সাজিয়ে দিয়েছেন।

উমা। তাকে ডাক্, ডাক্, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

শান্তি। বিধবাকে ছুঁতে নেই বলে আগেতো আমার কাছে আস্‌তেই চান্‌নি, এখন আবার লোকজন দেখে বেরোতে চাইছেন না।

উমা। তা নাই বেরুলো। কিন্তু ছুঁতে নেই কি? ওর গায়ে কিছু ছোঁয়াচে রোগ আছে নাকি? ওকে বিধবাই বা কে বলে?

ললিত ও অমুর প্রবেশ

অমু। কনে নিয়ে যেতে হবে।

ললিত। স্বামীজী, এখন সভায় যান।

[স্বামীজীর প্রস্থান]

উমা। লোকজন সব আস্‌চে; ভদ্রলোক জনকতক উপস্থিত আছেন তো?

ললিত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিস সাহেব এসেছেন, কাজেই জমীদার বাবু ও দলবল নিয়ে উপস্থিত। কেউ তো আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ কর্চ্চেননা। কোন গোলযোগের ভয় নেই।

অমু। সিবিল সার্জ্জনের বিয়েতে গোলযোগ হবে? ডাক্তারের হাতে অন্যের প্রাণ, তার কাছে কেউ জাত মানের বড়াই করে না।

উমা। নহবত বাজ্‌ছে না কেন, বাবা? বাজাতে বল।

অমু। মা তোমার অসুখ, বেশী উত্তেজনা তো ভাল নয়। তুমি এখন চুপ করে শুয়ে থাক।

উমা। বিমল কই?

অমু। সে সেজে গুজে বর আনতে গিছল, এখন বরকে নিয়ে বসাচ্চে। আমি এখন শান্তিকে নিয়ে বিবাহ সভায় যাই। চল্ শান্তি, আজকের মত আমি অভিভাবকত্বটা করে নিই। এর পর মণি দাদা তো আমায় নূতন সম্বন্ধের সম্বোধনে আপ্যায়িত করে হাঁকিয়ে দেবেন।

বিমলের প্রবেশ

বিমল। সেজদাদা! এঁরা কনেকে শীগগীর নিয়ে যেতে বলচেন।

১২

বাহিরে স্বামীজি ও ললিত

স্বামীজি। টেলীগ্রাম যখন পেলাম, তখন ট্রেন ধরবার আর সময় ছিল না।

তাই একটা দিন দেরী হল। অবস্থাটা এত খারাপ কবে হল ?

ললিত। শান্তির বিয়ের পর থেকে শরীর যেন একেবারেই ভেঙ্গে পড়্লো, আর উঠতে পারেন না।

স্বামীজি। শান্তি কি শ্বশুর বাড়ী ?

ললিত। না, এ বাড়ীতেই বরাবর আছে। একবার মাত্র শ্বশুঃ শ্বাশুড়ীকে প্রণাম কত্তে গিছলো।

স্বামীজি। মণীন্দ্র কি বলেন ?

ললিত। বলেন, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কখন কি হয় বলা যায় না।

স্বামীজি। মন যা বয়, শরীর তা বইতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আচ্ছা, প্রভাত যে শত্রুর আক্রমণের মধ্যে নিজের রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আস্তে পেরেছে বলে Military cross of honour পেয়েছে, সে খবর শুনে খুব আহ্লাদ কল্লেন ?

ললিত। আহ্লাদ নিশ্চয়ই হয়েছে ; কিন্তু এসময় খুব আহ্লাদ দেখাবারও শক্তি নাই। চিঠিখানা বুকে করে খানিক ক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, আর দুধারে চোখের জল গড়াতে লাগ্লো। তারপর বল্লেন—"তোরা আনন্দ কর, বাড়ীতে খুব আলো জ্বালিয়ে দে।" মেজদার খবরের জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে আছি। মা বেশী কিছু বলেন না, কিন্তু ভাবছেন দিন রাত।

স্বামিজী চন্দননগর কি পণ্ডিতচারীতে চেষ্টা করে খবর আনা যায় না ?

ললিত। যত রকমের চেষ্টা সম্ভব, মণিদা তা কচ্চে। আজইতো খবর পাবার কথা। ঐযে মণিদা আসচেন,—হাতে কাগজ পত্তর।

শান্তি। [দৌড়িয়া আসিয়া] সেজদা, মা যে কেমন হয়ে পড়লেন্! উনি কখন আসবেন ?

মণীন্দ্রের প্রবেশ

তোমার হাতে ও সব কি ? খবর এসেছে ?

মণীন্দ্র। ভিতরে চল শান্তি, সব দেখ্বে। তোমার মনে যত বল সব সংগ্রহ করে স্থির শান্ত হয়ে মার সেবা করতে হবে। অধীর হলে চলবে না। মার জীবন তোমার উপর নির্ভর কচ্চে, মনে কর।

শান্তি। মেজদা! আমার মেজদা তরে নেই! [ক্রন্দন]

মনীন্দ্র। মা যেন না শুনতে পান। শান্তি, মাকেও হারাবে।

১৩

শয্যার উপর উমা উঠিয়া বসিয়াছেন নিকটে ললিত মণীন্দ্র, ও স্বামীজি

উমা। ওরে শান্তিকে একবার আমার কাছে আসতে দে। ওকে একবার আমার বুকে মাথা রেখে ভাল করে কাঁদতে দে।

ললিত। [বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে] মা শান্তির শরীরটা ভাল নেই অন্য ঘরেই থাকনা। তোমায় দেখলে বেশী কাঁদবে, তোমার চেহারাটা যে কি রকম হয়েছে—তুমি তো দেখ্‌তে পাও না। [অশ্রুগোপন]

উমা। অমুটা বাইরে বসে থাক্‌চে, আমার কাছে এসে বোস্‌চে না কেন? খোকা কই? ও বিমল, আয়, আমার কাছে আয়।

বিষণ্ণমুখে মার পায়ের কাছে বিমলের উপবেশন

উমা। [সকলের মুখ লক্ষ্য করিতে করিতে অতি ধীরে ধীরে] আমার কাছ থেকে কি লুকাবি? আমার কিছু জানতে বাকী নেই। আমি সব জেনেছি। তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

মণীন্দ্র। [স্থির কণ্ঠে] মা এই ওষুধটা খান।

উমা। (ঔষধ সেবন করিয়া) শান্তিকে এখানে নিয়ে এস বাবা। কান্না চাপ্‌তে গিয়ে মেয়েটা মারা যাচ্চে। আমি যে ওর বুক ফাটা চাপা কান্না শুনতে পাচ্চি,

[স্বামীজির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া মনীন্দ্রের প্রস্থান]

ললিত। কেউ তো কাঁদছে না, মা। তোমার অসুখের কথা ভেবে সে কাতর হচ্চে, মা! তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হও দেখি।

উমা। আমি ভাল হব, বাবা? ভালই হবো। আমার ভববাস শেষ হয়ে আস্‌চে। সত্যি বল্‌ছি, কিরণের জন্যে আমার আর কিছু ভাবনা নেই। সে দেহমুক্ত হয়ে আমায় ডাকছে।। ওযে আমায় ছেড়ে আর কখনো থাকেনি।

শান্তিকে লইয়া মণীন্দ্রের প্রবেশ

শান্তি। [মার গলা জড়াইয়া] মেজদার খবর পেয়েছি, মা, সে তোমার বীর ছেলে। কর্ত্তব্য করতে করতে—খবর পেয়েছি—সবাই তাকে ধন্য ধন্য কচ্চেন।

উমা। খবর পেয়েছিস্! আমি যে থেকে থেকে তার হাসি মুখ দেখ্‌চি। সেই যে যাবার আগে আমার কোলে মাথা রেখে, আমার দুটো হাত তার মুঠোর ভিতরে নিয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলেছিল "মা—আ - আ, বল আমি যাব?" তেমনি করে আবার এসে বলে গেল—মা আমি যাব।

ললিত। তুমি মেজদাকে স্বপ্নে দেখেছ মা?

উমা। স্বপ্ন বলতে চাস বল। আমি কিন্তু ঠিক বল্‌চি। তার কাজ সেরে সে চলে গেছে। আমারও দুঃখ নাই, আমারও যাবার সময় হয়েছে। শান্তির জন্য একটু ভাবনা ছিল মনীন্দ্র তার ভার নিলেন। বাবা মণি! অমু বিমল ও ললিতের উপরও একটু দৃষ্টি রেখো। তুমি রাখবে তা জানি।

মনীন্দ্র। মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর কথা বলবেন্ না। [নাড়ী পরীক্ষা। গম্ভীর মুখে ঘড়ির দিকে চাহিয়া রহিলেন]

শান্তি। [কাতর কণ্ঠে] আমাদের ফেলে কোথায় যাবে? যেয়ো না।

উমা। [ক্ষীণকণ্ঠে] তুমি সুখে থাকো; সকলের সেবা কর আমার লক্ষ্মী মা!

শান্তি। তুমি বল তুমি বাঁচ্‌বে, আমাদের ফেলে যাবে না। মনের জোরে তুমি সব কর্ত্তে পারো।

মনীন্দ্র। স্থির হও শান্তি! কথা বলিয়ে দুর্ব্বল করো না।

উমা। বাঁচ্‌বো না। ফেলেই যাব। তোর বাবার যখন সময় হয়ে এলো তখন আমিও ঐ বলে কেঁদেছিলাম—"ফেলে যেয়ো না আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।" বল্লেন "এদের জন্যে তোমায় বাঁচ্‌তে হবে।" উনি চলে গেলেন। আমি তোদের জন্যে অনেক দিন বাঁচ্‌লাম, আর না।

শান্তি। এখনো তোমাকে বাঁচতে হবে। আমরা এখনো আছি। অমু বিমল যে—

চক্ষু মুছিতে মুছিতে অমুর প্রস্থান

মনীন্দ্র। [অতি মৃদুস্বরে] মাকে শেষ মুহূর্ত্তে অস্থির করো না। [উমার কথা বলিবার চেষ্টা, মনিন্দ্র কর্ত্তৃক মুখে ঔষধ দান, বিমল কর্ত্তৃক মাতার পাদ চুম্বন]

মনীন্দ্র। কিছু বলতে চান আর?

উমা। [ললিতের দিকে চাহিয়া] তোমরা সব বড় হয়েছ ভাবনা নাই। ভগবান আছেন। প্রভাত শীগগীর আসছে, যদি— যদি—

ললিত। 'যদি' কি মা? দাদাকে কিছু বলে যেতে চাও? [মাতার মুখের কাছে কাণ লইয়া গিয়া] কি বলবে?

উমা। [ক্ষীণস্বরে] প্রভাতকে আশীর্ব্বাদ দিস্। আর যদি সে শোভনাকে ভাল বাসতে পারে, বলিস্ বিয়ে করতে আমার অমত নেই।

মনীন্দ্র। মা, শোভনাকে দেখবেন? আপনার অসুখ শুনে তিনি এসেছেন।

উমা। ডাক।

ললিতের প্রস্থান ও শোভনাকে লইয়া পুনরাগমন।

শোভনা কর্ত্তৃক উমার পদধূলি গ্রহণ

উমা। মা আমার ভালো হয়ে থেকো। ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন্ [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া] ঐযে কিরণ হাসচে। আমি আসচি বাবা! গুরুদেব! পায়ের ধুলো দিন। ও বিমল! আমার পা দুটো ছেড়ে দে ধন আমি যাব যে। সামনে এসে বোস।

[বিমলের সম্মুখে গমন]

[তাহার মাথায় হাত বুলাইতে গিয়া উমার হাতখানি পড়িয়া গেল]

উমা। আমার খোকন! খেলতে যাও। আমি একটু ঘুমুই।

স্বামীজি। [উমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে] জয় সচ্চিদানন্দ হরে!

অনু। [বাহির হইতে দৌড়িয়া আসিয়া] মা চলে গেলে, [মনীন্দ্র উমার হাত দুখানি তাহার বুকের উপর রাখিয়া শান্তিকে ধরিয়া দাঁড়াইল]

পুত্রকন্যা সকলে। [কাতরকণ্ঠে] মা! মা! মা!

(বাহিরে সংকীর্ত্তন) জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

গণ-আন্দোলনের শিল্পী ও সাহিত্যিক

আমাদের দেশে গণশক্তি এখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে প্রকাশ করে নাই। জনসাধারণের মধ্যে যে আন্দোলনের চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহার মূল কারণ অর্থনৈতিক। সকল দেশেই অল্পাধিক এই কারণে গণশক্তি বিপ্লবমুখী হয়। বিপ্লবের ঋষি যিনি তিনি পথ দেখাইয়া যান—বিপ্লবের সেনাপতি যিনি তিনি এই অন্ধ গণশক্তিকে চালিত করিয়া রাজার রাজ্য পরিবর্ত্তনের সুযোগ গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে শাস্ত্রকারগণ গণপতির বড় সুন্দর আকার দিয়াছেন। মস্ত বড় পেট আর মাথাটা হাতীর, চোখ দুইটি নাই বলিলেই চলে। জন সাধারণ পেটটিলে, জনহস্তীর দৃষ্টি ক্ষুদ্র—কিন্তু বিশাল দেহ। অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে এই ঐরাবত ভাসিয়া আসিয়া ছিল, কিন্তু নেতাদের দোষে সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজীতে বলে—Hunger breeds revolution—ক্ষুধা বিপ্লবের জননী। ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ চালকাপড় কিসে সস্তা হইবে, জমি দখল কিসে পাইবে, ভাবিয়া কংগ্রেসের মণ্ডপসম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কচকচানি দেখিয়া যেমন ক্ষুধা ছিল তেমনি ক্ষুধা লইয়াই ফিরিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, তাহারা যাহা চাহিয়াছিল নেতৃগণ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাদের জমায়েৎ দেখিয়াই বিদেশী শাসক ভয়ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল—"Let us forget the past and sit in a round table conference"- আজ গণদেবতার অন্তর্ধানের সঙ্গে শাসকের সে ভয় ভাঙিয়াছে—যানবিহীন সেনাপতির উপর অপমানের বজ্র ভিন্ন আজ আর সে অন্য কিছুই নিক্ষেপ করিতেছে না। নেতারা নিজেদের সংস্কারমতই কাজ করিতেছেন। মানুষের Social affiliation—সমাজগত সংস্কার—জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে কাজ করে। সহযোগীরা জ্ঞাতসারে নিজেদের স্বার্থমত কথা কহিয়াছেন—অসহযোগীরা গণ-আন্দোলনের নেতা সাজিতে গিয়া নিজেদের এক মহা অসামঞ্জস্যের মধ্যে ফেলিয়াছেন। স্ব-শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়া সেদিক দিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই—আবার গণ-আন্দোলনের জন্য যে মূর্ত্তি ধারণ প্রয়োজন রুদ্রের সে মূর্ত্তি দেখিয়া পিছাইয়া আসিয়াছেন। অথচ যে কোটিমুণ্ড দেবতার একবার দর্শন পাইয়া এত বল হৃদয়ে আসিয়াছিল, আজ শুধু স্বপ্নের স্মৃতির মত তাহার কথা স্মরণ করিয়া এখনও মধ্যে মধ্যে Civil Disobedienceএর কথা আওড়াইতেছেন—কিন্তু যাহার কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করিবেন, সে কোথায় সরিয়া গিয়াছে, তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

এই আন্দোলনের অসফলতার প্রধান পরিচয়, শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে ইহার আত্মপ্রকাশ হয় নাই। রুশিয়া দেশে যে গণ-বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, তাহার নেতাগণ সমাজের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উদ্ভূত না হ'লেও তাহাদের জীবন তাঁহারা যাপন করিয়াছেন। এই declassified element বা 'শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিগণে'র মধ্য দিয়াই সাহিত্য, শিল্প পরিপুষ্টি লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে নূতন মূর্ত্তি দিয়াছে। লেনিন, গোর্কি প্রভৃতির জীবনকথা আলোচনা করিলে এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

জার্মানি দেশেও এই গণ-আন্দোলনের জন্মলাভে নূতন শিল্প-সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিতেছে। কাটে কলোভিট্জের মত জনসাধারণের চিত্রকর এখনও আমাদের দেশে আসিলনা।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের দেশের কবিতা, চিত্রকলা প্রভৃতি একটা নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সাহিত্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র নাথের "গোরা", "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কবি বা শিল্পী কেহই দেখা দেয় নাই। কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অতি কষ্টে মহাত্মাজীর প্রোগ্রাম মত গাহিবার জন্য কয়েকটা গান লিখিয়াছেন। সে গানে কবির প্রতিভাই ফুটিয়াছে, আন্দোলনের মহত্ত্ব ভাষা পায় নাই। ইহার প্রধান কারণ "অ-সহযোগ" কথাটার মত আন্দোলনটাও negative basis বা নিতিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য ভাবপ্রবণ বাঙালী প্রথমে ইহাতে সাড়া দেয় নাই—চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চমকে অন্ধ হইয়া ঐ পথে কিছুদিনের জন্য যাইলেও আবার এক নূতন পথে আন্দোলনকে চালাইয়া নিজের ধাতুগত করিয়া লইয়াছিল।

চিন্তাশীল লেখকগণের মধ্যে অধ্যাপক রাধাকমল গণ-আন্দোলনের মস্ত বড় একটা সূত্র ধরিয়া দিয়াছেন। যে স্বরাজের কর্ম্মসংকল্পের ভিতর জমিবিভাগ এবং ভূমি-স্বত্বের ন্যায্য প্রতিষ্ঠার কথা নাই এবং কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের ন্যায্য বিভাগের কথা নাই তাহা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনরূপে দাঁড়াইতে পারে না। তাই তিনি বলিয়াছেন - Peasant point of view in our political policies and programme. শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, হৃষীকেশ সেন প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাশীল লেখক ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া কৃষকের পক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সহিত কৃষকের স্বার্থের কি সম্বন্ধ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই।

ছবির মধ্য কৃষকের প্রার্থনা বা সাঁওতাল দম্পতীর চিত্র দেখা যায় বটে কিন্তু ধর্ম্ম বা প্রেমের দিক হইতে চিত্রকর তাহাকে দেখিয়াছেন।

গল্প লেখকের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীবনকথা অবতারণা করিয়াছেন।

কবিতার মধ্যে শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উদীয়মান মুসলমান কবি শ্রীযুক্ত জসীম উদ্দিন কৃষকজীবনের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহাও কবির প্রয়োজনাসাধনার খাতিরে।

গণ-আন্দোলনের "লা মার্সেলিস" বা "বন্দেমাতরম্" লিখিবার ঋষি এখনও আসেন নাই। যে গানে জনসাধারণ সত্যই নিজের ভাষাহীন ব্যথার বাণী পাইয়া প্রাণ খুলিয়া গাহিয়া মাতিবে—সে গান এখনও আসে নাই।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নামক পুস্তকে গণ-আন্দোলনের একটা সুরের অস্ফুট ভাষা দিয়াছেন। গানটি এই:—

"(আমরা) গাঁয়ে বসে বুনছি ফসল,
(তোমরা) খাচ্ছ বসে সহরে।
(আমরা) ম্যালেরিয়ায় মচ্ছি ভুগে,
(তোমরা) আরাম কচ্ছ মোটরে॥
(আমরা) দিচ্ছি যোগান খেটে খেটে,
(তোমরা) নিজেরা সব নিচ্ছ বেঁটে,
(আমরা) পেটে খেতে পাইনা মোটে,
(তোমরা) চালান দিচ্ছ সদরে॥
(খালি) ভরে আঁজলা টাকার পোঁটলা,
তুলছ নিজেদের ঘরে॥
(আমরা) পরের তরে কর্ব্বি না চাষ
(যদি) কোট ধরি ভারি,
(তখন) কোথায় রবে ব্যবসা পাটের
চালের আড়ৎদারি?
চাষীদের সব করে ঘায়েল,
লুটলে কড়ি এতকাল
(আর) চলছে না সাবেকী চাল,
চোখ ফুটেছে চার ধারে—
"পয়সা" কিম্বা "গতর" বড়
(হবে) বোঝাপড়া এবারে॥"

এই গানের ভিতর নাট্যকারের বিশ্লেষণ ঠিক প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু জনসাধারণ এখনও এতটা সত্যিই বুঝিতে পারে নাই—বা তাদের সামনে এ গান গাওয়াও

হইতেছে না। কলিকাতার থিয়েটারে বসিয়া যাহারা এই গান শোনে তাহারা ইহাকে জাতির একটা জীবন্ত সমস্যার আকারে দেখে না। তবে তাহাদের চক্ষুর অন্তরালে গণ-দেবতা এই সুরই ভাঁজিতেছেন। তাঁহার ভৈরব-রাগিণী কোনদিন ভুবন জুড়িয়া আগুণের সুরে সব জ্বালাইবে, কে জানে!

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয়ভাবে স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণায় এই বিপ্লব যুগের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন—তাঁহার সমগ্র কবিতাটি এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না :—

"নূতন সমুদ্র তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে
ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে,
ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,—
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো,—
জানেনা তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ;
দিগন্তে ফেনায়ে ওঠে ঢেউ,—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—
'নূতন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে
দিতে হবে পাড়ি।'
'যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রী দল,'
উঠেচে আদেশ
'বন্দরের কাল হ'ল শেষ।'
অজানা সমুদ্র তীর, অজানা সে দেশ,

সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি'—
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে
প্রচণ্ড আহ্বান,
মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে
নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ,
যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল'
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন.
হে নির্ভীক, দুঃখ অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি?
মাথা কর নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এইতাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে
আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি-অভিমান,

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘ শ্বাসে জলে স্থলে
বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়,
জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের
যত বজ্র বাণ!
রাখ নিন্দা বাণী, রাখ আপন
সাধুত্ব অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে!"

এই নূতন সৃষ্টি আরম্ভ না হইলে গণ-আন্দোলনের প্রকৃত শিল্পী এবং সাহিত্যিক জন্ম গ্রহণ করিবে না। তবে সূচনা হইয়াছে—এখন পরিণতির যন্ত্রনায় সমাজদেহ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ব্বে বলিয়াছি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান উপাদান তিনটি—(১) ফিউড্যাল ভূস্বামীতন্ত্র; (২) চর্চ্চের যাজকতন্ত্র; (৩) পৌরতন্ত্র। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভূস্বামীতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ঐ যুগের পৌরতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে।

যাজকতন্ত্র ও ভূস্বামীতন্ত্রের ইতিহাসের ধারার সহিত পৌরতন্ত্রের ইতিহাসের ধারার মিল নাই। চর্চ্চ ও ফিউড্যাল পদ্ধতি যদিও পরবর্ত্তী কালে নবনবভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তথাপি পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তাহারা সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট স্বরূপ লাভ করিয়াছিল; ঐ সময়ের মধ্যে কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি

ঘটিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু পৌরতন্ত্রের ইতিহাস অন্যরূপ। আমাদের আলোচ্য যুগের শেষভাগেই অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেই পৌরতন্ত্র ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে; অবশ্য ইহা নহে যে তৎপূর্ব্বে ইহার কোন আলোচনাযোগ্য ইতিহাস ছিল না; ইহাও নহে যে আমাদের আলোচ্যযুগের বহুপূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন ছিল না; কিন্তু কেবল একাদশ শতাব্দীতেই পৌরতন্ত্র আধুনিক সভ্যতার একটা বৃহৎ অঙ্গরূপে সুস্পষ্টভাবে জগতের দৃশ্যপটে প্রকট হইয়া উঠিল। ভূস্বামীতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের ইতিহাসে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বীজ হইতে ফলে পরিণতি, কারণ হইতে কার্য্যে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে সেখানে আমাদের আলোচ্য যুগের বাহিরে চলিয়া যাইতে হয় না। পৌরতন্ত্রের বেলায় আমরা সে সুবিধা পাইব না! আমাদের আলোচ্যযুগের মধ্যে কেবল তাহার জন্মের ইতিহাস পাওয়া যাইবে, তাহার পরিণতির ইতিহাস নহে। সুতরাং আপাততঃ কেবল ইহার মূলকারণ ও উৎপত্তির কথাই আলোচনা করিব। পৌরতন্ত্রের পরিণামফল ও সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে এখ। যাহা বলিব তাহা কতকটা পরবর্ত্তী ইতিহাসের আনুমানিক পূর্ব্বভাষরূপে গ্রহণ করিবেন। আমি সে সব কথা এখন সমসাময়িক ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব না। যখন দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিব, তখন দেখিবেন পৌরতন্ত্র পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিতেছে, তখন দেখিবেন সে তাহার স্বভাবানুযায়ী ফল ফলাইতেছে, তখন দেখিবেন ইতিহাসের ঘটনা আমাদের যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে। আপনাদের সমক্ষে যে চিত্র উপস্থিত করিতেছি তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া পাছে আপনারা আপত্তি করেন, সেই জন্যই এ কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

এখন মনে করুণ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্সের নবজীবনচেষ্টার ভীষণ সূচনাকালে দ্বাদশ শতাব্দীর একজন পৌরপ্রধান হঠাৎ আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই সময়ে যে সকল পুস্তিকা লোকচিত্তে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে সেইরূপ একখানি পুস্তিকা তাঁহাকে পড়িতে দেওয়া হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুণ তাঁহাকে সীয়ে (Sieyes) প্রণীত "থার্ড এষ্টেট্ বা তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ কে?" এই নামের পুস্তিকাখানি পড়িতে দেওয়া হইল। পুস্তিকাখানির মূলভিত্তিস্বরূপ এই কথাটি তাঁহার চোখে পড়িল; "অভিজাতবর্গ ও যাজকবর্গকে বাদ দিয়া সমগ্র ফরাসী জাতিই রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ।" একথাটি পড়িয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইবে জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কি মনে করেন তিনি ইহার কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন? না, তিনি "ফরাসী জাতি" কথাটি বুঝিতে পারিবেন না, কারণ এরূপ কোন পদার্থের সহিত তিনি পরিচিত নহেন, তাঁহার সময়ে "ফরাসী জাতি" বলিয়া কোন বস্তু ছিল না; আর যদিই বা তিনি "ফরাসী জাতি" বস্তুটি কি তাহা বুঝিতে পারেন, যদি তিনি

স্পষ্ট দেখিতে পান যে উপরোদ্ধৃত বাক্যে রাষ্ট্রের এই তৃতীয় অঙ্গের হস্তে সমগ্র সমাজের শাসনাধিকার আরোপ করা হইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইবে ইহা একটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ উন্মত্ত প্রলাপবাণী; তাঁহার অভিজ্ঞতা, তাঁহার ভাব ও ধারণার সহিত আধুনিক এই তত্ত্বের এত বিরোধ।

এখন এই বিস্ময়াপ্লুত পৌরপ্রধানকে লইয়া রাঁ (Reims) বোভে (Beauvaix), লাওঁ (Laon) বা নোয়াইয়োঁ Noyon এইরূপ কোন আধুনিক ফরাসী নগরে প্রবেশ করুন এখানে তিনি আর একপ্রকার বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন, এখানে না আছে দুর্গ, না আছে প্রাকার, না আছে পৌরসেনা, পুরীরক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই; সমস্তই উন্মুক্ত, যে কোন আগন্তুক, যে কোন বিজেতা আসিয়া দখল করিলেই হইল। পৌরপ্রধান এ পুরীকে কখনই নিরাপদ মনে করিবেন না, তিনি ইহাকে দুর্ব্বল ও অযত্নরক্ষিত বলিয়াই ধরিয়া লইবেন। তিনি নগরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইলেন, সেখানে কি ঘটিতেছে, কি প্রণালীতে পুরী শাসিত হইতেছে, পুরীর অধিবাসী কাহারা এ সমস্ত সন্ধান লইলেন। তাঁহাকে বলা হইল পুরীর বাহিরে একটা রাজশক্তি আছে, সে পৌরবর্গের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বেচ্ছানুসারে পুরী হইতে রাজকর আদায় করে, পৌরসেনা সংগঠন করিয়া যথা ইচ্ছা যুদ্ধে পাঠায়। তিনি পৌরকর্ম্মচারীর কথা, পৌরাধিনায়ক মেয়রের কথা, পৌরপ্রধানদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; শুনিলেন তাঁহারা পৌরবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন না। তিনি আরও শুনিলেন পুরীর মধ্যেই পৌরব্যাপারের মীমাংসা হয় না; পরন্তু একজন রাজকর্ম্মচারী দূর হইতে একাকী পুরীর শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকেন। উপরন্তু তিনি শুনিলেন যে পৌরজনসংক্রান্ত কোনও ব্যাপারের বিচার করিবার জন্য একত্র সম্মিলিত হইবার অধিকার পৌরবর্গের নাই; পৌরবর্গ গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সাধারণ সভাস্থলে কখনও আহূত হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান একেবারে বিস্ময়বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন। তিনি প্রথমেই বিচকিত হইলেন যখন দেখিলেন ~~দেখিলেন।~~ নেশন বা সমগ্রজাতি রাষ্ট্রের তৃতীয়াঙ্গরূপে নিজকে কত মহিমাশালী মনে করিতেছে; এখন আবার দেখিতেছেন সেই জাতীয় সত্তা নিজের ঘরেই এত পরাধীন, এত দুর্ব্বল, এতটা নগণ্য যে তাঁহার সময়ের সমাজের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। তিনি একদিকে দেখিতেছেন সমাজই রাষ্ট্রের অধিপতি, অন্যদিকে দেখিতেছেন সমাজ একেবারে শক্তিহীন। এ বৈষম্য তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? ইহার সামঞ্জস্য বা তিনি কি করিয়া করিবেন? তাঁহার চিত্তবিভ্রম না ঘটাই আশ্চর্য্য।

এখন উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক আমরা একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিরিয়া যাই। আমরাও দেখিব সেখানে এই একইরূপ দ্বৈতসমস্যা। দেশ বা রাষ্ট্র বা শাসনতন্ত্র বা সমগ্র সমাজের ব্যাপার আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইব সেক্ষেত্রে

পৌরবর্গের কোন সংশ্রব নাই; সেক্ষেত্রে কোন বিষয়েই তাহারা হস্তক্ষেপ করে না, তাহারা গণণার মধ্যেই আসে না। রাষ্ট্রব্যাপারে তাহারা যে নগণ্য শুদ্ধমাত্র তাহাই নহে; পরন্তু যদি জানিতে চাই যে তাঁহারা নিজেদের এই অবস্থাটা কি চক্ষে দেখেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষার মধ্যে সংমসঙ্কোচ ও ভীরুতারই আতিশয্য দেখিতে পাইব। যে সমস্ত ভূস্বামী প্রভুর হাত হইতে তাহারা জোর করিয়া স্বাধীন অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে তাহারা পৌরবর্গের প্রতি এতটা ঔদ্ধত্যের সহিত আচরণ করে যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়; অথচ ইহাতে সেকালের পৌরবর্গের বিস্ময়ও নাই, ধৈর্য্যচ্যুতিও নাই।

এখন সেকালের একটা পুরীর মধ্যেই প্রবেশ করা যাউক; দেখা যাউক সেখানে কি ব্যাপার। সেখানে আর এক দৃশ্য; আমরা একটা প্রাকারবেষ্টিত পৌরসেনাসংরক্ষিত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; পৌরবর্গ এখানে নিজে নিজেই কর বসাইতেছে, শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেছে, বিচার করিতেছে, দণ্ড দিতেছে, এবং পৌরব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য সভাসংসদে সম্মিলিত হইতেছে। এই সকল সম্মিলনীতে সকলেই আসিতেছে; তাহারা স্বাধীনভাবেই ভূস্বামীপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; এবং তাহাদের একটা পৌরসেনা আছে। এক কথায় তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসন করিতেছে, পুরীর এলাকার মধ্যে তাহারাই রাজশক্তি। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে যে বৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এ বৈষম্যও তদনুরূপ; কেবল অঙ্গদ্বয়ের অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। এখন পৌরজন লইয়া যে জাতীয়সমাজ সেই জাতিই সব, পুরী কিছুই নহে; পূর্ব্বে জাতীয় সমাজ ছিল নগণ্য, পুরীই ছিল সব।

নিশ্চয়ই, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক অসাধারণ ঘটনা, অনেক বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, নতুবা পৌরসমাজের অবস্থার এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত না। এই পরিবর্ত্তন সত্বেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১৭৮৯ অব্দের তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ বা "থার্ড এষ্টেট", রাজনৈতিক হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরসংঘেরই বংশধর। যে ফরাসী জাতি আজ এত উদ্ধত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যাহার দম্ভোক্তি আজ গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, যে আজ শুধু নিজকে নহে, সমগ্র জগৎকে শাসন করিতে ও নবজীবন দিতে চাহে, নিশ্চয়ই সে, সম্পূর্ণভাবে না হউক প্রধানতঃ সেই প্রাচীন পৌর-বর্গেরই সন্তান, যাঁহারা দ্বাদশ শতাব্দীতে সাহসে ভর করিয়া ভূস্বামীদিগের যথেচ্ছ শাসনের বিরুদ্ধে স্ব স্ব পুরীর স্বাতন্ত্র্যসাধনের জন্য বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছিল।

অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর সমাজের অবস্থা আলোচনা করিয়াই এই পরিবর্ত্তনের রহস্য বুঝিতে পারিব না; দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল; সেই পরবর্ত্তী যুগেই এই পরিবর্ত্তন

কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল দেখিতে পাইব। তথাপি তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের ইতিহাসে এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহা কেবল তাহার মূল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং যদিও আমাদের আলোচ্য যুগে তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের ভবিষ্যত পরিণামের কোন আভাস পাওয়া যায় না, তথাপি অন্ততঃ তাহার মূলবীজের সন্ধান পাওয়া যায়; কারণ সে মূলে যাহা ছিল, তাহার এখনকার পরিণতির মধ্যেও অনেক পরিমাণে পুনরায় তাহাই পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরসমাজের একটা অসম্পূর্ণ চিত্র হইতেও আপনারা একথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন।

এই পৌরসমাজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পুরীগুলিকে প্রধানতঃ দুই দিক দিয়া দেখা আবশ্যক। দুইটী বড় প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে:— প্রথম প্রশ্ন পুরীগুলি কিরূপে স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিল,—কিরূপে ও কি কি কারণে এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল—ইহার ফলে পৌরগণের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, সাধারণ সমাজের উপর, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপর এবং রাষ্ট্রশক্তির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ হইল? দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিল, স্বায়ত্তশাসনাধিকারপ্রাপ্ত পুরীগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন ছিল, পুরীমধ্যে পৌরগণের পরস্পরসম্বন্ধ কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং পুরীমধ্যে কিরূপ রীতিনীতি আচারব্যবহার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

একদিকে সাধারণভাবে পৌরগণের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন আসিল, অন্যদিকে তাহাদিগের পৌরশাসনপদ্ধতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিল এই উভয় দিক দিয়াই আধুনিক সভ্যতার উপর সেকালের পৌরজীবনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রভাবের আলোচনা করিতে গিয়া যে কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহার মূলে হয় একটি না হয় অপরটী আছে। অতএব এই দুইটি দিক্ পর্য্যালোচনা করিলেই সেকালের পৌরতন্ত্রের ইতিহাস আমাদের করায়ত্ত হইবে। একদিকে বুঝিতে হইবে পুরীগুলির স্বায়ত্তশাসনলাভের ইতিহাস, অন্যদিকে বুঝিতে হইবে পৌরশাসনপদ্ধতি।

পরিশেষে সমগ্র ইউরোপে পুরীগুলির কিরূপ বিভিন্ন অবস্থাবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আমি যে সমস্ত তথ্য ও ঘটনা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব সে গুলি দ্বাদশ শতাব্দীর সমস্ত পুরী সম্বন্ধে, ইটালী, স্পেন, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের যে কোন পুরী সম্বন্ধে সমানভাবে খাটিবেনা। অবশ্য কতকগুলি ব্যাপার সমস্ত পুরীর মধ্যেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রভেদও সামান্য বা নগণ্য নহে। আমি সেই সকল প্রভেদগুলি দেখাইয়া যাইব; পরবর্ত্তী যুগের সভ্যতার আলোচনাকালে আবার আমরা সেগুলির দেখা পাইব, এবং তখন আমরা আরও সূক্ষ্মভাবে সেগুলির আলোচনা করিব।

পুরীগুলির স্বায়ত্তশাসনলাভের ইতিহাস বুঝিতে হইলে আপনাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে সামাজিক বিদ্রোহের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত নগরগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল। তখন নগরগুলির মধ্যে নানারূপ অবস্থাভেদ ছিল; ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলির অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ ছিল; তথাপি এমন কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার আছে যাহা প্রায় সকলগুলির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আমি সেই সকল সাধারণ তথ্য লইয়াই বিচার করিতে চেষ্টা করিব। যেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিব, অর্থাৎ যেখানে কোন বিশেষ ব্যাপারের উল্লেখ করিব তখন বুঝিতে হইবে আমি বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের এবং আরও বিশেষ করিয়া রোণ ও লোয়ার নদীর অপরপারবর্ত্তী উত্তর ফ্রান্সের পুরীগুলি লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছি। আমি যে চিত্রপট আপনাদের সমক্ষে উন্মুক্ত করিতে চাই, তাহার মধ্যে এই শেষোক্ত পুরীগুলিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নগর্গুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থাও নহে, স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্রচিত্রণে যে বিপদ, শব্দপ্রয়োগেও পদে পদে সেইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। যখন একটা সমাজ ও তাহার ভাষা প্রাচীনত্ব লাভ করে, তখন ভাষার শব্দগুলি এক একটী সুসম্পূর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ লাভ করে। কালক্রমে এক একটি শব্দের অর্থে নানা বিচিত্র ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়, শব্দটি উচ্চারণ করিলেই সেই সমস্ত বিচিত্র ভাব মনে উদিত হয়; অথচ এই সকল বিচিত্র ভাব বিভিন্ন যুগে আসিয়া জুটিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বকালের ঘটনার পক্ষে সেগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাসত্ব ও স্বাধীনতা, এই দুইটি কথার বিচার করিয়া দেখুন। এখনকার কালে এই উভয় শব্দদ্বারা যে সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবের দ্যোতনা হয় তাহার সহিত অষ্টম বা নবম বা দশম শতাব্দীর কোন ব্যাপারের সম্পূর্ণ মিল নাই। যদি বলি যে অষ্টম শতাব্দীতে নগরগুলি স্বাধীন ছিল তাহা হইলে অনেক বেশী বলা হইল; আজকাল আমরা স্বাধীনতা শব্দের যে অর্থ বুঝি তাহার অনুরূপ কোন বস্তু অষ্টম শতাব্দীতে ছিল না। আবার যদি বলি তখনকার নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থা, তাহা হইলে সেই একই ভ্রমে নিপতিত হইব, কারণ দাসত্ব-শব্দটি দ্বারা এখন আমরা যাহা বুঝি, তাহার সহিত সে সময়ের পৌরজীবনের কোন মিল নাই।

আমি পুনরায় বলি যে সে সময়ে নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থাও নহে, স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। দুর্ব্বলকে যতপ্রকার লাঞ্ছনা দুর্দ্দশাভোগ করিতে হয় তাহারা সে সমস্তই ভোগ করিত; সবল পক্ষের অত্যাচার উৎপীড়ন তাহাদিগকে নিয়তই সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তথাপি এ সমস্ত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সত্বেও অবিরত ধনক্ষয়লোকক্ষয় সত্বেও তাহারা কতক পরিমাণে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষ

করিয়া আসিয়াছিল। অধিকাংশ নগরেই একটি করিয়া যাজকসমাজ ও একজন করিয়া বিশপ থাকিতেন। তাঁহার একদিকে যেমন অসামান্য ক্ষমতা অন্যদিকে তেমনি সাধারণ জনবৃন্দের উপর অসাধারণ প্রভাব। সুতরাং তিনি পৌরসংঘ ও ফিউড্যাল ভূস্বামীর মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্রস্বরূপ থাকিতেন, এবং এইরূপে ধর্ম্মের আবরণ দ্বারা পৌরজীবনের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিতেন ইহা ছাড়া নগরগুলির মধ্যে, প্রাচীন রোমীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষও অনেক পরিমাণে বজায় ছিল। এই যুগে প্রাচীন রোমীয় পদ্ধতি অনুসারে ঘন ঘন "সেনেট" ও "কিউরিয়া" অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ পৌরসম্মিলন এবং পৌরশাসনকর্ত্তারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় পৌরতন্ত্রের রীতি অনুসারে এই যুগের নগরগুলির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উইল, দানপত্র প্রভৃতি পৌরজীবনের অনেক ব্যাপার পৌরবিচারসভায় পৌর বিচারক কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে। এই সকল পৌরক্রিয়ার অবশেষ ক্রমশঃই অবশ্য লোপ পাইতে থাকে। বর্ব্বররীতিনীতির প্রভাব, চারিদিকের বিশৃঙ্খলা এবং উত্তরোত্তরপরিবর্দ্ধনশীল দুর্ভাগ্য-দুর্য্যোগের তাড়নায় দ্রুতবেগে লোকক্ষয় হইতে থাকে। ভূস্বামীগণ পল্লীজনপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং কৃষিজীবনই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল; এই সকল নূতন কারণে পৌরজীবনের আরও বলক্ষয় হইল। বিশপগণও যখন প্রথমে ফিউড্যাল পদ্ধতির অন্তর্গত হইলেন, তখন তাঁহারা পৌরজীবনের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করেন নাই। শেষে যখন ফিউড্যালপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল তখন পৌরসমাজগুলি একেবারে দাসসমাজে পরিণত না হইলেও তাহাদের পূর্ব্ব স্বাধীনতা একেবারে হারাইল। প্রত্যেক পুরী এক একজন ভূস্বামীর জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কবলে আসিয়া পড়িল। বর্ব্বর আক্রমণের প্রথম আমলের অশান্তিবিপ্লবের মধ্যেও তাহারা যেটুকু স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, এখন তাহারা তাহাও রাখিতে পারিল না। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দী হইতে ফিউড্যাল পদ্ধতির সম্পূর্ণপ্রতিষ্ঠাকাল পর্য্যন্ত নগরগুলি উত্তরোত্তর অবনতির পথে চলিল।

যখন একবার ফিউড্যাল পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি এই পদ্ধতির মধ্যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভূমি অধিকার করিয়া বসিল, যখন যাযাবর সমাজ স্থাবর সমাজে পরিণত হইল, তখন কিয়ৎকাল পরেই নগরগুলি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, আবার তাহাদের মধ্যে সজীবতার লক্ষণ দেখা দিল। আপনারা জানেন পৃথিবীর শস্যদায়িকা শক্তি যে নিয়মে কার্য্য করে মানুষের কর্ম্মশক্তিও সেই নিয়মেই কার্য্য করে; বিপ্লববিক্ষোভ যেই বন্ধ হয় অমনি সৃষ্টিক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; চারিদিকে অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে, চারিদিকে সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। শান্তি ও শৃঙ্খলার সামান্য আভাস পাইবামাত্র মানুষ আবার আশান্বিত হয়, আশান্বিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে

অবতরণ করে। নগরগুলির ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল; যে মুহূর্ত্তে ফিউড্যালপদ্ধতি কিঞ্চিৎ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তেই ভূস্বামীদিগের মনে নূতন নূতন অভাব জাগিয়া উঠিল, উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্ম আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এই অভাব পূরণের জন্ম তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত নগরগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎপরিমাণে শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুত্থান ঘটিল; পুনরায় ধীরে ধীরে তাঁহাদের লোকবল ও ধনবল বাড়িতে লাগিল। যে সকল কারণে এই পুনরুন্নতি সম্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে একটির প্রতি সাধারণতঃ তেমন মনোযোগ করা হয় না;— সেটি হইতেছে ঐহিক শাসনশক্তির কবল হইতে পলায়নপর ব্যক্তির পক্ষে চর্চের ক্রোড়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভের অধিকার। যখন পর্য্যন্ত পৌরসংঘ পূর্ণপ্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, যখন পর্য্যন্ত সে স্বীয় প্রাকারপরিখা ও সম্মিলিতশক্তির প্রভাবে গ্রাম্যজনপদের উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবার সামর্থ্য লাভ করে নাই, যখন পর্য্যন্ত চর্চ ভিন্ন তাহার অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয় ছিল না, তখন পর্য্যন্ত এই চর্চের আশ্রয় পাইবার জন্যই বহু দুর্ভাগ্য পলাতক নগরে আকৃষ্ট হইত। তাহারা চর্চের মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে আশ্রয় লইতে থাকিল। শুধু যে চাষামজুরের মত নিম্নশ্রেণীর লোকই এইরূপে আশ্রয় লইতে আসিত তাহা নহে, অনেক সময় ধনমর্য্যাদাসম্পন্ন সমৃদ্ধ ব্যক্তিও আসিত। এই সময়ের ইতিবৃত্তগুলি এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। দেখিবেন অনেক পরাক্রমশালী ব্যক্তি প্রবলতর প্রতিবেশী অথবা স্বয়ং ভূপতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া স্বাধিকারভুক্ত ভূখণ্ড পরিত্যাগকরতঃ, যথাসর্ব্বস্বসমেত কোন এক নগরে আসিয়া চর্চের আশ্রয় লইতেছেন এবং সেই নগরের পৌর-পদবী গ্রহণ করিতেছেন। নগরের উন্নতির উপর এইরূপ আশ্রিতবর্গের কোন প্রভাব ছিল না, ইহা আমার মনে হয় না। তাঁহারা নগরের মধ্যে ধনসম্পদ আনিলেন এবং সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোকসম্পদ আনিলেন। তাহা ছাড়া সকলেই জানেন যে একবার কোনসূত্রে একটা আংশিক সংসর্গ ঘটিলে, লোকে তখন শুধু আশ্রয়ের জন্য নহে, সামাজিকতার প্রলোভনেই এইরূপ মিলনক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়।

এই সকল কারণের একত্র সমবায়ে, ফিউড্যাল শাসনপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরই, নগরগুলি পুনরায় কিঞ্চিৎ বললাভ করিল। বললাভ করিল বটে, কিন্তু সে পরিমাণে নিরুপদ্রব শান্তি লাভ করিল না। যাযাবরবৃত্তি তখন বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই যাযাবরজীবনযাত্রার মধ্যেই বিজেতা নূতন ভূস্বামীগণ নিজ নিজ দুর্দ্দাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইতেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত তখন তাঁহারা দূরদেশ লক্ষ্য করিয়া বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যখন সকলেই তাঁহারা স্ব স্ব ভূখণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, যখন এই পরিভ্রমণলিপ্সা বর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল, তখনও তাঁহাদের লোভ, তাঁহাদের অসীম আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের দুর্দ্দম প্রবৃত্তি কিছুই প্রশমিত হইল না। সুতরাং তাঁহাদের প্রবৃত্তির সমস্ত আক্রোশ পড়িল নিকটস্থ নগরগুলির উপর

লুণ্ঠনের জন্ত দূরদেশে না যাইয়া তাঁহারা ঘরে বসিয়াই লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। ভূস্বামী অভিজাতবর্গ কর্তৃক পৌরবর্গের অর্থশোষণ ব্যাপার দশমশতাব্দীর আদি হইতেই দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইল। যখনই কোন ভূস্বামীর অর্থলিপ্সা জাগিয়া উঠিত তখনই তিনি স্বীয় অধিকারভুক্ত নগরের পৌরজনের উপর অত্যাচার করিয়াই তাহা চরিতার্থ করিতেন। পদে পদে এই অত্যাচার উপদ্রবের আশঙ্কা বাণিজ্যের পক্ষে যে একেবারে প্রাণঘাতী এই কথা লইয়া এই যুগেই পৌরবর্গের মধ্য হইতে ঘন ঘন অভিযোগ উঠিতে লাগিল। বণিকগণ বাণিজ্যযাত্রা হইতে ফিরিবার সময় শান্তিতে স্বপুরী প্রবেশ করিতে পারিত না; ভূস্বামী ও তাহার অনুচরবৃন্দ অনবরত পথঘাট আগলাইয়া তাহাদিগকে বাধা দিত। যে সময়ে শিল্প বাণিজ্যের পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই শান্তি শৃঙ্খলার একেবারেই অভাব ছিল। নিজের কার্য্যে এইরূপ পদে পদে বাধা পাইলে এবং প্রত্যাশিত শ্রমফল হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইলে মানুষ যেরূপ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয় সেরূপ আর কিছুতে নহে। জীবনযাত্রা যখন একঘেয়েভাবে একটা বাঁধা পথে চলিতে থাকে, তখন যদি কেহ উপদ্রব করে, যখন পিতৃপিতামহাগত সম্পত্তিই দুর্বৃত্তে লুণ্ঠন করিয়া লয়, নিজের উপার্জ্জনের ধন নহে, তখন মানুষ বিরক্ত ও কুপিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী কুপিত হয় পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে। কোন ব্যক্তি বা লোকসমষ্টি যখন উন্নতির পথে সমৃদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে তখন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রবল বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে যেমন আর কোনও অবস্থায় হয় না।

এই ছিল তাহা হইলে দশম শতাব্দীতে নগরগুলির অবস্থা;—তাহাদের শক্তি বাড়িয়াছিল, মর্য্যাদা বাড়িয়াছিল, অর্থ বাড়িয়াছিল—সুতরাং প্রাণপণে রক্ষা করিবার মত বস্তু তাহাদের অনেক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও তাহাদের এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; কারণ এই বলবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি দেখিয়াই ভূস্বামীগণের মনে হিংসার সঞ্চার হইল। বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যও তাহাদের যে পরিমাণে বাড়িতে থাকিল, বিপদও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিল। তাহা ছাড়া, যাহারা একবার ফিউড্যাল ভূস্বামীতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহারা পদে পদে প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত, বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছে; এ পদ্ধতি কখনও এমন একটা দৃঢ়বদ্ধ শাসনতন্ত্রের আকারে দেখা দেয় নাই যাহা অনন্যাপেক্ষীভাবে কেবল নিজের শক্তিতে সকলকে শাসন ও দমন করিতে পারে। বরং ব্যক্তি-মানবের স্বাধীন ইচ্ছা কেবলই শাসনতন্ত্রকে উপেক্ষা করিতেছে, ইহার বশ্যতাস্বীকার করিতেছে না, এই দৃশ্যই ফিউড্যাল পদ্ধতির ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়। নিম্নতন ভূস্বামীর সহিত ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর সম্বন্ধ এইরূপই ছিল। সুতরাং নগরগুলি ভূস্বামীদিগের উপদ্রব অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যখন তাহাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের সম্মুখে বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল

ছিল না। ফিউড্যালপদ্ধতি মানবজাতির একটা মহৎ উপকার করিয়াছে; সে অনবরত ব্যক্তিমানবের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপূর্ণ বিকাশ শিখাইয়াছে। এ শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই। পৌরসমাজের দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও, ভূস্বামীগণের সহিত তাহাদের বিস্তর অবস্থাবৈষম্য সত্ত্বেও, নগরগুলি চারিদিকে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল।

এ ঘটনার যথাযথভাবে সময় নির্দ্দেশ করা কঠিন। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে পৌরবর্গের স্বাধীনতালাভ একাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়; কিন্তু সমস্ত বড় বড় ব্যাপারের মধ্যেই দেখা যায় যে কত অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যর্থ চেষ্টার পরে তবে একটা চেষ্টা ফলবতী হয়। সমস্ত ব্যাপারেই বিধাতা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কত সাহস, কত সদ্‌গুণ কত আত্মত্যাগ, কত মানবজীবন অকুণ্ঠভাবে প্রয়োগ করিয়া যান; এবং এইরূপ অগণিত চেষ্টার পর, বহু মহাপ্রাণ পুরুষের হতাশ আত্মবলিদানের পর, তবেই কেবল বিধাতার সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয়। সাধারণ পৌরসমাজের পক্ষেও নিশ্চয় এই রূপই ঘটিয়াছিল। নিশ্চয়ই অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে অনেকবার বিদ্রোহের চেষ্টা হইয়াছিল, স্বাধীনতার দিকে অনেকবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে সব চেষ্টা যে শুধু ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা নহে, সেই সব ব্যর্থ চেষ্টার গৌরবহীন স্মৃতি লোকমনে একটা নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। তথাপি ইহা সত্য যে পরবর্ত্তী ঘটনার উপর এই সকল চেষ্টার প্রভাব একেবারে উপেক্ষনীয় নহে; এই সকল চেষ্টাদ্বারাই স্বাধীনতার ভাব পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, এবং একাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমি ইচ্ছা করিয়াই "বিদ্রোহ" শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। একাদশ শতাব্দীতে সাধারণ পৌরবৃন্দের স্বাধীনতালাভ বাস্তবিকপক্ষে একটা বিদ্রোহের ফল। এই বিদ্রোহে পৌরবর্গ ভূস্বামীবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রথম প্রায়ই দেখা যায় পৌরগণ হাতের কাছে যে যে অস্ত্র পাইয়াছে তাহাই লইয়া বিদ্রোহ করিয়া উঠিল এবং ভূস্বামীর যে সমস্ত অনুচর কোন একটা অন্যায় কর বা বলি আদায় করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বিতাড়িত ~~করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বিতাড়িত~~ করিয়া দিল; হয়ত ভূস্বামীর দুর্গাবাসহ আক্রমণ করিয়া বসল। এ বিদ্রোহের সমস্ত যুদ্ধেরই এই প্রণালী। বিদ্রোহ যদি ব্যর্থ হয়, তখন বিজেতা কি করেন? পৌরগণ পুরীর ও স্ব স্ব গৃহের চতুষ্পার্শে যে সমস্ত দুর্গ, প্রাকারাদি তুলিয়াছে তিনি সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। পৌরগণের সমষ্টিবন্ধনকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরস্পর সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক নাগরিক সর্ব্বপ্রথম নিজ নিজ গৃহ প্রাকারাদিদ্বারা দৃঢ়সংরক্ষিত করিতেন। কতকগুলি পুরী এখনকার কালে একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত হইলেও সে সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া

অক্লান্ত উদ্যমের সহিত ভূস্বামীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। নিবের্ণোয়া-র অন্তঃপাতী বেজেলে-নামক ক্ষুদ্র নগরী ইহার একটি দৃষ্টান্ত। বেজেলের মোহন্ত-ভূস্বামীই জয়লাভ করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে পৌরগণের গৃহ-প্রাকারগুলি ভূমিসাৎ করা হউক। যাঁহাদের প্রাকার-সংরক্ষিত আবাসবাটী এইরূপে বিধ্বস্ত হইল তাঁহাদের অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায়।

এখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আবাসভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাউক; তাহাদের গঠনপ্রণালীই বা কিরূপ, এবং তাহা হইতে তাঁহাদের জীবনযাত্রার ধরণ সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায় দেখা যাউক। দেখিবেন এখানেও সমস্তই সামরিক জীবনযাত্রার উপযোগী, চারিদিকেই সংগ্রামের আয়োজন।

যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর বাসবাটির গঠন কতকটা এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়: সাধারণতঃ বাটিগুলি ত্রিতল হইত, প্রত্যেক তলে একটি করিয়া ঘর; নিম্নতলের ঘরটি সাধারণ ব্যবহারের ঘর, এখানে সমস্ত পরিবার একত্র ভোজন করিত; দ্বিতলের ঘরটি নিরাপদ করিবার জন্য অনেক উর্দ্ধে নির্ম্মাণ করা হইত, বাটীর গঠনের ইহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ। এই দ্বিতল গৃহেই নাগরিক সস্ত্রীক বাস করিতেন। বাড়ীর একপার্শে প্রায়ই একটি চতুষ্কোণ বুরুজ নির্ম্মিত হইত; ইহাও সামরিক জীবনের পরিচায়ক, আত্মরক্ষাই উহার উদ্দেশ্য। ত্রিতলের ঘরটি কি ভাবে ব্যবহার হইত তাহা ঠিক জানা যায় না, সম্ভবতঃ বালকবালিকা ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি এই ঘরে থাকিত। সর্ব্বোপরি একটি ক্ষুদ্র চত্বর থাকিত, ইহা নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বাটীর সমগ্র গঠনপ্রণালীর মধ্যে সামরিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে আন্দোলনের ফলে পৌরসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহাকে সামরিক আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

সংগ্রাম কিছু দিন পর্য্যন্ত চলিলে পর, উভয় পক্ষ যেই হউক না কেন, এক সময়ে শান্তি আসিবেই। পৌরসমাজ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে যে সন্ধিপত্র দ্বারা শান্তি সংস্থাপিত হইত, তাহারই নাম হইল চার্টার (Charter) বা অধিকারপত্র। পৌরঅধিকারপত্রগুলি পৌরবর্গ ও ভূস্বামীর মধ্যে সন্ধিপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এ বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছিল। দেশের সমস্ত পৌরসমাজ সম্মিলিত হইয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহা নহে। তবে সাধারণ পৌরবর্গের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্র একইরূপ ছিল, সকলের একইরূপ বিপদ, একইরূপ অত্যাচারে সকলে প্রপীড়িত হইতেছিল। প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষাকল্পে সকলে একইরূপ উপায় সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং প্রায় একই সময়ে সকলে এই সকল উপায় প্রয়োগ করিয়াছিল। দৃষ্টান্তের দ্বারাও কতকটা ফল ফলিয়া থাকিতে পারে, দুই একটি পুরীর কৃতকার্য্যতায় অন্যান্য সকলে উৎসাহিত হইয়া থাকিতে

পারে। কখনও কখনও অধিকারপত্রগুলিও একই আদর্শে রচিত দেখা যায়; যথা নোয়াইয়োঁ-পুরীর অধিকার পত্রের আদর্শে বোবে, সঁ্যা কিঁত্যা প্রভৃতি নগরের অধিকারপত্র রচিত। তথাপি দৃষ্টান্তের প্রভাব যতখানি কাজ করিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয় বাস্তবিকপক্ষে ততখানি করে নাই। তখন দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমনাগমন অত্যন্ত কঠিন ও বিরল ছিল, এবং লোকশ্রুতি কেবল অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্টভাবে মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া আসিত আবার মিলাইয়া যাইত; আমার মনে হয় এই বিদ্রোহের ব্যাপকতার কারণ অবস্থাসাদৃশ্য এবং একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যাপক আন্দোলন। প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ইহাকে ব্যাপক আন্দোলন বলিতেছি; ইহার পশ্চাৎ একটা সম্মিলিত চেষ্টা কিম্বা পরামর্শ কিছুই ছিল না; এ আন্দোলনের সমস্ত ঘটনাই বিশেষ বিশেষ স্থানকালে আবদ্ধ; প্রত্যেক পুরী নিজেরই স্বার্থরক্ষার জন্য নিজ নিজ ভূস্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে; এবং এ বিদ্রোহের সমস্ত ব্যাপার সেই সেই পুরীর সন্নিধিতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই সংঘর্ষের মধ্যে অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শুধু যে বিজয়লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া কখনও এপক্ষ কখনও অপর পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন তাহা নহে; যখন শান্তিস্থাপন হইয়া গেল বলিয়া মনে করা গেল, উভয় পক্ষ যখন অধিকারপত্র শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, তখনও আবার সর্ব্ববিধ উপায়ে ইহার সর্ত্ত অমান্য করিবার ও ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই সংঘর্ষের নানা ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্যে ভূপতিবৃন্দের প্রভাব নিতান্ত সামান্য ছিল না। পরে যখন রাজতন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিব তখন একথা বিস্তার করিয়া বলিব। পৌরসমাজের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে ভূপতিগণের সহায়তা সম্বন্ধে অনেকে বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়াছেন; অনেকে আবার এ সহায়তার যথাযথ মূল্য দিতেও প্রস্তুত নহেন; আবার কেহ কেহ ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। আমি এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিব যে রাজশক্তি এই সংঘর্ষে অনেকবার হস্তক্ষেপ করিয়াছে, কখনও বা পৌরবর্গের নিমন্ত্রণে, কখনও বা ভূস্বামীদিগের নিমন্ত্রণে; অনেক সময়ে সে ক্রমান্বয়ে পরস্পরবিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে; কখনও এক নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছে, কখনও অন্য নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছে; সে নিয়তই উদ্দেশ্য, সংকল্প ও আচরণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু মোটের উপর একথা বলিব যে সে অনেক কাজ করিয়াছে, এবং তাহার কার্য্যের কুফল অপেক্ষা সুফলই অধিক।

এই সমস্ত ভাগ্যপরিবর্ত্তনসত্ত্বেও, ঘন ঘন অধিকারপত্রের সর্ত্তভঙ্গসত্ত্বেও, দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসংঘগুলির স্বাতন্ত্র্যসাধন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সমগ্র ইউরোপ, এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্স, এক শতাব্দী ধরিয়া বিদ্রোহবিপ্লবে আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহার স্থানে সর্ব্বত্রই দেখা দিল কতকগুলি চার্টার বা অধিকারপত্র; কোনটির বা সর্ত্ত কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে

পৌরস্বাতন্ত্র্যের অনুকূল, কোনটির বা কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণে। পৌরসংঘগুলি অল্পাধিক-পরিমাণে নির্বিরোধে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। পৌরস্বাতন্ত্র্য এখন একটা বাস্তবব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইল, পৌরাধিকার এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

এই বৃহদ্ব্যাপারের অব্যবহিত ফল কি হইল এবং ইহার ফলে সাধারণ সমাজের মধ্যে পৌরবর্গের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইল এখন তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, অন্ততঃ প্রারম্ভকালে এ ব্যাপারের দরুণ দেশের সাধারণ শাসনতন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির সহিত পৌরবর্গের সম্বন্ধ কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না; তাহারা পূর্ব্বেও রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে যেরূপ হস্তক্ষেপ করিত না, পরেও সেইরূপ। তাহাদের যাহা কিছু কারবার সমস্তই স্থানীয় নিজ নিজ ভূস্বামীর এলাকার মধ্যে আবদ্ধ। তবে এক বিষয়ে একথাটা খাটে না; পৌরবর্গের সহিত রাজগণের একটা সম্বন্ধস্থাপনের সূত্রপাত হইল। কখনও কখনও পৌরগণ ভূস্বামীর বিরুদ্ধে রাজার সহায়তা আমন্ত্রণ করিত; কখনও বা ভূস্বামী যখন একটা অধিকারপত্র অঙ্গীকার করিতেছেন, পৌরগণ তখন রাজার নিকট হইতে সেটি যাহাতে সুরক্ষিত হয় এই মর্ম্মে একটা প্রতিশ্রুতি লইতেন। কোন সময়ে আবার ভূস্বামীই পৌরবর্গের সহিত বিবাদে রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে নানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক পক্ষ বা অন্যপক্ষের আহ্বানে রাজা এই বিবাদে অনেকবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; ইহার ফলে পৌরবর্গের সহিত রাজার প্রায়ই একটা না একটা সম্বন্ধ এবং অনেক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। এই সম্বন্ধের দ্বারাই পৌরগণ রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিল এবং সাধারণ শাসনতন্ত্রের সহিত তাহাদের একটা সংযোগ ঘটিল।

এক একটি পৌরসমাজ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও এই স্বাতন্ত্র্যলাভের ফলে একটা নূতন ব্যাপক জনশ্রেণী সৃষ্ট হইল। বিভিন্ন পুরীর পৌরবর্গ মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ সমাজ বন্ধন করে নাই সত্য, কিন্তু সমস্ত দেশ এমন একদল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল যাহাদের অবস্থা এক, স্বার্থ এক, রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী এক। এই সমস্ত লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঐক্যবন্ধন ঘটিয়া বুর্জ্জোয়াসী (Bourgeoisie) বা পৌরসমাজ নামে একটা ব্যাপক সমাজ যে গড়িয়া উঠিবে ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। পৌরবর্গের স্থানীয়পৌরস্বাতন্ত্র্যলাভের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল পৌরসমাজ বলিয়া একটা বৃহৎ সামাজিক শ্রেণীর গঠন।

একথা মনে করিবেন না যে এই পৌরসমাজ এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে সেই সময়েও তাহাই ছিল। ইহার অবস্থাই যে শুধু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে, যে উপাদান লইয়া ইহা গঠিত সেই উপাদানই তখন বিভিন্ন ছিল; দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসমাজ কেবল বণিক কিম্বা নগরবাসী সামান্য ভূস্বামী ও গৃহস্বামী লইয়া গঠিত ছিল। তিন শতাব্দী পরে পৌরসমাজের মধ্যে উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত উকীল, বৈদ্য, নানা শ্রেণীর পণ্ডিত, এবং স্থানীয় শাসনকর্তৃগণ অন্তর্ভুক্ত হইলেন। পৌরসমাজ

ক্রমে ক্রমে নানা বিভিন্ন উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পৌরসমাজের ইতিহাসে ইহার এই ক্রমপরম্পরা বা উপাদানবৈচিত্র্যের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যেখানেই পৌরসমাজের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই খানেই যেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সব সময়ে একই উপাদানে ইহা গঠিত। এ ধারণা কিন্তু একবারে অযৌক্তিক। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহার যে এই গঠনবৈচিত্র্য তাহার মধ্যেই বোধ হয় ইহার ভাগ্যবিবর্ত্তনের রহস্য পাওয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত পৌরসমাজে রাজপুরুষ বা সাহিত্যিকবর্গ প্রবেশলাভ করে নাই, ষোড়শ শতাব্দীতে এ সমাজ যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল যতদিন পর্য্যন্ত সে রূপান্তর ঘটে নাই, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রমধ্যে এ সমাজ সেরূপ গণ্যতাও লাভ করে নাই, সেরূপ প্রকৃতিও লাভ করে নাই। ইহার ভাগ্যবিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝিতে হইলে ইহার ক্রোড়ের মধ্যে কেমন করিয়া নূতন নূতন ব্যবসায়, পদমর্য্যাদাসম্পন্ন নূতন নূতন নৈতিক শক্তি, এবং একটা নূতন চিন্তারাজ্য গড়িয়া উঠিল তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমি পুনরায় বলি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল কতগুলি সামান্য বণিক যাহারা বাহিরে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া নগরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করিত; এবং কতকগুলি গৃহস্বামী ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী যাহারা পল্লী ছাড়িয়া নগরে আসিয়া বাস করিত। এই হইল ইউরোপীয় পৌরসমাজের প্রথম উপাদান।

পৌরসমাজের স্বাতন্ত্র্যলাভের তৃতীয় পরিণাম হইতেছে বিভিন্ন জনশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের কাহিনীতে আধুনিক ইতিহাস পরিপূর্ণ। সমাজভুক্ত বিভিন্ন জনশ্রেণীর সংঘর্ষ হইতেই আধুনিক ইউরোপের উৎপত্তি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যত্র এই সংঘর্ষের ফল অন্যরূপ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এসিয়াতে একশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া অন্যান্য শ্রেণীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, শ্রেণী সেখানে জাতিতে পরিণত হইয়াছে, এবং সমাজ সেখানে জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহে ইউরোপে এরূপ কিছুই ঘটে নাই। কোন এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে পরাজয় করিয়া বশ্যতা গ্রহণ করাইতে পারে নাই। এখানে সংঘর্ষের ফলে জড়ত্ব না ঘটিয়া উন্নতিই ঘটিয়াছে। প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পরসম্বন্ধ, তাহারা যে প্রয়োজনের তাড়নায় কখনও বা সংগ্রাম করিতে কখনও বা পরাজয়স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের রুচি, লক্ষ্য ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য; তাহাদের প্রত্যেকেরই একাধিপত্য লাভের বাসনা অথচ বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে ক্ষমতাভাব;—এই সমস্ত কারণের একত্র সমবায়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণী কেবলই পরস্পর সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়াছে; অবস্থাভেদ, লক্ষ্যভেদ এবং রীতিনীতিভেদের দরুণ তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে; এবং তৎসত্ত্বেও তাহারা ক্রমশঃই

পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরিশেষে আদানপ্রদানও ঘটিয়াছে। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতির ক্রোড়ে ক্রমশঃ একটা সার্ব্বজনীনভাবের উৎপত্তির বিকাশ ঘটিয়াছে, জাতীয় জীবনে সমস্ত বিরোধবৈচিত্র্যের ঊর্দ্ধে ধ্যান-ধারণা-ভাবনার একটা সমতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট নৈতিক পার্থক্য ছিল; তথাপি মিশ্রণ ক্রিয়া অগ্রসর হইতেছিল; ইহা নিঃসন্দেহ যে তখন বাস্তবিকপক্ষে ফরাসীজাতি বলিয়া একটা বস্তু দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; এই জাতীয় সত্ত্বা কোন একটা বিশেষ শ্রেণী লইয়া গঠিত নহে; সমস্ত সামাজিক শ্রেণীই ইহার অন্তর্ভুক্ত; ইহার মধ্যে সকলেই একটা সার্ব্বজনীনভাবে অনুপ্রাণিত, এবং সামাজিক জীবনে এই ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত। এই ভাবের নাম স্বাজাত্যবোধ। এইরূপে বৈচিত্র্য, বিদ্বেষ ও সংগ্রামের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপে জাতীয় ঐক্যের জন্ম হইল। এই জাতীয় ঐক্যই এখন ইউরোপীয় জীবনের বিশিষ্ট ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম ক্রমশঃই পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হইয়া চলিতেছে, দিনে দিনে অধিকতর ঔজ্জ্বল্যলাভ করিতেছে।

আমরা যে সমাজবিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়াছি এইগুলিই হইল তাহার বাহ্য সামাজিক পরিণাম। এখন ইহার নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেখা যাউক পৌরগণের অন্তর্জীবনে ইহার ফলে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল; নূতন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের নৈতিকজীবন কিভাবে রূপান্তরিত হইল।

শুধু দ্বাদশ শতাব্দীতে নহে, পরবর্ত্তী কালেও দেশের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্র ও দেশের সাধারণ স্বার্থের সহিত পৌরবর্গের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া একটা বিষয় বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে হইতেছে দেশের সাধারণশাসনতন্ত্র সম্পর্কে পৌরবর্গের অসাধারণ ভীরুতা, সঙ্কোচ ও বিনয়নম্রতা। এক্ষেত্রে তাহারা অল্পেতেই অতি সহজে সন্তুষ্ট। এক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক ভাবের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হইলেই মানুষ প্রভাব খাটাইতে চায়, সংস্কার সাধন করিতে চায়, শাসনাধিকার লাভ করিতে চায়। এসময়ের পৌরবর্গের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও সাহস দেখা যায় না, মহৎ আকাঙ্খারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল দুই কারণে মহৎ আকাঙ্খা বা স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হইতে পারে। হয় নিজের পদমর্য্যাদা ও পরাক্রম সম্বন্ধে বেশ একটা বড় রকম ধারণা থাকা চাই, বহুজনপদের বহুলোকের ভাগ্যাভাগ্য আমার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে এইরূপ বোধ থাকা চাই—না হয় ব্যক্তিগতভাবে নিজের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অন্তরের মধ্যে অনুভব করা চাই, আমি যে কোনরূপে কাহারও অধীন নই, আমার ভাগ্যনিয়তি আমার নিজের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর

নির্ভর করে না এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই। এই দুই অবস্থা হইতেই কেবল মহৎ আকাঙ্খার উদ্ভব হইতে পারে, স্বাধীন চিন্তার সাহস আসিতে পারে, বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার ও বড় বড় কার্য্যফল লাভ করিবার স্পৃহা জন্মিতে পারে।

মধ্যযুগের পৌরবর্গের জীবনে এই দুই অবস্থার কোনটিই মিলে না। আপনারা এই মাত্র দেখিলেন যে পৌরগণের যে স্বমর্য্যাদাবোধ তাহা কেবল পুরীর প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ ; পুরীর বাহিরে বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। এদিকে আবার তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবও অধিক পরিমানে থাকা সম্ভব ছিল না। বৃথাই তাহারা ভূস্বামীদিগকে পরাজিত করিল, বৃথাই তাহারা অধিকারপত্র আদায় করিল। নগরবাসী নাগরিক নিকটবর্ত্তী যে কোন সামান্য ভূস্বামীর সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্বই অনুভব করিত। ভূস্বামীর মন যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে সঞ্জীবিত, তাহা একজন সামান্য নাগরিকের মনে পরিস্ফুটিত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। যে পৌরস্বাতন্ত্র্যের সে অংশ-ভাগী তাহা তাহার নিজের একস্ব নহে, অন্যান্য পৌরগণের সহিত একত্র মিলিয়া সে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, সকলের সহিত মিলিত হইয়া তবে সে স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে। এই সহায়তা তাহার ইচ্ছায়ত্ত নহে, নানারূপে নিজের ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করিয়া তবে এ সহায়তা লাভ করা যায়। এই কারণেই শুধু দ্বাদশ শতাব্দীর নহে, পরবর্ত্তী কালেরও পৌরগণের মধ্যে এতটা সংযমসঙ্কোচ, এতটা সাহসাভাব, এই জন্যই যেখানে তাহাদের আচরণে দৃঢ়তা দেখা যায় সেখানেও ভাষার বিনয়নম্রতা। কোন বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের একেবারে প্রবৃত্তি ছিল না ; এবং যখন অদৃষ্টের প্রেরণায় তাহাদিগকে এইরূপ কোন ব্যাপারে বাধ্য হইয়া লিপ্ত হইতে হইত, তাহারা তখন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত ও অশান্তি বোধ করিত। দায়িত্বের ভার তাহাদিগের পক্ষে এক বিষম ঝঞ্চাট হইত. তাহারা যেন স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ বোধ করিত এবং যথাশীঘ্র পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহিত। এইজন্য তাহারা সামঞ্জস্য করিয়া যথাসম্ভব দাবী কমাইয়া সন্ধিবন্ধন করিত। এই জন্যই ইউরোপীয় ইতিহাসে, বিশেষতঃ ফ্রান্সের ইতিহাসে যে পৌর-সমাজ অন্যপক্ষের হস্তে শ্রদ্ধা পাইয়াছে, বিচারবিবেচনা পাইয়াছে, তোষামদ পাইয়াছে, এমন কি সম্মানও পাইয়াছে, কিন্তু কখনও কেহ তাহাকে ভয় করে নাই। সে যে একটা বিরাট শক্তির আধার, রাজনৈতিক শক্তির এক বিপুল ভাণ্ডার, এ ধারণা সে কখনও জন্মাইতে পারে নাই। আধুনিক পৌরসমাজের এই দৌর্ব্বল্যে বিস্মিত হই-বার কিছুই নাই। এই দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ ইহার উৎপত্তি ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাসেই নিহিত। লোকসাধারণের মনে উচ্চাকাঙ্খার সমুদ্গম, ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিবার ক্ষমতা, মানুষ বলিয়াই মানুষের

যে একটা গৌরব তাহা অনুভব করিবার শক্তি, মানুষের আত্মশক্তিবোধ—এ সমস্ত ভাব ও বৃত্তি ইউরোপে একেবারে আধুনিক ব্যাপার, সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার ফল। যে সমুজ্জ্বল বিশ্বজনীনতার আদর্শ আধুনিক সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং যাহার প্রভাবে দেশের শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতামত এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা হইতেই এগুলির উৎপত্তি।

এদিকে আবার সেকালের পৌরগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়া যে পরিমাণ উদ্যম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যগুণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহাদের সঙ্কল্পসাধনের পথে বাধাবিপত্তি এত ছিল যে তাহা অতিক্রম করিতে তাঁহাদিগকে অভূতপূর্ব্ব সাহস দেখাইতে হইয়াছে। আজকাল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পৌরজীবন সম্বন্ধে একটা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রসারলাভ করিয়াছে। আপনারা স্যার ওয়াল্টার স্কটের কোয়েন্টিন ডরোয়ার্ড নামক উপন্যাসে লীজ নগরীর পৌরপ্রধানের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন; সেখানে তাহাকে রীতিমত একটি প্রহসনের নাগরিক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে—সে স্থূলকায়, আরামপ্রিয়, না আছে তাহার অভিজ্ঞতা না আছে সাহস, কেবল বিনা আয়াসে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাইবার জন্যই সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে সময়ে পৌরপ্রধানদের চেহারা অন্যরূপ; তাঁহাদের বক্ষ সদাই লৌহবর্ম্মে আবৃত, হস্তে টাঙ্গি; তাঁহাদের জীবন যেমন ঝটিকাসঙ্কুল, তেমনি শৌর্য্যপরায়ণ; যে ভূস্বামীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিতেন তাঁহাদের মতই তাঁহারা শক্ত সমর্থ। এই সকল বিপদজালের মধ্যেই, বাস্তব জীবনের নানা বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই তাঁহারা এই পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন; আধুনিক কালের শান্তিময় জীবনযাত্রায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পৌরস্বাতন্ত্র্যের এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পরিণাম কোনটিই দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে নাই; পরবর্ত্তী শতাব্দীতেই ইহারা পুষ্টভাবে দেখা দেয়। এ পরিণতির বীজ কিন্তু পুরীগুলির মৌলিক অবস্থান এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। এই জন্যই আমি দুইটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। এখন দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরজীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাউক; দেখা যাউক পুরীর শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, পৌরগণের পরস্পরসম্বন্ধ কোন্ কোন্ নীতি ও তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

আপনারা স্মরণ করিবেন যে রোমীয় সাম্রাজ্য আধুনিক জগৎকে যে পৌরপদ্ধতি দান করিয়া গিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে রোমীয় সাম্রাজ্য মূলতঃ কতকগুলি পূর্ণরাজশক্তিসম্পন্ন পৌরসংঘের এক বৃহৎ সমষ্টি।

প্রত্যেক পুরীর মূলতঃ রোমের মতই স্বতন্ত্র সত্বা ছিল ; তাহারা এক সময়ে এক একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল ; তাহারা যুদ্ধ করিত, সন্ধি করিত এবং নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধি অনুসারে নিজেদের শাসনকার্য্য নিজেই চালাইত। যে পরিমাণে তাহারা রোমীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদের রাজাধিকার, সন্ধিবিগ্রহ করিবার অধিকার, বিধি প্রণয়ন ও কর স্থাপনের অধিকার রোমের হাতে আসিয়া পড়িল। তখন কেবল রোমই একমাত্র রাজস্বাধিকারসম্পন্ন পুরী রহিল ; এবং অন্যান্য পৌরসংঘগুলি রাজশক্তি হারাইয়া রোমের শাসনভুক্ত প্রজাসঙ্ঘে পরিণত হইল। পৌরব্যবস্থার এইরূপে প্রকৃতিপরিবর্ত্তন ঘটিল। পৌরপদ্ধতি এখন আর স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র রহিল না, কেন্দ্রশক্তির অধীন একটা শাসনপ্রণালীমাত্রে পরিণত হইল।

রোম সাম্রাজ্যের শাসনে এই একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। পৌরপদ্ধতি শাসনপ্রণালীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কেবল স্থানীয় ব্যাপার ও পৌরস্বার্থের শাসনসংরক্ষণের ভার পাইল। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে পুরী ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির এই অবস্থা ছিল। বর্ব্বরযুগের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, সমস্ত বস্তু, সমস্ত তত্বই লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল ; পূর্ণরাজশক্তি ও খণ্ডশাসনাধিকারের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেদিকে আর কেহ লক্ষ্য করিল না। প্রয়োজনের তাড়নায় সমস্ত ব্যাপার স্থানকালপাত্রভেদে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। অবস্থা বা ঘটনানুসারে প্রত্যেক স্থানে কোথাও বা একটা রাজশক্তি কোথাও বা একজন শাসনকর্ত্তার আবির্ভাব হইল। নগরগুলি যখন কতকটা স্থিরতা আনিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিজহস্তে রাজশক্তি আরোপ করিল। তাহারা যে পৌরসেনাগঠন, যুদ্ধের জন্য করস্থাপন এবং শাসনকর্ত্তানিয়োগের অধিকার গ্রহণ করিল, তাহা কোন রাজনৈতিক তত্ব অনুসরণ করিবার জন্য বা আত্মমর্য্যাদাবোধ চরিতার্থ করিবার জন্য করে নাই, ভূস্বামীদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার উপায় সংগ্রহের জন্যই করিয়াছিল। পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনে অধিকারস্থাপন আত্মরক্ষারই উপায়স্বরূপ ছিল। এইরূপে পৌরতন্ত্রের যে রাজক্ষমতা রোমের দিগ্বিজয়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। নগরগুলি আবার স্বরাট্ হইয়া উঠিল। পৌরসমাজের স্বাতন্ত্র্য লাভের ইহাই হইল রাজনৈতিক সার্থকতা।

[illegible] প্রধান হয় না। যে এই রাজশক্তি পরিপূর্ণ রাজশক্তি। পৌরব্যাপারে বাহিরের রাজশক্তির অধিকার কখনই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই ; বরাবরই তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও ভূস্বামী পৌরশাসকবর্গের সহযোগিতায় বিচারাদি করিবার জন্য নগরে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা পাঠাইবার অধিকার রাখিয়া দিতেন ; কখনও বা তিনি কিছু রাজস্ব আদায় করিবার

অধিকার রাখিতেন ; কোন স্থানে বা তিনি একটা কর আদায় করিতেন। কখনও বা রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ দেশের রাজা পৌরসমাজের উপর বাহির হইতে রাজশক্তি পরিচালন করিতেন।

পৌরসংঘগুলিও ফিউড্যাল পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে ; তাহাদেরও প্রজা ছিল এবং তৎসম্পর্কে তাহারা ভূস্বামী ; এই অধিকারের বলে ভূস্বামীর যে সমস্ত রাজ-শক্তি তাহারাও কতক পরিমাণে তাহার অংশভাগী ছিল। এই কারণে তাঁহাদের ফিউড্যাল অধিকার এবং বিদ্রোহলব্ধ নূতন অধিকার এই উভয়বিধ অধিকার মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গেল ; ফলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার দ্বিগুণীকৃত হইল।

এ বিষয়ে যৎসামান্য প্রমাণ যাহা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে অন্ততঃ প্রাচীনকালে পৌরশাসনপদ্ধতি কিরূপে পরিচালিত হইত তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। নগরের অধিবাসীসমষ্টি লইয়া পৌরসম্মিলনী গঠিত হইত। যে কেহ পৌরশপথ গ্রহণ করিয়াছে (পুরীপ্রাচীরের মধ্যে যে কেহ বাস করে সকলকেই এই শপথ গ্রহণ করিতে হইত) সকলে ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সাধারণ পৌরসম্মিলনীতে আহূত হইত। সেইখানেই তাহারা পৌরশাসন-কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিত। শাসনকর্ত্তৃনিয়োগ হইয়া গেলে সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত, এবং তখন হইতে শাসনকর্ত্তারাই প্রায় একক, কতকটা যথেচ্ছভাবে শাসন কার্য্য চালাইত। আবার একটা নূতন নির্ব্বাচন বা সাধারণ লোকের দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যতীত তাঁহাদিগকে দমন করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

এখন দেখিলেন যে পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা মোট দুইটি সরল উপাদানে গঠিত ; অধিবাসীবর্গের সাধারণ সম্মিলনী, এবং যথেচ্ছশাসনাধিকারসম্পন্ন শাসনতন্ত্র, যাহা দাঙ্গাবিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত নহে। তখনকার সমাজের যেরূপ রীতিনীতি ও শিক্ষাদীক্ষা তাহাতে একটা স্থায়ী সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা গঠন করা অসম্ভব ছিল। নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই এরূপ অশিক্ষিত, পশুপ্রকৃতি ও ক্রূরমতি ছিল যে তাহাদিগকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। পূর্ব্বে যেমন ভূস্বামীবর্গের সম্পর্কে পৌরবর্গের জীবনে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না, অল্পকাল পরে পুরীর অভ্যন্তরেই সেইরূপ অশান্তি-উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটা উচ্চশ্রেণীর পৌরসমাজ গড়িয়া উঠিল। আপনারা সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। তখনকারকালের সামাজিক অবস্থা ও লৌকিক মনোগতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পীসম্প্রদায় গঠিত হইল। এই সমস্ত সম্প্রদায় আইন অনুসারে এক একটি স্বরাট্ সংঘরূপে পরিগণিত হইল। এইরূপে পৌরসমাজে অধিকারবৈশিষ্ট্য প্রবেশ করিয়া নানারূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করিল। অল্পকালের মধ্যেই প্রত্যেক নগরে একদিকে কতকগুলি ধনী ও গণ্যমান্য নাগরিকের এবং অপরদিকে বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর আবির্ভাব হইল। এই শ্রমজীবীসম্প্রদায় নিম্নপদস্থ হইলেও পৌর-ব্যাপারে ইহাদের প্রভাব একেবারে নগণ্য ছিল না। পৌরসমাজ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত

হইল ;—একদিকে উচ্চপদস্থ ভদ্র সম্প্রদায়, অপরদিকে কুশিক্ষা-কদাচার বিশিষ্ট সাধারণ জনসম্প্রদায়। ভদ্র পৌরসমাজের দুইদিকে বিপদ ;—একদিকে নিম্নশ্রেণীগণকে শাসনে রাখার কঠিন ভার, অপরদিকে পুরীর পূর্ব্বতন ভূস্বামীর পক্ষ হইতে অনবরত পুরীমধ্যে পুনরায় ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা। শুধু ফ্রান্সে নহে, সমস্ত ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিল। এইজন্যই অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে পৌরসংঘগুলি আশানুরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। নগরের মধ্যে অনবরত দুই বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষ চলিতে থাকিল ;—একদিকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা অসংযত, উদ্ধত, বিচারবিবেচনাশূন্য গণতন্ত্রমুখী ভাব ; অপরদিকে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইহারই ফলে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কেই হউক, প্রাচীন ভূস্বামী সম্পর্কেই হউক বা পুরীর অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনব্যাপারেই হউক, একটা সঙ্কোচ ও সাহসাভাব দেখা দিল, তাহারা কোন বিষয়ে জোর করিতে সাহস করে না, সর্ব্বদাই সামঞ্জস্যের খাতিরে নিজের দাবী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, সর্ব্বদাই অপর পক্ষের সহজে তুষ্টিবিধানের জন্য ব্যগ্র। সুতরাং পৌরসংঘগুলি যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশালী হইবে না ইহা ত অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এ সমস্ত পরিণাম দেখা দেয় নাই ; তথাপি, পৌরবিদ্রোহের প্রকৃতি ও সূচনাপ্রণালী এবং পৌরসমাজের গঠনোপাদান পর্য্যালোচনা করিলে এই সমস্ত পরিণামের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আমার মনে হয় পৌরবিদ্রোহ, পুরীগুলির স্বাতন্ত্র্যলাভ এবং পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি—এ সমস্ত ব্যাপারের যথার্থ প্রকৃতি ও পরিণাম এইরূপ। আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে চাই যে আমি সাধারণভাবে যে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলাম বাস্তবিক ব্যাপার কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র। ইউরোপের পৌরইতিহাসে অনেক বৈচিত্র্য-বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইটালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সে রোমীয় পৌরব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল ; সেখানে উত্তর ফ্রান্সের মত অতটা বৈচিত্র্য বা বৈষম্য দেখা যায় না, রোমীয় পারম্পর্য্যগুণেই হউক বা লোকের অবস্থার উৎকর্ষজন্যই হউক, সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা আরও উৎকৃষ্ট ছিল। উত্তরে সামাজিক জীবনে ফিউড্যাল পদ্ধতিরই প্রাধান্য ছিল ; ভূস্বামী-দিগের সহিত সংগ্রামের প্রয়োজনেই সেখানে সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত। দক্ষিণের পুরীগুলি নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, উন্নতি ও উৎকর্ষসাধনেই অধিক ব্যস্ত ছিল ; তাহারা কেবল স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হইবার কথাই ভাবিত। উত্তরের পুরীগুলির নিয়তি ক্রমশঃই অপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জার্ম্মানী, স্পেন ও ইংলণ্ডের পুরীগুলির দিকে তাকাইলে আরও অন্যান্য প্রভেদ দেখিতে পাইব। সে সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের আমি এখানে অবতারণা করিব না ; সভ্যতার ইতিহাসে অগ্রসর হইতে হইতে তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করিব। সমস্ত বস্তুই মূলে একাকার থাকে, পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বৈচিত্র্য দেখা দেয়। তখন আবার একটা নূতন পরিণতির সূচনা হয়, যাহাতে সমাজ একটা স্বাধীন ও

সর্ব্বসমঞ্জস ঐক্যের দিকে ধাবিত হয়। এই ঐক্যই মানবজাতির সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত আকাঙ্ক্ষার গৌরবোজ্জ্বল পরিণাম।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

বাদল-রাত্রে।

বাদল রাতে মাদল বাজে
　　মাতাল সমীরণ—
কার্ পরশে কাঁপলো ধরা
　　উতল বরিষণ!
কোন্ অসীমের সীমা রেখা
মুহুর্মুহু যায়রে দেখা;
কোন্ সে গোপন অভিসারে
　　পাগল-পারা মন,
নিবিড়-ঘন গহন পথে
　　ছুটেছে অনুখন!
হৃদয়-দ্বারে কে এলরে
　　পাগল হ'য়ে আজ
কার বেদনা উঠলো ফুটে
　　নিখিল ধরা মাঝ!—
না জানি কার আসার আশা,
মর্ম্ম-কোষের অফুট ভাষা—

ব্যাথিয়ে তোলে বাঁধন-হারা
ঝর-ঝরানি গান,
কোন্ সে ব্যথা জাগায় প্রাণে
আপন ভোলা টান্।

শ্রীতৃপ্তি সেন।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ

দেশবন্ধুর পরলোকগমনের কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ডাক পড়িয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছিলেন; তাঁহার যৌবন-স্বপ্নের কতক সফলতা—অন্ততঃ সফলতার সূচনা তিনি নিজর জীবনকালে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পুত্রপরিজনও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এরকম মৃত্যু ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই বরং সকলেরই ইহা কাম্য। তবে তাঁহার নিজের বিশ্বাস ছিল তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিবেন। তাঁহার কর্ম্মশীলতা, তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতায় বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে পারেন নাই তিনি এত শীঘ্র সকলকে ছাড়িয়া যাইবেন।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস সুপরিচিত। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত বিলাত যাত্রা, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, আদালতের আশ্রয় লইয়া কর্ম্মপ্রাপ্তি, কর্ম্মচ্যুতি, বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাশ, ব্যারিষ্টারীর সনদলাভে বিঘ্ন, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও শিক্ষকতা গ্রহণ, রিপন স্কুল ও কলেজের সূচনা ও পরিণতি, ভারত-সভা ও জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির কথা সকলেই জানেন সুতরাং আমরা উহার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া তাঁহার অন্তরের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব, যাহার বলে তিনি যাহা ছিলেন তাহা হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার বাগ্মীতা ভগবানের দান, উহার অনুকরণ চলে না, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার প্রীতি, তাঁহার দেশহিতৈষণা, তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার উদ্যোগ, * সকলের উপরে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত।

* উদ্যোগ Initiative.

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলা। তাঁহার প্রপিতামহ পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে আসেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতামহ ৺গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে লবন বিভাগে কাজ করিতেন। তিনি কলিকাতার তালতলা অঞ্চলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং গরীব দুঃখীকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সময়ের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার এমন হাতযশ ছিল যে তিনি চিকিৎসাভার গ্রহণ করিলে রোগী নিজেকে অর্দ্ধেক নিরাময় জ্ঞান করিত। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সারা বৎসর তিনি কলেজের পড়া ফেলিয়া বাহিরের বই লইয়া থাকিতেন, অথচ পরীক্ষায় তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় স্নেহপ্রবণ ছিল। সুরেন্দ্রনাথের 'জাতির অভ্যুত্থান' * পুস্তকে দেখিতে পাই বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে পুত্রের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ কালে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিয়াছিল, এবং তিনি অশ্রুমোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। এই স্নেহপরায়ণতা সুরেন্দ্রনাথেরও জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। পত্নীবিয়োগে প্রৌঢ় সুরেন্দ্রনাথকে যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রীতি, এই নিষ্ঠা কেবল পরিবারপরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—পরিবারের গণ্ডী ছাড়াইয়া উহা দেশকে, জাতিকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই স্নেহপ্রবণতার ন্যায় তাঁহার প্রতিভাও যে পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রেই লব্ধ তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার দ্বিতীয় সন্তান। শৈশবে পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহাকে পটলডাঙ্গার একটি পাঠশালায় পড়িতে পাঠান হয়। পিতার প্রতিপত্তিতে, এবং ব্রাহ্মণ বলিয়াও গুরুমহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। কিন্তু তিনি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। একদিন গুরুমহাশয় কোন কথায় সুরেন্দ্রনাথকে 'মরা বামুন বলায় তিনি পাঠশালায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার কঠোর সঙ্কল্পের নিকট মাতাপিতাকে হার মানিতে হয়। এই যে দৃঢ়তার পরিচয় পাঁচ বৎসরের শিশু সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে পাই, তাঁহার পরিণত বয়সে উহাই কিরূপে বৃটিশ সিংহের Settled fact রূপী সুদৃঢ় প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। এই দৃঢ়তার পরিচয় তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে আরও বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

---

* A Nation in the Making

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একদিক আমরা দেখিতে পাই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রসঙ্গে। তাঁহার নেতৃত্বে ২৭ জন সভ্য কর্পোরেশন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হয় নাই,—এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল সেদিন, যেদিন জীবনব্যাপীসংগ্রামলব্ধ অধিকারের সুযোগ লইয়া তিনি নূতন মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত করিয়া পুরাতন ব্যবস্থাকে সমাহিত করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের মনে স্বদেশ-হিতৈষণার সঞ্চার করিতেন কিরূপে পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধবের লেখায় আমরা তাহা দেখিতে পাই। ব্রহ্মবান্ধব তখন রিপণ কলেজে পড়েন। একদিন নব্য ইতালীর ইতিহাস পাঠনান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বালকগণ তোমরা কে কে ম্যাট্‌সিনী গ্যারিল্ডীর মত হইবে?'—তখন সমস্বরে রব উঠিল 'সকলে' 'সকলে'।—তাঁহার মনের বলের সহিত স্বদেহিতৈষণা এবং বাগ্মীতার যোগে তিনি তৎকালীন ছাত্রসমাজে যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। পরবর্ত্তীকালে লোকমতের সহিত তিনি যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু সেটা তাঁহার নিষ্ঠা অথবা দেশহিতৈষণার অভাবের পরিচায়ক নহে,—কতকটা মতপার্থক্য, কতকটা দূরদর্শিতার ফল। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ইংরেজ জাতির উপর কতটা নির্ভর করা যাইতে পারে অথবা কতদূর স্বাধীনতার জন্য জাতি প্রস্তুত হইয়াছে এবিষয়ে সকলে তাঁহার সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণের বাহবা অথবা কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহনিগ্রহ দ্বারা যে তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের তেমন আকাশ পাতাল কোন পরিবর্ত্তন কখন ঘটিয়াছে এমন অপবাদ তাঁহাকে কেহ দিতে পারিবেন না। স্বদেশীযুগের চরমে যাহারা কথায় কথায় সাদাকালা পাঁটা বলি দিতেন, ইংরেজের রক্তচক্ষু দেখিয়া যখন উঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন তখন একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই নির্য্যাতিত স্বদেশসেবীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উঁহাদের যন্ত্রণাভার লাঘবের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সূত্রে বেঙ্গলী কার্য্যালয়, এমন কি তাঁহার ব্যক্তিগত সিন্দুক পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ খুঁজিয়া দেখিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, কিন্তু তাহাতেও সুরেন্দ্রনাথ বিচলিত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের মনের বল, তাঁহার দূরদর্শিতা, তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব, সর্ব্বোপরি তাঁহার এই নীরব সাহস আমরা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দেখিতে চাই।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের কথায় আমরা বলি :—

"নবস্বাদেশিকতার মাদকতায় অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান যুগের স্বদেশবাসীরা যাহাই বলুন অথবা মনে করুন না কেন ইতিহাস মানুষ অথবা ঘটনার বিচার করে সমসাময়িক জনসঙ্ঘের অনুরাগবিরাগ দিয়া নহে, যে যুগে উঁহারা জন্মগ্রহণ করেন সেই যুগের চিন্তাধারায় ও জীবনে স্থায়ী কি দিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা। ইতিহাস সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সমসাময়িক অনেকেরই উপরে স্থান দিবে। জনসাধারণের মন প্রভাবিত করিবার এবং সমসাময়িক জনগণকে আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক স্বাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া

তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া যদি তিনি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা, এমন কি ভারতবর্ষ আজ যাহা হইয়াছে তাহা হইতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ এক নবভাবের সাধক ছিলেন, নব আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন। জাতীয় রাজনীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে তিনিই যে বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।"

পরলোকগত দেশসেবকের সাধনা জয়যুক্ত হউক। বর্ত্তমানের চিন্তাধারার পার্থক্য হেতু দেশ যে তাঁহার কাছে কতদূর ঋণী সেকথা যেন আমরা কখন ভুলিয়া না যাই।

আমি রব সয়ে

আমারে ধরিণি মাগো দাও ধৈর্য্য তব,
সয়ে রব, আমি রব সয়ে
দুঃসহ ভাস্কর তাপ, নিদাঘ দিবায়,
ঝঞ্ঝা বাত শিরে যাবে বয়ে।
প্রাবৃটের জলধারা অনাবৃত দেহ
সিক্ত করি যাইবে চলিয়া,
শীতের শাণিত বায়ু ত্বক্ ভেদ করি
বিঁধিবে মজ্জা ও মর্ম্মে গিয়া।
তবু আমি মৌন মুখে উর্দ্ধশির হয়ে
প্রতীক্ষা করিব বার বার,
নিদাঘে শীতল বারি রৌদ্র বরষার
শিশিরে বসন্ত পুষ্প-হার।
যতটুকু সুমধুর পাই যতদিন
হাসি মুখে লব ততটুকু
রৌদ্র আনি দিবে মেঘ, বরষা শরৎ
এ আশায় ভরা রবে বুক।

শ্রীকামিনী রায়।

পর্টুগালের রাণী †

চিত্রকরের নিখুঁত ছবিখানির মত পর্টুগালের রাণীর জীবনটি বড়ই সুন্দর; ইচ্ছা হয়, পটে-আঁকা ছবির মত রাণীর জীবনের চিত্রখানি সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখেই রাখি এবং উহার অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই।

পর্টুগালের এই ধর্ম্মশীলা রাণীর নাম এলিজাবেথ; তিনি এরগণের রাজা তৃতীয় পিটারের কন্যা। রাজকুমারী ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁহার এই সুকুমারী কন্যার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, তাঁহার জীবনটি যাহাতে সুন্দর ও পবিত্র হয়, সেজন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। রাজকন্যার শৈশবকালেই তাঁহার শিক্ষার ভার একজন সুশিক্ষিত সাধুপুরুষের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; এলিজাবেথ যখন ছয় বৎসরের বালিকা, তখন ধর্ম্মশীলা মহিলাগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। বালিকার চতুর্দ্দিকে এমনই একটি নির্ম্মল ও ও স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক বায়ু উৎপন্ন করা হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে তিনি মনের পুলকে পুষ্পটির মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

রাজকুমারীর বয়স যখন সবেমাত্র আট বৎসর, তখনই তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কোমল মনোবৃন্তে ভক্তির ফুল ফুটিতে লাগিল। তিনি সেই বয়সেই সকলের চেয়ে ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসিবার জন্য নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন। এলিজাবেথের শিক্ষক তাহার তরুণ বয়সে মনের মধ্যে এই কথাটিই অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, আত্মসংযমের দ্বারা আপনাকে সুনিয়মে চালাইতে পারিলে এবং বিনয়ী ও ঈশ্বরের বাধ্য হইলেই জীবন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বালিকা শিক্ষকের এই উপদেশের অনুরূপ জীবন গঠনের জন্য প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতেন। যথার্থই বালিকার প্রার্থনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের এক অপূর্ব্ব শক্তি নামিয়া আসিয়াছিল। সেই শক্তি রাজকুমারীর সুকুমার ও স্বচ্ছ হৃদয়খানি

† এই জীবনচরিতটা এলবান্ বাট্লার প্রণীত সেন্টদিগের জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বিনয়ে, বাধ্যতায়, সংযমে, সৌন্দর্য্যে ও সদ্‌গুণে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজকন্যার চতুর্দ্দিকেই ধনৈশ্বর্য্যে, তাহাদের রাজপ্রাসাদ ভোগের সামগ্রীতে এবং আনন্দোৎসবেই পরিপূর্ণ; কিন্তু তিনি সুখস্পৃহা খর্ব্ব করিবার জন্য ঐ সমস্ত হইতেই দূরে থাকিতেন এবং ভক্তিরসাত্মক গাণ গাহিয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এলিজাবেথের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন বর্ষাকালের লতাটির মত তাঁহার কোমল অঙ্গ লাবণ্যে বড়ই মনোহর হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও রাজকন্যার আত্মার সৌন্দর্য্য ও হৃদয়মাধুরীর তুলনায় দেহের এই রূপ অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে হইত। এই সময়ে পর্টুগালের রাজা ডায়োনিসাস (Dyonisius) তরুণ বয়স্ক যুবক; তিনি রাজকুমারীর বাহিরের রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এলিজাবেথ স্বামীর গৃহে আসিয়া রাণী হইলেন; রত্নসিংহাসন তাঁহার আসন হইল, স্বর্ণমুকুট তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতে লাগিল; অতুল ধনৈশ্বর্য্য তাঁহার হস্তগত হইল; কিন্তু তিনি ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা তৃপ্তিলাভ করিবেন? এলিজাবেথ চাহেন দয়াধর্ম্মে নারীহৃদয় পূর্ণ করিয়া, ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, দুঃখীর সেবা ও রাণীব কর্ত্তব্য পালন করিতে; আর তাঁহার রাজ-গৌরব-গর্ব্বিত স্বামী ধর্ম্মও চাহেন না, ঈশ্বরকেও চাহেন না; তিনি চাহেন ধনরত্নে রাজকোষ পূর্ণ করিয়া আপনার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে। বলিতে কি, তখন রাজার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহাও নহে। তিনি রাণীর রূপে মুগ্ধ, গুণে আকৃষ্ট ও সেবায় অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন বলিয়া রাণীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী হন নাই, তাঁহার কোন কার্য্যের উপরেও হস্তার্পণ করেন নাই; বরং রাণীর আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের অতিশয় প্রশংসা করিতেন।

পূর্ব্বকালে ইউরোপে পতিব্রতা নারীর আদর্শ অনেকটা হিন্দু নারীর আদর্শের মতনই ছিল। তজ্জন্য, অথবা এলিজাবেথ তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, বাধ্যতা ও অনুপম হৃদয়মাধুরীর দ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্বামীর বিস্তর দোষত্রুটিসত্ত্বেও তাঁহাকে ভালবাসিতেন; তাঁহার সেবা করিয়া আপনার নারীহৃদয়ের প্রেম সার্থক করিতে চেষ্টা করিতেন। শুধু তাহাই নহে; স্বামীর জীবনের পরিবর্ত্তনের ও আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। সেই জন্যই রাজার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; তিনি ধর্ম্মশীলা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

• ২. •

রাণীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের ধর্ম্মভাব গভীর হইয়া উঠিতে

লাগিল। তিনি উপাসনায় ও ধ্যানে বসিলেই প্রেমোচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইত, দুটি চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া যাইত; তখন শিশিরসিক্ত পদ্মের মত রাণীর অশ্রুমাখা মুখখানি দর্শন করিয়া তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে হইত।

রাণী সময়ের মূল্য অতি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আলস্য অথবা সুখস্পৃহার জন্য জীবনের একটি মুহূর্ত্তও যাহাতে বৃথা নষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি সতর্ক থাকিতেন। রাণীর জীবনচরিত-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"তাঁহার অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাহার পরে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানারকম স্তোত্র ও প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেন। এই কার্য্যটির পরে, তিনি ধর্ম্মাচার্য্যের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় যোগদান করিতেন। প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য রাণীর চিত্ত পরলোকের চিন্তায় ডুবিয়া যাইত। তিনি নিরূপিত সময়ে পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। রাজসংসারের কার্য্যেও রাণীর কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। রাণী প্রত্যহ রোগীর সেবা এবং দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাঁহারই জীবনের মত, সহচরী ও পরিচারিকাদিগের জীবনেও যাহাতে ধর্ম্মবিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রাণী সেজন্য পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সংযত, বেশভূষায় বিলাসিতাশূন্য, কথাবার্ত্তায় সরল বিনয়ী এবং সকল কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনেই তৎপর ছিলেন।" ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বীরাষ্টমী

বঙ্গজননীগণের প্রতি

আমি বঙ্গের জননীগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে আগামী ৯ই আশ্বিন বীরাষ্টমীর দিনে তাঁহারা যেন পুত্রকে অঙ্কে লইয়া পুরোহিতের নিকট ব্রতকথা শুনেন এবং "বীর হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ঐ দিন যাহাতে তাঁহাদের সাবালক পুত্রেরা গ্রামের মধ্যে নানারূপ দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল ও শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইবার সুযোগ পায়, তাঁহারা যেন সে বন্দোবস্ত ও করেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

নব্য ভারত

অতিরিক্ত পত্র

দ্বিতীয় খণ্ড] আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩২ [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

পাশ্চাত্য সমস্যা *

জনৈক ইউরোপীয় বন্ধু লিখিতেছেন—

• * * •

"যে বজ্রমুষ্টি ভারতবাসীকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, এখানেও উহা নিষ্ক্রিয় নহে। এই স্বাধীন দেশগুলির † প্রত্যেকটিতেই এই সয়তানী প্রথার প্রভাব দৃষ্ট হয়। সংহত অর্থলালসার নিকট রাজনীতি আমলই পায় না। জনগণ পাপে ডুবিয়া যাইতেছে। যে কোন উপায়ে জীবন্ত নরক হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় উহারা গাঢ়তর পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম বহুযুগব্যাপিয়া শক্তিমান এবং অর্থলোভীর সহকারিতা দ্বারা জনসাধারণের উপর প্রভাব হারাইয়াছে। মহাত্মাজী হয়ত বলিবেন ব্যাপকভাবে অহিংস অসহযোগই ইউরোপীয় জনসঙ্ঘের মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু ইউরোপের মাটীতে এবং ইউরোপের মনোজগতে অহিংসার স্থান নাই। অহিংসা ঠিকভাবে বুঝা ও প্রয়োগ করাত দূরের কথা, উহার প্রচারের পথেও বিপুল বিঘ্ন রহিয়াছে।"

বন্ধুবর এত সরলভাবে যে সমস্যার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা আমার আয়ত্বের বাহিরে। ভারতের সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিকার সম্বন্ধে যে জ্ঞানের দাবী আমি করিতে পারি, ইউরোপীয় সমস্যার সম্বন্ধে তা করিতে পারি না, সুতরাং অপর কাহারও সুচিন্তিত মত অপেক্ষা আমার মতের মূল্য অধিক নহে। কিন্তু মূলে যে সমস্যা উভয় দেশেই এক, তা আমি বেশ বুঝিতে পারি, যদিও সেই সকল দেশের লোক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরে আমার আকাঙ্খা তৃপ্ত হইবে না, যদিও এই হস্তান্তর ভারতের

---

* What of the West ? Young India. 13. 9. 25.

† ইউরোপ ও আমেরিকা

জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করি। ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু স্বরাজ নাই। এসিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের শোষনদ্বারা ইউরোপীয়েরা আংশিকভাবে উপকৃত হন বটে, কিন্তু দেশের শাসকসম্প্রদায় গণতন্ত্রের পবিত্রনামের আবরণে উহাদিগকেই আবার শোষন করিয়া থাকেন। উপরের সমস্ত আবরণ সরাইলে দেখা যায় উহাদিগকেও পশুবলের সাহায্যেই শোষন করা হইয়া থাকে।

পশুবলের সাহায্যে এ রোগের প্রতিকার কখনও হইবে না। পশুবললব্ধ সাফল্য অতি ক্ষণস্থায়ী, উহা অধিকতর পশুবলেরই প্রয়োজক। এ পর্য্যন্ত বলবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ পশুবলের নানাবিধ প্রয়োগ ও নানা কৃত্রিম উপায়ে উহার প্রতিকার চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে, কাজে কাজেই শেষকালে উহারা স্বভাবতঃই ব্যর্থ হইয়াছে। মুক্তি যদি লাভ করিতে হয় একদিন উহাদিগকে অহিংসা অবলম্বন করিতেই হইবে। উহাদের যদি অবিলম্বে একযোগে উহা গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। অসীম কালসাগরে কয়েক হাজার বৎসর বিন্দুতুল্য। অটলবিশ্বাস লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার মত একজন লোক চাই। উহারা যে কালে অসহযোগ ব্রতে দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না; কিন্তু সময়ের হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী ব্যাপকভাবে অসহযোগের পরীক্ষা তত নহে, যত মুক্তির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা।

জনসংঙ্ঘকে মুক্ত করিতে হইবে কি হইতে? 'শোষণ এবং নৈতিক অবনতি হইতে'—এরকম ভাসা ভাসা উত্তর দিলে চলিবে না। সমাজে আজ মূলধনিকের যে স্থান, তাহাই উহারা লাভ করিতে চায় এই কি উত্তর? সেই স্থান কেবল পশুবলের সাহায্যেই লাভ করা যাইতে পারে। মূলধনের কুফলের প্রতিকার যদি করিতে হয়, মূলধনিকসুলভ 'দৃষ্টিবিন্দুর' + পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদির অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিলিব্যবস্থার চেষ্টা করিতে হইবে। এখানেই আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সন্তোষ এবং সাদাসিদা জীবন যাপনের কথায় আসিয়া পড়ি। নূতন আদর্শে বাহ্যপ্রয়োজনের প্রাচুর্য্যসাধনই জীবনের লক্ষ্য হইবে না, লক্ষ্য হইবে আরামের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহাদের সঙ্কোচসাধন। + যাহা কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই আয়ত্ব করার কথা

+ দৃষ্টি বিন্দু View Point ;— প্রায় কোন জিনিষকেই আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না, অবস্থার অনুসারে ভিন্নরূপে দেখিয়া থাকি, অন্ধের হাতী দেখার মত। এই অবস্থান বাহ্য ও মানসিক, দুইই হইতে পারে। যে বিন্দু হইতে অথবা যে মানসিক বিকার লইয়া আমরা কোন জিনিষ দেখি বা কোন বিষয়ের বিচার করি তাহাকে View Point বলে আমি উহাকে 'দৃষ্টিবিন্দু' নাম দিলাম। অনুবাদক।

সঙ্কোচ সাধন restriction,

আমরা ভাবিব না, বরং যা সকলের পাওয়া সম্ভবপর নয় তাহা লইতে আমরা সম্মত হইব না। আমার মনে হয় ইউরোপীয় জনগণকে অর্থনীতির দিক হইতে ব্যাপারটী বুঝাইতে গিয়া সফলতা লাভ করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। এই চেষ্টায় কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও উহার আধ্যাত্মিক ফল নিতান্ত সামান্য হইবে না। আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহ যে কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। উহারা বরং আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপে ইহাদ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন সবই প্রভাবিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় জনসঙ্ঘ যদি আমার মত গ্রহণ করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে দেখিবেন অহিংসার সূত্র অবলম্বন করিয়াই উহাদের অভীষ্ট লাভ হইবে, উহাতে পশুবলের প্রয়োজন হইবে না। এমনও হইতে পারে যে ভারতের পক্ষে যাহা এত স্বাভাবিক ও সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নির্জ্জীব ভারতবাসী অপেক্ষা কর্ম্মতৎপর ইউরোপীয় জনসংঙ্ঘকেই হয়ত উহা অধিকতর সহজে প্রভাবিত করিবে। আমি কিন্তু আবার বলিতেছি আমার সমুদয় যুক্তিরই ভিত্তি অনুমানের উপর, সুতরাং উহাদের উপর ইহার অতিরিক্ত কোন গুরুত্বের আরোপ নিষ্প্রয়োজন। মোঃ ক, গান্ধী, ৩,৯,২৫ ইং

স্বরাজ্যের আলেখ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলিয়াছি আমি অসহযোগী। আমি নিজেকে আইনপ্রতিরোধকারীও বলিয়া থাকি। অন্যান্য বহু শব্দের মত এই দুইটি শব্দও ইংরাজী ভাষায় কদর্থযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি অসহযোগ করি সহযোগে সক্ষম হইবার জন্য। মেকী সহযোগে আমি তৃপ্ত হইতে পারি না,—আমি চাহি ষোলআনা সোনা। কিন্তু অসহযোগ করিলেও আমি স্যার মাইকেল ওডায়ার অথবা জেনারেল ডায়ারের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করিতে পারি। অসহযোগ কাহারও অশুভপ্রয়াসী নহে। অসহযোগ কর্ম্মের সহিত, কর্ম্মপ্রণালীর সহিত, অনুষ্ঠাতার সহিত নহে। আমার ধর্ম্ম অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকেও ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। আমার অসহযোগ আমার ধর্ম্মেরই অঙ্গ মাত্র। কাহারও শ্রবণের তৃপ্তিসাধন আমার উদ্দেশ্য নহে। যা আমার মনে নাই এমন কথা বলার অপরাধ আমি কমই করিয়াছি। আমার স্বভাব সোজা পথে চলা। যদি ইহাতে আমি সাময়িক ভাবে অপরের

হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিতে অপারগও হই, তাহা হইলেও পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে আমি জানি চরমে সত্যই জয়ী হইবে। আপনাদের পরস্পরসম্বন্ধ যেন প্রগাঢ় সৌভ্রাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই বাসনা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উদ্ভূত। আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে আপনারা অশুভ এবং বন্ধন হইতে ভারতের মুক্তির সহায়তা করুন, এবং জগতে শান্তির বার্ত্তা প্রচারে ভারতের সহায় হউন। ভারতে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়ের এই মিলনের একটা বিশেষ অর্থ আছে বা থাকিতে পারে। উভয় সম্প্রদায় যে একত্র বসবাস করিয়া জগতে শান্তি এবং সৌভ্রাত্রের বার্ত্তা প্রচার করিবেন, ইহা অপেক্ষা মঙ্গলতর আর কি থাকিতে পারে? ভগবান করুন তাতার জন্য কাজের ভিতর দিয়াই যেন আপনারা দেশেরও সেবা করিতে পারেন, এবং শুধু একটা কারবারের জন্য কাজ করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনারা এখানে আছেন একথা যেন কখনও না ভুলেন।

মোঃ কঃ গান্ধী।

ভারতীয় খ্রীষ্টানদের প্রতি

(দিনকয়েক হইল কোন সভায় বক্তৃতা দিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছিলাম। উহাতে ভারতীয় খ্রীষ্টানগণেরই প্রাধান্য থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ উহাতে ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগেরই আধিক্য দেখা গেল। কাজেই আমার বক্তৃতা যে রকম হইবে আশা করিয়াছিলাম সে রকম না হইয়া অন্যরকম হইয়া গেল। যাহাই হউক, যিনি বিচিত্র অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়াছেন তিনি উহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন জানিবার কৌতুহল অনেকেরই হইতে পারে এই বিবেচনায় উহার কতিপয় অংশ সংক্ষেপে সঙ্কলণ করিয়া দিলাম। মোঃ ক গান্ধী)

মনে পড়ে আমার যৌবনকাল জনৈক হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সকলেই বুঝিল খৃষ্টের নামে গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান এবং জাতীয় পরিচ্ছদ বর্জ্জন এই সম্ভ্রান্ত হিন্দুর দীক্ষার অঙ্গীভূত। পরবর্ত্তী জীবনে শুনিয়াছি যে নবদীক্ষিত ব্যক্তি দারিদ্র্য হইতে স্বচ্ছলতায় উপনীত হন। (মিশনরী বন্ধুগণের ভাষায় বলিতে গেলে, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন) ভারতভ্রমণকালে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি খৃষ্টান ভারতবাসীগণ নিজেদের জন্মের জন্য লজ্জাবোধ করেন,—পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্ম এবং বেশের অন্তত করেনই। ইউরোপীয়ের অন্ধ অনুকরণ ইঙ্গভারতীয়ের পক্ষেই মন্দ,

দীক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষেত মন্দই—উহাতে দেশের প্রতি, এমন কি নবগৃহীত ধর্ম্মের প্রতিও অন্যায় করা হয়। (খৃষ্টীয়) ধর্ম্মপুস্তকের নূতন ভাগের একটী শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রতিবাসীর বিরাগসম্ভাবনা থাকিলেখ্রীষ্টান মাংসাহারও পরিত্যাগ করিবেন। এস্থলে মাংস বলিতে পরিচ্ছদ এবং পানীয়ও বুঝিতে হইবে ধরিয়া লইতে পারি আশা করি। পুরাতনের যাহা মন্দ উহাকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করার মহত্ব আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু যেখানে মন্দের কোন কথাই উঠে না, এমন কি যেখানে প্রাচীন প্রথা হয়ত আকাঙ্ক্ষনীয় সেখানে উহার বর্জ্জন নিতান্তই দূষনীয় বিশেষতঃ যদি উহাতে আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধবেরা মর্ম্মপীড়া পাইবেন ইহা নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। জাতীয়তাবর্জ্জন ধর্ম্মান্তরগ্রহণের অঙ্গ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। দীক্ষায় পুরাতনের মন্দকে নিশ্চিতরূপে ত্যাগ করিতে, নূতনের সমস্ত শুভকে বরণ করিয়া লইতে, এবং মন্দকে সযত্নে এড়াইয়া চলিতে হয়। অতএব দীক্ষিত জীবনের লক্ষ্য স্বদেশে অধিকতর আত্মনিয়োগ, ভগবানে অধিকতর নির্ভর এবং অধিকতর আত্মশুদ্ধি। বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় কালিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যে খৃষ্টান ইহা যদি আমার পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিত তাহা হইলে উহার গৃহের বাহিরের রূপ হইতে আমি কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতাম না। সাজসরঞ্জামের অপ্রতুলতা বশতঃ আধুনিক হিন্দু গৃহস্থের বাসগৃহের সহিত উহার গৃহের কোনই পার্থক্য ছিল না। এই মহাপুরুষ পোষাক পরিচ্ছদেও সাহেবীয়ানাবর্জ্জিত সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুরই মত ছিলেন। আমি জানি ভারতীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। উহাদের অনেকের ভিতরেই চিরাচরিত সরল জীবনে ফিরিয়া যাইবার, জাতির অন্তর্ভূক্ত হইয়া উহার সেবা করিবার আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিতেছে, কিন্তু অতি ধীরে। এজন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা খুব চেষ্টাসাপেক্ষও নহে, কিন্তু শুনিয়াছি, এবং একজন খৃষ্টান ভারতবাসীর পত্রেও দেখিতেছি গুরুজনের বিরুদ্ধাচরণে ইচ্ছাসত্বেও উহারা এই পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলিতেছেন উহাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, এবং জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবার চেষ্টা দেখিলেই কঠোরভাবে ভৎসর্না করা হয়। পরলোকগত অধ্যক্ষ রুদ্র এবং আমি অনেক সময়েই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।—তিনি এজন্য কত দুঃখ করিতেন তা আমার বেশ মনে আছে। যে সকল নিষ্প্রয়োজনীয় ইউরোপীয় চালচলনে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন উহা পরিবর্ত্তনের বয়স চলিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি অনেক সময়েই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। বহু খৃষ্টান ভারতবাসী যে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সন্তানকে শুধু ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেন ইহা কি বাস্তবিকই দুঃখাবহ নহে? যে জাতির মধ্যে উহাদিগকে বাস করিতে হয়, উহারা কি এইরূপে নিজেদের ঐ জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন না? আত্মসমর্থনকল্পে উহারা উত্তর দিতে পারেন বহু হিন্দু, এমন কি মুসলমানও বিজাতীয়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু এইরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই। আমি তর্ক করিতে আসি নাই, বন্ধুভাবেই আসিয়াছি। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি বহু

খৃষ্টান ভারতবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। আমি আশা করি যে ভাব হইতে আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, আমার খৃষ্টান মিশনরী বন্ধুগণ সেই ভাবেই ইহাতে সাড়া দিবেন। বিভিন্নধর্ম্মীঅধ্যুষিত এই দেশের অধিবাসীবর্গের মধ্যে যে অন্তরের একতা আমি দেখিতে চাই তাহারই দিক হইতে আমি এই কথা লিখিতেছি। প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র আমরা যে বৈচিত্র্য দর্শন করি উহার মধ্যেও এক মৌলিক একতা অনুস্যূত রহিয়াছে। ধর্ম্মেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মূলগত একতা উপলব্ধির প্রক্রিয়া দ্রুততর করিবার জন্যই মানবসমাজে এই বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা। * মোঃ কঃ গান্ধী

চয়ন

জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে আমি সুযুক্তিপূর্ণ একখানা পত্র পাইয়াছি। সকল বিষয়ে উঁহার সহিত একমত না হইলেও পত্রখানি আমি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। পত্রখানির মূল বক্তব্য এই যে হিন্দু-মোস্লেম একতা সাধনের জন্য যে উপায় আমি অবলম্বন করিতে চাই উহাতে অন্ততঃ আপাততঃ বিরোধই বাড়িতেছে। পত্রের শেষাংশ এইরূপ :—

স্বরাজের আদর্শ ঘোষণা

"আপনার কৃত কর্ম্মের ফল দেখিতেছেন। এখন অনুরোধ এই, আপনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাই স্বরাজের লক্ষ্য, রাষ্ট্র জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে জবরদস্তি চলিবে না, জন্মের জন্য কাহারও কোন যায়গায় যাইবার বা কিছু করিবার বাধা থাকিবে না, সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া, এবং দৈন্য ও অজ্ঞানতার গুরুত্বানুযায়ী সকল সম্প্রদায়ের দীন ও পতিত জাতি সমূহকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে। জন্ম অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসের খাতিরে কোন বিশেষ সুবিধা কাহাকেও দেওয়া হইবে না। রাষ্ট্রের সকল বিভাগের পরিচালনায়ই এই নীতির অনুসরণ করা হইবে। সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই নীতি গ্রহণ করিলে ভারতমাতার সন্ততিবর্গের অন্তর্বিরোধ সমস্যার অর্দ্ধেক সমাধান হইয়া যাইবে। খিলাফতীদের তরফ হইতে আলিভ্রাতৃদ্বয়ও যদি এইরূপ একটা ঘোষণা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছি। কথায় আর কাজ হইবে না স্বীকার করি, তাই আমি কাজে মন দিয়াছি। স্বরাজের আদর্শঘোষণা বিষয়েও আমি পত্রপ্রেরকের সহিত একমত, এবং প্রস্তাবিত ঘোষণাকে পাঠক আমার নিজের ঘোষণা বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারেন। (মোঃ কঃ গান্ধী ২০।৮।২৫)

* To Indian Christians. Young India. 20. 8. 25.

বাক্স চরকা ঘোরাঘুরির সময় সূতাকাটার সমস্যা খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত 'বাক্স চরকা' সমাধান করিয়াছে। চল্‌তি গাড়ীতেও ইহাতে অন্য চরকারই মত সূতাকাটা যায়। ১৬ ইঞ্চি × ৬ইঞ্চি × ৬ইঞ্চি একটী বাক্সে ইহাকে খুলিয়া রাখা চলে। চরকাটী খাটাইতেও ২।৩ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।—* * বাক্সটীতে তেলের টিন, সামান্য কয়টী যন্ত্র, পাঁজ ইত্যাদি রাখিবার স্থান আছে। মূল্য ১৫৲ টাকা মাত্র। যাহারা ভ্রমণ কালে সূতাকাটা স্থগিত রাখিতে চান না, বা অনবরত ভ্রমণের অজুহাতে যাহারা সূতা কাটেন না এই চরকা উহাদের কাজে লাগিবে। (মোঃ কঃ গান্ধী ২০।৮।২৫ ইং)

চীন ও ভারতীয় সৈন্য— চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা, শ্রীযুক্ত সাক্‌লাত ওয়ালার এই প্রশ্নের উত্তরে উইণ্টারটন সাহেব কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে এরূপ আদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় কর্ত্তৃপক্ষের ছিল। গত বৎসর কবিবরের সঙ্গে চীনদেশে থাকা কালীন আমি লক্ষ্য করিয়াছি চীনের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ভারতীয় সেনা প্রেরণে উহারা কিরূপ ক্ষুব্ধ। ব্যবস্থাপক সভার শিমলা অধিবেশনের পূর্ব্বেই যদি এই আদেশ দেওয়া হয় তবে সমগ্র দেশ হইতে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ অবিলম্বে হওয়া উচিৎ। অধিবেশনকালে এই আদেশ দিলে সভায়ই ইহার কঠোর প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। সভ্যগণ যেন না ভুলেন পার্লামেণ্টে বলা হইয়াছে এইরূপ বৈদেশিক অভিযান ইংলণ্ডের অর্থে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া (১), এবং ইহাতে ভারতীয় সৈন্যেরা বিদেশের অভিজ্ঞতা লাভ করে বলিয়া (২) ব্যবস্থাপক সভা ইহার অনুমোদন করেন। আসুন, আমরা পরিষ্কার করিয়া বলি এত ক্ষতির বিনিময়ে আমরা ব্যয়সংক্ষেপ অথবা অভিজ্ঞতা, কোনটীই চাই না। (এণ্ড্রুজ ২০।৮।২৫ ইং)

খদ্দর ও বিহার পুরুলিয়ায় বেহার প্রাদেশিক সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে মহাত্মাজীর যোগদান উপলক্ষে অনেকেই খদ্দর ক্রয় করিতেছেন। ইহাদের অনেকেই হয়ত কোনকালেই খদ্দর পরিধান করেন নাই, বিলাতীও অবাধেই ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অধিবেশনের পরিসমাপ্তির পরেই আবার খদ্দর বর্জ্জন করিবেন। জনৈক পত্রপ্রেরক মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই রকম প্রবঞ্চনার সার্থকতা কি। বিশ্বাসযোগ্য খাটী খদ্দরের অভাব সম্বন্ধেও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। গান্ধীজী উত্তরে বলিতেছেন ;

'একেবারে কিছু না করার চাইতে অল্প কিছু করাও ভাল, এই নীতির দিক হইতে সাময়িক ভাবে খদ্দর ব্যবহারেও উৎসাহ দেওয়া উচিৎ।—যাহারা সাময়িকভাবে খদ্দর ব্যবহার করে, কালক্রমে উহাদের নিয়মিত খদ্দর ব্যবহারেরও সম্ভাবনা থাকিতে পারে। যে লুকাইয়া মদ খায় অথচ প্রকাশ্যে সাধুতার ভাণ করে সে প্রতারক এবং তাহাকে পরিহার করিয়া চলাই বিধেয়, কিন্তু যে মদ্যপানের বিষয় গোপন করে না, কিন্তু সমাজে অথবা বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ মদ্যপানে বিরত থাকে সে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। তাহার মুক্তি

সুদূরপরাহত নহে। উহারা বরাবরই খদ্দর ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, আমার মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই যদি পুরুলিয়ার লোকে আমার আগমন উপলক্ষে খদ্দর ব্যবহার করে, তবে তাহা অবশ্যই দূষনীয়, কিন্তু এরূপ কোন দুরভিসন্ধি যে উহাদের আছে সে বিশ্বাস আমি করি না। আমার আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অভিপ্রায়ে যাহারা খদ্দর ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা সর্ব্বদাই খদ্দর ব্যবহার করিবেন আমি আশা করি কিন্তু সাময়িকভাবে খদ্দর ব্যবহারেও আমি দোষ দিতে পারি না। ইহাতেও কিছু লাভ আছে, অন্ততঃ অতিরিক্ত খদ্দরটা বাটিয়া গিয়া নূতনভাবে খদ্দর তৈরীর জন্য টাকাটা পাওয়া যায়।

নকল খদ্দরের সমস্যা সমাধান একটু দুরূহ। ক্রেতারা খাঁটী জিনিষ ক্রয়ে অবহিত না হইলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। কংগ্রেস এবং খাদি প্রতিষ্ঠান সমূহ উহার নিবারণ কল্পে অনেক কিছু করিতে পারেন। পত্র প্রেরকের মতানুযায়ী প্রধান প্রধান কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত খদ্দরভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। এজন্য অর্থ এবং গঠনশক্তির প্রয়োজন। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই নিখিলভারত সূতাকাটা সমিতির আয়োজন হইতেছে। এই জন্য পত্রপ্রেরকের মত লেখকগণের প্রতি আমার নিবেদন উহারা যেন অসুবিধার জন্য খদ্দর পরিত্যাগ না করেন। খদ্দর এবং চরকার প্রচলন সার্থক করিতে হইলে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে তাহা জাগাইয়া তুলিতে হয় বলিয়াই আমি অনেক সময়ে বলিয়া থাকি চরকার প্রবর্ত্তনেই স্বরাজ লাভ হইবে।

(মোঃ কঃ গান্ধী, ৩।৯।২৫)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

আগামী চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কণ্ট্রাক্টে নব্যভারতের জন্য নিম্নলিখিত হারে বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে।

মলাট	২য় পৃষ্ঠা	প্রতিবার	৮৲
মলাট	৩য় পৃষ্ঠা	,,	৮৲
মলাট	৪		১৫৲
সাধারণ পৃষ্ঠা			৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		,,	৩৲
সিকি ,, বা অর্দ্ধ ,,		,,	১৸৹
⅛ ,, বা সিকি ,,		,,	১৲

পুরাতন বিজ্ঞাপন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বহারেই চলিবে। ⅛ পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

বিশেষ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন।

জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুস্তক, স্বদেশী শিল্প, কুটীর শিল্প ও উন্নত প্রণালীর কৃষিযন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পঠিতব্য বিষয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পর পৃষ্ঠায় প্রতি ⅛ কলম প্রতিবার ।৹ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ কোন বিজ্ঞাপন ⅛ কলমের বেশি হইবেনা, বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভাউচার পাইবেন না, এবং মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে। এই সুযোগের বহুলব্যবহার হইবে আশা করা যায়।

গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি।

আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারত ভাদ্রের শেষে, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা আশ্বিনের শেষে, ও কার্ত্তিক হইতে প্রতি সংখ্যা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যদি কেহ কাগজ না পান, আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ পাইতে অথবা দেরী হইলে মোড়ক বুকপোষ্টে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা, নব্যভারত,

২১০।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

অতিরিক্ত পত্র

নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩২ [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্রাহ্মসমাজের এই সাম্বৎসরিক উৎসবের কর্ম্মপদ্ধতিতে যোগ দেবার অবসর পেয়ে আমি বাস্তবিক নিজকে কৃতার্থ মনে করছি। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে গড়ে তুলেছেন। আমি যে যুগের লোক, সে যুগে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের নিকট যে আদর্শ ধরেছিলেন সে আদর্শের প্রেরণাতেই জীবনে যা কিছু ভাল করতে চেষ্টা করেছি তা সম্ভব হয়েছে। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন একটা অতি পবিত্র দিন বলে মনে করি।

এই ব্রাহ্মসমাজ সকলের আগে আমাদের নিকট স্বাধীনতার একটা নূতন আদর্শ ধরেছিলেন। প্রাচীন ভারতের যতই গৌরব করি না কেন—আর গৌরব করবার অনেক বস্তুই যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না—একথা বলতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নই, যে, বর্ত্তমান যুগে যে আশার সংবাদ আমরা পেয়েছি, বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের যে চিত্র আমাদের চক্ষে ফুটে উঠেছে, সে চিত্রের তুলনায় প্রাচীন ভারতের গৌরব ম্লান হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের কেন, প্রাচীন জগতের সর্ব্বত্রই সমাজকে ব্যক্তির উপরে অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমে সমাজ ছিল অঙ্গী, ব্যক্তি ছিল সে অঙ্গীর অঙ্গ, সমাজ ছিল পরিপূর্ণ বস্তু, ব্যক্তি ছিল সে পরিপূর্ণ বস্তুর অংশ বা খণ্ড; সমাজ ছিল বৃক্ষ, ব্যক্তি ছিল সে বৃক্ষের শাখাস্বরূপ; সমাজ দ্বারা ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত, সমাজশাসন ব্যক্তিকে সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্কুচিত করে' রাখত, সমাজজীবনের সার্থকতা ব্যতীত ব্যক্তির নিজের জীবনের যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য আছে, ব্যক্তির নিজের যে একটা সার্থকতা আছে, একথাটা প্রাচীন গ্রীস বা রোমে কেহ বলে নাই।

আমাদের দেশে ঠিক এই ভাবে সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল থেকে, উপনিষদের সময় থেকে, এক প্রকার ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য আমাদের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা ব্যক্তিকে কেবল ব্যক্তি বলে' কখনও গণ্য

করিনি, আমরা মানুষকে কেবল মানুষ বলে' কখনও ভাবিনি. উপনিষদের সময় হ'তে আমরা মানুষকে দেবতার চক্ষে দেখে এসেছি। উপনিষদের মূল কথা এই—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—হে শ্বেতকেতু তুমিই তাই, সেই পরম সত্য। এই বাক্যের উপর শঙ্কর-বেদান্তের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আবার এই বাক্যের এমন ব্যাখ্যা হয়েছে, যাহা দ্বারা বৈষ্ণব-বেদান্ত, যাহা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের চরম সীমা অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষ একেবারে এক, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো,"—এখানে তুমি কে এই প্রশ্ন উঠে? তুমি শ্বেতকেতুর দেহ নও। উপনিষদের সর্ব্বত্র দেহ হ'তে যে আত্মা ভিন্ন এই মহাসত্য প্রচারিত হয়েছে। শ্বেতকেতুর ইন্দ্রিয়গ্রাম তাও শ্বেতকেতু নয়, তারা আত্মা নয়, অন্নময় কোষের উপর যে প্রাণময় কোষ, শ্বেতকেতুর প্রাণ—তাও ব্রহ্ম নয়; তার পর শ্বেতকেতুর যে মনোময় কোষ, ইন্দ্রিয়ের জীবন যেটা এবং ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে মন, যে মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপর জীবন গড়ে উঠেছে, সেটাও তত্ত্বম্ নয়;- সেই শ্বেতকেতুকে লক্ষ্য করে' এখানে 'ত্বম্' বলেনি; কেননা আমাদের শরীর যেমন উপচয় অপচয়ের অধীন, তার যেমন হ্রাসবৃদ্ধিক্ষয় হয় তেমনি আমাদের প্রাণও উপচয়-অপচয়ের অধীন; আবার তেমনি আমাদের যে মানস জীবন এই জীবনের যাকে আমরা জ্ঞান বলি, সে জ্ঞান উপচয়-অপচয়ের অধীন, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তু গ্রহণ করি সে জ্ঞান নিত্যজ্ঞান নয়, আর এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আমরা যে অনুমানউপমান প্রতিষ্ঠা করি তাও নিত্যজ্ঞান নয়, তাতে ভ্রান্তি, অজ্ঞানতা আছে; আমাদের এই মনুষ্য-জীবনের নিদ্রিত জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থা আছে, সুতরাং এই যে মানসজ্ঞান বা মানসজীবন তাকে আমরা আমাদের নিত্য জীবন মনে করতে পারি না।

প্রথমে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, তারপর মনোময় কোষ, তারপর বিজ্ঞানময় কোষ—বুদ্ধি যার আশ্রয়—তারপর আনন্দময় কোষ—যা হ'তে আমরা সর্ব্বপ্রকার আনন্দ পাই—এই সকলই উপচয়-অপচয়ের অধীন, হ্রাসবৃদ্ধির অধীন; এই সকলের মধ্যে স্থায়ী, চিরন্তন, নিত্য কিছু নাই, সুতরাং ঋষি যে বললেন—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" তুমি তাই—এখানে তুমি ব'লতে শ্বেতকেতুর শরীর, প্রাণ, মানসজীবন বা বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করেন নাই, অথবা এই সংসারে মানুষ যে সমস্ত আনন্দ ভোগ করে তাকেও নির্দ্দেশ করেন নাই, এই সকলের উপরে যে নিত্য সত্যবস্তু আছে, যা চিরকাল এক অবস্থায় থাকে তাকেই ত্বম্ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তুমি সেই পরমতত্ত্ব সুতরাং এখানে এই যে মানুষ, এই যে ব্যক্তি তার একটা সত্য স্থায়ী চিরন্তন প্রতিষ্ঠা আমরা দেখতে পাই। এই মানুষ কেবল মানুষ নহে, এই মানুষের ভিতর নিত্য সত্য চিদানন্দময় পুরুষ বর্ত্তমান। আমার আমিত্ব কেবল আমার আমিত্ব নহে, আমার আমিত্বের ভিতর সত্য যিনি, নিত্য যিনি, পরমতত্ত্ব যিনি, তিনি আমাকে অভিব্যক্ত ক'রছেন, তিনি কেবল আমার মানস জীবন নহেন, তিনি আমার ইন্দ্রিয় মনের প্রতিষ্ঠা—"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচম্" এই বলে' উপনিষদ ব্যক্তিত্বের একটা চিরন্তন সত্য

প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর বলেছেন, এই ইন্দ্রিয়গ্রাম, এই যে দেহাদি, এই যে সংসারের বিষয় ভোগাদি এই সকল বিষয়ে তোমার আত্মবুদ্ধি বর্জ্জন করে' তুমি "অহং" তত্ত্ব লাভ কর।

এ কথাটা প্রাচীন গ্রীসে কখনও এমনভাবে বলেছে বলে শুনি নাই, প্রাচীন রোমেও একথাটা এমনভাবে অতটা ফুটিয়ে বলেছে ব'লে জানিনা; সুতরাং তাদের যে সমাজতত্ত্ব ছিল তা আমাদের সমাজতত্ত্ব হ'তে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; কেননা আমাদের সমাজতত্ত্ব একদিকে যেমন ব্যক্তিকে সমাজ-শক্তির নিতান্ত অধীন করে রেখেছে তেমনি অন্যদিকে এমন একটা অবস্থার কথা স্বীকার করা হ'য়েছে, যে অবস্থায় ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে, সর্ব্বপ্রকারে সমাজ-শৃঙ্খলা, সমাজ-শাসন ও সমাজ-শক্তির অতীত হয়ে থাকে। অতি-সামাজিক একটা অবস্থা প্রত্যেক মানুষের হতে পারে, আমাদের প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদ্ ঋষিরা এটা স্বীকার করে' গেছেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি যে আশ্রম চতুষ্টয় তাতে দেখতে পাই আগে ব্রহ্মচর্য্য, মধ্যে গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ। ক্রমে ক্রমে এই গুলির দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজশাসনের ভিতর দিয়ে, শুদ্ধি দ্বারা সংযত করে' মার্জ্জিত করে' নিয়ে, তার যে চিরন্তন মনুষ্যত্ব সে মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করে,' তারপর সন্ন্যাস অবস্থাকে ব্যক্তিত্বের একমাত্র শাস্তা, একমাত্র প্রভু, একমাত্র কর্ত্তা বলে গ্রহণ করেছেন। এই যে আত্মাশ্রয়ী সন্ন্যাসের অবস্থা তার কোন বন্ধন নাই, জাতি নাই, বর্ণ নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। যে সমুদয় সমাজ-বন্ধন মানুষটাকে অতি কঠোরভাবে বেঁধে রেখেছিল সে সকল বন্ধন থেকে সে তখন মুক্ত হয়; ইংরাজিতে যাকে বলে Law unto himself—সেই নিজেই তার আইন।

এই একটা অবস্থা, একটা আদর্শ, একটা তত্ত্ব আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনাতে প্রকাশিত ও কতক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে। এই আদর্শ ইউরোপে ফুটে উঠে নাই। ইউরোপের রোমান কাথলিক সমাজ আত্মাশ্রয়ী নয়, কঠোর সমাজশাসনে তাদের বাস ক'রতে হয়েছে। গ্রীস রোমের সভ্যতায় যে সমাজনীতি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমাজনীতি কাথলিক চার্চ্চে নূতন আকার ধারণ করে' ব্যক্তিত্বকে আয়ত্ত করেছে। আমাদের দেশে ব্যক্তিত্বের চেষ্টা অতি প্রাচীনকাল হ'তে হয়েছে। যে প্রশ্ন আলোচনা করতে এখানে দাঁড়িয়েছি এ প্রশ্নের আলোচনার আরম্ভ যে ভাবে চলেছে এবং এর মীমাংসার চেষ্টা যে ভাবে হয়েছে, ইউরোপ সেভাবে চেষ্টা করে নাই। মানুষকে দেবতার চক্ষে দেখার দরুণ মানুষের ব্যক্তিত্বের এমন একটা মর্য্যাদা ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এটা গৌরবের কথা। ভারতবাসী বলে', হিন্দু বলে' শতমুখে এ গৌরব চিরদিন করব। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা বলতে হবে—আধুনিক যুগে, আধুনিক সভ্যতা ও সাধনায় আমাদের নিকট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার যে আদর্শ ধরা হয়েছে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় তা তেমন ভাবে ধরা হয় নাই। আর, এই যুগে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে—যার জন্মোৎসব আমরা করতে এসেছি—৯৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৮ খৃঃ ৬ই ভাদ্র এই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়েছে—

এই সমাজে—রামমোহন যে আদর্শ ধরেছিলেন, সে আদর্শ ধরে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হয়েছে।

আমাদের প্রাচীনকাল থেকে, উপনিষদের সময় থেকে স্বাধীনতার একটা প্রেরণা যুগে যুগে ভারতবর্ষে এসেছে। উপনিষদের ধর্ম্ম আপনারা জানেন, পড়েছেন। এটা প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিকূলে একটা বিদ্রোহ। কতগুলি উপনিষদ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী আর কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহঘোষণা হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম্ম সে বিদ্রোহকে ফুটিয়ে তুলে আরো বিস্তৃত করে। তারপর খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস উত্তরোত্তর স্বাধীনতার ইতিহাসের নামান্তর মাত্র এটা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার সংবাদ আনলেন, যে আদর্শ আমাদের কাছে ধরলেন, সে আদর্শ আগে কেহ ধরে নাই। রাজা এই উপনিষদের দিকে দৃষ্টি রেখে, বৈদান্তিকভাবে সাধন করতে চেষ্টা করলেন। আপনারা রাজার গ্রন্থ পড়েছেন, তাঁর ছোট একখানি পুস্তিকা—যাতে ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যা-বন্দনা বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রথমেই একটা শ্লোক আবৃত্তি করতে হয়; ভগবানের উপাসনা করবার সময় ঈশ্বর ভজন করবার সময় উপাসক এবং ঈশ্বর সগোত্র স্বজাতি এটা অনুভব করতে হয়। যিনি আমা হতে নিতান্ত বিভিন্ন তাঁর ভজন আমার দ্বারা সম্ভব হয় না, সুতরাং আমার মধ্যে যদি ঈশ্বরত্ব না থাকে তবে ঈশ্বরের ভজন আমার দ্বারা অসম্ভব। আমার ভিতরে যা শ্রেষ্ঠতম বস্তু তাকে বাইরে দেখাবার জন্য, তাকে বাইরে ফুটিয়ে তুলবার জন্য, চরিত্রজীবনে প্রত্যক্ষ করবার জন্য চেষ্টা করতে পারি এবং তাই সত্য উপাসনা, সুতরাং এই যে ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্দনা তার প্রথম শ্লোকে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমি দেবতা, আমি ব্রহ্ম, আমি এই সংসারে সকল মায়া ভোগ ক'রবার জন্য সৃষ্ট হই নাই। আমি দেবতা, আমি কোন ইতর বস্তু নই। আমি ব্রহ্ম, আমি মৃত্যুর অধীন নই। আমার যে নিত্যস্বরূপ সেটা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আর আমি নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান্। মুক্তি আমার সাধ্য নয়। কথাটা হঠাৎ কেমন শুনায়। মুক্তি আমার নিত্য-সিদ্ধ, তবে আমায় কি ক'রতে হবে? কতকগুলি আবরণ দ্বারা আমার নিত্যমুক্তস্বভাব আবৃত হয়ে রয়েছে—এটাকে তাঁরা মায়া বা অজ্ঞানতা বলেছেন—আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান এ জ্ঞান অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, সুতরাং এই অজ্ঞানতা দূর করতে হবে, ইহাই সাধন ভজনের লক্ষ্য। অজ্ঞানতা দূর হলে মুক্তি সাধনার পথ সুগম হয়। মুক্তি কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় না। মুক্তি বৈদান্তিক ভাষায় 'জন্য' বস্তু নহে, কোন ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মুক্তি লভ্য নহে,

দান দ্বারা নহে, ধ্যান দ্বারা নহে। মুক্তির পরিপন্থী আমার মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে দান ধ্যানাদি দ্বারা সরিয়ে দেওয়া মাত্র, অজ্ঞানতা বা মায়াকে দূর করা মাত্র, আমার সত্য যে স্বরূপ সে স্বরূপ প্রকট হয়; তখন দেখি আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান্, এই নিত্যমুক্তস্বভাব, এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য রাজা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহ্বান করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাজা অন্য একটা কার্য্য করেছেন। তিনি বলেছেন —আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ এটা যখন উপলব্ধি করব, তখন আমি স্বাধীন হব, যখন আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধি করব তখন স্বাধীন হব।

রাজা যখন এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংবাদ আনলেন, তখন তিনি এই স্বাধীনতাকে সমাজশাসনের ভিতর দিয়ে এবং সমাজ শাসন মানুষকে যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি এই জন্য একেবারে সমাজদ্রোহী হয়ে উঠেন নাই, শাস্ত্রাদিও একেবারে বর্জ্জন করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রাদির নূতন, সর্ব্বব্যাপক এবং ক্রমশঃ উন্নতিশীল ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে শাস্ত্রাধিকারের একটা সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের যে একটা অধিকার, শক্তি ও শাসন আছে তারও সমন্বয় করবার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টার কিন্তু তখনো সময় আসে নাই। সমন্বয় চেষ্টা তখন হয়, যখন বিরোধ পেকে উঠে; রফার সময় তখন আসে, যখন দুই পক্ষ—বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষ—আপন দাবীর চরম সীমা পর্য্যন্ত বুঝতে পারে; তার আগে রফা হয় না। অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে নালিশ যখন রুজু হয়, সেই নালিশ রুজু করবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ সুলেনামা করতে বসে না। একবার পরীক্ষা করে দেখে। যে বাদী সে বলে, আমার সাড়ে সতের আনা পাওনা; যে প্রতিবাদী সে বলে এক পয়সাও পাওনা নাই; তারপর ক্রমশঃ যখন বিবাদ পেকে উঠে, উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের শক্তি ও অধিকারের প্রকৃত ওজন জানতে পারে, তখন স্বদর্দ্ধং মদর্দ্ধং—তুমি কিছু ছাড় আমি কিছু ছাড়ি, এখন আমাদের রফার সময় এসেছে। সমন্বয়ের আরম্ভ তাই।

এই যে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা আর সমাজের যে অধিকার এই দুয়ের সমন্বয়ের সময় তখন আসে নাই। কেন না ব্যক্তিত্ব তখনো প্রকৃষ্টরূপে প্রচেষ্টিত হয় নাই। রাজার সময় লোকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়েছিল, শাস্ত্র যে কিছু নয় তখন লোকে একথা বলতে সাহস পেত না, সুতরাং সে সময় তিনি সমন্বয়ের যে চেষ্টা করেছিলেন তাহাতে ভবিষ্যতের পথ মাত্র দেখিয়ে গিয়েছেন, তখনকার উপযোগী কার্য্য তাঁর দ্বারা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফল পরে ফলিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে শাস্ত্র বর্জ্জন করে' শাস্ত্রীয় অধিকার, শাস্ত্রীয় প্রমাণ অস্বীকার করে' ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বল্লেন বেদাদি কিছু নয়, আত্মপ্রত্যয়—আমার ভিতর যে সদসদ্ বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধিই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে আমার একমাত্র কষ্টিপাথর। আমার কাছে কি সত্য কি অসত্য শাস্ত্র তা বলতে পারে না, আমার

বুদ্ধিই কেবল তা বলতে পারে, আমার বিচারশক্তি বলতে পারে ; ইংরেজীতে যাকে reason বলে সেই reason বলতে পারে—এ সত্য, এ অসত্য। এই বলে তিনি শাস্ত্র বর্জ্জন করলেন, মানুষের মনকে শাস্ত্রের বন্ধন হতে মুক্ত করলেন।

কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোনটা সনাতন, কোনটা সাময়িক, এ বিচার করতে হলে আগে বলা হত—শাস্ত্রের কাছে যাও। মহর্ষি বল্লেন তা নয়, শাস্ত্র আমার জন্য রচিত হয়েছে, শাস্ত্রের জন্য আমি রচিত হয় নাই, শাস্ত্রের বিচারক আমি, আমার বিচারক শাস্ত্র নহে, আমার বুদ্ধি শাস্ত্রের উপরে, আমার বুদ্ধি যা সত্য বলে' বলে না, শত শাস্ত্রবাক্যেও সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে হল, এটা বাংলার বৈশিষ্ট্য। এই যে স্বাধীনতা এটা বাংলার বৈশিষ্ট্য। আমাদের বাংলার সাধনার, ধর্ম্মের ও চিন্তার সঙ্গে এ কথাটা একটা নিত্যবস্তুরূপে আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখতে পাই। শাস্ত্রের কথা না বলছিলাম? আমাদের দায়ভাগ-নিবন্ধকার জীমূতবাহন হাজার বৎসর আগে বলেগেছেন—তখন তো আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা উঠে নাই—জীমূতবাহন বলে গেছেন, শত শাস্ত্র বাক্য দ্বারাও বস্তুর বস্তুত্ব বিপর্য্যস্ত হয় না, অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রবাক্য দ্বারা তাহা কখনও বিপর্য্যস্ত হতে পারে না।

মহর্ষিও বল্লেন—আমার আত্মপ্রত্যয় যাকে বড় বলে' ধরে, শাস্ত্রবাক্য দ্বারা তার প্রমাণ কখনও নষ্ট হবে না। তার পর বল্লেন, কেবল নিজের বিচারকে, বুদ্ধিকে শাস্ত্রাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করলে চলবে না, প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মবুদ্ধিকে সমাজশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

প্রথম সংগ্রাম ব্যক্তির বুদ্ধিকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানকে, ব্যক্তির কর্ত্তব্যকে ব্যক্তির কর্ম্মকে শাস্ত্রের শাসন হতে মুক্ত করল, এটা বিশেষভাবে মহর্ষির কাজ। কেশবচন্দ্রের সময় দ্বিতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হল, যে সংগ্রামের ফলেতে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুচরগণ আদিব্রাহ্মসমাজ হতে পৃথক হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম সোপানে স্বাধীনতার বিকাশ, শাস্ত্রের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য বর্জ্জন, দ্বিতীয় সোপানে কেশবচন্দ্রের দ্বারা বিবেক, ইংরেজীতে যাকে conscience বলে, কর্ম্মেতে তার প্রাধান্য স্বীকার। আগে ছিল জ্ঞানে সদসদ্‌ বিচার, আত্মবুদ্ধির প্রাধান্য, এখন হল কর্ম্মেতে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মবুদ্ধির প্রাধান্য—আমি যাকে ভাল মনে করি আমি তাই কেবল অনুসরণ করব, যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এসে বলে এ অনুসরণ করতে পারবে না সে কথা মানব না। আমি যে পথে চলেছি সেটা অমঙ্গলের পথ, অন্যায়ের পথ, অনাচারের পথ, পাপের পথ যদি বুঝিয়ে দিতে পার, অবনত মস্তকে স্বীকার করব, কিন্তু যতক্ষণ না বুঝিছি, আমার বিচারে আমার বুদ্ধিতে আমার ভিতর যে পরমাত্মা বিরাজ করছে তিনি যতক্ষণ না বলবেন এটা অসত্য, ততক্ষণ আমি যাকে সত্যপথ বলে ধরেছি, তোমার আদেশে কখনও তা বর্জ্জন

করতে পারব না, সে তুমি সমাজই হও, রাজাই হও, তোমাকে মানব না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি একত্র হয়ে আমার বিবেককে শাসন করতে চায় আমি তার সম্মুখীন হব। যা যাবে প্রাণ, বিবেকের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, আমি প্রাণ দিতে রাজী আছি, আমার বিবেকের স্বাধীনতার জন্য আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছি কিন্তু আমার ধর্ম্মকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেশবচন্দ্র এই দ্বিতীয় সংগ্রাম ঘোষণা করলেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে—বাংলার নবযুগের স্বাধীনতার ইতিহাসে—কেশবচন্দ্র এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করলেন। এটা ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজীর সাধনার ফল।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল, প্রাচীনকালে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটা অন্য জাতীয় ছিল। বর্ত্তমান যুগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে নূতন স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারিত হল, ফরাসী বিপ্লব যার ফল, সে আর একটা জিনিষ। আমরা যখন ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করলাম তখন সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য ও সাধনা এই ফরাসী স্বাধীনতা মন্ত্রের মোহে আবদ্ধ হয়েছিল, ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী ইতিহাস তখন ফরাসীভাবে অনুপ্রাণিত ছিল, সুতরাং আমরা ইংরেজীশিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়ে, নূতন ভাবে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সমাজে, পরিবারে সর্ব্বত্র গড়ে তুলতে আরম্ভ করলাম। ব্রাহ্মসমাজ সেকালে ব্যক্তিপ্রধান ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মন্দির ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বর্জ্জন করলাম, রইল কি? Intuition, আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের একটা অর্থ আছে, তার একটা সার্ব্বজনীন ভূমি আছে, সকলে সে ভূমি লাভ করতে পারে না, অধিকাংশ লোক মনে করে, আমি যা ভাবি তাই বুঝি আমার আত্মপ্রত্যয়, আমি যা কল্পনা করি তাই বুঝি আমার আত্মপ্রত্যয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—opinions may be many but truth is one. প্রকৃত সত্য যে আত্মপ্রত্যয়, সে one truth দেখিয়ে দেয়, তার নীচে আমাদের মানসী ক্রিয়া যা আমাদের intellectuation এর ফল, তা বহু বস্তুকে প্রতিফলিত করে, বহু বস্তুকে আমাদের কাছে ধরে সেটা সত্য নহে, সত্যাভাস। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যখন শাস্ত্রাদি বর্জ্জন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—হেতুবাদ বা যুক্তিবাদের উপর দাঁড়ালেন, ইংরেজীতে যাকে বলে ratiocination—তখন একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হল। কেননা আমি যা ভাবি সত্য আমার কাছে তাই সত্য, আপনি যা ভাবেন সত্য আপনার কাছে তাই সত্য, সুতরাং আমার একটা সত্য আপনার আরেকটা সত্য হ'ল, এখানে সত্যের একটা স্থায়ী সার্ব্বজনীন ভিত্তি পাওয়া গেল না। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ, আমাদের ধর্ম্মটা মতবাদে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হল, উৎকট ব্যক্তিত্ব ব্রাহ্ম সমাজে গজিয়ে উঠল। কেশবচন্দ্র দেখলেন বড় ভয়ের কথা, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠে, সকলে যদি বলে আমার মনে যা হয় তাই আমার আদর্শ, এ রকম আদর্শবাদে কুলাবে না; আপনি আপনার ভিতর যে আদর্শ

পেয়েছেন আমি যদি তার প্রতিকূলে একটা আদর্শ পাই, তবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা নির্ণয় করবে কে? হ'ল না। Subjective রয়ে গেল। তারপর তিনি একটা মীমাংসা করতে চেষ্টা করলেন, সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজবন্ধনের সমাজশাসনের একটা রফা করবার চেষ্টা করলেন, Apostolic Durbar প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন। রোমের কাথলিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ যাঁরা, গুরুস্থানীয় যাঁরা তাঁরা সকলে একত্র হয়ে দিবারাত্র প্রার্থনা করে যখন সকলের মত এক হয়ে যায়, তখন তাঁরা মনে করেন যীশুর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়া গেছে। কেশবচন্দ্র তাই করলেন। প্রেরিত-মণ্ডলীর সকলে মিলিত হয়ে যখন একবাক্যে কোন ব্যাপারকে বা কোন বিষয়কে ঈশ্বরাদিষ্ট বলে প্রচার করবেন, তখন তাকে প্রামান্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু এই দরবারেও ব্যক্তি ও সমাজ সমস্যার মীমাংসা হ'ল না।

কেশবচন্দ্রের পরে একটা উপায়ে তাহা মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ গঠনের বা constitution এর ভিতর দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইএর ভিতর একটা সামঞ্জস্য করবার জন্য একটা constitution গঠিত হ'ল। কিন্তু constitution দ্বারা এর মীমাংসা হ'ল না। সমস্যাটা আমাদের কাছে এখনো রয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজ দুইএর একটাকেও অগ্রাহ্য করতে পারি না, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা মত আছে, যেমন একটা বিচার আছে, বিবেক আছে, তেমনি সমষ্টিভাবে যে সমাজ তারও একটা মত আছে, বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, বিবেক আছে। Individual conscience যেমন একটা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে social conscience ব'লেও একটা জিনিষ আছে। Individual স্বাধীনতার যেমন একটা অধিকার আছে তেমনি সমষ্টিগত সমাজ শাসনের একটা অধিকার আছে। এটা যদি অস্বীকার করি তাহলে একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয় তেমনি অন্যদিকে সমাজশৃঙ্খলা নষ্ট হয়, আর শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তির সার্থকতালাভ সম্ভব হয় না। আমাদের সমাজশৃঙ্খলা আছে বলেই আমরা জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার অবসর পাচ্ছি, আমাদের খুসীমত, পছন্দমত খেয়ালমত নিজের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সুবিধা পাচ্ছি। সমাজশৃঙ্খলা আছে বলে আমি স্বাধীনভাবে আমার মত প্রচার করতে পারছি, সমাজশৃঙ্খলা আছে বলে' আমি সাক্ষাৎ ভাবে আমার উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করতে পারছি, সমাজশৃঙ্খলা আছে বলে আমার পরিবারে শান্তি ও সমন্বয় রক্ষা হচ্ছে, সুতরাং মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য যেমন ব্যক্তিগতস্বাধীনতা তেমনি সমাজশৃঙ্খলা রক্ষাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তি ও সমাজের কথা ভাবতে গেলে অনেক কথা ভাবতে হবে। আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু স্বাধীনতা কাকে বলে? যারা বনে জঙ্গলে ফেরে তারা আমাদের চাইতে ঢের বেশী স্বাধীন। সমাজ কালে যেখানে গড়ে উঠে নাই সেখানে লোকে বেশী স্বাধীনতা

ভোগ করে, তাদের আইনকানুন সাক্ষাৎরূপে সূক্ষ্মগতিতে ঘোরেনা, জীবনের কর্ম্ম বিভিন্ন খাতে যায়না। অনেক স্বাধীন অসভ্য সমাজের লোক আছে; এই ভারতবর্ষেও কোন কোন স্থানে পার্ব্বত্য জাতি আছে, আমাদের মত তারা সমাজবন্ধনে আবদ্ধ নয় তারা বহুল পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা কি স্পৃহনীয় জিনিষ? আমরা যে সংকীর্ণতর উন্নততর স্বাধীনতা ভোগ করি তার মূল্য কি অনেক বেশী নয়?

তারপর, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? গ্রীসে ব্যক্তিকে অঙ্গরূপে দেখ্‌ত, সমাজকে অঙ্গীরূপে দেখ্‌ত। রোম গ্রীসের কন্যা ছিল—সমাজকে বৃক্ষরূপে দেখ্‌ত, ব্যক্তিকে সে বৃক্ষের শাখারূপে দেখত, সমাজজীবনের সার্থকতা ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির জীবনের কোন সার্থকতা ছিল না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর হইতে এই প্রাচীন বিধান নষ্ট হয়ে গেল। Human Personality বলে একটা জিনিষের প্রতিষ্ঠা হল, প্রত্যেক মানুষের যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব শক্তি আছে, অধিকার আছে, একথা খৃষ্টধর্ম্মে সেখানে প্রথম শিখান হল। তারপর, Human personalityর বিকাশ ইউরোপীয় ইতিহাসে হয়েছে, সমন্বয় এখনো হয় নাই। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন সমাজের কথা হলে লোকে বলত সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি মিলে সমাজ হয়েছে। কথাটা অর্দ্ধ সত্য, পরিপূর্ণ সত্য নয়। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বটে, অথচ ব্যক্তির সমষ্টি বলতে যা বুঝি সমাজ একান্ত তা নয়। যেমন পাটীগণিতের ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০ বলি এই দশ এক জাতীয় একত্ব, এই দশ আর ইনি, উনি, তিনি যারা সকলে মিলে সমাজ হয়ে দাঁড়াই, তা অন্য জাতীয় একত্ব। একটা হল mechanical unit—কেবল সংখ্যা গণনার একত্ব, সমাজ যেটা সেটা organic unit। এই জন্য সমাজকে অঙ্গী বলেছে ব্যক্তিকে সমাজ অঙ্গীর অঙ্গ বলেছে। প্রাচীনকালে এটা মেনে নিয়েছে কিন্তু এখন আর একটা কথা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এই যে অঙ্গী আর এই যে অঙ্গ এতে পার্থক্য কি? সমাজরূপ অঙ্গীর সকলে অঙ্গ, কিন্তু তারা কেবল অঙ্গই নয়; social organism, কেবল organ নয়; এখানে সমাজতত্ত্ব তার একটা বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত; আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, আমার মন বুদ্ধি প্রীতি রঞ্জনীবৃত্তি এই সকলের কর্ত্তা আমি, এই সকলের ভিতর দিয়ে জীবনের চরম সার্থকতা অন্বেষণ করি, এবং লাভ করি, এখানে আমি অঙ্গী। সমাজের অঙ্গ বলে আমি চক্ষুর মত অঙ্গ নাই, আমি অঙ্গীস্বরূপ সমাজের অঙ্গ, সমাজ যেমন বৃহত্তর অঙ্গী আমি সেইরূপ বৃহত্তর সমাজের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর অঙ্গী। আমি অঙ্গী না হইলে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা হতে পারেনা। এটা সামাজিক চিন্তাতে নূতন কথা, সুতরাং আগে যে বলা হত, যে কতগুলি ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ, তাও বলতে পারিনা। সমাজ তার চাইতেও বেশী; সমষ্টিস্বরূপ সমাজের একটা ব্যক্তিত্ব আছে Society is a being Humanity is a being—সমগ্র মানবসমষ্টি একটি সত্তা—সে কেবল

কতকগুলি মানুষের বা জাতির সমষ্টি নহে, তার নিজের লক্ষ্য আছে, প্রেরণা আছে, নিজের একটা শক্তি আছে, সার্থকতা আছে। কেবল কতকগুলি মানুষের সমষ্টিই সমাজ নয়। ঘোড়দৌড়ের সময় গড়ের মাঠে অনেকগুলি লোক একত্র হয়, তারা সমাজ নয়; জাহাজে কত লোক যায়,—লুসিটেনীয়া প্রভৃতি নূতন জাহাজ হওয়ায় হাজার হাজার যাত্রী তাতে যায়—এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে বসে, একত্র খেলা করে, গল্পগুজব করে' ৫।৭।১০ ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, আটলাণ্টীকের বুকেতে—তারপর প্রভাতে যখন New York বা অন্য কোথাও জাহাজ লাগল, কে কোথায় গেল তার ঠিকানা নাই। এটাকে ঠিক সমাজ বলব না। সমাজ বলব তাকে, যার সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, যেমন মার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ; যে সমাজকে পরিত্যাগ করে আমার জীবনের সার্থকতা অসম্ভব হয়; মায়ের ভিতর থেকে যেমন শিশু স্তন্য পান করে তেমনি যাহার ভিতর দিয়ে আমার শক্তি আমি আহরণ করছি; সেই সমাজের সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এই যে ভাষা বলছি, কে দিল? এই সমাজ-মাতৃকা আমার কণ্ঠে তাকে দিয়েছে। ভাব কে দিল? এই সমাজমাতৃকা মায়ের মত এই সকল ভাব আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছে। এই যে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করি কে দিল? সমাজমাতৃকা হতে এই সকল শিক্ষা করেছি। আমার পিতামাতার নিকট যেমন শরীরের শক্তি, জীবনী শক্তি লাভ করেছি তেমনি সমাজমাতৃকার নিকট হতে আমার যা কিছু মনুষ্যত্ব তা লাভ করেছি। এই সমাজে যদি না জন্মগ্রহণ করতাম, যদি আমি মাংসভোজী কোন নগণ্য মনুষ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে যে সভ্যতা ও সাধনার স্পর্দ্ধা করে' আনন্দ সম্ভোগ করি কোথায় পেতাম সে আনন্দ? আমার পক্ষে সে আনন্দ সম্ভব হতনা। সমাজের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন ঋণে ঋণী যে ঋণ শত জন্মেও শোধ হয়না। সমাজ খাতের ভিতর দিয়ে সভ্যতার ধারা, জ্ঞানের ধারা, সাধনার ধারা, আনন্দের ধারা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে জীবনের সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সুতরাং সমাজকে অগ্রাহ্য করলে চলবেনা। আবার ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করলেও চলবেনা। ব্যক্তিকে ফুটিয়ে দিয়ে সমাজকে ফুটোতে হবে, আবার সমাজকে ফুটিয়ে দিয়ে ব্যক্তিকে ফুটোতে হবে, এটা আমাদিগকে বুঝতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজের শক্তি ক্ষুন্ন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ সমাজকে অগ্রাহ্য করে চলেছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তার সাধনা ও সভ্যতার মূলমন্ত্র। এখন ব্যক্তিত্ব নাই, সমষ্টিগত সমাজশক্তির সাধনা করতে আমরা আরম্ভ করেছি। আমরা একপেশে হয়ে গেছি, জগতের গতি এখন একটু উল্টোদিকে চলেছে, সমষ্টিগত যে বিজয় তাই এখন প্রধান জিনিষ, জার্ম্মেণী তার প্রমাণ। জার্ম্মেণ সাধনা ব্যক্তিকে নিষ্পিষ্ট করে, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তার ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করে তাকে মনুষ্যত্ববিহীন করে তুলেছে। এ'তো অবশ্যম্ভাবী, জার্ম্মেনীর কোন দোষ নাই। যদি সর্ব্বদা লড়াইয়ের কথা ভাবতে হয় তাহলে সমরের আয়োজন করতে হবে। সমরের

আয়োজন করতে হলে, মানুষকে নিয়ে সংগ্রাম করতে হলে সংগঠন করতে হবে, মানুষকে অহোরাত্র ছুটাছুটি করতে হবে। এইজন্য জার্ম্মেনীর কি হল ? মানুষ নষ্ট হয়ে organisation বাড়তে আরম্ভ করল, organisation এর নাম হল State. Everything for the state, ব্যক্তি যেন কিছু নয়, রাষ্ট্র বা State এর জন্যই সমস্ত। জন্মিবামাত্র কে কোন্ দিকে State এর কাজ করবে সেদিকে চালিয়ে দিতে হবে, কে কোন দিকে কোন অস্ত্র অভ্যাস করবে, State তাকে সেদিকে চালিয়ে নেবে, তারপর সকলকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যখন কোন একটা সংগ্রামের অবস্থায় কোন জাতি এসে দাঁড়ায়, চারিদিকে যখন সে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে, সর্ব্বদা ভাবতে হয় আপনাকে কি করে বাঁচিয়ে রাখবে, তখন এরূপ ভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে আততায়ীর আততায়িতা নিবারণের জন্য আপনাকে সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পিষ্ট করতেই হয়। জার্ম্মেনী সে পথে গিয়েছে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে কোন সমাজ আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না, এতে মানুষ ক্রমে যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এমন অবস্থা আসে যে মানুষের ভিতরটা একেবারে বিদ্রোহী হয়ে বলে—"আমি যন্ত্র নই,আমি কেবল বন্দুক ধরতে আসিনি, আমি কেবল লড়াইয়ের জন্য জন্মিনি, কেবল আততায়ীকে নষ্ট করতে জন্মিনি, আমি কেবল শত্রুর উপর জয়পতাকা উড্ডীন করতে জন্মিনি, আমার নিজস্ব স্বার্থকতা আছে, আমার বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধির বিকাশ দ্বারা আমার মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লাভ হবে, আমার ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা আমার চরিত্রের স্বাধীনতা দ্বারা আত্মবিকাশ লাভ হবে ; আমার ভিতরে রঙ্গিণীবৃত্তি আছে সে বৃত্তির বিকাশের দ্বারা জগতের সভ্যতা সম্ভোগ ক'রতে পারি। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্—আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করলে চলবেনা।" এতে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে, জার্ম্মেনীর তাই হয়েছিল, ইউরোপের অন্যস্থানেও তাই হয়েছিল।

ভগবানকে দুইভাবে সাধনা করা যায়, আধুনিক ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, ফরাসী ও ইংলণ্ড জার্ম্মেনীকে শত্রুভাবে সাধন করেছে, জার্ম্মেনী কি করছে না করছে তার ভয়ে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, একদিকে আত্মরক্ষার চেষ্টা অন্যদিকে একটা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা এ সবাই করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি ঐ পথে যাব ? আমরা কি স্বরাজের নামে জার্ম্মেণীর পথে যাব ? ইংরেজের সঙ্গে যদিও লড়াই করতে হবে—যদিও সে যুদ্ধ কেবল বাগ্‌যুদ্ধ, মসীযুদ্ধ -তাই বলে organisation করব আর মানুষ মারব ? Conscience নাই, বিবেক নাই ? Discard your conscience—এই বলে জাতিটা গড়তে চেষ্টা করব? এতেই কি স্বরাজ হবে ? প্রত্যেক মানুষকে যদি মানুষ করতে পারি, তাহলে জাতি বাঁচবে, তা নইলে জার্ম্মানী যে পথে নষ্ট হয়েছে, ইউরোপ যে পথে ধ্বংসের দিকে চলেছে, আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ, আর্য্যদের

প্রিয়ভূমি ভারতবর্ষ, আধ্যাত্মিক সাধনার সনাতন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সেইপথে গিয়ে নষ্ট হবে। যেখানে মানুষকে দেবতা বলে দেখেছে সে ভারতবর্ষে মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে সামান্য ইংরাজ আমলাতন্ত্রের উপর জয়লাভ করবার জন্য আমি কি দেশের যুবকবৃন্দকে ও অপর লোকদিগকে বল্‌ব—"তোমরা বিবেক বিসর্জ্জন কর, তোমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন কর, মনুষ্যত্ব চেওনা, স্বরাজ্যের দিকে ছোট।" ওপথে স্বরাজ যদি পাওয়া যায় সেটা স্বরাজ হবেনা, এক আমলাতন্ত্রের পরিবর্ত্তে আর এক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, একদল মুষ্টিমেয় মানুষ যারা আমাদিগকে শাসনে রেখেছে তাদের পরিবর্ত্তে আরএকদল আসবে, তাদের রঙ্গ বদ্‌লে যাবে, সাদার পরিবর্ত্তে কালো পাব' আর কিছু পাবনা।

যদি স্বরাজ পেতে হয়, যদি স্বাধীনতা পেতে হয়, তাহ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অন্তরের মধ্যে। সেই স্বরাজ কি? প্রথম স্বরাজ্য তার বুদ্ধি, দ্বিতীয় স্বরাজ্য তার বিবেক বা conscience, তৃতীয় স্বরাজ্য তার পরিবার পরিজন, চতুর্থ স্বরাজ্য গোষ্ঠী, এর উপর তাকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ব্যক্তিকে, পরিবারকে স্বাধীন করতে হবে, গোষ্টীকে স্বাধীন করতে হবে, জাতিকে স্বাধীন করতে হবে। একজন যদি পরাধীন থাকে, আপনার প্রতিবেশী যদি অধীন থাকে, ভয়ের অধীন থাকে, লোভের অধীন থাকে, ততক্ষণ আমার সমাজ স্বাধীন হবেনা। ইউরোপ তাই স্বাধীনতা পায় নাই, আমেরিকা স্বাধীনতা পায় নাই, যে স্বাধীনতার ছবি দেখে প্রথম যৌবন হতে ছুটেছি সে স্বাধীনতা ইউরোপে দেখি নাই, সে স্বাধীনতা আমেরিকায় দেখি নাই, কেবল আশা করছি, কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি—"হে ঠাকুর! এই প্রাচীন ভারতবর্ষে তুমি সে স্বাধীনতার ইতিহাসকে যদি প্রত্যক্ষীভূত কর! তা হবে না কি? যদি হতে হয়, তাহলে মানুষগুলিকে মানুষ করতে হবে, মানুষগুলিকে স্বাধীন করতে হবে, আমি যা সত্য বুঝব তার অন্বেষণ আমি করব; দুনিয়া যদি তার প্রতিবাদী হয় তবু শুন্‌ব না। আমি যখন ভুল বুঝ্‌ব সে ভুল আমি সংশোধন করব কিন্তু—

যদি না দেখ আপন নয়নে
বিশ্বাস না কর কভু গুরুর বচনে

কর্ত্তাভজাদের কথা—বাংলা দেশের নিজের কথা যা নিজে না বুঝি তা মানব না। আর এই যে organisation এ সংঘাতিক বস্তু, ইউরোপে organisationএর organ নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সমুদয় সাধনচেষ্টা বাহ্যমুখীন হয়েছে। মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে তারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। আমরা ইউরোপকে ঘৃণা করি, আমরা ইউরোপের অনুকরণ করতে চাই না, মুখে বল্লে হবে না। যদি ইউরোপের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হতে হয়, সত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে; মানুষের ভিতর যে দেবতা

আছে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, নির্দ্ধারণ করতে হবে, শিক্ষা করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানুষের মধ্যে আছে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাহলে যাকে নব বৃন্দাবন বলি, Kingdom of Heaven on Earth বলি, স্বর্গরাজ্য বলি, স্বরাজ্য বলি, তা প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য কোন পথে হবেনা, হবার সম্ভাবনাও নাই। *

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

দীপ ও ধূপ

সন্ধ্যা নামে, ওগো কুটীর-বাসিনি,
ত্বরায় তোমার প্রদীপ জ্বালে',
তব সদনের সম্মুখের পথে
পড়ুক তা হ'তে একটু আলো।

ধুনুচি তোমার আগুনে ভরিয়া
খোলা দরজার আড়ালে রেখে
ঢালো তাহে ধূপ, দিক তার ধূঁয়া
বাহিরি বায়ুরে সুবাস মেখে।

কখনো পথিক নিশার আঁধারে
সোজা পথ ছেড়ে বেড়ায় ঘুরে,
লোকালয় খুঁজি না পেয়ে ঠিকানা
কাছ হতে যায় ক্রমশঃ দূরে।

ক্ষীণ প্রদীপের এ আলো তোমার
যদি দৈবগুণে নিশানা হয়,
তোমার ধূপের বাসে মোদিত
যদি ক্ষণতরে দাঁড়ায়ে রয়,

(ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে ৮ই ভাদ্র তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী গৃহীত শর্টহ্যাণ্ড নোট হইতে)

যদি ধীরে ধীরে তোমার দুয়ারে
পথের ঠিকানা সুধাতে আসে—
ঈষৎ আড়ালে রাখ ধূপাধার
খোলা কপাটের ডাহিন পাশে।

হোক্ ক্ষীণ আলো, জেলে সলিতায়
ভরে রাখ তব প্রদীপখানি,
অন্ধকার রাতে যে যে পথ চলে,
কোথা গিয়ে পড়ে কেমনে জানি ?

শ্রীকামিনী রায়

চীন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা

আমাদের দেশে আমরা চীনাকে মিস্ত্রী ও মুচিরূপে দেখিতেই অভ্যস্ত। ইহারা নোংরা থাকে এবং আরশুলা খায়, এই কথাই জানি। এই জাতির সভ্যতা যে কত পুরাতন, ইহাদেরও যে এক অতুল সাহিত্যসম্পদ রহিয়াছে, সে খবর হয়তো অনেকেই রাখিনা। অনুবাদের মধ্য দিয়াও যাঁহারা এই জাতির সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা এই জাতির হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিয়া ও ইহাদের ধমনীতে প্রবাহিত রসতরঙ্গলীলা দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের উত্থানপতনের বৈচিত্র্যের ভিতরে এই জাতির হৃদয়ে যে আশা ও আকাঙ্খা, প্রেম ও বিরহ, আনন্দ ও বেদনা খেলিয়া গিয়াছে ইহাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবার একটু পথ পাইলে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে।

অন্য সকল দেশের মত চীন দেশেও প্রাণের ভাষা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে কবিতার মধ্য দিয়া। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথম চীন সাহিত্যের রেখাপাত দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয়কুলের জীবনকথা, কৃষকের আশা ও আকাঙ্খা, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কথা, হাসি ও কান্না লইয়াই প্রথম চীন সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। অপর জাতির মধ্যে আমরা যেসকল প্রাথমিক গাথা পাই তাহার কথাবস্তু সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্য্য; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, চীন জাতির মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের গীতিকবিতা শান্তির ভাবে পরিপুর্ণ। কেমন একটা সন্তোষ ও আত্মপ্রসাদের রসে এই যুগের চীন সাহিত্য ভরপুর—কেবল মাঝে মাঝে সেই বিরাট শান্তির নিরবচ্ছিন্নতা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে গভীর নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, কখনও বা উচ্ছল আনন্দের চঞ্চল কলরব।

কিন্তু তাঙ্ যুগই সত্য সত্য চীন সাহিত্যের গৌরবের যুগ। এই যুগেই আমরা লীপো, তুফু ও পোচুই এই তিন কবিকে পাই—যাঁহারা তাঁহাদের যশঃগৌরবে চীনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কেবল দুই একটি নাম মাত্র উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ শতাব্দীতে চূয়ুয়ান নামক এক কবির নাম দেখিতে পাই। ইনি প্রথমে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন, পরে নির্ব্বাসিত হইয়া মিলো নদীতে প্রাণত্যাগ করেন। চান্দ্র বর্ষের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে এখনও তাঁহার স্মরণার্থে ড্রগন-নৌপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস তাঁহার মৃতদেহের সাম্বৎসরিক অন্বেষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হ্যান বংশীয় রাজারা চীনের সিংহাসনে আরূঢ় হন। চারিশত বৎসর কাল তাঁহারা চীনে রাজত্ব করেন। এই চারিশতাব্দী চীন জাতিকে এমন আশ্চর্য্য ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যে তাহারা এখনও হ্যান পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। এই বংশের সম্রাটগণ সকলেই নিজেরা সাহিত্যিক ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। নানাপ্রকার ললিতকলা এই বংশের রাজত্বকালে সমৃদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মও এইসময়ে চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে চীন সাহিত্য হইতে আনন্দবাদ নির্ব্বাসিত হয়।

তৃতীয় খৃষ্টাব্দে "বংশ কুঞ্জের সপ্তর্ষি" নামক কবিসংঘ চীনের সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বন্ধুদলের বিশেষত্ব এই ছিল, যে তাঁহারা একাধারে সাহিত্যিক, কবি, গায়ক ও দার্শনিক ছিলেন। গুণের মধ্যে আরও একটী ছিল, তাঁহারা মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের জীবন ছিল ওমরখৈয়ামী প্রকৃতির। খাও, দাও; হাস, খেল, জীবনটা দুদিন বৈত নয়। ভাবিয়া কি হইবে বল? মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সকল প্রচেষ্টার অবসান হইবে।—'বংশকুঞ্জের সপ্তর্ষি মণ্ডল' দীর্ঘ রাত্রির অন্তে বৈতালিকের ন্যায়

চীনের স্বর্ণযুগের আবাহন সঙ্গীত গাহিয়া ছিলেন। তাঁহাদের ক্ষীণকণ্ঠে যে কাকলি ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই তাঙ্ যুগে আসিয়া মধুরতর, গভীরতর ও পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল। শুধু তিন শতাব্দীকাল তাঙ্ রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই তিন শতাব্দী চীনের সাহিত্য ভাণ্ডারে যে রত্ন দান করিয়াছে তাহা অমূল্য। এই যুগের কবিদিগের সৌভাগ্য যে তাঁহারা মিঙ্-হোয়াঙ্ এর মত সাহিত্যপ্রেমিক রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। * প্রেম তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তিনি রাজাহিসাবে বা যোদ্ধা হিসাবে কিছুই ছিলেন না বলিলেই হয়। কিন্তু সেই রাজার কি সৌভাগ্য যাঁহার সমসাময়িক ছিলেন লীপো ও তুফ্, কবিতা প্রস্তরীভূত হইয়া যাঁহার চেঙান রাজভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সর্ব্বোপরি প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আধাররূপিনী, সহস্র কবিতার বিষয়ীভুতা তাইচেন ছিলেন যাহার মহিষী! কোথায় আজ সেই চেঙান রাজপ্রাসাদ—সূর্য্যাস্তের স্তিমিত রশ্মিতে যার তিন সারি প্রাচীর সুবর্ণের ন্যায় কিরণ বর্ষণ করিত—কোথায় সেই মর্ম্মররচিত হর্ম্ম্যরাজি যার গগনস্পর্শী চূড়া সকল উজ্জ্বল নীলাকাশে শোভমান হইত—কোথায় সেই কুঞ্জভবন—কোথায় সেই তোরণদ্বার? কোথায় সেই হ্রদবক্ষে ভাসমান গীতিমুখর নাট্য-মন্দির? একদিন ছিল যখন চেঙানের নীল হ্রদের তীরবর্ত্তী পুষ্পিত কুঞ্জান্তরালে তাইচেন তার সুললিত বীনাঝঙ্কারে গন্ধ-ভার-মন্থর পবনকে হিল্লোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন —আর তার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়াছিলেন সম্রাট মিঙ্‌হোয়াঙ্। তাহার পর কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু লীপোর চোখে চোখ দিয়া আমরা আজও দেখিতে পাই সেই প্রেম ও সৌন্দর্য্য, যাহার তুলনায় অতুল ঐশ্বর্য্য, বিশাল রাজ্য সব ধুলিমুষ্টির ন্যায় গণ্য হয়। লীপো ও পোচুই এর অমর কবিতা তাহাকে চিরকালের বস্তু করিয়া গিয়াছে। লীপো গাহিয়াছেন—

কিবা ক্ষতি তায় যদি তুষারের স্রোত
মুছে দেয় শেষ স্মৃতি তার? নিত্যকাল
সে অলিন্দে এলায়িত দেহলতা তার
দিবে শোভা। পবন মন্থর ছড়াইবে
কুন্তলের বাস। মধু ঋতু আসি দিবে
মত্ত করি তপ্ত তার শিরার শোনিত।

একদিন এই প্রেমের পরীক্ষা আসিল। রাজা মিঙ্‌হোয়াঙ্ তাইচেনের আত্মীয় স্বজন দিয়া রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সমস্ত চীনরাজ্যের কর্ম্মচারীবৃন্দ হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। পরিশেষে বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ আন্ লূশান রাজ্য আক্রমণ করিয়া সম্রাটকে পরাজিত করিল।

* যে পত্নীঘাতী কাপুরুষ তাহার নাম ইতিহাসে 'স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে' এবং তাহাকে 'অমর করিয়াছে', এ কথাগুলি আজকালকার দিনে যেন একটু অত্যুক্তির মত শোনায়। নঃ সঃ

রাজা ক্ষুদ্র শৃঙ্খলাবিহীন সেনাদল লইয়া সুস্থুচুয়ান প্রদেশে পলায়ন করিতেছিলেন। সেনাদল তাইচেনের ভ্রাতা রাজমন্ত্রী ঈয়াঙকুওচাঙকে দেখিয়া বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া সকল অমঙ্গলের সূত্রস্বরূপ তাহাকে বধ করিল। রাজা ভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। শুধু ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। তাইচেনই সকল সর্ব্বনাশের মূল, তাহার জন্যই তাহাদের রাজা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছেন, তাহার জন্যই তাহাদের আজ এত লাঞ্ছনা, তাই তাইচেনের জীবন দিয়া তাহারা আজ নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। তাইচেন বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্তা হইলেন। রাজা পরিষ্কার জানিতেন ইহা অসম্ভব। কিন্তু হায়, কূট রাজনীতি এই চরম মুহূর্ত্তে প্রেমের উপর জয়ী হইল। প্রজার সন্তুষ্টির জন্য রাজা মিঙহোয়াঙ আদেশ করিলেন শ্বাসরোধ দ্বারা তাইচেনের জীবনলীলার অবসান হইবে। পোচুইর অমর লেখনী সে কাহিনীকে চিরকালের সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে। তাইচেন মৃত্যুদণ্ডকে বরণ করিবার জন্য চলিয়াছেন—প্রিয়তমের উপর তাহার এতটুকুও অভিমান নাই—শুধু বিরহাশঙ্কায় তাহার মুখকমল বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে -

রবিকরে ম্লানমুখী নলিনীর মত
পাণ্ডুর সে মুখচ্ছবি। বল্লমের শ্রেণী
দুই ধারে, মধ্যস্থলে নীরব নিশ্চল
দাঁড়াইয়া মৃত্যুসখা করিতে বরণ।

তাইচেনের জীবন লীলাত ফুরাইল কিন্তু মিঙহোয়াঙের কি আর বাকী রহিল? যে রাজসম্পদের লোভে তিনি তাইচেনকে বলি দিলেন তাহা আজ তাহাকে বিষের মত যাতনা দিতে লাগিল। প্রজাপ্রেমের যূপকাষ্ঠে প্রাণপ্রিয়াকে বলি দিয়া চীনের রামচন্দ্র যখন সেই মৃতদেহের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন তখন—

তপ্ত অশ্রু পীত বালু'পরে রক্তসনে
হইল মিলিত।

তাইচেন সম্রাটের জীবনকে এমন নিবিড় ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে তাহার অভাবে এক বিরাট শূন্যতা তাঁহার জীবন অধিকার করিল—

কৃষ্ণ বর্ণ সুস্থুচুয়ান নীর। মসীলিপ্ত
হিমাদ্রি সকল। আসে দিবা, যায় রাত্রি,
নিরন্তর শোকদাহে রাজার হৃদয়
শুধু করে হাহাকার। শান্তি নাহি তাহে।

তাই রাজা যেখানে যেখানে তাইচেনের একটুও স্মৃতি জড়িত আছে সেখান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন কাটিবে? কোথায় সেই প্রাণের অধিক ধন যাহাকে তিনি হেলায় বিসর্জ্জন করিয়াছেন? কোথায় সেই দয়িত - চিরবাঞ্ছিত

—তাহার দেখা না পাইলে যে জীবন বৃথা। এইবার পাগল শিব উমার সন্ধানে বাহির হইলেন। কতদিন আসে—কতদিন যায়। অবশেষে তাইচেনের সন্ধান মিলিল। নীল সাগরের অসীম শূন্যতার মাঝখানে যেখানে নীলাকাশ আসিয়া জলের সঙ্গে কোলাকুলি করিতেছে সেখানে একটী দ্বীপ আছে। তাহার নাম পেঙ্গলাই। এখানে কুঞ্জ ঘেরা উচ্চ প্রাসাদ সকলে পরলোকগত আত্মারা বাস করেন। এইখানে তাইচেনের দেখা পাওয়া গেল। সেও সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছে যেদিন মিঙহোয়াঙ্ আসিয়া আবার তাহাকে বক্ষে ধরিবেন। সপ্তম চান্দ্রমাসের সপ্তম দিনে রাজা মিঙহোয়াঙ্ "অমৃত কক্ষে" নীরব নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে তাহার কাণে বলিয়াছিলেন—"আমরা উভয়ে মিলিতপক্ষ বিহঙ্গমের মত অনন্ত কাল অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইব, অথবা এমন বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিব, যাহার শাখায় শাখায় নিত্য আলিঙ্গন হইতেছে।" তাইচেনের প্রাণে শুধু সেই আশাটুকু জাগিয়া আছে।

তুফু, লীপো ও পোচুই এই তিন জনই অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তুফু ও লীপোর ভাগ্যে রাজকার্য্য চিরদিন ধরিয়া করা দেখা ছিল না। সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে তাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যও তাঁহাদিগের কণ্ঠে বরমাল্য দেন নাই।

সুশ্রী, সৌম্য ও শান্ত তুফু বহুবর্ষ ধরিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে সাতাইশ বৎসর বয়সে রাজধানীর অতিথি হয়েন। কিছু দিন পরে তিনি রাজসভার উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রাণে এই কাজ কোন সাড়া দিতে পারিল না, স্পষ্টবাদিতার অপরাধে কোন এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। তুফু শাসন কর্ত্তারূপে অভিষিক্ত হইবার সময় হঠাৎ রাজপ্রদত্ত সকল চিহ্ন ও পদক অঙ্গ হইতে খুলিয়া ও কোন বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিস্মিত সভাসদ্গণের সম্মুখে রাজসভা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয় গেলেন। এইবার তাঁহার বাউলের জীবন আরম্ভ হইল। দেশে দেশে নগরে নগরে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইয়া, কবিতা শুনাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া, সাহিত্যপ্রেমিক সহৃদয় ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণ দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় সুসচুয়ান প্রদেশের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে তুফুকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে একটি উচ্চ রাজ পদ দেওয়া হইল। ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর একদিন সেই প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং বাধ্য হইয়া তুফুকে আবার গৃহত্যাগী হইতে হইল। তাঁহার জীবনের আর একটী ঘটনা আমরা জানিতে পারি। একদিন তাঁহার চৈতন্যবিহীন দেহ জলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার জন্মভূমির এক ভগ্ন মন্দিরের গায়ে আসিয়া লাগিল। সেই অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহার সম্মানার্থ বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। স্তূপীকৃত আহার্য্যবস্তু ও মদিরাপূর্ণ পানপাত্র পুরোভাগে সজ্জিত।

কিন্তু তুফুর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সকলের আদর ও অভ্যর্থনার মধ্যে, রাশি রাশি ভোজ্য ও পানীয়ের সম্মুখে তুফুর ইহজীবনের লীলা শেষ হইয়া গেল। তুফু.ক চীনে 'কাব্য দেবতা' বলা হয়। তুফু শুধু কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি চিত্রকরও ছিলেন এবং চিত্র বিদ্যা তাঁহার কাব্য রচনার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

লীপো অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন। রাজা মিঙ্‌হো াঙ্‌ এর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃ সমস্ত চীন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য সম্ভ্রান্তসমাজে এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। মিঙ্‌হোয়াঙ্‌ এর আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার আদর ও যত্নের সীমা রহিল না। রাজপ্রাসাদের হ্রদতীরোপান্তে রমনীয় কানন মধ্যে তাঁহার আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু এই অত্যধিক আদরই লীপোর সর্ব্বনাশের কারণ হইল। একদিন রাজা সর্দ্দার খোজা কাও লিশিকে লীপোর পাদুকা খুলিয়া দিতে বলিলেন। এইদিন হইতে লীপোর এক ভয়ানক শত্রু জুটিল, যাহার ষড়যন্ত্রে অবশেষে লীপোকে রাজাতিথ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে হইল। লীপো এইবার মুক্ত হইলেন। মুক্তকণ্ঠ বিহঙ্গমের ন্যায় এইবার তিনি দেশে দেশে নগরীতে নগরীতে প্রাণ ভরিয়া গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জীবনে আর কোনও বন্ধন রহিল না। আজ কোন জমীদারের, কাল কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার গৃহে আমন্ত্রিত, আবার কোন দিন হয়ত স্থানীয় কোন মদিরালয়ে সুরাপানে বিভোর, আত্মহারা হইয়া লীপো দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে অনুষ্শানের বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পড়ায় লীপোর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু কারাগৃহের প্রাচীরমালা তাঁহার যশোভাতিকে ম্লান করিতে পারিল না। একদিন রাজধানী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু আসিয়া তাঁহার জীবনের শেষ করিয়া দিয়া গেল। লীপোর ছিল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। তিনি এই জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন, কাজেই তুফুর মত তাঁহার কবিতাতে অনাবশ্যক শোকের বা বেদনার ভাব নাই। তিনি প্রাণ ঢালিয়া লিখিতেন। তুফুর সাজাইবার ক্ষমতা তিনি পান নাই, কিন্তু তাঁহার কবিতায় প্রাণ মাতাইবার শক্তি রহিয়াছে।

পোচুই যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মিঙ্‌হোয়াঙ্‌ এর গৌরবময় যুগ চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু রহিয়াছে তাঁহার স্মৃতি—তাঁহার প্রেমের ও ত্যাগের স্মৃতি। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন সপ্তদশবর্ষীয় যুবক পোচুই সমগ্র চীন সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং প্রতিভা বলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করেন। তুফু ও লীপোর সঙ্গে তাঁহার এক বিষয়ে প্রভেদ ছিল; তুফু ও লীপো রাজকার্য্য কখন জীবনের সঙ্গে এক করিয়া লইতে পারেন নাই। পোচুই তাঁহার জীবনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কবিতা রাজকার্য্যের অবসর সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তিনি আদর্শ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। চীন দেশে স্বদেশপ্রেম বস্তুটীর অন্তর্নিহিত ভাব কোন দিন পরিষ্কাররূপে গৃহীত

হয় নাই। পরিবার বা কুলের উন্নতিসাধনের জন্য এমন কোন কর্ম্ম ছিল না যাহা চীনা কর্ম্মচারীর অসাধ্য ছিল। কিন্তু পোচুই এর জীবন আশ্চর্য্য ছিল। তিনি কোন দিন নিজ পরিবারের উন্নতি সাধনের জন্য সম্রাটের কোন অনিষ্ট করেন নাই। তিনি জাতিকে এক পরিবার মনে করিতেন এবং সম্রাটকে সেই জাতিরূপ পরিবারের পিতৃস্থানীয় গণ্য করিতেন। উচ্চ স্বদেশপ্রেমের সহিত তিনি 'রোমান্সকে' চীনীয় সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার কবিতা বাহুল্যবর্জ্জিত, কিন্তু ইঙ্গিত ও ভাবে পূর্ণ। তিনি মানব হৃদয়ের প্রেম ও দুঃখকে কবিতার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া দিয়া ছন। কিন্তু তাঁহার কবিতায় কোন নিরাশা বা নিরানন্দ নাই। বিরহবিধুর হৃদয়ে শান্তি ও আশার বার্ত্তা দিয়া তাঁহার "চিরন্তন অন্যায়" নামক বিয়োগান্ত কাব্য শেষ করিয়াছেন। তাইচেন রাজা মিঙ্ হোয়াঙ্ এর উদ্দেশ্যে তাও পুরোহিতকে বলিতেছেন :—

কহিও নাথেরে মোর ধৈর্য্য ধরিবারে।
কঠিন করিতে হৃদি সুবর্ণের মত।
তবেত হইব মোরা আবার মিলিত।
ইহ কাল, পরকাল লোকলোকান্তরে।

আজ কত শতাব্দী হইল পোচুই এর বীণা নীরব হইয়াছে। কিন্তু অতীতের ওপার হইতে এখনও সেই সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে।

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়।

সাকার ও নিরাকার-বাদের আভাস

সাধারণতঃ chemistry শব্দের বঙ্গানুবাদ "রসায়ন"। ইহা হইতে সন্দেহ হয়, হয়ত, রসায়ন বাক্যের উৎপত্তি কালে, কঠিন বা ক্ষিতি ভাবযুক্ত পদার্থকে দ্রব করিয়া রস বা অপ্ ভাবে পরিণত করিতে পারিলেই রসায়ন বিদ্যার চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্তু অধুনা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, রসায়নের নাম রসায়ন না রাখিয়া বাষ্প বা 'গ্যাসায়ন' রাখিলে অধিক সঙ্গত হইত। পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা, পদার্থ সকলের vapour density অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাদিগের অণু সকলের

গুরুত্ব (molecular weight) নিরূপণ করিয়াছেন। এই molecular weight হইতে আবার পরমাণুর গুরুত্ব (atomic weight) নিরূপণ হইয়াছে ; এবং এই atomic weight রূপ তথ্য পরিশীলন করিতে যাইয়া প্রথমে প্রাউট্ (Prout) নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে উদ্‌যানই (hydrogen) জড় পদার্থ নিচয়ের আদিমরূপ এবং ইহা হইতেই ঘনত্ব অনুসারে অপরাপর ভূত (elements) সকল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং পরে রুষ পণ্ডিত মেণ্ডেলিফ, ভবিষ্যতে আরও কি কি মৌলিক পদার্থ (element) আবিষ্কৃত হইবার সম্ভব, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত তালিকার সত্যতা, অনেক আধুনিক নব নব আবিষ্কার দ্বারা, সপ্রমাণ হইতেছে। এইরূপে জড়পদার্থ সকলকে বাষ্প বা মরুৎ ভাবাপন্ন অবস্থায় পাইয়া, তাহাদিগের অনেক নূতন নূতন রহস্যের আবিষ্কার ও বিশিষ্ট পরিচয়ের সুবিধা হইতেছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস রসায়ন বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর সকল কঠিন পদার্থকেই সূক্ষ্মভাবে আনিতে হইলে, তাহাদিগকে বাষ্প বা মরুৎ ভাবেতে পরিণত করিতে হয়, আরও তাঁহাদের বিশ্বাস, যে, সকল পদার্থকেই এই মরুৎ ভাবে আনয়ন করা সম্ভব। এমন কি, তাঁহারা সূর্য্য রশ্মিতে লৌহ এবং অন্যান্য ধাতুপদার্থের মরুৎ ভাবে অবস্থান বৈজ্ঞানিক উপায়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন, এই কারণে অধুনা সাধারণের বিশ্বাস, যে, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই তিন ভাবে থাকিতে পারে; যথা বাষ্প বা মরুৎ ভাবে, তরল বা অপ্‌ভাবে এবং কঠিন বা ক্ষিতি-ভাবে। আরও দেখা যায় যে ক্ষিতি ভাব অপেক্ষা অপ্‌ভাবে পদার্থসকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, এবং বাষ্প বা মরুৎ ভাবে তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। এই যে মরুৎভাব, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে, ইহাই জড়পদার্থের প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মভাব। এই ভাবে জড়পদার্থের স্বভাবের স্ফুরণ অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে ; অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায়, এই অবস্থায় রাজসিক গুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণ তমোগুণাচ্ছন্ন ক্ষিতি-ভাবাপন্ন পদার্থ, মরুৎ-ভাবে আসিয়া পড়িলে, ঠিক এক পদার্থই থাকে কি ? অন্ততঃ ইহাতে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি বা বিকাশের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে না কি ?

জড়পদার্থের এই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া মরুৎ-ভাবাপন্ন হইবার উপায়, কেবল মাত্র উত্তাপ যোগে বা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রভাবে সম্ভব। আরও দেখা যায়, যে, এই তাপ যোগ করণ দ্বারা বা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রভাবে, পদার্থ সকলকে উজ্জ্বল করিয়া, আলোক উৎপাদনের উপায় করা যাইতে পারে। সুতরাং এই দুই প্রকরণ পদার্থ সকলকে তেজোভাবে পরিণত করিবারও উপায় বটে। তেজোভাবের আতিশয্যে পদার্থ সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে বাষ্প বা মরুৎ ভাবে পরিণত হয়। সূর্য্যের উত্তাপ বিশ হাজার ডিগ্রি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাতে ধাতু সকল মরুৎভাবে অবস্থিত ইহা রশ্মিবীক্ষণ

(Spectroscope) নামক যন্ত্রদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে পদার্থের তেজোভাবের বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি ?

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে, মরুৎ, অপ ও ক্ষিতি ভাবাবিষ্ট সকল পদার্থই অণু পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এই অণুপরমাণু সকল সম্ভবতঃ গোলাকার এবং তাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট নহে ; অর্থাৎ তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যস্থলে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান সকল আছে। এই কারণে জড়জগতের কোন পদার্থই সম্পূর্ণ সংলিপ্ত অবস্থায় নাই ; তাহাদিগের সকলেরই অনুপরমাণু সকল শূন্যগর্ভ ব্যবধান সংযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অণুপরমাণু সকল, বিশেষতঃ মরুৎ অবস্থায়, তাহাদিগের মধ্যস্থিত ব্যবধান অনুযায়ী সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সংস্থিত। (১) এমন কি, আধুনিক Electron Theory মতে, এই অণুপরমাণু সকল প্রত্যেকে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড রূপে, আপন আপন কেন্দ্র ব্যাপিয়া, ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় অবস্থিত। পদার্থের অণুপরমাণু সকলের সদা এই সচঞ্চল ও সকম্প অবস্থায় অবস্থানের অনুভূতিকে আমরা উত্তাপ বলিয়া থাকি। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, উত্তাপ জড়পদার্থের একটি বিশিষ্ট অবস্থা মাত্র ; অর্থাৎ ইহার মূল, স্পন্দনজনিত পরমাণুগণের চঞ্চলতা মাত্র। এই স্পন্দনের বেগাতিশয্যে আলোক উৎপাদনকারী স্পন্দনের আবির্ভাব হয়। সেই ভাবকে তেজোভাব বলা যায়।

বিজ্ঞানের মতে, ক্ষিতি অবস্থা অপেক্ষা অপ অবস্থায় এই অণুপরমাণুর স্পন্দন বৃহৎ ও দ্রুততর হয়, আবার অপ অবস্থা অপেক্ষা মরুৎ অবস্থায় ইহা অধিকতর বৃহৎ ও দ্রুত হয়। অপর দিকে, এই স্পন্দনের বেগ প্রভাবে পদার্থ সকল সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থায় পরিণত হয় ; সুতরাং মরুৎ ভাবই জড়পদার্থের সূক্ষ্মতম অবস্থা। এই অবস্থাপন্ন পদার্থ সকলের যতই বৃহত্তর আধারে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যায়, ইহা ততই সেই আধারের সর্ব্বস্থানটি

** (১) "The Kinetic Theory of gases—a matter in the state of gas or vapour is regarded as an aggregation of molecules in which the attractive forces, which tend to hold them together are reduced to a minimum, and in which the spaces that separate them are at a maximum. These molecules are in a state of rapid motion, each one moving in a straight line until it strikes some other molecu'e, or rebounds from the walls of the containing vessel, when it continues its movements in another direction until it is once more diverted by another encounter. As they constanly encounter and rebound from each other, it will be evident that at any given instant some will be moving with a greater speed than others ; the majority, however, will have an average velocity in these encounters. No loss of energy results so long as the temperature results in a change in the velocity of movement of the molecules, the speed being increased with increased heat."—A Text Book of Inorganic Chemistry by G, S, Newth. F. I. C,, F. C. S.

সমভাবে ব্যাপিয়া বা অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু,অপ্ বা ক্ষিতির ভাবে পদার্থের এই শক্তি অর্জ্জন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ব্যাপিকা শক্তি প্রভাবে, জড়পদার্থ সকল যত অধিক সূক্ষ্ম হইবে, তাহারা নির্বাধা অবস্থায় তত অধিক স্থান অধিকার করিবে, এমন কি, অনন্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় তাহারা অনন্ত স্থান অধিকার করিতে পারে, এই ধারণা করা কঠিন বলিয়া মনে হয় না। অঙ্কশাস্ত্রে বলে $\frac{1}{0}$=∝ (Infinity)

এই তাপ বা অণু সকলের স্পন্দনযুক্ত অবস্থার স্থূলতঃ পরিমাণ জন্য তাপমান যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। এই তাপমান যন্ত্রের শূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া এক, দুই, তিন, প্রভৃতি মান বা ডিগ্রি রূপ উপায় সকল আছে। যে শীতল ভাবে পহুঁছিলে জল জমিয়া গিয়া করকাতে পরিণত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ শূন্য ডিগ্রি বলে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, যে, এই সকল তাপমান যন্ত্রে যাহা শূন্য ডিগ্রি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে ; কারণ এ অবস্থায় পদার্থের অণু সকল সম্পূর্ণ নিস্পন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। মরুৎ অবস্থাপন্ন পদার্থ সকলের অণুগণের চাপ (pressure) বা স্পন্দন জনিত ঘাত প্রতিঘাত নিচয়ের বেগ পরিমাণ দ্বারা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে, যখন মরুৎ অবস্থাপন্ন পদার্থের অণুসকল সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগের আর ঘাত প্রতিঘাত বা চাপ থাকিবে না, তখন সেই অণুসকল আকাশে আর কোন স্থান অধিকার করিতে অপারগ হইয়া ইহাতে লীন হইয়া যাইবে, অর্থাৎ নিরাকার হইয়া পড়িবে, এবং তখনই সেই পদার্থ সম্পূর্ণ তাপহীন অবস্থায় আসিবে, ও ইহাই হইল প্রকৃত শূন্য ডিগ্রি। এই অবস্থাকে পণ্ডিতেরা absolute zero temperature (২) বা নিরপেক্ষ শূন্য অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; আমরাও ইহাকে পদার্থের ব্যোম্ অবস্থা বলিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে, জড়পদার্থ যখন ব্যোম্ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আর জড়ের স্থুল অবস্থায় থাকিতে পারে না ; অর্থাৎ ইহা সাকার হইয়াও নিরাকার হইয়া পড়িবে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে ইহাই বাহ্যজগতের সাধারণ নিয়ম।

অণু সকলের স্পন্দন ও পরিস্পন্দনের সম্যক্ উপলব্ধি করণোদ্দেশে, অঙ্কশাস্ত্র আলোড়িত করিয়া, অনেক মনীষী পণ্ডিতের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের আবিস্কার হইয়াছে। তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই সকল স্পন্দন বা আন্দোলনের দৈর্ঘ্য ও বেগ (এক একটি আন্দোলন কত সময়সাপেক্ষ) নিরূপণ করিয়া, ইহাদিগের সম্বন্ধে

(২) The absolute zero of temperature will be reached when the linear velocities of the molecules have been reduced to zero i. e,, when the molecules have been brought to rest." (Edwin Edser

* * * It is obvious that at-273° the volume would be nil and the gas ceases to exist."—Chemical Philosophy—William. A. Tilden.

সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা। কিন্তু absolute zero বা সম্পূর্ণ নিষ্পন্দ অবস্থায়, অণু সকলের আন্দোলনের দৈর্ঘ্যও থাকেনা, বা বেগও থাকে না; সুতরাং এই অবস্থায় অণু সকল কোন দেশও অধিকার করে না বা কালেরও কোন পরিমাণের সম্পর্ক রাখে না; অর্থাৎ এই নিষ্পন্দ অবস্থায়, মানবের স্থূল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে, পদার্থের অণু সকল এক প্রকার দেশ ও কালের অতীত হইয়া পড়ে; সুতরাং নিরাকার। কিন্তু এই নিরাকার অবস্থা আর্য্য দার্শনিকের নিরাকার অবস্থা হইতে সম্যক্ পৃথক।

অণুগণের এই সম্পূর্ণ নিষ্পন্দ অবস্থা, পণ্ডিতগণের অনুমানপ্রসূত কল্পনা মাত্র; কারণ, আজ অবধি কোন পণ্ডিতই এই অবস্থার সঠিক পরিচয় পান নাই, কেবল অনুমান দ্বারা বিবৃত করিয়া থাকেন। অম্লজান ও জলজান বাষ্প ঘনীভূত করিয়া, তরল অবস্থায় জমাইয়া ফেলিবার কলের আবিষ্কারক পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক জন্ ডেওয়ার সাহেবের মতে এই absolute zero অবস্থা, তাপমান যন্ত্রের সাধারণ zero বা শূন্য মান হইতে ২৭৩° C বা ৪৬০° F ডিগ্রি নিম্নে অবস্থিত; অর্থাৎ নিরপেক্ষ শূন্যাবস্থার অপর একটি নাম,—২৭৩°C বা ৪৬০°F। আবার আমেরিকান্ শিল্পী মিঃ ট্রিপ্লার, যিনি সাধারণ বায়ুকে, কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে, জমাইয়া কলস কলস জলের মত ঢালিয়া দিতে পারেন, যিনি সুরাসারকে বরফের মত জমাইয়া ফেলিতে আয়াস বোধ করেন না, তিনি বলেন, যে, absolute zero অবস্থায় পহুঁছিবার অগ্রেই পৃথিবীর বায়ুরাশি তরল হইয়া সাগর উৎপাদন করিবে, এবং সাগরের জল জমিয়া প্রস্তরের মত কঠিন হইয়া পড়িবে, ও লৌহ এবং অতি কঠিন ইস্পাৎ মৃত্তিকার মত এমন ভঙ্গুর পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে যে তাহাদিগকে সহজেই অঙ্গুলি পেষণে চূর্ণ করিয়া ফেলা যাইতে পারিবে; আরও এই অবস্থায় প্রাণিগণের জীবনী-শক্তি সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহা সৃষ্টির অন্ততঃ একটি খণ্ড-প্রলয়াবস্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্যদর্শন মতে, বৃহৎ প্রলয়াবস্থায়, জড়পদার্থসকল সম্পূর্ণ নিরাকার অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কে বলিতে পারে নিরপেক্ষ শূন্যাবস্থা বা absolute zero অবস্থা প্রকৃত প্রলয়ের না হউক অন্ততঃ ভৌতিক জগতে, তত্তুল্য কোন অবস্থা নয়?

বিজ্ঞান মতে স্বভাবতঃ মরুৎ ভাবাপন্ন পদার্থকে অপ্-ভাবে বা ক্ষিতি ভাবে আনিতে হইলে, তাহার স্বাধীন পরমাণুগুলিকে পরাধীন করিয়া, তাহাদিগের বাহ্যিক চাপ বর্দ্ধন ও আভ্যন্তরিক তাপ হরণ দ্বারা হইয়া থাকে। এই প্রকরণের পরীক্ষা করিতে যাইয়া, অধ্যাপক এণ্ড্রুস্ critical point বা সন্ধিস্থ নামক অবস্থার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অবস্থার বিশেষত্ব এই, যে, ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পের critical point ভিন্ন ভিন্ন; এবং আভ্যন্তরিক তাপহরণ দ্বারা বিশেষ বিশেষ বাষ্পকে, তাহার বিশেষ বিশেষ critical point অবস্থায় না আনিতে পারিলে, কেবল বাহ্যিক চাপ বর্দ্ধন দ্বারা তাহাকে তরলীভূত করিয়া, অপ-ভাবে পরিণত করা অসম্ভব। এই সন্ধিস্থ অবস্থার প্রক্রিয়া এখনও সম্যক্ নিরাকরণ হয় নাই; ইহা অদ্যাবধি বেদান্তে উক্ত মায় শক্তির মত মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য একটি প্রহে-

-লিকাবৎ রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, অণুগণের স্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি করণোদ্দেশে বাহ্যিক চাপ বর্দ্ধন ও আভ্যন্তরিক তাপ হরণের আবশ্যক; আর ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, যে অণুগণের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে হইলে, critical point অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়, ও তখন একটি নবশক্তির আবির্ভাব হয়, এবং এই শক্তির বলে অণুসকল, স্পন্দনের হ্রাস বিধায়,এক প্রকার অবয়বীভূত হইয়া পড়ে। তবে ইহা নিশ্চয়, যে, এই critical point নিরপেক্ষ শূন্য বা absolute zero মানের অনেক উর্দ্ধে স্থিত অবস্থা। এই রূপে, দেখা যায় মরুৎ অবস্থা অপেক্ষা অপ-অবস্থায় অণুগণের স্পন্দনের হ্রাস হইয়া থাকে, আবার ক্ষিতি অবস্থায় আরও অধিক হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু ভৌতিক স্পন্দন একেবারে শান্ত হইলে ব্যোম্ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়; অর্থাৎ মরুৎ অবস্থাতেই অণুগণের স্পন্দন পূর্ণ মাত্রা লাভ করে। এবং পরে হয়ত, ব্যোম অবস্থায় ভৌতিক স্পন্দন আত্মিক স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভৌতিক নিস্পন্দ অবস্থা আনয়ন করে। কারণ, যদি স্পন্দনের জন্য পদার্থকে Energy বা শক্তি বলা যায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে শক্তি অনশ্বর Energy is indestructible.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সীমা এই অবধি, আর তাহাতে কিছু নাই। * তবে কুরীদম্পতীর Radium আবিষ্কারের ফলে, লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, যে, হয়ত এক মৌলিক পদার্থকে (Element) অপর মৌলিক পদার্থে পরিণত করিবার উপায়, ভবিষ্যতে কোনদিন উদ্ভাবিত হইতে পারে; অর্থাৎ alchemy বিদ্যার সত্যতার উপর লোকের আস্থা ফিরিয়া আসিবার উপক্রম হইতেছে। আর এক কথা, আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মত, যে সৃষ্টির মূলে matter ও motion জড় ও গতি বা স্পন্দন নামক দুইটি পৃথক পৃথক বস্তুর অবস্থিতি আরোপ না করিয়া, কেবল motion বা স্পন্দনের আরোপ করিলেই ঠিক হয়। তাঁহাদিগের বিশ্বাস matter বা জড়ের সৃষ্টি motion হইতে। ইহা তাঁহারা ঘূর্ণ্যমান গতি বা স্পন্দনের (vortex motion) ফল লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন। কিন্তু স্পন্দনের আধার কি? মানুষের মনের স্পন্দন অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম স্পন্দনের ধারণা করা সকলের পক্ষে সহজ না হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যদর্শন মনকেও জড়ের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করে। "Mind is but matter in a finer form." (৩)

---

* এই সন্দেহ এক্ষণে বহু পরীক্ষাদ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের অনেক পাঠক এবং লেখক স্বয়ং একদিনে নিশ্চয়ই সে সংবাদ অবগত আছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই প্রবন্ধ সম্প্রতি নব্যভারত অফিস হইতে উদ্ধারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের এই অভিনব সমন্বয় চেষ্টা চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রকাশিত হইল।

(৩) "The 'Prana' cannot live alone, or act without a medium; when it is pure 'Prana' it has the 'akasha' itself to live in, and when it changes into forces of Nature, say gravitation, or centrifugal force, it must have matter."...Swami Vivekananda.

এক্ষণে মৌলিক পদার্থের (Elements) পরিচয় কি? জড়বিজ্ঞান মতে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যখন পদার্থকে আর অধিক মৌলিক অবস্থায় আনিতে পারা যায় না, তখনই ইহা মৌলিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া স্থির করা হয়; কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে চরম সীমায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে, একথা কেহই বলিতে প্রস্তুত নহে; কারণ, এখনও নূতন নূতন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হইতেছে। Radium মৌলিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বতঃই সহজে Helium নামক পদার্থে পরিণত হয়, আবার Helium জলজানের (Hydrogen) রূপান্তর বলিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়। সুতরাং এই তিনটির মধ্যে কোনটি আসল মৌলিক পদার্থ নিরূপণ করা কঠিন নয় কি? অতএব দেখা যাইতেছে, যে, মনকে বুঝাইবার জন্য, ও বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারণের সম্যক্ উপায়ের অভাবে, কতকগুলি পদার্থকে মৌলিক বা বীজ পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র, ইহা সঠিক তত্ত্ব কি না কে বলিতে পারে? আবার এই সকল পদার্থ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ এক হইতে অপরটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, বা ভিন্ন ভিন্ন পৃথক অবস্থাপন্ন একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? মনুষ্যবুদ্ধি জড়বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রকরণে এখনও চরম সোপানে আসিতে পারে নাই, ইহাই কেবল সত্য।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়গুণ অবলম্বনে বস্তু বিচার করিতে যাইয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, আর্য্যদর্শন সেইজন্য সূক্ষ্মতর আত্মিক অবস্থা অবলম্বনে বিচারতৎপর। ইহার মতে প্রকৃত মৌলিক পদার্থ এক, এবং তাহা হইতেই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অর্থ কেবল জীবজগৎ নহে, জীবজগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, এমন কি আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহাও ইহার অন্তর্গত। এই যে মূল পদার্থ ইহার নাম সম্বিৎ, কারণ ইহা চিন্ময়, ইহা সমস্ত সৃষ্টির, এমন কি ঈশ্বর বলিলে আমরা যে বস্তু বুঝি তাঁহারও মূল কারণ। ইহার সত্ত্বা আছে বলিয়া ইহা সৎ, ও ইহা এরূপ অসীম ও পরম পদার্থ, যাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। এই অসীম বস্তু, পরমিত হইবার উদ্দেশ্যে, মায়াশক্তির যোগে, পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়া, অবশেষে, পঞ্চভূতে পরিণত হয়। কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টি অর্থে কুম্ভকারের ঘট প্রস্তুত প্রণালী বুঝায় না, তবে একটি প্রদীপ হইতে অপর একটি প্রদীপ জ্বালার ন্যায় কতকটা প্রক্রিয়া বুঝায় বটে। এই মূল পদার্থ, ভূত-ত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ নিরাকার; সুতরাং, ইহার তুলনায়, পূর্ব্বে যে নিরাকার বা absolute zero অবস্থার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা ভূতাবস্থাপন্ন বস্তুর বা আধিভৌতিক নিরাকার অবস্থা মাত্র, আর সম্বিৎ আধ্যাত্মিক নিরাকার অবস্থাপন্ন। অতএব ব্যোম অবস্থাপন্ন জড়, যখন ভূতাবস্থাতেই নিরাকার হওয়া সম্ভব ধারণা করা যাইতে পারে, তখন ঈশ্বর নিরাকার বলিলে কি অত্যুক্তি করা হয়, বা কোন অসম্ভব কথা বলা হয়? এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত J. H. Tuckwell সাহেব তাঁহার 'Religion and Reality' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

In our main conclusion we have long ago been anticipated by the religious philosophy of India. In the west, our philosophy has been surely but slowly moving to the same inevitable monastic goal. In Professor Ladd of Harvard, we have a notable western thinker who by a process of careful and consistent reasoning, concrete in character, has also arrived at the conclusion that the ultimate reality must be conceived of as an Absolute Self of which we are finite forms or appearances. But it is the crowning glory of the Vedanta that it so long ago announced, re-iterated and emphasized this deep truth in a manner that does not permit us for a moment to forget it and explain it away. This great stroke of identity, this discernment of the ultimate unity of all things in Brahman or the One Absolute Self seems to us to constitute the master-piece and highest achievement of India's wonderful metaphysical and religious genius to which the west has yet to pay the full tribute which is its due."—(Quoted by Sir John Woodroffe in his book called 'Is India Civilised ?')

আধ্যাত্মিক অবস্থা অবলম্বনে বিচার করিতে হইলে, জড়বিজ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির সাহায্য লইতে হয়। জড়বিজ্ঞান চক্ষুকে ইন্দ্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করে; কিন্তু মনোবিজ্ঞান ইহাকে মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ইহার মতে, প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি চক্ষুর বাহিরে অন্তরে অবস্থিত। প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান আবার এত সূক্ষ্মদর্শী, যে, ইহা মনকে জড়ের সামিল একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচনা করে; কারণ মন হইল সকল ইন্দ্রিয়ের বিচারক ও প্রকৃত বিকাশ-স্থল। কিন্তু তাই বলিয়া মনকে মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণ পদার্থের (Grey substance in the brain) (৪) সহিত তুল্য বস্তু বলিয়া বিবেচনা করে না। যে শাস্ত্র চক্ষুর অন্তরালে, প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অবস্থান আরোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই শাস্ত্রের পক্ষে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে সন্তুষ্ট না হওয়া কিছু বিশেষ বিচিত্র কথা নহে। এই শাস্ত্রমতে, জবাফুলের রং লাল, এ

(৪) "Consciousness is the perception of what passes in one's own mind (Webster's Dictionary); it is not an entity, but a phenomenon, an active condition of grey nervous substance ; it is partly perception by the grey matter of the nervous system, of impulses arriving through the ingoing nerves ; it has been said to be synonymous with mental existence, and this is largely true because it is the immediate fundamental basis of ordinary mental action."— 'The Scientific Basis of Morality' by G. Gore L. L. D., F. R. S.

কথার অর্থ, জবাফুল দেখিলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদিগের যে অনুভূতি হয়, তাহাকে আমরা লাল রং বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত লাল রং কি তাহা হয়ত আমরা জানি না। এই রূপে সকল সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ বা আত্মা অন্বেষণ করিতে করিতে, অবশেষে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় "সর্ব্বং ব্রহ্মং খল্বিদম্"। অর্থাৎ স্বরূপ অন্বেষণ করিতে যাইয়া অবশেষে কার্য্য-কারণ যোগ বশতঃ অবাঙ্মনসোগোচরম্ আদিকারণ সেই এক মূল পদার্থে যাইয়া পহুঁছাইতে হয়। এ কথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যে, প্রকাশিত ও প্রকাশ্য জগতে যাহা কিছু শক্তির পরিচয় পাওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এই আদিকারণে অপ্রকট বা নিষেধভাবে (potentially)নিহিত।

নিত্য পরিবর্ত্তনশীল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতগুলি আলোচনা করিতে যাইলে, মনে হয়, যে, ইহা এক্ষণে মাত্র রজ্জুতে সর্প-দর্শন দশায় উপস্থিত, এখনও রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং সন্দেহে দোলায়মান অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে বোধ হয় আর্য্যদর্শনের আশ্রয় লইলে কতকটা আসান হইতে পারে। আর্য্যদর্শনের উক্তি, সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টার 'আমি এক হইতে বহু হইব,' এই যে ইচ্ছার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই ইচ্ছা জনিত চাঞ্চল্য হইতেই প্রথম স্পন্দনের আবির্ভাব হয়। এই স্পন্দন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্পন্দন নয় কি? উক্ত ইচ্ছাটিকে একটি শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং এই শক্তিকে অপূর্ব্বা শক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; কারণ, ইহার পূর্ব্বে আর কোন শক্তির অবস্থিতি ছিল না। আবার আধ্যাত্মিক স্পন্দন হইতেই আধিভৌতিক (৫) স্পন্দনের উৎপত্তি, এবং এই স্পন্দনই হইতেছে বিশ্বপ্রকাশের মুখ্য কারণ।

সুতরাং সম্পূর্ণ নিষ্পন্দনের অবস্থা বলিতে গেলে, প্রলয়ের অবস্থা বুঝায় না কি? নিরপেক্ষ শূন্যাবস্থা বা absolute zero যদি কেবল ভৌতিক স্পন্দনের নিবৃত্তি অবস্থা বুঝায়, তাহা হইলে মনুষ্য-বুদ্ধি একদিন সে অবস্থায় পহুঁছাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেও করিতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্পন্দনের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে, যখন সৃষ্টিই থাকিবে না, তখন সে অবস্থায় পহুঁছান মনুষ্যের আদৌ সম্ভবপর

(৫) "The truths gathered from internal experience are psychology, metaphysics and religion ; from external experience, the physical sciences. Now a perfect truth should be in harmony with experience in both these worlds. The microcosm must bear testimony to the macrocosm, and the macrocosm to the microcosm ; physical truth must have its counterpart in the internal world, and the internal world must have its verification in the outside. * *
So far as my little knowledge goes, I find that the really essential parts of psychology are in perfect accordance with the essential parts of modern physical knowledge." – Swami Vivekananda.

হইতে পারে না। সুতরাং দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত যে নিরাকার অবস্থা তাহার ধারণা মনুষ্যের অত্যধিক কঠিন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে হয় না কি, যে ইহা একেবারে অসম্ভব নহে? আর এক কথা, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জগৎ-কারণ অনন্ত ও অফুরন্ত, সুতরাং অত্র রচনা মধ্যে তাঁহার যে যে অবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে, সে সকল অবস্থাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং একথাও সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, যখন ব্যোম্ অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুভূতি অভাবে অণুগণ নিষ্পন্দ হইবে বলিয়া মানব মনে ধারণা হইয়াছে, তখন হয়ত প্রকৃতপক্ষে, এই স্পন্দন ভৌতিক জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব সাহায্যে চিৎ-প্রতিবিম্বিত হইয়া এই সর্ব্ববাদিসম্মত ধারণার কারণ রূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিতেছে; কারণ মহাপ্রলয়াবস্থা না হইলে স্পন্দনের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

এক্ষণে আধ্যাত্মিক স্পন্দন হইতে আধিভৌতিক স্পন্দনের উৎপত্তি কিরূপ হইতে পারে বুঝিতে হইলে, ডারউইন সাহেবের Theory of Evolution পাঠে কতকটা আভাস পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। যদি artificial and natural selection দ্বারা, কি জীবরাজ্যে, কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে অদ্ভুত বিপর্য্যয়-ঘটন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জড়জগতের যে মূল-কারণ, সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনের মূলভিত্তি যে অপ্রকটভাবে (potentially) নাই, এরূপ মনে করা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না কি? মনুষ্য artificial selection দ্বারা গোলা পায়রা হইতে অন্ততঃ ২০০ রকম পায়রা সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছে, উদ্ভিদ্‌রাজ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর্য্যদর্শনও বলে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পঞ্চভূত বা মহাভূত সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে এক একটি করিয়া পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে; যথাঃ- (১) শব্দ-ব্যোম্, (২) স্পর্শ-মরুৎ, (৩) রূপ-তেজ, (৪) রস-অপ এবং (৫) গন্ধ-ক্ষিতি। আবার এই পঞ্চ-তন্মাত্রের পরিতোষ সাধনের উপায়স্বরূপ বা সার্থকতার জন্য, আমাদিগের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মূল কথা পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরম তত্ত্ব। এইরূপে দর্শনোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বই মূল সংবস্তুর সৃষ্টিকল্পে পরিণাম বা বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাদিগের প্রভাবে আত্মা অবশেষে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একই মূল-স্পন্দন হইতে উৎপত্তি-লাভ করিয়া এবং একই তত্ত্ব সকলের দ্বারা অনুশাসিত হইয়াও, একজাতীয় জীবগণের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য Individuality লক্ষ্য হয় কেন? ইহাতে মূলে কোন আধ্যাত্মিক-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না কি?

শ্রীবিপিন বিহারী নিয়োগী।

শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন। মানুষকে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশে মানব জীবনের আদর্শের বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নির্ণীত হয়। শিক্ষাপদ্ধতির কোন সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার সার্ব্বজনীন আদর্শ কি, বা কি হওয়া উচিত, তাহাই বিবেচনার বিষয়। যে শিক্ষা পদ্ধতি এই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে কোন সাহায্য প্রদান না করে, তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য বা পরিত্যজ্য মনে করিতে হইবে।

মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি বা বিকাশ, এবং সম্ভব হইলে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা অতিমানবত্বের প্রয়াসী হওয়া। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইবার উপযোগী করিয়া তোলা—যাহাকে ইংরাজীতে Good citizen বা gentleman বলা হয়। এই Good citizen বা gentleman নানাগুণের সমষ্টিস্বরূপ; যথা—রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার কোন বিশেষ দলের সহিত যোগ থাকা চাই, সমাজে তাহার একটি স্বাধীন স্থান থাকা চাই, কিম্বা সেইরূপ স্থান দখল করিবার ক্ষমতা চাই, এবং তাহার শরীরও শক্তিশালী হওয়া চাই, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের জন্য তাহাকে উপযোগী হইতে হইবে। তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিও এই আদর্শের অনুযায়ী। তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি এবং ভোগের আনন্দ সর্ব্বপ্রকারে ও সম্পূর্ণরূপে লাভ করাই তাহাদের জীবনের প্রধান চেষ্টা। এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে হইলে যে সাহসের ও বীর্য্যের প্রয়োজন তাহারই উৎকর্ষ সাধনে তাহারা ব্রতী, নিত্য নব বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাজিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া অসাধ্য সাধনে তাহারা প্রয়াসী। আমরা দেখিতে পাই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এই উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল। ব্যক্তিগত স্বার্থ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের আনন্দ—তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই ইউরোপ আমেরিকার সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক বা কল কারখানার সভ্যতা। ব্যবহারিক সত্য বা প্রাকৃতিক সত্যের আবিষ্কারই তাহাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, পরমার্থ-তত্ত্বের জন্য তাহারা তেমন আগ্রহান্বিত নহে। সেই জন্য পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ এই দুইটিই তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রণালী বা ভিত্তি। দর্শন বা মনোবিজ্ঞানকেও

তাহারা এই দুই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। অতএব তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থাও প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিতে হইবে। কোন পারমার্থিক আদর্শ বা সংস্কারের দ্বারা তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়মিত করিয়া রাখে নাই, বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারণ করা এবং প্রতিপালন করাও তাহাদের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়াছে।

এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাহারা সুস্থ, সবল, বিজ্ঞানবলে বলীয়ান, অর্থ উপার্জ্জনে তৎপর, ভোগৈশ্বর্য্যশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কোন বিশেষ পারমার্থিক আদর্শের প্রতি অনুরাগের অভাবে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গহীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কোন আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শকে তাহাদের সাধারণ জীবনযাত্রাকে কদাচ নিয়ন্ত্রিত করিতে দেখা যায়, * ইহার ফলে নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত জনিত যুদ্ধ বিগ্রহ বিদ্বেষ বিবাদ এবং মিথ্যাচার, জাতীয়তা ও আত্মরক্ষার ছদ্মবেশে, তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে তাই ধনী ও শ্রমজীবিতে, পুরুষ ও স্ত্রীজাতিতে এবং জাতিতে জাতিতে অহরহ স্বার্থসম্ভূত কলহ ঘটিতে দেখা যায়। ইহাতে সমাজ ও জাতীয় জীবনে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, শিক্ষার দ্বারা বিকশিত ও পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহারা একদিকে যেমন অর্থোপার্জ্জনে, ক্ষমতাবর্দ্ধনে ও মানবের কল্যাণকর নানাবিধ কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত করিতেছে সেইরূপ ইহার অপব্যবহারের দ্বারাও গুরুতর অশান্তি বিদ্বেষ ও অমঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতেছে। শরীরের শক্তির ন্যায় শিক্ষার দ্বারা পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের একটি বিশিষ্ট শক্তি। শক্তি মাত্রেরই সৎ ও অসৎ দুইরূপ ব্যবহার সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। মানুষ তাহার বুদ্ধি কৌশলের অসৎব্যবহারের দ্বারা সময়ে সময়ে পশু হইতেও অধমের ন্যায় আচরণ করে। যথা, তাহার শিক্ষা তাহাকে সংযমী না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে প্রকৃতির বিধানে বিহিত অসংযমীর দুর্ভোগ ও শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে বলিয়া, সে পশু অপেক্ষাও অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। এই জন্য কোন কোন ভাবুক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন— In certain cases man behaves as an animal degenerated তাহাদের শিক্ষা বিধির মধ্যে যে নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার লক্ষ্য শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান, ইহা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা নিয়মিত হয় না।

এ গেল ইউরোপের কথা, এখন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা

---

* লেখকের এই উক্তি দেশবিশেষে বা শ্রেণীবিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রযুজ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইয়োরোপের সর্ব্বত্র তথা সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে এইরূপ একটা মন্তব্য সমীচীন বোধ হয় না। নঃ সঃ

বিধান সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত ছিল। কিন্তু ইহা শুধু আশ্রমে ও তপোবনে নিবদ্ধ থাকাতে সংসার যাত্রায় বা সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যকরী হয় নাই। সাধারণে এই উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শুধু কলের মতন আচার ও অনুষ্ঠান মানিয়া চলিয়াছে। সুতরাং যে শিক্ষাবিধানের আদর্শ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন, তাহা লোক সমাজে অভীপ্সিত ফল প্রদান করিতে পারে নাই। ফলে তাহা শরীরকে ও জগতকে উপেক্ষা করিয়া শুধু আত্মাকে লাভ করিবার প্রয়াসে শরীর ও আত্মা উভয়কেই খর্ব্ব করিয়াছে। সংস্কার, আচার ও অনুষ্ঠান বিচার বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে সুতরাং এই অঙ্গহীন, সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে নাই। তাই জীবন সংগ্রামে প্রাচীন ভারতবর্ষকে নব্য ইউরোপের নিকট হার মানিতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে যখন ইউরোপের সংস্পর্শে ভারতবর্ষ তাহার শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে ব্রতী হইল, তখন পুরাতন আদর্শের উপর তাহার সমস্ত বিশ্বাস লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আহারে-বিহারে, শিক্ষা-দীক্ষায় সে ইউরোপকেই হুবহু অনুকরণ করিয়া চলিল, আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগের সন্ধানে রত হইল। কিন্তু ইউরোপের সে সাহস ও বীর্য্য তাহার ছিল না, তাই ইউরোপকে অনুকরণ করিতে যাইয়া সে যে শুধু নিজের আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাই নয়, পরন্তু ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির যাবতীয় দোষও নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। অসত্য, কপটতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপের সমাজগত বা জাতিগত স্বার্থবুদ্ধির প্রয়াসকে অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করিতেছি, এবং পুরাতন আদর্শকে সত্যভাবে অনুসরণ করিতে না পারিলেও বাহিরে শুধু তাহার দোহাই দিয়া সমাজে কপটতা ও ভণ্ডামির প্রচার করিতেছি। একমাত্র ত্যাগের পথের বা একমাত্র ভোগের পথের অনুসরণের দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক জীবন গঠনের যে অঙ্গহানি ঘটে, তাহাদের অপব্যবহারে তাহা আরো কলুষিত হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সত্যকার ত্যাগ ও সত্যকার ভোগের আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের শিক্ষা প্রণালী সেইভাবেই নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমরা সত্যকার ত্যাগের মহিমা বা সত্যকার ভোগের ক্ষমতা উভয় হইতেই বঞ্চিত। পরস্পর বিসম্বাদী উভয় পথের কোন একটির একান্ত অনুসরণের ফল পরিশেষে বিষময় হইয়া উঠে। ইউরোপীয় সমাজে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বিরাজ করিতেছে, আর আমাদের সমাজে পরমার্থের লোভ দেখাইয়া আমরা শুধু বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছি।

শিক্ষার প্রথম আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠন, এই চরিত্র গঠন শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নহে, মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহার

উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, এই আদর্শকেই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান স্থান দিতে হইবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য—বুদ্ধি বা মনোবৃত্তির ও শরীরের উৎকর্ষ সাধন,—যাহাতে জাতি বা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবন সংগ্রামের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে। যেখানে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন, সেখানে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষমতা যেখানে উচ্চ আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে সেখানে সততই তাহার অপব্যবহার হইতে দেখা যায়। ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমের উপর প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তাহার উপর এই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ব্যয়বহুল হয়, তাহা হইলে একমাত্র ধনীলোকেরাই এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া যে দরিদ্রের অর্থ লুণ্ঠন করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। কেবল অলস ও বিলাসী মুষ্টিমেয় ধনি সন্তানদের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রকৃত প্রতিভাবান্ পণ্ডিত সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়া যায়, এই জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বল্পব্যয়-সাধ্য করিয়া তুলিতে হইবে। আবার অন্যদিকে যেখানে বুদ্ধি, মনোবৃত্তি ও শরীরের উৎকর্ষ সাধনকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র আদর্শের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, যেখানে আদর্শের সহিত দৈনন্দিন জীবন যাপনের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয় নাই—সেইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে কর্ম্মপ্রচেষ্টাবিহীন, জীবন সংগ্রামের অনুপযোগী ও একদেশবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাচীন ভারতের ও চীনের শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে যে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে প্রকৃতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। কি মনোজগতে কি বস্তুজগতে কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। দেয়ালের গায়ে সোজা করিয়া কাঠ স্থাপন পূর্ব্বক কুড়ালি দিয়া তাহাকে কাটিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া উপর হইতে কুঠার ক্ষেপণে কাটিবার আবশ্যকীয় শক্তি অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী। ইহার কারণ শেষোক্ত প্রণালীতে প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কাঠুরিয়ার শরীরশক্তিকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করে। সেই রূপ আমাদের শরীর ও মনের মধ্যে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি—বল বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি—রহিয়াছে তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি। বাস্তবজগতে এই প্রকৃতির নিয়মকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া এবং সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া মানুষ অসাধ্য সাধন করিতেছে। আবার এই নিয়মের বিপরীত পথে চলিবার যাহাদের প্রয়াস তাহাদেরও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের শিক্ষার আদর্শ চরিত্র গঠন—এই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া যখন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়কে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই কেবল প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

পর্ত্তুগালের রাণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এলিজাবেথ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশিতেন; সকলেই তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও সুমিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হইয়া যাইত। রাণী ক্রোধের উপরে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। পবিত্রতার শুভ্রজ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় সমুজ্জ্বল থাকিত। শুদ্ধাচারিণী এলিজাবেথ চিত্ত নির্ম্মল রাখিবার জন্য কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনের কঠোরতা নিবারণের জন্য রাজপরিবারের লোকেরা বিস্তর চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। রাণী বলিতেন—

"যাহারা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন, আত্মসংযমের কঠোরতা তাহাদের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের সম্মুখেই নানা রকম প্রলোভন উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের উপরে মায়া বিস্তার করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে।"

রাণী সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন উপবাস করিতেন; রাত্রিকালে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা তাঁহার শুধু ধ্যান ও প্রার্থনাতেই কাটিয়া যাইত। রাণী প্রায়ই রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করিতেন। দরিদ্রের সেবাতেই রাণীর করুণ হৃদয় অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিত। নানাস্থানের দুঃখী, বিপন্ন, অসহায় ও তীর্থযাত্রীদিগকে তিনি দুই হাত ভরিয়া অর্থ বিতরণ করিতেন। কোন ভদ্রলোক দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কাহার গৃহে রোগ প্রবেশ করিয়াছে, কে বিপদে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে, রাণী গোপনে তাহার সন্ধান করিতেন। ঐ সকল ভদ্রলোক অবস্থাচক্রের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও পাছে বা আত্মসম্মানের লাঘব হয়, সেই ভয়ে রাণীর দ্বারস্থ হইয়া অর্থাকাঙ্ক্ষা করিতে পারিতেন না; কিন্তু দয়াশীলা রাণী গোপনে ঐ সকল ভদ্রলোককে অর্থ দান করিয়া তাঁহাদের অভাব মোচন করিতেন।

রাজবাড়ীর নিকটেই একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছিল; বিস্তর পুরুষ ও স্ত্রীলোক সেখানে বাস করিত। রাণী মাতার ন্যায় হৃদয়পাত্র স্নেহে পূর্ণ করিয়া তাহাদের কাছে যাইতেন, তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। কোন কোন রোগীর অতি দুর্গন্ধপূর্ণ ক্ষতস্থান স্বহস্তে ধুইয়া ঘায়ের উপরে ঔষধ লাগাইয়া দিতেন! রাণীর সেবায় ও সুমিষ্ট ব্যবহারে রোগক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয় একেবারে জুড়াইয়া যাইত। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে যে সমস্ত দুর্ভাগিনী নারীর পদস্খলন

হইত, রাণী সেই সকল স্ত্রীলোকের এবং তাহাদের অসহায় শিশুসন্তানদের জন্যও দুইটি আশ্রয়ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটিতে সমস্ত পতিতা নারী এবং অন্যটিতে অভিভাবকবিহীন ছেলে মেয়েরা বাস করিত।

রাজার চরিত্রের বিষয় পূর্ব্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি; তিনি যৌবনকালে দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তিনি যে একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং দয়াবান হইয়া প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার চরিত্রের দোষক্রটি সংশোধনের জন্য রাণীর কি আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা দেখা যাইত। রাজা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেই রাণী আপনার হৃদয় প্রেমে ও কণ্ঠ সুধায় পূর্ণ করিয়া, রাজার মনের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করিতেন যে, রাণীর অনুরোধে রাজাকে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইত। রাণীর বিস্তর চেষ্টায় ও বহু প্রার্থনায়, অনেক দিনের পরে রাজা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; এইসময়ে পতিপত্নী উভয়ে একপ্রাণ হইয়া অনেক মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ও রাণীর উদ্যোগে এবং অর্থেই কোয়াম্বাতে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

৩

রাজার জীবনের পরিবর্ত্তন হইলেও এক এক সময়ে তিনি ধূর্ত্তলোকের প্রতারণাজালে জড়িত হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য রাণীকে কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়া কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। রাণীর একটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মিয়াছিল; কিন্তু রাজবাড়ীর প্রতিকূল অবস্থা ও রাজার কুদৃষ্টান্তের জন্য তিনি কিছুতেই পুত্রকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। পুত্র পিতার বাধ্য ত ছিলই না; এখন সে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যের মধ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। রাণী পুত্রের দুর্ম্মতি দেখিয়া মর্ম্মাহত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা রাণীর অন্তরের ভাব মোটেই বুঝিতে পারলেন না; তাই তাঁহার একদল মো-সাহেব আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে রাণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল; তাহাদের কুমন্ত্রণা ও ছলনার জন্যই রাজার এই বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং রাণীই তলে তলে পুত্রের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া রাণীর প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। হায়, যিনি রাজকন্যা, যিনি রাজমহিষী, যিনি ধর্ম্মশীলা, যিনি পতিব্রতা, যিনি শতসহস্র রুগ্ন অসহায় ও দরিদ্রের জননী, তিনিই স্বামীর আজ্ঞায় রাজভবন ত্যাগ করিয়া এলেন কোয়ের নামক স্থানে বন্দিনীর ন্যায় নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

রাণীর এমনই ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের করুণা ও মঙ্গলভাবের উপরে এমনই নির্ভর এবং তাঁহার এমনই প্রশান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত যে, তিনি লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ও নির্ব্বাসিতা হইয়াও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিলেন না, অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিলেন না; দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়াও পড়িলেন না; তিনি জীবনের এই ঘটনার মূলে তাঁহার প্রেমময় ঈশ্বরেরই গূঢ় উদ্দেশ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। রাণী ভাবিলেন, আমারত কোনই অপরাধ নাই, তবে কেন রাজা আমার প্রতি কুপিত হইলেন? নিশ্চয়ই এই ঘটনার মূলে প্রেমময় ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি রাজপ্রাসাদের ধনৈশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মসাধনের যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই, আমার নারীহৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিতে পারি নাই, সেই জন্যই প্রভু পরমেশ্বর গূঢ় কৌশলে আমাকে রাজপুরীর বাহিরে লইয়া আসিলেন। এখন ত আর আমার অন্য কোন কার্য্যই রহিল না, সর্ব্বদা কেবল ধ্যান ও প্রার্থনাতে ডুবিয়া থাকিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকেই অগ্রসর হইব।

নির্ব্বাসিতা রাণী এলেনকোয়ের সহরে বাস করিবার সময়েই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে আর ত সুখের কোনই প্রলোভন নাই, আসক্তির কোন বস্তু নাই, রাজপ্রাসাদের কোলাহল ও আড়ম্বর কিছুই নাই; এখন তিনি একাকিনী; এখন তিনি বন্দিনী হইয়াও স্বাধীন; তাঁহার ধর্ম্মপথ বিঘ্নশূন্য, সাধনের পথ মুক্ত। রাণী পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আর বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিলেন না, যাহারা তাঁহাকে পরামর্শ দিতে আসিল, তাহাদের কুটিল পরামর্শও গ্রহণ করিলেন না। তিনি তাঁহার অন্তরে বাহিরে প্রেমময় ঈশ্বরকেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ধ্যানেই দিবারজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

৪

নির্ব্বাসিতা রাণীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগের কথা যতই রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাঁহার চিত্ত আকুল ও অধীর হইয়া উঠিল, রাজপুরী তাঁহার নিকট একেবারেই শূন্য বলিয়া মনে হইল। কেনই বা মনে হইবে না? আগেই বলিয়াছি, রাণী ধর্ম্মসাধনাই করুন, আর পরসেবাই করুন, তাঁহার স্বামীর প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা কখনই বিস্মৃত হইতেন না; তিনি উপাসনা, প্রার্থনায় ডুবিয়া থাকিয়া ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া যে সুধারসে হৃদয়পাত্র পূর্ণ করিয়া তুলিতেন, সেই সুধারস স্বামীর অন্তরে ঢালিয়া দিতে একটুকু কৃপণতা করিতেন না। রাজার তৃষিত হৃদয় সেই স্বর্গীয় সুধায় সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিত।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার বিশ্বাস জন্মিল, রাণীর কোনই অপরাধ নাই, তিনিই ভ্রমে পতিত হইয়া রাণীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। তাই তিনি রাণীর প্রতি

অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অতি সত্বরই তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। শুদ্ধাচারিণী ও বৈরাগ্যব্রতধারিণী রাজমহিষীর আধ্যাত্মিক-জ্যোতিবিমণ্ডিত উজ্জল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজার অন্তরে পবিত্র প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি ধৈর্য্যশীলা, ক্ষমাপরায়ণা, সাধ্বীপত্নীর কর্ত্তব্যে দৃঢ়, প্রেমে কোমল, ও ধর্ম্মে সমুন্নত জীবনের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অবশেষে এই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না সম্মানিতা রাণীর মহৎ জীবনের প্রভাব সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নিকটবর্ত্তী রাজ্যের রাজাদের মধ্যে অথবা রাজপরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে রাণী তাঁহার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ঐসকল রাজ্যে ও রাজপরিবারে উপস্থিত হইতেন এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া শান্তি স্থাপন করিতেন। রাণীর ভ্রাতা এরাগণের রাজার সঙ্গে ক্যাষ্টলের রাজার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম দেখিয়াই তিনি স্বামীর সঙ্গে উক্ত উভয় রাজার রাজ্যে গমন করিলেন। রাণীর হৃদয়মাধুর্য্যে ও মধুরবাক্যে এবং সুমধুর ধর্ম্মকথায় মুগ্ধ হইয়া দুই রাজা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; দুইটি রাজপরিবারের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

এই ঘটনার পরেই রাজা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। তখন রাণীর আর অন্য কোন কাজের উপরেই মন রহিল না; তিনি নিরন্তর স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দেহ ও মনের সমস্ত শক্তির দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি রাজার আত্মার কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাণী স্বামীর মঙ্গলের জন্য দরিদ্রদিগকে বিস্তর অর্থ দান করিতেন। রাজা তাঁহার এই অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যাহাতে চিত্তের প্রশান্ত ভাব ও ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন, সে বিষয়ে রাণী খুব চেষ্টা করিতেন। অবশেষে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাণীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিনই রাজা এই সংসারের নিকট অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আত্মা অতিশয় শান্তভাবে দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল।

রাণী স্বামীর মৃত্যুর পরে শোকভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া রাজপ্রাসাদের একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার চিত্ত গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেল। তাহার পরে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে সমর্পণ করিয়া সেণ্ট্‌ক্লাসস্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীদিগের বেশ ধারণ করিলেন। রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিশয় গম্ভীর ভাবেই সম্পন্ন হইয়া গেল। বিধবা রাণী আর রাজশূন্য রাজপুরীর সুরম্য অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে বাস করিতে পারিলেন না; তিনি

তৎকালের সন্ন্যাসিনীদিগের মঠের নিকটেই একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল তপস্বিনীদিগের সংসর্গে বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনীদিগের মতই তাঁহার তপস্যা আরম্ভ হইল। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার প্রেমময় দেবতা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তদ্ভিন্ন শত শত দরিদ্রের রক্ষয়িত্রী জননী হইয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিতেন; তাঁহার স্নেহমাখা হাতদুখানি পীড়িত লোকদিগের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিত। রাণী তাঁহার পুত্রবধূকেও সেবার জন্য উৎসাহিত করিয়া বলিতেন—

"বৎসে, বিপন্নের সহায় হও, দুঃখীর দুঃখ দূর কর, পীড়িত লোকদিগের সেবা করিয়া নারীজীবন সার্থক কর।"

রাণী অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই তপস্বিনী রাণী বিশ্বাসে ও প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া শান্তচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রস্থান করিলেন। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পোপ স্বর্গীয়া রাণীকে "সেণ্ট" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সেণ্টদিগের জীবনচরিতরচয়িতা রেভারেণ্ড এলবান্ বাটলার রাণী এলিজাবেথের জীবনের কয়েকটি সদ্‌গুণের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"রাণী বড়ই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিতেন, ক্রোধ, অহঙ্কার এবং হিংসা ও বিদ্বেষ শরীরের জীবনেই রাজত্ব করে, স্বর্গে ঐসকলের একটুকুও স্থান নাই। ঐসমস্তই মানুষের চিত্ত কলুষিত করে এবং যাহা অন্যায় ও পাপ, নরনারীকে তাহাতেই প্রবৃত্ত করায়। আমাদের সম্মুখে উত্তেজনা ও প্রলোভনের কারণ ত সকল সময়েই উপস্থিত হইবে, কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদিগকে শান্ত ও সংযত হইয়া থাকিতে হইবে। মানুষের অন্যায় ও অপ্রেমের পরিবর্ত্তে তাহাকে প্রেম দান ও তাহার কল্যাণ সাধন করাতেই ত প্রকৃত মনুষ্যত্ব। মানুষের উত্তেজিত প্রবৃত্তির মত শত্রু আর ত কিছুই নাই। আমরা কেন এই প্রবৃত্তির অধীন হইব? উন্মাদের পরামর্শ শুনিয়া চলাও যেমন অনুচিত, উত্তেজিত প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কোন কার্য্য করাও সেইরকম অন্যায়। এক একটি পাপ শুধু পাপ বলিয়াই পরিত্যাগ করা উচিত নহে; মনে করা কর্ত্তব্য যে, এক একটি পাপ একশত পাপের জন্মদাতা ও পরিচালক। যাঁহারা নিজেরা শান্ত ও সংযত, এবং যাঁহারা মানুষকে পুণ্য ও শান্তির পথেই পরিচালিত করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁহাদের জীবনেই ঈশ্বরের সত্তা সমুজ্জ্বল।"

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত

জাতি সংগঠনে সমবায়ের স্থান

আজ কাল জাতি সংগঠন ও পল্লীসংস্কারের একটা রব উঠিয়াছে। এবং একটা গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি (constructive programme) লইয়া জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইবে বলিয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে; কারণ সাধারণের বিশ্বাস যে আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধানের উহাই একমাত্র বা নিশ্চিত পন্থা। কিন্তু বিষয়টির মূলে কেহই বড় যাইতেছেন না। সংস্কার বা পুনঃসংগঠনের পক্ষে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। সে বিষয়ে দেশের অগ্রণীগণের দৃষ্টি বা যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। বর্ত্তমান জাতীয় অবস্থার সহিত নানা প্রশ্ন জড়িত আছে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অর্থনৈতিক সমস্যাই একটা মূল প্রশ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। অপরের স্বার্থসম্ভূত আর্থিক শোষণ বা exploitation দ্বারা ভারতের জনগণ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত, এই দারিদ্র্য নৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থারও কারণ। এই জন্য ভারতের জনবৃন্দ তাহাদের উচ্চ গুণগুলি হারাইয়া স্বাধীন জাতিসমূহের সহিত এক পংক্তিতে স্থান পাইবার অযোগ্য হইয়াছে।

ভারতের অধিকাংশ লোকই গভীর দারিদ্র্যে মগ্ন। এই অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে জাতীয় পুনরুত্থানকল্পে উচ্চ অবদান আশা করা যায় না। এবং এই জন্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মোন্মাদ উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পরিণামে ভীষণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বর্ত্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত জন সাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধনই আমাদের আশু কর্ত্তব্য। তাহাদের দারিদ্র্য দূরীকৃত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক জীবন সমুন্নত হইবে না। যাহারা দৈন্য ও অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত নহে, যাহারা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন, তাহারাই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিবার পক্ষে উপযুক্ত; জাতীয় মুক্তির যন্ত্রস্বরূপ হওয়া তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত জণবৃন্দ হুজুগে যোগ দিতে তৎপর হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সামাজিক শক্তি প্রকাশ পায়, দরিদ্র জনসাধারণ মধ্যে সেই শক্তি নির্জ্জীব ও নিষ্পেষিত হইয়া আপনাদের রাজনৈতিক দাবীর সমর্থনে নিয়োগ করিতে অসমর্থ।

ভারতবর্ষের জনবৃন্দ কেবল দারিদ্র্যপীড়িত তাহাই নহে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছে। তাহাদের যে আয় তাহা ব্যয় ও আহার্য্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার সহিত সমানভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহার উপরে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে যে অসংখ্য

'বেকার' শিক্ষিত লোকের প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ চাকরী বা ব্যবসায়ের প্রাচুর্য্য নাই। প্রকৃত কথা এই যে, ভারতের সভ্যতা এখন একটি পরিবর্ত্তমান ও অর্থনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই অবস্থাঘটিত অভাবের ও প্রয়োজনের উপযোগী জীবিকাঅর্জ্জনের নানাপথ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এই জন্য যে কয়েকটি চাকরী ও পেশা আছে তাহাতে প্রবেশলাভ দুষ্কর। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা, চাকরী হইতে উমেদারের সংখ্যা অনেক বেশী। এই শোচনীয় অবস্থা বশতঃ অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সংখ্যা ও সামাজিক দুর্দ্দশা যুগপৎ বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন সমাজের কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জীবিকার্জ্জনের নূতন পথ আবিষ্করণ ও নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সঙ্গে গরীব ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার শিক্ষিতদলের বাবুয়ানার স্পৃহা (petty-bourgeois mentality) ত্যাগ করিতে হইবে; কায়িকশ্রমের প্রতি সম্মান শিক্ষা করিতে হইবে; আইনের ও চিকিৎসার ব্যবসায় ছাড়াও যে সম্মানজনক ব্যবসা আছে, ইহা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতে বাণিজ্য ও কলকারখানা এত বেশী নাই যাহা দ্বারা সমুদয় শিক্ষিত বেকারের দল জীবিকা সংগ্রহে সক্ষম হয়। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত দেশ সম্পূর্ণরূপে শিল্পপ্রধান (Industrialised) না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার মীমাংসা হইবেনা। কিন্তু কেবল শিল্প সাধনার দ্বারাই এই বিশাল জনসংঘের আর্থিক দুরবস্থা দূর হইবেনা। কারণ আমাদের প্রয়োজন অন্তর্দ্দীয় স্বার্থসম্ভূত শোষননীতি (Exploitation) হইতে আত্মসংরক্ষণ। এজন্য এইরূপ একটা অবস্থা আনিতে হইবে যাহার দ্বারা বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী, বেতন ভোগী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীরই আর্থিক কষ্টের লাঘব হয়। শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী উভয় শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নানা অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িসংঘ (Trade Union) প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই প্রতিষ্ঠান তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার রক্ষার যন্ত্র স্বরূপ হইবে। অপিচ এই সঙ্গে এখন অন্যপ্রকারের প্রতিষ্ঠাণসকলও স্থাপন করিতে হইবে যাহাদ্বারা তাহারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান্ হইতে পারে। কিন্তু যতদিন না ইহারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করিতে পারে, স্বাবলম্বন না শিক্ষাকরে, ততদিন ঐসকল প্রতিষ্ঠাণ স্থাপিত হইতে পারিবে না।

আর্থিক বিনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভারতের শ্রমিকগণ ও দরিদ্র মধ্যবিত্তগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় পন্থা (Co-operation) অবলম্বন করিতে পারেন। এই বিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্ত তাহাদের গ্রহণীয়। সকল সভ্য দেশেই গণবৃন্দ জনবৃন্দ "সমবায়" দ্বারা যথাসম্ভব অন্তর্দ্দীয় শোষণের পথ রোধ করিয়া আপনাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্যে (mutual aid)

শ্রমদ্বারা সৃষ্ট কর্ম্মের মূল্যের অতিরিক্ত লাভ (surplus value of the capital) শ্রমিকদের হস্তে রাখাকে 'সমবায়' বলে।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এমন যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যাহাতে সাম্যসম্মত কার্য্যপ্রণালী ও অর্থোপার্জ্জনের উপায় দ্বারা সভ্যেরা নিজেদের ও সমাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী অন্য সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। অন্যপ্রকার কারবারে মূলধনের উপরে যে লাভ হয় অংশীরা তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু সমবায় সমিতিতে সভ্যেরা কেবলমাত্র কতকগুলি সুবিধা পাইয়া থাকে। এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে কর্ম্মোদ্যোগী (entrepreneur) মালিক ও পরিচালকেরা আবার খরিদ্দার হয়। সমবায় সমিতি কেবলমাত্র নিজের সভ্যদের উপকারার্থ নিযুক্ত থাকে, এই বিষয়ে অন্যসকল মহাজনী (capitalistic) কারবার হইতে এই পদ্ধতির প্রভেদ আছে। ইহার অর্থনৈতিক সুবিধা এই যে দ্রব্যের উৎপাদন (production) ও বণ্টন (distribution) কালে মধ্যবর্ত্তী কারবারীদের (middle men) বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ কারবারের মাল দশ হাতের ভিতর দিয়া খরিদ্দারের হাতে পৌছায়না, এইজন্য মাল অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে বিক্রীত হয়। সভ্যেরা বাহিরের দোকান অপেক্ষা সমিতির দোকানে সস্তায় দ্রব্য পাইয়া থাকে। সমবায়ে আর্থিক দিকের মত একটা সামাজিক দিক বিদ্যমান। ইহা কিয়ৎপরিমাণে কতগুলি সামাজিক সঙ্কটের নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার ও ক্রমবিকাশ দ্বারা বিশৃঙ্খল জাতীয় অর্থনীতিক পরিবর্ত্তণ করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রবর্ত্তনই সমবায় চেষ্টার লক্ষ্য। এই পদ্ধতিকে জমীর খাজনা, ব্যবসায়ে উদ্যোগী ও মধ্যবর্ত্তী লোকদের লাভ, মূলধনের উপর সুদ প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, এবং যাহাতে প্রত্যেক শ্রমিক তাহার কায়িক শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পায় এবং জাতির দ্বারা দ্রব্যজাতের উৎপাদন (production of the nation) কাটতি বা প্রয়োজনের (consumption) সঙ্গে সমানীভূত (balanced) হয় সেইরূপ যুক্তিযুক্ত (rational) নিয়ম প্রচলিত হইবে। এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে উন্নত করা আবশ্যক; তজ্জন্য তাহাদের প্রত্যেককে আহার্য্য উৎপাদনের, বর্ত্তমান কালের যন্ত্রপাতি, কর্ম্মের স্থান, মাল তৈয়ারির উপকরণ (Raw Stuff) সমবায় সমিতিকে সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে ঋণদান দ্বারা জোগাইতে হইবে। এইরূপে পরস্পর সহযোগিতাসাপেক্ষ সমবায় সমিতি দ্বারা দরিদ্রগণ আপনাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। এই ব্যাপারের সামাজিক দিকটি প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহযোগিতা একত্র মিলিত হইবে (অর্থাৎ

Co-operate করিবে)। এবং তদ্দ্বারা পরস্পরকে চিনিবে; জানিবে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। ইহাতে ভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও বিদ্বেষ দূর হইয়া সাম্য ও সদ্ভাব স্থাপিত হইবে। ইহার দ্বারা যে শিক্ষালাভ হইবে তাহার মূল্য অনেক। কর্ত্তব্য জ্ঞান, লাভের (dividend) প্রতি নিস্পৃহতা, ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানের (Reserve fund) অভ্যাস ইত্যাদি সমবায়ের কার্য্য প্রণালীর ভিতর দিয়া শিক্ষা করা যাইবে। সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে মিলন ও প্রচেষ্টা তাহাদ্বারা স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইবে। আজকাল ব্যবসায়ে লাভের জন্য যে একটা অদমনীয় অসীম লোভ দেখা যায় তাহা প্রশমিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা ও দ্রব্যের সুলভতা প্রবর্ত্তিত হইবে। কারণ সমবায় পদ্ধতিসম্মত অনুষ্ঠানগুলি কেবল জনকতক উপরিস্থিত লোকের লাভের জন্য নহে, সমিতির প্রত্যেক এবং সমুদয় সভ্যের উপকারের জন্য। এক কথায় সমবায়ের উদ্দেশ্য সমবেত বহুজনের সেবা।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

অষ্টম অধ্যায়।

এখন আমাকে একবার ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সমগ্রসম্পূর্ণ নক্‌সা খানি আপনাদিগের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল যুগের আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন জটিলতা নাই; তাহাদিগকে বুঝিবার জন্য দূর ভবিষ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক হয় নাই; তাহাদের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানও চিন্তাচেষ্টার পরিণাম অব্যবহিত কালেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা যে সকল যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব তাহাদের গৌণতম ও সুদূরতম পরিণামের সহিত সংযুক্ত না করিয়া দেখিলে তাহাদিগের ইতিহাস আমাদের পক্ষে বোধগম্যও হইবে না, চিত্তাকর্ষকও হইবে না। এরূপ একটা বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনায় এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে যখন আমরা সম্মুখের পথটা দেখিয়া না লইয়া অগ্রসর হইতে চাই না; কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় আসিলাম, কোন্ লক্ষ্যের দিকেই বা যাইতেছি, সবটুকু তখন আমরা বুঝিয়া লইতে চাই। এখন আমাদের সেই অবস্থা। যে যুগের আলোচনায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব আধুনিক যুগের সহিত তাহার সম্বন্ধটুকু বুঝিয়া না লইতে পারিলে তাহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে না, বিশিষ্ট তাৎপর্য্যও বুঝা যাইবে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল মৌলিক উপাদান, আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রায় সমস্তগুলিরই সন্ধান ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "প্রায়" বলিলাম কারণ এখনও আমি রাজতন্ত্রের উল্লেখ করি নাই। রাজতন্ত্রের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই। রাজতন্ত্র তখনই প্রথম যথার্থভাবে গঠিত হয় ও আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে একটা নির্দ্দিষ্টস্থান অধিকার করিয়া বসে। এইজন্য ইতিপুর্ব্বে রাজতন্ত্রের আলোচনা করি নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব। এই রাজতন্ত্র ব্যতিরেকে ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদানগুলিই একে একে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। আপনারা ভূস্বামীতন্ত্রমূলক আভিজাত্য, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, সমস্তগুলিরই উদ্ভব লক্ষ্য করিয়াছেন; ঐ সকল তন্ত্রের প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানাদিরও উদ্ভব দেখিয়াছেন; এবং শুধু প্রতিষ্ঠান নহে, তাহাদের প্রকৃতি-অনুযায়ী তত্ত্ব ও নীতির প্রাদুর্ভাবও দেখিয়াছেন। যথা, ভূস্বামীতন্ত্রের আলোচনাকালে আপনারা আধুনিক পরিবার ও পারিবারিক জীবনের উদ্ভব কিরূপে হইল দেখিয়া লইয়াছেন; ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভাব কিরূপে এত প্রবল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল তাহাও বুঝিয়া লইয়াছেন। তেমনি চর্চের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন কেমন করিয়া প্রথমে একটি বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠিল, সাধারণ সমাজের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক ঘটিল, কেমন করিয়া ক্রমশঃ যাজকতন্ত্রনীতির উদ্ভব হইল, ঐহিকতন্ত্র ও পারত্রিকতন্ত্রের পার্থক্য সাধিত হইল; এবং পরে কিরূপে চর্চ্চে অত্যাচারনীতির প্রবেশ ঘটিল, এবং কিরূপেই বা মানুষের বিবেক প্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অপরদিকে পৌরতন্ত্রের ইতিহাসে অন্য এক নীতির বিকাশ দেখিয়াছেন। যাজকতন্ত্র বা ভূস্বামীতন্ত্রের গঠননীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নীতি অনুসারে গঠিত এক নূতন সমাজের পরিচয় পাইলেন; তাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষম্য ও সংঘর্ষ হইতে কেমন করিয়া ক্রমশঃ আধুনিক পৌর চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ ভীরুতা ও উদ্যমের, উন্মাদনা ও আইনবশ্যতার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিল তাহাও দেখিয়া লইয়াছেন। এক কথায়, ইউরোপীয় সমাজ যে যে উপাদানের সহায়তায় গঠিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার যে সমস্ত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, এবং তাহার প্রাক্তন ইতিহাস হইতে তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপে সূচিত হয়—সমস্তই আপনাদের দৃষ্টিপথে আনিয়াছি।

এখন একবার কল্পনার সাহায্যে আধুনিক ইউরোপের মর্ম্মস্থলে উপনীত হওয়া যাউক। আমি ফরাসী বিপ্লবের বিপুল পরিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ইউরোপের কথা বলিতেছি না, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কথা বলিতেছি। আমরা দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজের যে রূপ দেখিয়াছি, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কি সে রূপের কোন পরিচয় পাইতেছি? কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আমি পৌরসমাজ সম্পর্কে এ রূপান্তরের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ বা জনসমাজের সহিত আধুনিক কালের জনসমাজের সাদৃশ্য কত অল্প তাহাও আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভূস্বামী সমাজ ও যাজক সমাজ সম্পর্কে ঐরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিলেও ঐরূপ বিস্ময়জনক রূপান্তরের পরিচয় পাইব। দ্বাদশ শতাব্দীর সাধারণ পৌরবর্গের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের যেরূপ বৈসাদৃশ্য, ফিউড্যাল অভিজাতবর্গের সহিত পঞ্চদশ লুইর রাজসভার অভিজাতবর্গের, এবং আবট সুগেরের (Abbot Suger) চর্চের সহিত—কার্দিনাল দ্য বেণীর চর্চের সেইরূপ বৈসাদৃশ্যই লক্ষিত হয়। যদিও উভয়যুগেই ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদানই একত্র হইয়াছিল, তথাপি এই উভয়যুগের মধ্যবর্ত্তীকালে সমাজ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

আমি এই রূপান্তরের যথার্থ প্রকৃতি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমাজের পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত উপাদানই বর্ত্তমান ছিল। রাজা ছিল, ঐহিক অভিজাতবর্গ ছিল, যাজকবর্গ ছিল, পৌরবর্গ ছিল, শ্রমজীবি-সমাজ ছিল, ঐহিক ও পারত্রিক শাসনতন্ত্র ছিল—এক কথায় একটা নেশান বা জাতি, এবং রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই ছিল, কিন্তু তথাপি রাষ্ট্রও ছিল না, জাতিও ছিল না। এই সমগ্রযুগের মধ্যে একটা সম্মিলিত জাতি বা যথার্থ রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি বলিলে যাহা বুঝায় তাহার কিছুই ছিলনা। কেবল কতকগুলি খণ্ডশক্তি, বিশিষ্ট ব্যাপার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি পাওয়া যায়; কিন্তু সার্ব্বজনীন বা সর্ব্বসাধারণ কোন ব্যাপারই পাওয়া যায় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রও নাই,—যথার্থ জাতীয় সত্ত্বাও নাই।

অপরদিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন ইউরোপীয় জগতের রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বত্রই দুইটি প্রধান সত্ত্বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—রাষ্ট্রতন্ত্র বা গবর্ণমেন্ট এবং প্রজাসাধারণ বা নেশন্। সমগ্র দেশের উপর একমাত্র কর্ত্তৃশক্তির শাসন এবং এই শাসনশক্তির উপর সমগ্র দেশের জনবৃন্দের প্রভাব—এই লইয়াই সমাজ, এই লইয়াই ইতিহাস। এই দুই প্রবল শক্তির পরস্পরসম্বন্ধ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও বিরোধ, ইতিহাস ইহাই কেবল উদ্ঘাটন করিতেছে ও বিবৃত করিতেছে। অভিজাতবর্গ, যাজকবর্গ, পৌরবর্গ, এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডসমাজ ও খণ্ডশক্তি এখন গৌণস্থান অধিকার করিয়া আছে, পূর্ব্বোক্ত দুই বৃহৎশক্তির পশ্চাতে তাহারা প্রায় ছায়ার মত মিলাইয়া গিয়াছে।

আদিম ইউরোপ ও আধুনিক ইউরোপের মধ্যে ইহাই হইল আসল প্রভেদ; ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই রূপান্তরই সংঘটিত হইয়াছিল।

অতএব ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ এখন আমরা যে যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব সেই যুগের মধ্যেই এই রূপান্তরের রহস্য সন্ধান করিতে হইবে। এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে ইহার মধ্যে আদিম ইউরোপ আধুনিক ইউরোপে রূপান্তরিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক হিসাবে ইহাতেই এযুগের মূল্য ও তাৎপর্য্য। যদি এইদিক দিয়া এ যুগের ইতিহাসের আলোচনা না করা হয়, যদি পরবর্ত্তী পরিণামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া

এযুগের ইতিহাস চর্চা করা যায়, তাহা হইলে এ ইতিহাস বুঝা ত যাইবেই না, উপরন্তু শীঘ্রই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকপক্ষে, ইহার ভবিষ্য পরিণামের সহিত সম্পর্কিত করিয়া না দেখিলে এ যুগের কোন বিশিষ্ট প্রকৃতি পাওয়া যায় না; দেখিব কেবল বিশৃঙ্খলাই বাড়িয়া চলিতেছে, অথচ কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, চারিদিকে কেবল লক্ষ্যবিহীন গতিবেগ ও নিস্ফল আন্দোলনের ঝটিকাবর্ত্ত। রাজা, অভিজাত, যাজক, পৌর—সমাজব্যবস্থার সমস্ত অঙ্গই একই আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে—অগ্রসরও হইতে পারে না, স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না। তাহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইতেছে; তাহারা কেহ সুব্যবস্থ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কল্পে চেষ্টা করিতেছে, কেহ সাধারণের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে, কেহ বা ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু কিছুই সুসিদ্ধ হইতেছে না, কিছুই সুসম্পূর্ণ হইতেছে না। যদি কখনও মানবজাতি এমন বিড়ম্বনায় পড়িয়া থাকে, যে সে চঞ্চল হইয়াও অগ্রসর হইতে অসমর্থ, অবিরত পরিশ্রম করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত, তবে সে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে।

আমি কেবল একখানি গ্রন্থ জানি যাহাতে এই বিড়ম্বনা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে—দ্য বারাঁত্ (De Barante) প্রণীত "বর্গণ্ডীর ডিউকদিগের ইতিহাস"। এই গ্রন্থে রীতিনীতির বর্ণনায়, বা তথ্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় যে সত্যের আভাস পাওয়া যায় তাহার কথা বলিতেছি না; পরন্তু যে সাধারণ সত্যের আলোকে সমস্ত গ্রন্থখানি এই যুগের নিস্ফল চাঞ্চল্যের একটি যথার্থ প্রতিচ্ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই কথা বলিতেছি।

কিন্তু যদি পরবর্ত্তীকালের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করা যায়, যদি আদিম হইতে আধুনিক ইউরোপের রূপান্তরকাল হিসাবে ইহাকে দেখা যায় তাহা হইলে তখনই ইহা উজ্জ্বল ও সজীব হইয়া উঠে; তখন ইহার মধ্যে একটা সমগ্রতা, একটা লক্ষ্যমুখী গতি, একটি ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই; ইহার মধ্যে ধীরে ধীরে যে নীরব ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তাহাতেই তাহার ঐক্যসূত্র ও তাৎপর্য্য নিহিত।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসকে তাহা হইলে তিনটি বৃহৎ যুগে ভাগ করা যায়:—

(১) সৃষ্টিযুগ—এযুগে ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে গা ঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, এবং স্ব স্ব মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এযুগের ব্যাপ্তিকাল।

(২) দ্বিতীয় যুগটি প্রচেষ্টার যুগ, পরীক্ষার যুগ, পথ সন্ধানের যুগ। সমাজশৃঙ্খলার বিভিন্ন উপাদান এখন পরস্পর সান্নিধ্যে আসিল, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইল,

পরস্পরের প্রভাব অনুভব করিল, কিন্তু একটা কিছু সার্ব্বজনীন, সুব্যবস্থ বা স্থায়ী সত্ত্বা গড়িয়া তুলিতে পারিল না। এ অবস্থা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলা যায়।

(৩) তৃতীয় যুগ বিকাশের যুগ। এই যুগে ইউরোপীয় সমাজ একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি লাভ করিল, একটা নির্দ্দিষ্ট গতিবেগ প্রাপ্ত হইল, একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুতবেগে ও ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার আরম্ভ, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহা চলিতেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস আমার নিকট এইরূপেই প্রতিভাত, এবং এইরূপেই আপনাদিগের নিকট ইহা প্রকটিত করিব। এখন আমরা দ্বিতীয় যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহার মধ্যে পরবর্ত্তী কালের সামাজিক রূপান্তরের বড় বড় কারণগুলির সন্ধান লইতে হইবে।

এই যুগের প্রারম্ভেই যে প্রথম বৃহৎ ঘটনা আমাদের চক্ষে পড়ে তাহা ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ। একাদশ শতাব্দীর আরম্ভেই ক্রুসেডের আরম্ভ এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। এই ক্রুসেড্ যে একটা বৃহৎ ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ইহার সমাপ্তিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিকবর্গ অনবরত ইহার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; এমন কি ইহার বিবরণ পাঠ করিবার পূর্ব্বেই সকলেই বুঝিয়াছেন যে ইহা এমন একটা ঘটনা যাহা জনসমাজের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, এবং ঘটনাবলীর সাধারণ গতি বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

ক্রুসেডের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার ব্যাপকতা। সমগ্র ইউরোপ এই সকল ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল; ক্রুসেডই প্রথম ইউরোপব্যাপী ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্রুসেডের পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপ কখনও একভাবে উত্তেজিত হয় নাই বা এক উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া কার্য্য করে নাই; এক কথায় তৎপূর্ব্বে ইউরোপ বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। ক্রুসেড যুদ্ধই খৃষ্টপন্থী ইউরোপকে প্রকটিত করিল। ফরাসীরাই প্রথম ক্রুসেড সেনার পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা ছাড়া জার্ম্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, ইংরেজ ইহারাও ছিল। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন সমস্ত খৃষ্টীয় জাতিই তাহাতে যোগ দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার একেবারেই দেখা যায় নাই।

শুধু তাহাই নহে; ক্রুসেড যেমন একটি ইউরোপ-সাধারণ ঘটনা, সেইরূপ ইউরোপে প্রত্যেক দেশে ক্রুসেড্ একটি জাতীয় ইতিহাসের ঘটনা। সমাজের সকল শ্রেণী একই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, একই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। রাজা, ভূস্বামী, যাজক, পৌর, পল্লীবাসী সকলে একই উদ্যমের সহিত একভাবেই ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিল। এইরূপে যেমন একটা ইউরোপীয় ঐক্যের সূচনা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে সেইরূপ এক একটা জাতীয় ঐক্যের নূতন আবির্ভাব দেখা গেল।

এইরূপ ঘটনা যখন জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থায় দেখা দেয়,- যখন মানুষ স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে চিন্তাচেষ্টা না করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না লইয়া কাজ করে—তখন এই সকল ঘটনাকে "হিরোয়িক" বা অতিমানব আখ্যা দেওয়া হয় এবং সেই সেই যুগকে জাতীয় জীবনের মহাবীরযুগ বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ক্রুসেড্ আধুনিক ইউরোপের হিরোয়িক ঘটনা। এ আন্দোলন এককালে ব্যাপক ও ব্যক্তিগত, জাতীয় অথচ অনিয়ন্ত্রিত।

ক্রুসেডের আদিম প্রকৃতি যে বাস্তবিকই এইরূপ তাহা সমস্ত দলিল সমস্ত ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ক্রুসেডযুদ্ধে প্রথম নামিল কাহারা? কতকগুলি সাধারণ লোকের সমষ্টি। পীটার সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল, না ছিল তাহাদের উদ্যোগ, না ছিল তাহাদের পথপ্রদর্শক, না ছিল তাহাদের নায়ক অধিনায়ক। দুই একজন অখ্যাতনামা নাইট্ বা ক্ষত্রবীর তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাদিগকে নেতা না বলিয়া অনুচর বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপে তাহারা জার্মানী অতিক্রম করিল, গ্রীক সাম্রাজ্য অতিক্রম করিল, অবশেষে এশিয়া মাইনরে তাহারা হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, না হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

যথাক্রমে ফিউড্যাল্ অভিজাত সম্প্রদায়ও ক্রুসেড আন্দোলনে উদ্যমের সহিত যোগ দিলেন। গোদ্‌ফ্রোয়া দ্য বুয়িয়ঁর (Godefroi de Bouillon) নেতৃত্বে ভূস্বামীবর্গ অনুচরপরিবৃত হইয়া উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন। এশিয়া মাইনর অতিক্রম করিবার সময় ক্রুসেড-নেতৃদিগের অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা আর গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে চাহিল না; তাহারা পথিমধ্যেই দল বাঁধিয়া এক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। সেনাভুক্ত জনসাধারণ ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহারা জেরুসালেম যাইতে চাহে, কারণ জেরুসালেম-উদ্ধারই ক্রুসেডের লক্ষ্য; ক্রুসেডারগণ রেমঁ দ্য তুলুজ্ (Raimond de Toulouse) বা বোহেমণ্ড (Bohemond) বা অন্য কাহারও জন্য রাজ্যজয় করিতে আসে নাই। এই যে ইউরোপব্যাপী লোকসাধারণের সমবেত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা, ইহার নিকট ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরাজিত হইল; সাধারণ লোকের উপর নেতৃবর্গের এত প্রভাব ছিল না যে তাহাদিগকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে পারে। ইউরোপের রাজন্যবর্গ, যাহারা প্রথম ক্রুসেড হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে এই আন্দোলনের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বড় বড় ক্রুসেডে রাজারাই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

এখন একেবারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যাওয়া যাউক। তখনও ইউরোপে লোকে ক্রুসেডের কথা বলিত, এমন কি উৎসাহের সহিত প্রচারও করিত। পোপগণ রাজা প্রজাকে উত্তেজিত করিত, পুণ্যক্ষেত্রের উদ্ধারকল্পে সভাসমিতিও করিত; কিন্তু

লোকে তখন আর বড় কেহ ক্রুসেডে যাইত না, ক্রুসেডের আহ্বান বড় কেহ আর গ্রাহ্য করিত না। ইউরোপীয় সমাজে ও লোকচিত্তে এমন একটা কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, যাহাতে ক্রুসেড-যুদ্ধের অবসান ঘটিল। দুই একটি ভূস্বামী বা দুই একটি দল তখনও জেরুসালেম যাত্রা করিত; কিন্তু সেই ব্যাপক আন্দোলনের তখন শেষ হইয়াছে; অথচ ইহা বুঝা যায় না যে সে সময় ক্রুসেডের প্রয়োজন বা সুবিধার কিছু অভাব ছিল। মুসলমানেরা তখন এশিয়াখণ্ডে উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতেছে। জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয়রাজ্য তাহাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেই রাজ্য পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল; ক্রুসেডের প্রারম্ভকাল অপেক্ষা তখন কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল; এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনে বহুসংখ্যক খৃষ্টান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রান্ত ছিল। তাহারা তখন এশিয়াখণ্ডে যাতায়াত ও কার্য্য করিবার উপায় ও প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল শিখিয়া লইয়াছে। তথাপি, ক্রুসেড আন্দোলন আর কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত হইল না। স্পষ্ট দেখা গেল যে সমাজের দুই প্রবল শক্তি—রাজশক্তি ও জনশক্তি—উভয়েই ক্রুসেডের প্রতি বিরূপ।

অনেকে বলেন এটা অবসাদমাত্র; বার বার এইরূপে এসিয়ার উপরে পড়িয়া ইউরোপ তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদ কথাটি লইয়া ভাল করিয়া একটু বোঝা পড়া হওয়া আবশ্যক; এরূপক্ষেত্রে প্রায়ই কথাটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা অসঙ্গত প্রয়োগ। পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য বর্ত্তমান কালের লোক ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করিবে ইহা সম্ভব নহে, কারণ যে উদ্যম করে সেই ক্লান্তি বোধ করিতে পারে। ক্লান্তি বা অবসাদ ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার, তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে চালিত হইতে পারে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের দ্বারা পরিক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই; তাহারা একটা নূতন প্রভাবের বশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনোভাব ও সামাজিক অবস্থায় একটা মহৎ পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। লোকের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তখন আর পূর্ব্বের মত ছিল না। তাহাদের চিন্তা ও বাসনার বিষয় তখন অন্যরূপ। পুরুষানুক্রমে লোকের চেষ্টা ও আচরণ যে ভিন্নরূপ হইয়া যায় তাহার কারণ এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন। লোকসমাজে যে কল্পিত অবসাদ আরোপ করা হয় তাহা মিথ্যা রূপকমাত্র।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

বঙ্গনারীর নূতন অধিকার

এই বৎসর ভাদ্র মাসের স্মরণীয় নানা ঘটনার মধ্যে নব্যভারতের নবীন আদর্শের অনুরূপ একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি বঙ্গনারীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার বা franchise.

এই অধিকারটি পাইবার জন্য সভ্যতা ও স্বাধীনতার দেশ ইংলণ্ডের নারীদিগকে অনেক দিন ধরিয়া অতি কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সে দেশে নারীর অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই, সর্ব্বত্র যাতায়াতে বা প্রকাশ্য সভায় আসন পরিগ্রহ করিতে বাধা নাই; সেখানে নারী সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে, সমাজের সকল ব্যাপারের সঙ্গে যোগ ও সহকর্ম্মিতা আছে, পুরুষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে নারীরা সেখানে বহুকাল হইতে তাহাদের সাহায্য করিয়া আসিতেছিল, তথাপি তাহাদিগকে সেই স্বাধীন দেশের পুরুষেরা তুল্য রাজনৈতিক অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না। যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা যখন সহজপ্রাপ্য না হয়, যখন অন্যায়রূপে কেহ কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করে, তখন যে পক্ষে ন্যায় সে পক্ষও অযথা পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য আবেদন, নিবেদন, যুক্তিপ্রদর্শনে যখন ফলোদয় হইল না, তখন ন্যায্য অধিকার লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীর দল নারীসুলভ শান্তির পথ ত্যাগ করিয়া অতি দুরন্ত হইয়া উঠিল। ছাড়িয়া না দিলে কাড়িয়া লইতে হইবে, বলিয়া, তাহারা নানা উৎপাত ও উপদ্রবের সৃষ্টি করিল, দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া পথে ঘাটে, সভাসমিতিতে, এমন কি পার্লামেণ্ট মহাসভার মধ্যে গোলযোগ উৎপাদন করিয়া দেশের লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিল। শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তাহারা দলে দলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, সেখানে কত জন অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া দেহপাত করিতে প্রস্তুত হইল; আশা, যদি এইরূপে পুরুষের হৃদয় দ্রবীভূত এবং নারী সাধারণের অধিকার প্রাপ্তির পথ মুক্ত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমাদের যুবকেরা এই নারীদের প্রদর্শিত পথই কতকটা অনুসরণ করিতেছিল। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ব্রত গ্রহণও বোধ হয় ইহাদের শিক্ষার ফল। সে যাহা হউক, ইংরাজ নারী শান্তির দিনে যে আশা ও আশ্বাস পায় নাই, গত মহাসমরের ঘোর সংকট কালে সে আশ্বাস তাহাদিগকে দেওয়া হইল। তাহার পর, যুদ্ধকালে দেশের পুরুষবিরল অবস্থায়, নানাক্ষেত্রে ইংরাজ নারীরা অদৃষ্টপূর্ব্ব কর্ম্ম-ক্ষমতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেবা ও সহকারিতার পুরস্কারস্বরূপ যুদ্ধশেষে পুরুষদিগের তুল্য অধিকার লাভ করিল। এদেশে ১৯১৯ সনের সংস্কার আইনে নারীর নির্ব্বাচন অধিকার দেওয়া না দেওয়ার মীমাংসার ভার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তদনুসারে

বম্বে ও মান্দ্রাজ তথাকার নারীদের এই অধিকার দিতে বিলম্ব করে নাই। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ বহুকাল নানা বিষয়ে অপরাপর প্রদেশের পথপ্রদর্শক হইলেও এ বিষয়ে পশ্চাতে রহিল। বাঙ্গলা দেশ মুসলমানপ্রধান। মুসলমান নারী পারস্যে ও তুরস্কে এ যুগে যাহাই করুক, এদেশে সে পূর্ব্বের মতই অবরোধবন্দিনী অসূর্য্যম্পশ্যা, পুরুষের দৃষ্টি হইতে সযত্নে রক্ষিতা, ভোট দিতে আসিলে তাহার এই মহাগৌরব নষ্ট হইবে। বঙ্গের হিন্দু রমণীরা বিদেশে ও তীর্থস্থানে যথেচ্ছ চলাফেরা করিলেও এবং কেহ কেহ কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং সহরে ইংরাজ দোকানে সওদা করিয়া বেড়াইলেও, তাহাদের অধিকাংশই অবরোধ মানিয়া চলে, বম্বে মান্দ্রাজের নারীদের মত তাহারা অবগুণ্ঠনবর্জ্জিতা নহে! অপর দিকে বম্বে মান্দ্রাজের পুরুষেরা অবিকৃতচিত্তে নারীদিগকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে অভ্যস্ত। এই জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুসলমান সভ্য, এবং প্রাচীনপন্থী হিন্দু সভ্য নারীদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে, ১৯২১ সনের অক্টোবর মাসে, নব্যতন্ত্রের জনৈক উদারনৈতিক সভ্য নারীদের নির্ব্বাচন অধিকার দিবার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। তখন দুই চারিজন ভিন্ন আর সকল মুসলমান সভ্যের এবং দুই একজন ভিন্ন রাজা-মহারাজ-কুমার-উপাধিগ্রস্ত হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় সভ্যদের প্রতিকূলতায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। সরকার পক্ষীয় ইংরাজগণ কোন পক্ষে যোগ দিলেন না। সেদিন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৩৭ এবং বিপক্ষে ৫৬ জন ভোট দিয়াছিলেন। এবার ১৯শে আগষ্ট তারিখে একজন বঙ্গনিবাসী ইংরাজ এই প্রস্তাব আবার উপস্থিত করেন। স্বপক্ষে ৫৪ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন মত দেওয়াতে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় এই দুই দলের সভ্য সংখ্যার অনুপাতের সহিত দেশের লোকের এই বিষয়ে স্বপক্ষতা বিপক্ষতার সমানুপাত না ও হইতে পারে। তথাপি বর্ত্তমান কালে, এই দেশে চারিবৎসরের মধ্যে নারীর স্বপক্ষে এই পরিবর্ত্তনটুকু আশা ও আনন্দের কথা। ইহার মধ্যে উদাসীন দর্শকেরা অদৃষ্টদেবতার একটু পরিহাসও দেখিয়াছেন। গতবার যিনি নারী জাতির দাবীর প্রতিকূল পক্ষের অন্যতম সেনাপতিরূপে জয়োল্লাস করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবার তিনি ছিলেন তাঁহার স্বপক্ষের পরাজয়ের নির্ব্বাক্ সাক্ষী।

দুইবারেই নারীদিগকে নির্ব্বাচন অধিকার না দিবার পক্ষে পরদাপ্রিয় মুসলমানগণ ও দেশাচার রক্ষণে যত্নশীল হিন্দুগণ যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহার যে কয়েকটি স্মরণ হইতেছে নিম্নে উল্লিখিত হইল। পাঠকবর্গ যুক্তিগুলির যৌক্তিকতা বিচার করিবেন।

১। গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান রমণীরা পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না, তাহাদের পক্ষে পোলিং ষ্টেষনে আসিয়া ভোট দেওয়া অসম্ভব।

২। (ক) নারীদের অধিকাংশ অশিক্ষিতা, এমন কি নিরক্ষর, তাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার কিছুই বোঝেনা, অতএব তাহাদের মতামত লওয়া অনাবশ্যক।

(২) তাহারা পিতা স্বামী ভ্রাতা বা অপর কোন অভিভাবকের মতে মত দিবে, অতএব সেই পুরুষ অভিভাবকের মতই যথেষ্ট।

(৩) নারীরা সুখে ও শান্তিতে ঘরকন্না করিতেছে। পতিসেবা ও সন্তান পালন, এই দুইটি তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, রাজনৈতিক অধিকার এই কর্ত্তব্য পালনের সহায়ক না হইয়া ব্যাঘাতক হইবে।

(৪) রাজনীতির পথ অতি পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময়। এ পথে আমাদের মাতা পত্নী ও ভগিনীকে টানিয়া আনা অপকর্ম্ম। অন্ততঃ আরও দশ বৎসর যাউক, তখন এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।

(৫) দেশের নারীরা এ অধিকার চাহে না। দুই চারিটি শিক্ষিতা নারীর প্ররোচনায় সকলের জন্য এ দাবী পূরণ করিতে গিয়া অনর্থক একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে। এই জন কতক যদি নিতান্তই চায়, ইহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। অতএব স্থির হউক, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা নারীরা ভোট পাইবে।

(৬) গৃহস্থের বধূরা ভোট দিতে আসিবেই না। এই অধিকার দেওয়া হইলে সহরের পতিতা নারীদের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সকল আপত্তির সংক্ষেপে এই উত্তর দেওয়া যায়।

১। বঙ্গে ও মান্দ্রাজে হিন্দু এবং মুসলমান আছে। সেখানে যদি নারীর ভোট গ্রহণ সম্ভব হয় এখানে অসম্ভব হইবে কেন? সম্প্রতি মিউনিসিপাল ইলেকশনে নারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে নারীদের ভোট লইবার সুব্যবস্থা করা গিয়াছিল। আপনি যাহারা ভোট দিতে ইচ্ছুক, কেবল তাহারাই দিতে আসিবে। এবিষয়ে ভোট প্রার্থীর জোর জবরদস্তি খাটে না। গোঁড়া হিন্দু নারীর কিম্বা সমুদয় মুসলমান নারীরা যদি ভোট দিতে নিরস্ত থাকেন তাহাতে কি ক্ষতি?

২। নারীরা যেমন অশিক্ষিতা, তেমনি দেশের বহু অশিক্ষিত পুরুষ আছে, তাহাদের ভোট লওয়া হইতেছে, কেন অশিক্ষিতা বলিয়া নারীর লওয়া হইবে না, বরং আত্মীয় স্বজনেরা এই সূত্রে বাড়ীর বধূ ও কন্যাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু শিক্ষা দিতে পারিবেন, তাহাদের শিক্ষায় ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি উন্নত হইতে থাকিবে।

(খ) পুরুষেরাও বাড়ীর অভিভাবক স্থানীয়েরা, কর্ম্মস্থলে উপরিতন কর্ম্মচারীর, এবং প্রজারূপে নিজ নিজ জমীদারের মতে মত দিয়া থাকে, নিজেদের স্বাধীন মত রাখে না।

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত পরিবারের ও সমাজের শুভাশুভ জড়িত, একথা বুঝিতে শিখিলে, যাহাকে নিজেদের কল্যাণকামী বলিয়া বিশ্বাস তাহাকেই আপনাদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবে। একথাটা বুঝিতে শিখিলে পতিপুত্রসেবার বা অপর পারিবারিক কর্ত্তব্যের হানি হইবার আশঙ্কা অমূলক।

৪। রাজনীতির পথ পঙ্কিল কিসে হয়, কে করে? স্বার্থপরতা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, মিথ্যাচার, প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ, উৎকোচদান ও গ্রহণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সমাজের ও দেশের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া চলিলে, রাজনীতির পথ পঙ্কিল হইত না। নারী এ পথে আসিয়া আপনাকে পঙ্কে লিপ্ত না করিয়া, সান্নিধ্য ও সহকারিতা দ্বারা পতি ভ্রাতা কি পুত্রকে কি সুপথে টানিয়া রাখিবার পক্ষে একটু সহায় হইতে পারে না?

৫। দেশের পুরুষেরাও সকলে রাষ্ট্রীয় অধিকার চাহে নাই, এখনও চাহে না; জনসংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকই এ অধিকার দাবী করে। যদি অশিক্ষিত পুরুষের বেলা সে অধিকার স্বীকৃত হয়, অশিক্ষিতা নারীর সম্বন্ধে তাহা স্বীকৃত হইবেনা কেন? কোন বিশেষ যোগ্যতা কেবল নারীর নিকট দাবী করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

৬। যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে চাহে, সে নিজে ভোট চাহিতে যায়, যাহারা ভোট দেয় তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভোট যাচিয়া বেড়ায় না ভদ্র পরিবারের মাতা, বধূ ও কন্যাদের ভোট না চাহিয়া, যে ব্যক্তি পতিতা নারীদের দ্বারা সমর্থিত হইতে চেষ্টা করিবে, তাহাকে লজ্জা দিবার কি সমাজে কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? পুরুষসমাজ, কি এমনই অধঃপাতে গিয়াছে যে তাহারা ভোট বাড়াইবার জন্য অনন্যগতি হইয়া বারবণিতাদের দ্বারস্থ হইবে? অবশ্য এই প্রশ্নের আর একটা দিক্ আছে। এই শ্রেণীর নারীরা ও দেশের মানুষ। তাহাদেরও প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের অধিকার আছে। দেশের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ যাহা বিধেয়, তাহার বিধানার্থ তাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের আবশ্যক হয়। সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের ভোট একেবারে অগ্রাহ্য করিবার নহে। কিন্তু যে ভাবে ১৯২১ সনে এই বিষয়টি উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই হতভাগিনীদের প্রতি অবিচার এবং নিজেদের প্রতি ও অসম্মানপ্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া লেখকের ধারণা।

এখন দেশের মাতা ও ভগিনীদের প্রতি কিছু নিবেদন আছে। তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিচার ও অসম্মান প্রকাশ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজের চেষ্টা বিনা যাহা পাইয়াছেন, একটু সজাগ ভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছেন কি? শিক্ষিতা ভগিনীরা দেশের অবস্থা ও বিধি ব্যবস্থার দিকে একটুও মনোযোগ দিতেছেন কি? শক্তির যদি ব্যবহার না করা যায় তবে তাহা থাকা ও যা, না থাকাও তা।

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যের পূর্ব্বে পৌরকর্ত্তব্য। ইহার অনেক কাজ নারীর পক্ষে সুবোধ্য ও সুসাধ্য। মিউনিসিপাল অধিকার পাইয়া কোন বঙ্গনারী কাউন্সিলের পদপ্রার্থী হন নাই। আমরা জানি ব্যবস্থাপক সভায় বরং কম সময় দিতে হয়, কিন্তু কর্পোরেশনের সভায় হাজিরা দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। যাঁহাদের সময় এবং সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই কঠিন কর্ত্তব্যে ব্রতী হইলে দেশের কল্যাণ হয়।

মধ্যপন্থী—

আধুনিক বাংলা

আধুনিক বাংলার দুঃখ ও ব্যর্থতা এখন আমাদের কাব্য ও রাজনীতির স্বতঃসিদ্ধ। বাংলা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভ এখন না পড়েও মুখস্থ বলা যায়; শুধু তাই নয়, সেগুলি আবার আমাদের তিনভাগ কাব্য ও উপন্যাসের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা। এই সখ্য ও সংমিশ্রণ আশার কি নিরাশার জিনিস তা নিয়ে তর্ক তুলছি না, এটা যে তথ্য এই-টুকুই আমার বক্তব্য; এই তথ্যের শিক্ষা (moral) আমার কাছে এই, যে, যদি দুটো কথা কয়ে' মন জুড়াতে চাও, তবে খবরদার তোমার মনের বাংলা মহলের দিকটায় খুব বড় একটা তালা লাগিয়ে রেখো; অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে।

কিন্তু মন মানে না; কারণ ভদ্রতার খাতিরে মুখ যদি বা বন্ধ করি, কানটা আরও সজাগ হয়ে' ওঠে। তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে; যেমন এই প্রবন্ধটা। কারণ অভিনয়ে রাতের পর রাত যদি নামতেই হয়, তবে নির্ব্বাক্ প্রহরীর ভূমিকাটা কখনই সুস্বাদু লাগতে পারে না, আমার শিক্ষানবিশী যতই কাঁচা হোক্ না কেন। তাই দুকথা বলে নিই; যারা পাকা বলিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে আমার মত কি, এটুকুও হয়ত শোনবার জিনিস হ'তে পারে।

আর কথা না বাড়িয়ে আমার সমালোচনা আরম্ভ করে' দিই। আমার প্রথম কথা এই, যে বাংলার ও বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ এখন ভাববার ও বোঝবার বিষয় না হয়ে বলবার ও লেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যেন এক বিরাট পৌরাণিক ঐতিহ্য; এর মধ্যে অনুসন্ধানের দরকার নেই; দরকার শুধু ছন্দ ও মুন্সিয়ানার। একটা উদাহরণ দিয়ে একটু পরিষ্কার করে বলি। সেই ডিরোজিওর আমল থেকে প্রায় একশ বৎসর আমরা শুনে আসছি, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে; বিজাতীয় ভাবের পক্ষপাতী হয়ে তারা নিজেদের আচার অনুষ্ঠান ভুলে সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কথাটা এই যে ইংরাজী লেখাপড়া শিখে আমাদের যুবকেরা আর হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করে না; তাই আমাদের যত রাজ্যের দুঃখ। এখন যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করি তা হলে দেখতে পাই এটা নিছক গল্প-কথা। আর এই গল্পকথা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, সেই ইংরাজীশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ই এর সবচেয়ে বড় মুখপাত্র। আমার দীর্ঘ ছাত্রজীবনে বিলাত ফেরত ও অবিলাত ফেরত অসংখ্য ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আজ পর্য্যন্ত এমন একজনকেও দেখিনি যিনি ডিরোজিওর আমলের উত্তরাধিকারী, যিনি

ওই আমলের নিন্দা না করেন। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে শিথিল করে এ যুক্তি আর চল্লো না। কিন্তু এর উত্তরে আমি নিশ্চয় জানি আমাদের সমস্ত বলিয়ে লোকেরা সকরুণ স্মিতহাস্যে, এই গল্পকথাকেই ভূদেব বাবুর বচন (quotation) দিয়ে, আরও জোর করে, আরও সুন্দর করে, আরও গুছিয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন।

এখন কথা উঠতে পারে যে মুখে তাঁরা বিশ্বাস করি বললেও কাজে সে বিশ্বাসের পরিচয় দেন না। এখানেও আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য মানছি। যদি অনুসন্ধানীর চোখ দিয়ে ইংরাজী শিক্ষিতদের জীবন বিশ্লেষণ করি, তবে এইটে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে যে কি রকম বিশ্বস্তভাবে তাঁরা ধর্ম্মতন্ত্রের সমস্ত অনুষ্ঠান সব সময়ে মেনে চলেন। দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা থেকে আরম্ভ করে ছেলের অন্নপ্রাশন ও মেয়ের বিয়ে, সত্যনারায়ণ ও শ্রাদ্ধ যেটাকেই পরীক্ষা করি, দেখি ধর্ম্মতন্ত্রের শাসন (discipline) এখনও অটুট রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যাঁরা উদার হিন্দু, (reformed Hindu) তাঁদের মধ্যেও আমি আলোচনার সময় ছাড়া কার্য্যতঃ কাউকে বিদ্রোহ করতে দেখিনি। আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন আমি এত লোকের কাছ থেকে পেয়েছি, যে ডুকুড়ি বাংলা কাগজ ছমাস ধরে পড়লেও আমার এই বিশ্বাস যাবে না। অথচ আমায় শুনতে হবে যে আমাদের আচার অনুষ্ঠান সব শিথিল হয়ে যাচ্ছে, ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমাদের যুবকবৃন্দ ধর্ম্মবিশ্বাস হারিয়ে··· ... ···আর বেশী বলবার দরকার নেই।

যে দুটো উদাহরণ দিয়েছি তার দ্বারা আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমরা traditionএর এতদূর দাস যে নিজেদের জীবন্ত সুখ দুঃখ নিয়েও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন পুরাণের (mythologyর) সৃষ্টি করেছি; এই পুরাণই এখন হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের শাস্ত্র। বর্ত্তমান জগতে নব্য জাপানের শিন্টোমতবাদ (Shintoism) ও মিকাডোপূজা ছাড়া আর কোন কিছুরই এর সঙ্গে তুলনা হয় না। এই mythologyর একটু বিশদ বর্ণনা না দিলে এর গুরুত্ব ভাল করে বোঝা যাবে না। কিন্তু বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম; তাই নীচে একটা ব্যঙ্গচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমরা যে এককালে খুব বড় ছিলাম এটা অস্বীকার করা পাপ। বড় ছিলাম ভয়ঙ্কর বড় ছিলাম, শুধু তাই নয় ইংরাজের চেয়ে বড় ছিলাম সব বিষয়ে। একথা বলার সার্থকতা কি? সার্থকতা এই যে ইউরোপীয় লেখকেরা আমাদের ছোট বলে গালাগালি দেয়। ঠিক কোন্ সময় থেকে আমরা ছোট হতে আরম্ভ করেছি? পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে। কেন? ইংরাজী শিক্ষা। আমাদের বড় হওয়ার মূল কারণ ছিল ধর্ম্ম; ইংরাজেরা আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলে গালাগালি দিয়েছে আর আমরাও মোহান্ধ হয়ে তাই বিশ্বাস করেছি; সেইজন্যই আমাদের অধঃপতন। আবার বড় হব কি উপায়ে? ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করে—কেন না হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তা বিবেকানন্দ স্বামী শিকাগোতে প্রমাণ

করে দিয়েছেন। আমাদের জাতীয়তা ছিল না বলে' ইউরোপ আমাদের গালাগাল দেয়; কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। আমাদের জাতীয়তা ছিল, তবে তা ধর্ম্মগত; এ বড় কঠিন ব্যাপার, ইউরোপ এ সমস্ত বুঝবে না। ইউরোপ ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে ফেলেছে; আমাদের আবার তা জুড়ে ফেলতে হবে। ঠিক কি উপায়ে তা সম্পন্ন হবে? উত্তর—"ঘরের দিকে ফের"। লর্ড সিংহ যে বলেছেন যে আমাদের নারীরা পর্দ্দানসীন এ কথা সত্য নয়। পাড়াগাঁয়ে আমাদের মেয়েরা কলসী করে' জল নিয়ে আসে। তবে সহরের মেয়েরা কি বাইরে বেরুবে? না, কেননা আমাদের নারীর আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

আমার ব্যঙ্গচিত্রটা দুঃখের বিষয় সত্যই বিদ্রূপের মত শুনিয়েছে। কিন্তু সত্যকারের যা অযৌক্তিকতা তা এই বিদ্রূপকেও ছাড়িয়ে যায় এইটেই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। এসব ফুটিয়ে তোলা একজন আর্টিষ্টের কাজ। আমি এইটুকু বোঝাতে পারলেই খুসী হব যে আমাদের বর্ত্তমান সুখদুঃখ সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিশ্বাস আমাদের চারদিকে খেলা করছে; এই বিশ্বাসগুলি আমাদের সমস্ত পুরাতন ঐতিহ্যের (tradition) উপর এক শাকের আঁটি, স্কুল কলেজের শিক্ষার চাইতে এই ঐতিহ্য (tradition) অনেক বেশী প্রভাবশালী; আর আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাঁরা এই প্রভাবকে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগে দেশে মুক্ত ও অবাধ চিন্তার বেশ পরিচয় পাই। পশ্চিম মানবজীবনের যে সমালোচনা আমাদের সামনে হাজির করেছিল, অনেকেই তা উদারমনে ও ভক্তিভরে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সমালোচনাকে যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা সঙ্গতি ও শোভনতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন; সমাজকে নাড়াচাড়া দিয়ে তাকে সচল ও স্বাস্থ্যশীল করার বেশ চলনসই রকমের চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের তরফে রাজপুতের মত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয়েছিল; বঙ্কিমচন্দ্র গোপীবল্লভ কৃষ্ণকে বিসমার্কের হেলমেট পরিয়ে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন বললেও চলে। এই সমস্তের ফল কতদূর কি দাঁড়িয়েছিল, ভাল না মন্দ হয়েছিল, একথা এখন যাক্; কিন্তু লোকেরা ভাবত, আলোচনা করত, এবং বুঝালে নূতন বিশ্বাসের অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করত। সেইজন্য ওই যুগটাকে আমি আমাদের প্রকৃত জাগরণের যুগ (Age of Enlightenment) বলি।

এই জাগরণের যুগ কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। তার আসল কারণ আমাদের প্রাণশক্তির অল্পতার দরুণ আমরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের অকথ্য গালাগালি আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছিল। তার উপর নব্যহিন্দুমতবাদের (Neo-Hinduism) বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা, অমৃতবাজার পত্রিকা, রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব এবং ধর্ম্মগত জাতীয়তার প্রচার, এর ধ্বংসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। সেই জন্য পশ্চিম যে যে দিক থেকে আমাদের মাথায় ঘা মেরেছিল, সেই সমস্ত দিক থেকে

আত্মরক্ষার জন্য বেশ একগোছা বিশ্বাস গজিয়ে উঠ্‌ল। তার পর শুধু পুনরুক্তির জোরেই এই বিশ্বাসগুলি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেও, নিজেদের ঘরের ব্যাপারে, পত্রিকা সম্পাদক ও স্বামী চঘটীবাবার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এই সমস্যাটা অনেকদিন আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য "intelligence" দেওয়া নয়, "information" দেওয়া। Graham Wallas এর ভাষায় "We do not learn the difficult art of thought" স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটী যদি আমাদের শুধু ভাষা ও গণিত শিখিয়েই ক্ষান্ত থাকে, তবে শিক্ষার আর একটা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে; সেই উদ্দেশ্যটা Bertrand Russell বলেছেন "To create those mental habits which will enable people to acquire knowledge and form sound judgments for themselves"। এইটেই হল "intelligence"। এই দিক থেকে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর কাছ থেকে আশা করার কিছুই নেই। কিছু করতে গেলে বাংলার একটা Free thought পত্রিকা চালান যেতে পারে। আর একটা কাজ করা যেতে পারে যদি একটা স্কুল খুলে সেখানে বই ও খবরের কাগজ পড়ার প্রণালী শেখান হয়। Bertrand Russellএর বইগুলিই ধরা যাক্। বেশীর ভাগ যুবকই এই বইগুলি পড়ে ইংরোপীয় সভ্যতা ও Industrialism এর উপর একটা অস্পষ্ট ঘৃণা অর্জ্জন করেন। তাতে কোন ক্ষতি হত না যদি তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সভ্যতা ও industrialism এর অভাবের উপর একটা ভালবাসা অর্জ্জন না করতেন। এই থেকেই বোঝা যায় Russell পড়া তাঁদের কত দূর ব্যর্থ হয়েছে। এখন Russellএর বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব তাঁর বৈজ্ঞানিক মেজাজ। এই মেজাজের দাম তাঁর মতামতের চেয়ে অনেক বেশী। এই মেজাজকে যদি শ্রদ্ধা করি তবে Russell এর মতামতও আর চট্‌ করে মেনে নেব না। তাঁর ব্যক্তিগত অপমানের স্মৃতি ও ১৯১৪ সালের যুদ্ধ তাঁর লেখার মধ্যে যে রং দিয়েছে, সেই রংকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব। তারপর, তাঁর কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদের সত্য বলে মনে হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের অন্য সমস্ত বিশ্বাসের একটা সাম্য আনতে হবে। এই সাম্য আনার জন্য দরকার যাকে Russell বলেছেন—"Love of mental adventure"। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। Russellএর "Idea of good life"এর সঙ্গে কি আমাদের বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহিত জীবনকে খাপ খাওয়ান যায়? যদি বিশ্বাস করি যে "good life" হল "Life of love guided by knowledge" তবে প্রথমে দেখতে হবে যে আমি যে বংশের সন্তান সেই বংশের সহজাত চরিত্র ও শরীর বেঁচে থাকার উপযুক্ত কি না। যদি আমি দুর্ব্বলচিত্ত neurasthenic পিতা ও পিতামহের সন্তান হয়ে থাকি, তবে খুব সম্ভব আমার সন্তানও হবে ভীরু, পিটপিটে ও রুগ্ন।

ক্ষেত্রে আমার বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করা ঘোর অন্যায়। তার উপর যাকে বিবাহ করব, তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও চরিত্র এবং বংশগত স্বাস্থ্য ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই না জেনে শুধু বাপ-খুড়োর পছন্দ মাফিক বিবাহ করা, এটা কি উচিত? আবার আমার আর্থিক অবস্থা যে কয়টি সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে পারে আমার সন্তান সংখ্যা যাতে তার বেশী না হয় এটাও ভেবে দেখতে হবে। দরিদ্র পরিবারে অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ও রোগখিন্ন একদল পুত্র কন্যা, এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল নয়। সেই পরিবারের পিতা হয়ত সন্তানদের "ভালবাসেন", তাঁর নিদ্রাবঞ্চিত পত্নীকে "ভালবাসেন"। শতকরা নিরানব্বই জন রাসেলভক্ত সেই পিতার বিরুদ্ধে immoralityর অভিযোগ আনার কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। কিন্তু রাসেলের "good life"এর সঙ্গে এই অভিযোগের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। Morality বলতে রাসেল যা বোঝেন তা যে কি রকম বৈপ্লবিক তা এই থেকে বোঝা যায়। আমাদের স্কুলে এই ভাবে রাসেল পড়ান যেতে পারে।

উপরের দীর্ঘ আলোচনাটা একটু অবান্তর হয়ে পড়ল বোধ হয়। যাক্ এখন আমাদের আসল কথায় ফেরা যাক্। আমি দেখাতে চাই যে সমাজে অমঙ্গল বলে যে বস্তুটি লুকিয়ে আছে, যার অস্তিত্ব বিষয়ে পঞ্চানন তর্করত্ন থেকে Bertrand Russellএর চেলারা পর্য্যন্ত সবাই একমত, তার সম্বন্ধে আমরা যে attitude নিয়েছি, সেইটেই মঙ্গলের পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায়। সে attitude হল, মোটামুটি "হ্যাঁ, দুঃখ কষ্ট ত আছেই; সে সব অমুক অমুকের দোষে। তা যাক্, চলে যাবে এখন"। এই যে অমুক অমুকের দোষ দেওয়া, এই যে মামলাবাজি, এটা শুধু minimum lifeকে যেমন তেমন করে আঁকড়ে থাকার একটা অছিলা। যাঁরা তরুণ, যাঁদের প্রাণ আছে, বেদনা বোধ আছে—তাঁরা আর একটু রোম্যাণ্টীক ভাবে এই একই attitudeএর আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের শহীদ মনে করে ব্যথা বেদনার রস নিংড়ে নিংড়ে অন্তরের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। এই দুটো attitudeই আমাদের মঙ্গলের সমান পরিপন্থী। রক্ষণশীলতা ও Romanticism এরা উভয়েই তমোদেবতার সঙ্গী; এরা উভয়েই মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের ধাঁধিয়ে রেখে অভ্যুত্থানের পথ আগলিয়ে আছে।

কথাটা আর একটু ভাল করে বোঝা দরকার। অভ্যুত্থান কথাটার মানে নিয়ে এরকম অদ্ভুত কসরৎ দেখান হয় যে সকলেরই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে এর কোন মানে নেই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এর মানে আছে এবং মানেটা খুব সরল। অভ্যুত্থানের মানে হল অভিব্যক্তিকে নীতিমূলক করা। অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে ঘটছে বা ঘটবে তা সমস্তই সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য বলেই যে তারা শিব ও সুন্দর এইটে মনে করা ভুল। সামাজিক অভিব্যক্তি যতদূর এবং যে পরিমাণে হবে আমাদের নৈতিক আইডিয়ার মূর্ত্তি, ততদূর এবং সেই পরিমাণে হবে আমাদের অভ্যুত্থান। এখন প্রশ্ন এই যে অভ্যুত্থান ইহা কি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত না আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বশীভূত?

এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন কিন্তু এর উত্তর আছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ জয় করতে পারে বটে কিন্তু সে জয়ের সীমা আছে। পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নিয়মগুলি আমাদের প্রভু, তাদের দাসত্ব আমাদের অস্তিত্বের প্রথম ও শেষ কথা। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা হল মূল্য জগতে (in the realm of values)। ভাল মন্দ, বড় ও ছোট, এই বিচার আমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারি ; এই বিষয়ে আমরা কোন কথাই মেনে নিতে বাধ্য নই। সুতরাং আমাদের সম্মতি ও অসম্মতির উপর যে সব বিষয় নির্ভর করছে, সেই সব বিষয়ে আমরা স্বাধীন : আর ঠিক এই কারণেই সামাজিক আভ্যুত্থান আমাদের করায়ত্ত।

কেন না সমাজ কি ? তা মাধ্যাকর্ষণ ও Boyle's Lawর মত প্রাকৃতিক তথ্য নয় যাকে মানি আর না মানি তা চলবেই। সমাজ হল মানবের প্রথা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির একটা শেষ ফল। এই শেষ ফলটা নির্ভর করছে, প্রত্যেক প্রথা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যেক সমিতি আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যে পরিমান আসক্তি আদায় করছে সেই আসক্তির উপর। এই আসক্তির নির্ভর, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর, আমাদের ভাল মন্দ বিশ্বাসের উপর, আমাদের মূল্য নিরূপণের উপর। যদি সচেতন ভাবে আমাদের প্রত্যেক সামাজিক আসক্তিকে বিচার করে দিতে বা কেড়ে নিতে আরম্ভ করি—তবে সমাজটাও বদলাতে থাকবে ; তার অভিব্যক্তি অভ্যুত্থানে পরিণত হতে থাকবে।

এই আত্মনিয়ন্ত্রিত অভ্যুত্থান বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ কাজ ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ইউরোপ ধরতে পেরেছে এই তার গৌরব। ধর্ম্ম ঈশ্বর শয়তান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, (personal property বিবাহ, পরিবার, ডিমোক্রেসী, সব বিষয়েই ইউরোপের লোকেরা তাদের আসক্তিকে ভেবে দেখেছে, তেমন অকুণ্ঠিত ভাবে আর আমল দিচ্ছে না। সমস্ত পুরাতন loyalty ও discipline এখন পরীক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি বিশ্বমানবের কাজে পিছিয়ে পড়তে না চাই, যদি তার অগ্রদূত হওয়ার সৌভাগ্য ইচ্ছা করি তবে আমাদেরও সমস্ত পুরাতন loyalty ও disciplineকে পরীক্ষা করতে হবে। রক্ষণশীলতা ও Romanticism এই জন্যই আমাদের শত্রু। যা দরকার তা হ'ল মুক্ত ও অবাধ চিন্তা, ভাল ও মন্দের নিষ্ঠুর বিচার ও সেই বিচারের ফল অনুযায়ী আমাদের আসক্তিকে দেওয়া বা কেড়ে নেওয়া। সমসাময়িক বাংলায় কি এর কোন পরিচয় পাই ?

ধরা যাক্ আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠান। যদি প্রশ্ন করি যে এর প্রাণশক্তি কোথায় অমনই সেই সুদূর অতীতের শ্রুতিসূক্ত থেকে আরম্ভ করে মনু-পরাশর-রঘুনন্দন, বল্লালসেন-কৌলীন্য-বর্ণসঙ্কর ইত্যাদি অনেক কথাই ওস্তাদদের মনে ঠেলাঠেলি করে উঠবে, এবং তারা খুসী হবেন যে ব্যাপারটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল কি ? অবশ্য না, কারণ আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠান টিকে আছে শুধু আমরা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীরা তাকে মানছি বলে। এই মানাটাকে যদি তর্কের খাতিরেও কেড়ে নিই, তবে ওস্তাদরা

যতই কারসাজি দেখান সে আর বাঁচবে না। এখন যদি আর একটা প্রশ্ন করি যে বিবাহ-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের মানা, আমাদের সম্মতি, আমাদের আসক্তি এগুলো উচিত কিনা, তাহলে ওস্তাদদের মনে যদিও আবার সেই মনু পরাশরই ঠেলাঠেলি করে উঠবে, তবু আমাদের শিক্ষানবিশদের উচিত একটু ভেবে দেখা। আমি ঘোষের বড় ছেলে হলেই আমাকে বসু বা মিত্রদের বাড়ী বিবাহ করতে হবে কিন্তু মেজ ছেলে হলেই আবার তার আরও ৮+৭২=৮০টা ঘর খোলা এটা কি যুক্তি, এটা কি বিচার; এটা কি স্বাধীনতা? অবশ্য এই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত রসবোধ আমার আছে। কিন্তু বিবাহে ব্রাহ্মণের হস্তক্ষেপকেও কি রসবোধের কোঠায় ফেলতে হবে? এরকম একটা privilleged class কেন থাকবে যার সহযোগিতা ভিন্ন আমার বিবাহ সিদ্ধ নয়? এত বড় একটা privillege কেন অন্য কোন শ্রেণীর লোকেদের দেওয়া হবে না? তার উপর ধনবিভাগের দিক থেকে দেখি, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাদের হস্তক্ষেপ থাকার দরুণ ব্রাহ্মণেরা জাতির ধনসমষ্টির খানিকটা অংশের অধিকারী। আলস্য ও unproductiveness এর উপর এই premium দেওয়াতে আমি সাহায্য করব কেন? আবার বিবাহ সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করা যাক্। স্ত্রীআচারটা কি? একটা বর্ব্বর যুগের স্মৃতিচিহ্ন। মন্ত্র তন্ত্র বশীকরণ ম্যাজিক এই সমস্তর একটা সমষ্টি। এর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে কেন সাহায্য করব? তারপর আমাদের বিবাহের theory হল এই যে স্ত্রী যে তার স্বামীর সঙ্গে এই পৃথিবীতেই চিরকালের মত যুক্ত হল তা নয়, অনন্ত কাল ধরে তার ব্যক্তিত্ব তার আত্মা, তার স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মার একটা অঙ্গস্বরূপ হয়ে গেল। সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ঐ যে দার্শনিক ব্যাখ্যা, এটাকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবেনা; কেননা অধিকাংশ নারীর মনে এটা খুবই জাগ্রত। সেই জন্যই বিধবাবিবাহ আইন এতদিন সরকারী কুঠরিতেই চাবি বন্ধ হয়ে রইল। এই ব্যাখ্যা মেনে কি আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সম্মতি দেব? যদি দিই তবে আমার অবর্ত্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে জীবনের সকল সুখ থেকে বঞ্চিত করে যাব। এই নিষ্ঠুরতা কি শুধু ওস্তাদী আলাপের দ্বারাই উড়ে যাবে? মনে রাখতে হবে যে প্রচলিত প্রথায় বিবাহ করা, দেশের সমস্ত বিধবার অশ্রুজলের দায়িত্ব নেওয়া। আমার অসম্মতি যখন এই অশ্রুজলের পরিমাণ কমাতে পারে তখন সম্মতিটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের বিষয়। এখানে দরকার প্রত্নতত্ত্ব ও রসবোধ নয়, দরকার moral sense ও অবাধ চিন্তা।

বিবাহ সম্বন্ধে আমার আলোচনাটা যথেষ্ট হল না। একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা করা সম্ভব নয়। যা বলতে চাই তা হল সমাজ সম্বন্ধে, একটা Melioristic View নেওয়া দরকার। ধরে নেওয়া যাক্ যে সমাজ নির্ভর করছে আমাদের সম্মতির উপর; সুতরাং চিন্তা করে যেখানে দরকার, অসম্মতি দিয়ে একে moralise করতে হবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের Statistics নিয়ে, সমাজের কোন্ উপাদানটা বদলালে কতখানি অমঙ্গল দূর হবে তার একটা আন্দাজ থাকা দরকার। নারী সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে tradition রয়েছে তাকেই

আমি অমঙ্গলের কোঠায় সব চেয়ে বড় স্থান দিই। কেননা প্রথমতঃ নারী আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক; সুতরাং যা কিছু নারীসাধারণের সুখ বাড়াবে তাতে সামাজিক সুখসমষ্টি যতটা বাড়বে আর কিছুতেই তেমন নয়। তারপর নারী এত সহজ সুখ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যে আমাদের একটু বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনে একটু চেষ্টাতেই তার সুখ দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে। গার্হস্থ্য প্রাচীরের বাহিরে একটু বাহির হওয়ার অধিকার, একটু মেলামেশা করার সুযোগ পেলেই instinctive life এর যে কতখানি পরিপূরণ হতে পারে তা ভাবলে আমি ধৈর্য্যহারা হয়ে যাই অথচ সমসাময়িক বাংলায় দেখি, মুখে ইংরাজ ও স্বদেশীয় স্বাধীন নারীদের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টি ও মুখে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর জয়গান। এই জয়গান বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে।

আমার শেষ কথা এই যে সামাজিক tradition কে বদলানর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আমাদের যৌথপ্রবৃত্তি ও একলা থাকার ভয়। এই ভয়কে জয় করা যেতে পারে যদি সমস্ত লোকেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে সমিতি করতে আরম্ভ করে। এই সমিতির tradition ক্রমে চলতি tradition কে স্থানচ্যুত করতে পারবে। সমসাময়িক বাংলার কাছে আমার প্রোগ্রামটা তাই অবাধ চিন্তা ও Voluntary association! এই প্রোগ্রামটা কি নেহাৎ বাজে জিনিষ?

আমি কে

আমি কে জানিনা বলে সতত সংশয়;
দেহটি "আমার" বলি, আমি ঠিক নয়।
ভেদবুদ্ধি তন্ত্রী সেতু,
'আমি' তন্ত্র তাহা হেতু, (১)
বাজায় আমার ধ্বনি মুগ্ধ করি মন।
আমি তাই আমি তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

(১) Bridge of a violin.

আমি কে বুঝিনা বলে, মনেরে বুঝাই
সংসারে আমিই সার অপরে বালাই,
আমার প্রীতির জন্য
বিশ্বময় যত পণ্য,
সৃষ্টি শুধু সাধিবারে আমার তোষণ,
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

আকাশে উঠেছে চাঁদ বিশ্ববিমোহন,
তাহারে নেহারি মুগ্ধ দুইটি নয়ন।
বহির্মুখী জ্যোতি তার
মনোরাজ্যে রাজে সার
মূলতঃ সে কিবা বস্তু হেরে কয়জন?
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

বাঁশরী রবাব শুনি চিত্ত মুগ্ধ তা'য়,
বাহ্য বস্তু অক্ষপথে অন্তরত্ব পায়।
অন্তরের রাজা মন
রহে ব্যস্ত অনুক্ষণ
বাহ্যিক বিকাশ লয়ে মুকুর মতন।
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

সৃষ্টিমূলে ইচ্ছাবলে সত্তের বিকার
অন্তর্মুখী চিৎশক্তি ঘটায় ব্যাপার। (২)
বাহ্যিক বিকাশ যায়
দীপ্তদীপ শিখা প্রায়,
শলাকা স্নেহের পানে কে চায় তখন
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

বহির্মুখী বীজ হতে বিকৃত বিকাশ
বহির্মুখ ভাব লয়ে করয়ে প্রয়াস
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার
তন্মাত্র ইন্দ্রিয় আর
বাহ্যক্রিয়া লয়ে সবে সদা ব্যস্ত র'ন।
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন

আমি কে জানিতে যদি হয় সে বাসনা,
বুঝিতে না পারি তার কিরূপ ধারণা।
"মমপ্রাণ" সবে কয়,
"আমি" পূর্ব্বভাবে রয়;
"মমবস্ত্র" ভেদবুদ্ধি ঘটায় যেমন
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

মনে কভু "আমি" সত্তা (৩) হয় সম্ভাবন,
দার্শনিক শাস্ত্র যাহে কহয়ে করণ ? (৪)
দূরদৃষ্টি যন্ত্রে (৫) যথা
দৃষ্টিসঞ্চালন প্রথা,
কুঠার ছেদন কার্য্যে কর্ত্তা (৬) কি কখন ?
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

আমি বলি, আমি করি, "আমি"ময় সব।
আমির করমস্রোত সংসার আহব।
কার্য্যের (৭) স্বরূপ মন
কহে তার সুধীজন;
পরিমাণ (৮) ফুটে তায় ঘটের মতন।
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

মৃত্যু তো "আমার" বলি, আমির বিনাশ
ঘটেনা তবুও যেন মনেতে বিশ্বাস।
জন্ম পুণর্জ্জন্ম তথা
"আমার" সম্বন্ধে কথা,
বৃথায় আয়াস দেখি "আমি" অন্বেষণ।
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

---

(৩) Beingness.

(৪) ইন্দ্রিয়।

(৫) Telescope.

(৬) Agent.

(৭) As opposed to ; পরিণামবাদমতে কারণ ও কার্য্য—সৎ
বিবর্ত্তবাদ মতে—কারণ—সৎ, কার্য্য—অসৎ।

(৮) Limited Dimension.

মরণান্তে বিত্ত মম পাবে কোন জন
সে ভাবনায় চিত্ত মম ব্যস্ত অনুক্ষণ।
"আমি" তবে মরি কই ?
মরিয়াও জীবে রই ;
আত্মজ অভাবে তাই পোষ্যের (৯) পোষণ
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

"আমি" তবে হেন বস্তু ভাব দেখি মন
দেখিতে না পায় যার জনম মরণ—
পরিমেয় (১০) পায় লয়,
"আমি"তার তাহা নয় ;
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তার ঐশ্বর্য্য ব্যাপন। (১১)
আমি তবে "আমি" তত্ত্ব বুঝিবা এখন।

"আমি" যদি নিত্য বস্তু বিশ্বের ব্যাপক,
ব্যষ্টি "আমি" ফুটে নাকি সমষ্টিরূপক ?
তটিনী লহরী গুলি
উত্তাল তরঙ্গ তুলি
সাগর গৌরব তারা ফুটায় যেমন।
আমি তবে "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা এখন।

"আমি" যদি বিশ্বময় সৃষ্টি ব্যেপে রই
মমতার প্রিয় বস্তু কাহারে বা কই ?
ব্যষ্টিজ্ঞান ঘুচে যায়,
দিবালোকে দীপপ্রায়,
দীপের স্বাতন্ত্র্য কিন্তু ঘুচেনা যেমন
আমি তাই "আমি" তত্ত্ব বুঝিনা কেমন।

শ্রীবিপিন বিহারী নিয়োগী

(৯) Adopted son.
(১০) Limited things.
(১১) Pervasion.

ভ্রম সংশোধন।

মুদ্রাকর প্রমাদে বর্ত্তমান সংখ্যায় অনেকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে বিশেষ মারাত্মক ভুলগুলি প্রদর্শিত হইল :—

১২৯ পৃঃ ৭লাঃ ব্রাহ্মমাজ ব্রাহ্মসমাজ। ১৩৪ পৃঃ ৯ লাঃ একট একটা

১৩৪ ,, ১৬ ,, আত্মপ্রতয় আত্মপ্রত্যয়। ১৩৫ ,, ৪ ,, সমস্ক সমস্ত

১৩৫ ,, ২ ,, যা যায়। ১৩৫ ,, ৪ ,, রবার করবার

১৩৬ ,, ৭ ,, বরলেন করলেন। ১৩৭ ,, ২২ ,, সমাজরপ সমাজরূপ

১৩৬ ,, ৩২ ,, সমাজ কালে সমাজবন্ধন। ১৪০ ,, ২৮ ,, এর এর চাপে

১৩৮ ,, ৫ ,, থয় খায়। ১৩৯ ,, ২৪ ,, শক্র শক্ত

১৪১ ,, ৪র্থ কলি "দীপ ও ধূপ" বাস সুবাস। ১৪৩ ,, ১৮ ,, ভ্রাগ ড্রাগন

১৪৪ ,, পাদটীকা পত্নঘাতী—পত্নীঘাতী। এবং 'তাহাকে অমর'—তাহার প্রেম অমর

১৪৭ ,, ১৬ ,, শাসনবর্ত্তা শাসন কর্ত্তা। ১৪৭ ,, ১৯লাঃ কারাগৃহে কারাগৃহের

১৪৯ ,, ১৫ ,, পদর্থকে পদার্থকে। ১৫০ ,, ১১ ,, সকম্প সকম্প

১৫১ ,, ৬ ,, অবস্থয় অবস্থায়। ১৫২ ,, ৩২ ,, মায় মায়া

১৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম পাদটীকা সম্পাদকীয়, উহার শেষে নঃ সঃ বসিবে।

১৫৪ ,, ২২ লাঃ পারমিত পরিমিত। ১৫৫ ,, ২৭ ,, Webster's Worcester's

১৫৯ ,, ১৬ ,, বিশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা। ১৬০ ,, ৫ ,, অদর্শ আদর্শ

১৬০ ,, ২৪ ,, মধ্য মধ্যে। ১৬৪ ,, ১৪ ,, আবত আয়ত

১৬৫ ,, ৩১ ,, সম্পান্ন সম্পন্ন। ১৬৭ ,, ৩ লীবনের জীবনের

১৬৮ ,, ৩১ ,, গণবৃন্দ জনবৃন্দ জনবৃন্দ। ১৬৯ ,, ১৬ ,, এবটা একটা

১৬৯ ,, ১৭ ,, বিয়ৎপরিমাণে কিয়ৎপরিমাণে। ১৭১ ,, ২০ ,, পদ্ধতিকে পদ্ধতিতে

১৭২ ,, ১৪ ,, বেবল কেবল। ১৭২ ,, ১৬ ,, শত্তির শক্তির

১৭৩ ,, ২ ,, ভবিষ্য ভবিষ্যৎ। ১৭৪ ,, ১৩ ,, ই এই

১৭৫ ,, ৯ ,, পড়িল পড়িল। ১৭৫ ,, ২০ ,, ন না

১৭৫ ,, ২৭ ,, প্রথম প্রথমে। ১৭৬ ,, ২ ,, ন না

১৭৬ ,, ১৫ ,, একুট একটা। ১২৭ ,, ১৬ ,, সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বপ্রকারে

এই দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র দিবার যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত আছি। আগামী সংখ্যায় যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয় আমিরা তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ, নব্যভারত।

নব্য ভারত

অতিরিক্ত পত্র

দ্বিতীয় খণ্ড] ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩২ [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রশ্নাবলী।

জাতীয় কর্ম্মীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন উত্তরের জন্য কতকগুলি প্রশ্ন আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রশ্নগুলি ও উহাদের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল।

'আপনি বলেন স্বরাজ্য দলকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য--এই সাহায্যের মানে কি?'

আমার উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিবেকের সীমার মধ্যে থাকিয়া উহাদের যথাসাধ্য সাহায়তা করা কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশে যাহার কোন আপত্তি নাই তাহার স্বরাজ্য দলে যোগদান করা উচিত। যাঁর উহাতে আপত্তি আছে তিনি স্বরাজ্যদলে যোগদান করিবেন না, কিন্তু যোগদান করা ছাড়া অন্য সকল উপায়ে উহাদের সাহায্য করিবেন। ভোট দিতে আপত্তি থাকিলে তিনি বিরত থাকিবেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঐ দলের নিন্দাবাদ করিবেন না।

"গ্রামের তরুণ কর্ম্মীদের কি নির্ব্বাচন ব্যাপারে যোগদান করা এবং স্বরাজ্যদলের জন্য ভোট-সংগ্রহ করা উচিত?"

পরিবর্ত্তনকামী ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিনা। গ্রামের যে সকল কর্ম্মী খদ্দর প্রচারে ব্যাপৃত আছেন এবং রাজনীতির দিকে যাহাদের ঝোঁক নাই তাহারা অবশ্যই নিজেদের ওঁ কাজের ক্ষতি করিয়া এ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

'স্বরাজীরা গ্রাম্যবোর্ড, মিউনিপালিটী, লোকালবোর্ড ইত্যাদি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে খাদিকর্ম্মীদের কি করা কর্ত্তব্য?'

আমি আশা করি স্বরাজীরাও খাদি কর্ম্মী হইবেন। পরিবর্ত্তনবিরোধী এবং স্বরাজীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে উহারা খাদি কার্য্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার কাজও জুড়িয়া দেন। পরিবর্ত্তনবিরোধী দলের খাদি এর গঠন মূলক অন্যান্য কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই করিবেন না।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি এবং বিবেক অনুযায়ী চলিবেন, এবং পরস্পরের কার্য্যে যথা-শক্তি সাহায্য করিবেন।

'ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ পদ প্রার্থীরা যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন আমার কর্ত্তব্য কি?'

আপনার অবস্থায় পড়িলে এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করা ভিন্ন অন্য কোন রূপে হস্তক্ষেপ আমি করিতাম না।

'আপনি বলিয়াছেন পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা যে কেবল স্বরাজ্যদলকে বাধা দিবেন না তাহাই নহে, উহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। এই সাহায্য কতদূর পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। প্রীতি বর্ত্তমান থাকিলে নিজের ক্ষতি না করিয়াও পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। কতদূর সাহায্য করিতে হইবে তাহা প্রত্যেকের নিজে স্থির করিতে হইবে। এইরূপ সাহায্য স্বেচ্ছামূলক হওয়াই উচিত, অপরে উহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। এজন্য কোন রকম জোর জবরদস্তি চলিতেই পারে না। এখানে দলের শৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠিতেছেনা, ইহা আমার ব্যক্তিগত মত মাত্র। আমার আচরণ হইতেই ইহার অর্থ উপলব্ধ হইবে।

'আপনি কি অবস্থাচক্রে পড়িয়া স্বরাজ্যদলকে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন, না ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা দেশের উপকার হইবে মনে করিয়া?'

আমার প্রতিশ্রুতির কারণ অন্যবিধ। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা যে দেশের কোন লাভ হইবে তা আমি মনে করি না। প্রয়োজনের খাতিরে যে আমি স্বরাজ্যদলের সহায়তা করি একথাও সত্য নহে। আমি ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যপ্রণালী পছন্দ করি না। কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসীগণের অধিকাংশই উহা চাহেন। উহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রগামী কাজ পাইলে উহারাও সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবস্থাপক সভা হইতে সরিয়া পড়িবেন। উহারা কেবল গঠনমূলক কার্য্য লইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। গঠনমূলক কার্য্যের গতি উহাদের নিকট অতিশয় মন্থর মনে হয়। এই মনোভাব যে সাধু তাহা আমি বুঝিয়াছি। দেশের মঙ্গলের জন্য সকল শক্তিকে আমি সুসংবদ্ধ করিতে চাই, এবং ব্যবস্থাপক সভায় গিয়াও গঠনমূলক কার্য্যের পথ সুগম করা, অথবা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী কার্য্যে বাধাদান করা সম্ভবপর ইহা বুঝিতে পারি বলিয়া যে দলের দ্বারা এই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সুসাধিত হওয়া সম্ভবপর তাহাদিগের সহায়তা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।

(মো, ক, গান্ধী, ১৭, ৯, ২৫ ইং)

অসহযোগের ভবিষ্যৎ

কোন বন্ধু জানিতে চাহিয়াছেন অসহযোগ পন্থাকে যাহারা রাজনীতির মূলসূত্র করিয়াছিলেন স্বরাজ্য দলের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে উহাদের কি গতি হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা ভুলিয়া যাইতেছেন যে আমি পূর্ব্বের মত অসহযোগীই আছি। রাজনীতিক্ষেত্রের ন্যায় ইহা আমার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেরও মূলসূত্র। কোন কোন অবস্থায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসহযোগের সম্ভাবনা ব্যতীত স্বেচ্ছামূলক সহযোগ শুভ হইতে পারে না, সূক্ষ্ম বায়ুমান যন্ত্রের ন্যায় ইহা রাজনৈতিক ভারতের পরিবর্ত্তমান মনোভাবের গতি নির্দ্দেশক যন্ত্র মাত্র। নিজের রাজনৈতিক অনুভূতির বিরুদ্ধে চলিতে কোন কংগ্রেস সদস্য বাধ্য নহেন কিন্তু এখন হইতে আর তাঁহারা অসহযোগের প্রচারে কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও, কোন বিশেষ কর্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে অর্থবল স্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভাসম্পর্কিত নীতির সমর্থনে নিয়োজিত হইবে সুতরাং স্বরাজ্যদলের কাজের জন্য অর্থমঞ্জুর করিবার অধিকার যে কংগ্রেস কমিটী সমুহের আছে শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাপক সভার ভিতর দিয়া কাজের জন্য যদি অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা স্বরাজ্য দলের নীতির সমর্থনে ব্যয় করিতে উহারা বাধ্য। অপর পক্ষে যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্য নিছক রাজনৈতিক কাজের জন্য অর্থব্যয় অথবা সংগ্রহের বিরোধী এই প্রস্তাবানুসারে উহারা নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য নহেন। কংগ্রেসের সকল প্রস্তাবেরই উদ্দেশ্য পথনির্দ্দেশ, পীড়ন নহে।

রাজনৈতিক অসহযোগের সঙ্গে কাটুনী সমিতির কোন সম্বন্ধ নাই। আমি উহার সভাপতি খাদির প্রতি প্রীতি বশতঃ—অসহযোগী হিসাবে নহে। ইহা বৈষয়িক অথবা অর্থনৈতিক সমিতি, উহার উদ্দেশ্য লোকহিত। সমিতি খদ্দরের ব্যবসায় করিবেন সভ্যদের উপকারের জন্য নহে, জাতির উপকারের জন্য। সভ্যগণ লাভত পাইবেনই না বরং তাঁহাদের চেষ্টার ভিতর দিয়া জাতি যাহাতে লাভবান হয়, তজ্জন্য সমিতিকে বাৎসরিক সাহায্য করিবেন। অর্থনীতির দিক হইতে চরকা এবং খদ্দরের কার্য্যকারিতায় যাহারা বিশ্বাসবান রাজনীতিতে রুচিসম্পন্ন এমন সহযোগী অসহযোগী, রাজা মহারাজা, এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে আমরা এই সমিতিতে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি।

পত্রলেখকের মতে পঞ্চবিধ বর্জ্জননীতি ব্যতীত কাটুনী সমিতির কার্য্যতালিকা সফল হইবে না। আমি একথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যে ব্যবহারজীবিকে সর্ব্বদাই কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হয় তিনি কেন খদ্দর পরিতে পারিবেন না? উঁহাদের কেহ কেহ এখনও খদ্দর পরিতেছেন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ এবং সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও খদ্দর পরিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভাগামীদের মধ্যে অন্ততঃ স্বরাজীরা খদ্দর ব্যবহার করিতেছেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইঁহারা খদ্দর প্রচলন করিয়াছেন। কয়েকজন উপাধিধারী ভদ্রলোকও খদ্দর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিদ্রোহী অসহযোগীগণ যদি কংগ্রেস এবং কাটুনি সমিতি কোথাও স্থান না পান উঁহাদের পক্ষে নিজেদের একটা নিখিল ভারত সমিতি গড়িয়া তোলা সম্ভবপর কিনা, ইহাই লেখকের শেষ সমস্যা। প্রশ্নটা খুব সুন্দরভাবে বলা হয় নাই। কংগ্রেস হইতে কখন কাহাকেও বিতাড়িত করা হয় না। অধিকাংশের মতের সহিত নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধির সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে সকলেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং কেহ কেহ করিয়াও থাকেন। অল্পসংখ্যকের ধর্ম্মবুদ্ধি অনুযায়ী না চলিতে পারিলে অধিক সংখ্যককে দোষ দেওয়া চলে না। এমন অসহযোগী যদি থাকেন যাঁরা মনে করেন যতদিন কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভাগমনের স্বপক্ষে থাকিবে ততদিন উহার সংশ্রবে থাকা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধিবিরুদ্ধ হইবে উঁহারা অবশ্যই কংগ্রেসের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমি আরও বলি কংগ্রেসে থাকিয়া ব্যবস্থাপক সভাসম্পর্কিত কাজে বাধা দেওয়াই যদি উঁহাদের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলেও উঁহাদের কংগ্রেস পরিত্যাগ করা উচিত। আমার মতে সকলপ্রকার অন্তর্বিরোধ বাদ দিয়া কংগ্রেসের কাজ চালান উচিৎ। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কাটুনি সমিতিতে সহযোগী অসহযোগী উভয়েরই স্থান আছে।

ইহা সত্বেও যদি এমন অসহযোগী থাকেন যাহারা নিজেদের একটা নিখিল ভারত সমিতির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য মনে করেন তাহাদের পক্ষে সেটা করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর, কিন্তু আমি সেটা খুব সঙ্গত মনে করি না। অসহযোগীরা যদি ব্যক্তিগত ভাবে অসহযোগ করেন উহাই যথেষ্ট। (মোঃ, ক, গান্ধী, ৮ই অক্টোবর ১৯২৫)

জাতীয় শিক্ষা

যাহারা জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী উহারা এই অভিযোগ করেন যে আমি সর্ব্বদাই খদ্দর অস্পৃশ্যতা, হিন্দুমোস্লেম প্রভৃতি বিষয়ে বলি, কিন্তু আজকাল ইয়ং ইণ্ডিয়ায় শিক্ষার জাতীয় উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। অভিযোগটা একান্ত মিথ্যা নয় কিন্তু আমি ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াও ইহা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হওয়া উচিৎ নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার লেখায় জাতীয় শিক্ষার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা কম। উহার উন্নতি সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান সমূহের উপযুক্ত পরিচালনার উপর নির্ভর করে। যে সকল ছেলে এখন সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে উহারা ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল কথাই জানে, সুতরাং উহাদিগকে এখন আর সরকারী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বলা উচিৎ নহে। উহারা হয় দুর্ব্বলতা, নয় আসক্তি, নয় জাতীয় শিক্ষায় অনাস্থাবশতঃ সরকারী বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছে। কারণ যাহাই হউক না কেন, উহাদের দুর্ব্বলতা, আসক্তি, অথবা অনাস্থার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষকগণের দক্ষতা এবং চরিত্রবল দ্বারা জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহকে লোকপ্রিয় এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া তোলা।

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি একটি আবেদন পাইয়াছি। কলিকাতায় দীর্ঘকাল অবস্থানকালে একদিন কিছুক্ষণের জন্য আমি ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, একটি পত্রে ঐ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবেদনে বহু গণ্যমান্য লোকের সাক্ষর রহিয়াছে। সুতাকাটা এখানে বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ের খাতায় একশত ছাত্রের নাম আছে, শিক্ষকের সংখ্যা আঠারো। বিদ্যালয়টী বৎসরে ২০০শত টাকা সাহায্য পায়। সমগ্র দেশে এইরূপ বহু বিদ্যালয় আছে, উহার শিক্ষকেরা ইয়ং ইণ্ডিয়ায় উহাদের বিষয় লিখিবার জন্য অথবা অর্থসাহায্যের আবেদনে সাক্ষর করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কতকগুলি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও এই সকল আবেদনে সাড়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করা আমার উচিত। ক্ষণিক দেখা শোনায় যে ধারণা জন্মে সেই ধারণা যদি মন্দ হয় তদ্দ্বারা উহার ক্ষতি হইবে, অপরপক্ষে ক্ষণিকের ভ্রান্ত ধারণায় কোন অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকেও ফাঁপাইয়া তোলা অনুচিত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যাহার যোগ্যতা আছে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান সহায়তার অভাবে নষ্ট হইবে না। যেগুলি নষ্ট হইয়াছে উহাদের বিনাশের কারণ হয় উহাদের

কোন যোগ্যতা ছিল না, নয়ত পরিচালকগণ উহাতে বিশ্বাস বা বল হারাইয়াছেন। এই জন্য সকল জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের প্রতি আমার নিবেদন দেশব্যাপী অবসাদের প্রভাবে নিরুৎসাহ হইয়া যেন উহারা হাল ছাড়িয়া না দেন। যাহাদের যোগ্যতা আছে, এই তাহাদের পরীক্ষার সময়। বর্ত্তমান সময়েও ভারতবর্ষে এমন কয়টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদিগকে প্রভূত বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইতেছে, কিন্তু এখানে চরম অভাবে থাকিয়াও শিক্ষকেরা নিজের এবং আদর্শের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই। আমি জানি পরিণামে উহাদের উন্নতি হইবে, এবং এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাওয়ার দরুন উহাদের বল বৃদ্ধি হইবে। সাধারণের নিকট আমার নিবেদন উহারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রাখুন, এবং যোগ্যতা দেখিলে প্রয়োজন বুঝিয়া উহাদিগকে সাহায্য করুন।

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি গিয়াছি উহাদের অনেকগুলিতে সূতাকাট শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ উহাই আজকালকার ফ্যাসান। ইহাতে ছাত্রদের এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্য, উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। অপরিহার্য্য শিল্পরূপে যদি সূতাকাটা পুনরুজ্জীবিত করিতে হয় তবে উহাকে হাল্কাভাবে লইলে চলিবে না, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উহাও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে ব্যবস্থা হইলে চরকাও ভাল থাকিবে এবং সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, এবং শিক্ষার্থীদের অন্যান্য কাজের ন্যায় চরকার কাজও নিয়মিত পরীক্ষা করা হইবে। সকল শিক্ষক সূতা কাটা এবং উহার রহস্যের সহিত সুপরিচিত না থাকিলে উহা সম্ভবপর হইবে না। 'বিশেষতঃ' রাখা টাকায় অপচয় মাত্র। সূতা কাটা যদি যথার্থই শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক শিক্ষকেরই অভিজ্ঞ হইতে হইবে, আর সূতা কাটায় যদি আস্থা থাকে, দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া সময় দিলে তিনি একমাসের মধ্যেই ইহা শিখিয়া লইতে পারিবেন। ছেলেমেয়েরা যদি বাড়ীতে চরকা ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহা হইলে উহাদিগকে সূতা কাটার জন্য চরকা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্লাশের কাজের জন্য টেকোই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য এবং সুবিধাজনক। ৫০ জন ছেলে বিভিন্ন সময়ে আধঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া যদি ৫০ গজ হিসাবে সূতা কাটে তার চাইতে ৫০০ ছেলে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আধঘণ্টা সময় দিয়া যদি ২৫ গজ সূতা কাটে উহাই শ্রেয়ঃ। ৫০০ ছেলে টেকোতে রোজ ১২৫০০ গজ সূতা কাটিবে, কিন্তু ৫০ জন ছেলে চরকায় ৫০০০ গজ মাত্র সূতা কাটিবে। (মোঃ, কঃ, গান্ধী ১৫, ১০ ২৫)

চয়ন

খদ্দর প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠানসমূহের অর্দ্ধখদ্দরের সহিত কোনই সংশ্রব রাখা

অর্দ্ধ খাদি

উচিৎ নহে। অর্দ্ধ খদ্দর প্রচলনে হাতে সূতাকাটার উন্নতি প্রতিহত হয় এই সহজ সত্য কংগ্রেসওয়ালাগণ যতদিন ধরিতে না পারিবেন ততদিন সূতাকাটার উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। তানা ব্যবহার করিয়া উৎকর্ষ পরীক্ষাই চরকার সূতার উন্নতির প্রশস্ত উপায়। একদিন ঐ অসুবিধার সম্মুখীন হইতেই হইবে। নিজের জেলায় হাতেকাটা সূতা বুনাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অপর জেলায় সে ব্যবস্থা হইতে পারে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্দ্ধখদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতে বিরত থাকিবেন আশা করি।

নিখিল ভারত গোরক্ষা সভা যাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং উহার পরিচালনভার

গোরক্ষা

যাহারা আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছিলেন উহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে উহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও আমি অনবহিত হই নাই। আমি যতই চিন্তা করিতেছি, ততই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এই সমস্যার সহিত শুধু হিন্দুর সুনাম অথবা ভারতীয় গোকুলের উন্নতি নহে, পরন্তু দেশের আর্থিক উন্নতিও ঘনিষ্টভাবে জড়িত রহিয়াছে। দিন দিনই এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়তর হইতেছে যে সাধারণভাবে ভারতবাসীর এবং বিশেষভাবে হিন্দুগণ গোরক্ষা সভার অবলম্বিত উপায় গ্রহণ না করিলে ঐ সমস্যার সমাধান হইবার নহে। ভারত ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের কৃষিবিভাগ, সমুদয় স্থানীয় সমিতি, এবং গোরক্ষার অনুরাগী সকলের প্রতি আমার নিবেদন— গো সমস্যা এবং গোশালা ও ট্যানারী পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পুস্তক পুস্তিকা ও হিসাব ইত্যাদি দিয়া আমার সহায়তা করুন। ৩রা তারিখে কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে আমি স্থায়ী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ঘোষণ করিতে পারিব আশা করি। যাহারা সভ্য সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহারাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন বলিতে পারিবেন আশা করি।

প্রার্থিত কাগজপত্র নিখিলভারত গোরক্ষিণী সভা, সত্যাগ্রহ আশ্রম, সবরমতী, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(মোঃ কঃ গান্ধী ৩.৯.২৫)

শ্রীরামপুরে একটী সরকারী বয়ন বিদ্যালয় আছে, উহাতে সূতাকাটা শিক্ষা দেওয়া

সরকারী প্রতিষ্ঠানে চরকা

হয়। কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এদিকে উহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন জানিতে কুতুহলী হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া আমি উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে কার্পাস, পাট, ও রেসমে সূতাকাটা, রঙ করা, ও কাপড় বোনা শেখান হইয়া থাকে। আমি কেবল কার্পাস সূতার কথাই বলিব।

সূতাকাটার শিক্ষকগণের আগ্রহ দেখিয়া আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে যে নৈপুণ্য এবং পরিচালনক্ষমতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, এখানে তাহার পরিচয় পাইলাম না। আমি আধুনিক চরকা এবং সূতাকাটায় আস্থাবান সুদক্ষ কাটুনীর সমাবেশ দেখিতে পাইব আশা করিয়া গিয়াছিলাম। সেখানকার কতকগুলি চরকা সুনির্ম্মিত নহে। অন্যান্য অনেক চরকার সমস্ত ত্রুটীই উহাতে রহিয়াছে। কোন কোনটিতে কর্কশ শব্দ হয়। পাঁজগুলিও উৎকৃষ্ট নহে। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই যদি হাতে সূতাকাটা কার্য্যকরী নহে ঘোষণা করা হইয়া থাকে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া কোন পরীক্ষাকার্য্যকেই নিষ্ফল ঘোষণা করা সঙ্গত নহে। যাহার আস্থা আছে এবং যোগ্যতা আছে, তাহাকেই পরীক্ষার কার্য্যে নিয়োগ করা উচিৎ। শুনিতে পাই সেখানে কলের তাঁতের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার ও ব্যবস্থা হইবে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য গৃহশিল্পের প্রচলন। আমার মতে কলের তাঁতের ব্যবহারে সাধারণের অর্থের অপব্যয় হইবে মাত্র। কলের তাঁতে অনাস্থাবশতঃ যে আমি এরূপ বলিতেছি তা নয়, উহাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অগ্রসর হইবে না বলিয়াই একথা বলিতেছি। এই বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমুদয় অর্থ গৃহশিল্পের প্রবর্ত্তনে ব্যয়িত হওয়া উচিৎ। সুতরাং হাতে সূতাকাটার সার্থকতাসম্ভাবনা, উহার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান, ও শিক্ষার ব্যবস্থায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

হগ্‌ওয়ার্ফ সাহেব আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তুলার আঁশ, সূতার বল, সমতা ও নম্বর, এবং কাপড়ের স্থায়ীত্ব পরীক্ষার কতকগুলি যন্ত্র দেখাইলেন। যে সকল জাতীয় বিদ্যালয়ে সূতাকাটা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে যদি এই সকল যন্ত্র কিছু কিছু রাখা হয় এবং একটু বিবেচনা করিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে, কাজের উৎকর্ষও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

নিকটেই প্রধানতঃ সরকারী অর্থে পরিচালিত আর একটী প্রতিষ্ঠান আছে। একটি মিশনরী মহিলা ঐ কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এখানেও সূতাকাটা শেখান হয়, এবং বয়নবিদ্যালয় সম্পর্কে যে সকল ত্রুটীর উল্লেখ করিয়াছি ইহার সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। নিজে কাজ শিক্ষা না করা পর্য্যন্ত তিনি ভাল ও মন্দ চরকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে, অথবা সূতা ঠিক কাটা হইল কিনা ধরিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন না।—

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হোমিও-রিসার্চ-লেবরেটরী।

পোঃ ব্রাহ্মণগাঁও, জেলা ঢাকা।

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়াতে যে সকল উদ্ভিদ্ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উদ্ভিদ্ আমাদের দেশে গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ্ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধসমূহ সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া এজেণ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন; রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক; উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হয়।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি প্রভৃতি সত্বর উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, জ্বরান্তে সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় সুফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

সিনিসি

সিনিসি সেবনে কোমরে ও তলপেটে বেদনা এবং ভারবোধ, গা বমিবমি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, দুর্ব্বলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ-পর্য্যন্ত বাধকের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ হৃদ্‌স্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করার অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা।

ইউপেপ্‌সিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

সার্জ্জা

সার্জ্জা সেবনে পারদ সেবন-জনিত বিবিধ মন্দ ফল, বাতরক্তাদি বিবিধ চর্ম্মরোগ এবং আমবাতিক উপসর্গ প্রভৃতি সত্বর প্রশমিত হয়। রক্তদুষ্টজনিত বিকৃত চিহ্ন ও ক্ষত সকল দূরীভূত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

[illegible]ইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার বাতের অমোঘ ঔষধ। প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

ইউক্রোণা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) নিবারণের একটি মহৌষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পরিপাকশক্তি জন্মে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

তিক্রোসিন্

যকৃত ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃত যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন, ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹।

সাইট্রিসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অসাধারণ শক্তিশালী। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সময়ে কিম্বা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

বেট্রোল

সর্ব্ববিধ বাত ও বেদনা নিবারণের ঔষধ। মূল্য ৷৴৹ আনা। বড় শিশি ১৲ টাকা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কেবল রুগ্নস্থলে মালিশ করিবেন।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই "কলেরাবাম" রাখা কর্ত্তব্য। দাস্ত হওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবাম" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব ও কানপচা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইহা ক্রমাগত প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা।

আইকিওর

চক্ষুউঠা, চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুতে পোটা হওয়া ইত্যাদি চক্ষুর সর্ব্ববিধ ব্যারামে অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহার বিধি:—দুই ফোঁটা করিয়া প্রতিদিন ৪।৫ বার ব্যবহার্য্য। প্রতি শিশি ৷৹ আনা।

অর্ডার দিবার সময় 'হ. ল্যাবরেটরীর' নাম উল্লেখ করিবেন।

লেখকগণের প্রতি

১। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে। লেখা ভাল হইলে নূতন লেখক গণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।

২। সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক রচনা গৃহীত হইবে না।

৩। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত মোড়ক বা লেপাফা পাঠান প্রয়োজন।

৫। প্রবন্ধ হারাইয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন

৬। প্রবন্ধ, ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকানা।

সম্পাদক, নব্যভারত

২১০ ৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় 'নব্যভারতের নাম উল্লেখ করিবেন।

সূচী

অতিরিক্ত পত্র

নব্য ভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] কার্ত্তিক ১৩৩২ [৭ম সংখ্যা

অবেক্ষণ

বিহঙ্গ উড়িছে শূন্যে, সাঁতারিছে মীন
জলে, বিহরিছে সুখে পশু বনেচর ;
মানব জীবন কেন বহিতেছে ক্ষীণ,
সহিয়া চলিছে যেন ভার গুরুতর ?

একি গো আত্মার ভার, ওহে জগদীশ ?
সামর্থ্য-অতীত একি কামনার ক্লেশ ?
অমৃত লভিবে বলি, ছুটি অহর্নিশ,
ক্লান্ত পদে ফিরিছে কি মরণের দেশ ?

তুমি কি শুনায়ে তারে বাণী আপনার
জাগায়ে দাঁড়ালে সরে, লুকাইলে মুখ,
দুঃসহ আলোক দিয়া করি অন্ধকার,
তার ব্যর্থ চেষ্টা দেখি লভিছ কৌতুক ?

জীবের আনন্দ হ'তে বঞ্চিবে কি তারে ?
না, না, যারে জাগায়েছ সে নাহি ঘুমাবে
দেহকূলে যত শ্রান্ত কোক নিজ ভারে,
সে তোমারে চাবে, প্রভু, সে তোমারে পাবে

২

মধুর উষার হাসি পূরব অম্বরে,
মধুর মেঘের যাত্রা শূন্যে মায়ারথে,
মধুরে অরুণ-রশ্মি ধীরে খেলা করে
অনিলের সাথে, ঘন পল্লবিত পথে।

ভাল লাগে দিবাভাগে রৌদ্র-দীপ্ত জল,
কি সুন্দর আলোছায়া মৃদু সমাবেশ
দিবাশেষে, ছায় যবে শ্যাম সমতল
নিম্নভূমি, বনাবৃত উচ্চ গিরিদেশ!

ভালবাসি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাময়ী ধরা,
স্নাতদেহা, শুভ্রবেশা বধূটির মত;
সুগম্ভীরা, সমুজ্জ্বল তারকায় ভরা
কৃষ্ণা রজনীরে হেরি মাথা করি নত—

যেন সে বিধবা নারী, কেশপাশ খুলে,
ফেলে সর্ব্ব আভরণ, বৈরাগ্য কঠোর
আর পরত্রের আশা লইয়াছে তুলে
আপনার বক্ষে,—চক্ষে দীপ্তি, নহে লোর।

৩

গৃহস্থের আঙ্গিনায় খেলে শিশুদল,
পাদপ লতিকা কোলে দোলে পুষ্পচয়,
চটক শালিখ গুলি করে কোলাহল
বাঁশঝাড়ে, উড়ে চলে সানন্দ নির্ভয়।

নারিকেল গাছ হ'তে নামিতেছে চিল
দীর্ঘ চক্র বিরচিয়া, ফের উড়ে যায়
সুদূর গগনে। হোথা একটি কোকিল
আম্র পল্লবের মাঝে কুহু কুহু গায়।

কাঠবিড়ালীরা হোথা শিশুদের মত
কে আগে ছুঁইবে বুড়ী বলি ছুটে যায়,
খেলা শেষে বসে আসি শান্তশিষ্ট কত,
দুটিহাত তুলি ধীরে শস্য খুঁটে খায়।

আলোকের জীবনের এ সুন্দর খেলা
দুই চোখে ভরে' লয়ে, আমার হৃদয়
উঠিছে আনন্দে গাহি' আজ ভোর বেলা—
'যেথায় জীবন সেথা আনন্দও রয়।'

৪

জীবশূন্য কোথা আছে এতটুকু ঠাঁই ?
কোথায় জীবন আছে কিন্তু রাত্রি দিন
সজীবতা, নিরন্তর চটুলতা নাই ?
কোথা জীবনের ক্রীড়া সৌন্দর্য্যবিহীন ?

যেথা জন্ম সেথা মৃত্যু, যেথা বৃদ্ধি, ক্ষয়,
জীবন বয়ন করে কে সে তন্তুবায়
মিশাইয়া সুখদুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়,
জ্ঞান অজ্ঞানের সূত্রে—অপূর্ব্ব শোভায় !

৫

কোথা হতে আসে স্নেহ ব্যাঘ্রী-জননীর
শাবকেরে বাঁচাইতে ? নারীর অন্তর
ভয়ে ভীত, শিশু লাগি সাহসে সুস্থির
হাতে ধরি ফেলে দূরে সর্প বিষধর,

আগুনেতে ছুটে যায়, ঝাঁপে সিন্ধু জলে ;
অতুল ব্যাকুল স্নেহ, শুভ্র সমুজ্জ্বল
অমলেন্দুর মত, তার হৃদয়ের তলে
কোন্ মহা উৎস হতে ছুটে অবিরল ?

৬

জগতের কোন ঠাই অসুন্দর কিছু নাই,
ভাল করে দেখি যারে ভালবাসি তাকে,
আর উদাসীনবৎ চলিতে পারিনা পথ,
আগে পাছে, দুই ধারে, সবে মোরে ডাকে।

আমার এ জীবনের নীরবতা ভেদ করি
কোটী কোটী মূক প্রাণী আজ কথা কয়,
নয়নের অগোচরে যাহারা জনমে মরে
তাদের সৌন্দর্য্য হৃদে জাগায় বিস্ময়।

অদৃশ্য জীবাণু এল কত বড় হয়ে—
কেবা ছোট, কেবা বড়? সকলে সমান
অদ্ভুত স্রষ্টার চিন্তা, সে মুদ্রাঙ্ক লয়ে
আমি ক্ষুদ্র জুড়ে আছি আমার যে স্থান।

৭

ছোট ছোট পানামূলে এক সাথে থাকে
কোটী কোটী জীবনের অণু অণু ঢেউ,
উজ্জ্বল মুকুলসম ফুটে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
ইহাদের মুখপানে চেয়ে আছে কেউ।

কত না আনন্দে সেই আঁখি অনিমেষ
চেয়ে আছে—সৃষ্টি মাঝে যে আনন্দ র..,
খুদিয়াছে ইহাদের প্রতি সূক্ষ্ম কেশ
কিবা সে শিল্পীর হাত, কোমলতাময়

প্রেমভরে। প্রেম বিনা সৃষ্টি নাহি হয়।
অনন্ত শয়নে প্রভু কবে সুপ্ত ছিলা?
প্রেমের জলধি তিনি আনন্দ নিলয়,
চিরদিন আছে তাহে এই সৃষ্টিলীলা।

* Vorticelli or Bell Animalculæ. ৩২ বৎসর পূর্ব্বে লেখিকা যখন অণুবীক্ষণ যোগে জীবতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেন এই কবিতাগুলি সেই সময়ে লিখিত।

৮

তাহার চেতন শিশু অচেতন সহ
ভ্রাতৃপ্রেম করি অনুভব,
মনে হয়, ধূলি-লগ্না লতার বিরহ
আমি যেন বুঝিতেছি সব।

মূলে মূলে বারি পিয়া কেমনে মিটায়
দূরস্থিত অগ্রের পিয়াস,
কেমনে আশ্রয় খুঁজি চারিদিকে ধায়,
কি আগ্রহে বাঁধে তন্তুপাশ!

"উপরে আলোক, আমি পারিনা দাঁড়াতে
আপন চরণে করি ভর,"—
বলে—"ওগো তুলে লও আপনার সাথে,
আলো চাই, ওগো তরুবর।"

যে তারে আশ্রয় দেয় কেমন শোভাতে
রুক্ষ দেহ ছেয়ে দেয় তার,
তত আঁকড়িয়া ধরে যত প্রতিঘাতে
ব্যথা পায় দেহে আপনার।

কত ভালবেসে তারে অন্তরীক্ষ ভূমি
পরাইছে সুহরিৎ বাস,
সমীর সোহাগে কভু দেহ যায় চুমি,
ছুটাইয়া লাবণ্য উচ্ছ্বাস।

সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ হবে তার,
কি জানি কি আশা আজ, কি জানি কি স্নেহ,
জীবিত করিতে চাহে জীবন বিস্তার—
ফুলে ফুলে ছেয়ে দেয় আপনার দেহ।

কোমল কুসুমরাজি, শিশু তার, হাসে যবে,
হয়তো সে সুখ তার মায়েরি স্পন্দন হবে।

অসংখ্য সোপান বাহি' যুগ যুগ ধরি,
লভিতেছে নর উচ্চ হতে উচ্চতর
ভূমি ; এই ধরিত্রীরে তুচ্ছ জ্ঞান করি'
চাহিতেছে স্বর্গ পানে। কোথাহে ঈশ্বর,

কোথা তুমি ? ধরাধামে এ দেহমন্দিরে
তুমি কি দিবেনা ধরা ? শুধু লুকাচুরী
খেলাইবে ভক্তসাথে ? নানা দিকে ফিরে
করিবে কি দিগ্‌ভ্রান্ত ? জ্ঞান মার্গে ঘুরি

আসে দেখ নামি শেষে, পরিশ্রান্ত হয়ে,
সংশয়ের অন্ধকারে। পরিমিত জ্ঞান
দুর্লভ-সন্ধান ছাড়ি সুলভেরে ল'য়ে
চাহে তৃপ্তি, দেহ সাথে মাগে অবসান

জীবনের। "পরিবৃত সুস্নিগ্ধ পল্লবে,
ভূষিত প্রসূনকুলে মহা তরুবর,
কোথা গেছে মূল তার খুঁজিয়া কি হবে ?
ভুঞ্জ ছায়া, ভুঞ্জ ফল, শোভা মনোহর"—

কেহ কহে। প্রাণ তাহে মানে কি প্রবোধ ?
ছুটিছে উদ্দেশে তব আনন্দ বিস্ময়,
ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রেম ; কে করিবে রোধ
প্রবল প্রবাহ এই ? ওহে সর্ব্বময়,

পাতিয়া বিপুল বক্ষঃ অনন্ত উদার,
বিশ্বের ব্যাকুল প্রেম, নিত্য বহমান,
কে লইবে তুমি বিনা ? কে লইছে আর ?
ধরি দাও নাই ধরা, বুকে দেছ স্থান।

১০

একি সব অর্থহীন ফুল ফোটে প্রতিদিন
কত বর্ণ, কত গন্ধ, গঠনের ভেদ,
যে যাহার কাজ করে, সৌন্দর্য্যে জগৎ ভরে,
মুখে নাই হাহাকার, হৃদে নাই খেদ ?

আমারও হৃদয় হতে ঘুচে গেছে ক্লান্তি ক্লেশ,
আজ আত্মা শান্ত মোর, নির্ভর নির্ভয় ;
আমি জানি জীবনের এক উৎস পরমেশ,
কল্যাণের কল্পতরু, জ্ঞান শক্তি-ময় ।

জ্ঞান তার সুনিহিত প্রতি কার্য্যমূলে,
শক্তি তার দীপ্তি পায় ভরি চরাচর,
কোটী নক্ষত্রের মাঝে, প্রতি বিন্দু ধূলে।
শুধু তাই নহে, তিনি পুণ্যের আকর ।

জ্যোতিষ্মতী শক্তি তাঁর করি সঞ্চালন,
জড়ের আননে শোভা করিয়া বিস্তার,
সৃষ্টির আনন্দ তবু হ'লনা পূরণ,
সৌন্দর্য্য দর্শন সাধ মিটিলনা তাঁর ।

তা না হলে পুষ্পময়ী শ্যামল-আসনা
ধরণীর কোলে দেখি শিশু-জীব লীলা
কেন না হইল শেষ সৃষ্টির বাসনা,
সৃষ্টি হতে নবসৃষ্টি কেন আরম্ভিলা ?

নীরবে রহিলা একা যুগ রাত্রি জাগি,
স্থূল দেহ হতে কেন সূক্ষ্ম মন খানি
ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে ফুটাবার লাগি,
প্রতি স্নায়ু তার দিয়া যেন টানি টানি ।

কত ধৈর্য্যে, আপনার পুণ্যালোকে বসি,
জাগাইলা ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস হতে
আত্মজ্ঞানবান্ আত্মা, রহিলেন পশি
তার মাঝে, সূর্য্যকান্তি যথা ক্ষীণ স্রোতে ।

নভেম্বর ১৮৯৩ শ্রীকামিনী রায় ।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

অষ্টম অধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটি নৈতিক ও একটি সামাজিক, এ দুইটি কারণে ইউরোপ ক্রুসেডের আন্দোলনে নিপতিত হয়। নৈতিক কারণ হইতেছে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রেরণা। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্মের সহিত যুঝিয়া আসিতেছিল; ইউরোপে সে জয়লাভ করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; মুসলমানধর্ম্মকে সে শুধু মাত্র স্পেনদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্পেন হইতেও তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম অনবরত চেষ্টা করিতেছিল। অনেকে বলেন ক্রুসেড একটা আকস্মিক ব্যাপার; কেবল জেরুসালেম-প্রত্যাগত কতকগুলি যাত্রীর করুণকাহিনী ও পিটার সন্ন্যাসীর প্রচারের ফলে ক্রুসেডের জন্ম। ইহা একেবারে সত্য নহে। চারি শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্মে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল ক্রুসেড তাহার চরম পরিণতি। এতদিন ইউরোপে এই সংঘর্ষ চলিতেছিল, এখন ইহা এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হইল মাত্র। যদি আমি তথাকথিত ঐতিহাসিক উপমায় কোন আস্থা স্থাপন করিতাম তাহা হইলে দেখাইতাম যে মুসলমানধর্ম্ম ইউরোপে যে পন্থা অনুসরণ করিয়া যে ভাগ্যবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এশিয়াখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মও ঠিক সেই প্রণালীতে সেই নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একটী বৃহৎ ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। খৃষ্টানেরাও এশিয়াতে ঠিক তাহাই করিয়াছিল। স্পেনে খ্রীষ্টান অধিবাসীবর্গের সম্পর্কে মুসলমান নৃপতিদিগের ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। জেরুসালেমের খ্রীষ্টানরাজ্য ও গ্রেনাডার মুসলমানরাজ্যমধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ সমস্ত তুলনা ও উপমার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আসল ব্যাপার হইতেছে দুইটি ধর্ম্ম ও দুইটি সমাজের সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষের চরম পরিণতি ক্রুসেড। ইহাই হইল ক্রুসেডের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য, বৃহত্তর ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের সহিত ইহাই ক্রুসেডের সম্পর্ক।

কিন্তু ক্রুসেড আন্দোলনের একটা সামাজিক কারণও বর্ত্তমান ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সামাজিক অবস্থা ক্রুসেড-আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কি কারণে পঞ্চম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে কোন একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপক ভাব বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমস্তই তখন কিরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে খণ্ডিত অবস্থায় ছিল

তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপেই খণ্ডস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী ফিউড্যাল পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব হয়। কিছুকাল পরে, এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মানুষ আর আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না; মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা তখন এই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। মানুষের তখন আর যাযাবরবৃত্তি নাই, কিন্তু যাযাবর জীবনের উত্তেজনা ও সঙ্কটবৈচিত্র্যের আকর্ষণ তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। লোকে দলে দলে ক্রুসেডের আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটা বৃহত্তর বিচিত্রতর জীবনের আস্বাদ পাইল;—কখনও বা তাহাদের অতীত যুগের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বর্ব্বরলীলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, কখনও বা তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যতের বিশাল চিত্রপট উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের এই দুইটি প্রধান কারণ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই কারণের কোনটিই উপস্থিত ছিল না। মানুষ ও সমাজ তখন এতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে যে আন্তরিক প্রেরণা বা সামাজিক প্রয়োজনের তাড়নায় ইউরোপ এশিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোনটিই তখন অনুভূত হয় নাই। আমি জানি না আপনারা ক্রুসেডের মূল ইতিবৃত্তগুলি পাঠ করিয়াছেন কিনা, কিম্বা প্রথম ক্রুসেডের সমসাময়িক ইতিবৃত্তকারদিগের রচনার সহিত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিবৃত্তগুলি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমযুগের প্রতিনিধিস্বরূপ আলবের্ত্তার দেক্স (Albert d' Aix), সন্ন্যাসী রবার্ট এবং রেমঁ দাজিলের (Raymond d' Agiles) গ্রন্থ লউন। ইহারা তিনজনেই প্রথম ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ টায়ারবাসী উইলিয়ম ও জেম্‌স্ দ্য বিত্রীর (James de Vitry) গ্রন্থ লউন। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থকারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমোক্ত তিন জনের ইতিবৃত্তে প্রাণের চাঞ্চল্য, কল্পনার সজীবতা, বর্ণনার আবেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত সংকীর্ণ, যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার বাহিরে তাহাদের কোন চিন্তা নাই, সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান তাহাদের পরিচয়ের বাহিরে, মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাহাদের চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে বা যে সমস্ত ঘটনা তাহারা বর্ণনা করিতেছে সে সম্বন্ধে কোন বিচার করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই নাই। অপর দিকে টায়ারবাসী উইলিয়মের গ্রন্থ খুলুন—বিস্ময়ের সহিত দেখিবেন তাঁহার সহিত বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিকের বড় বেশী পার্থক্য নাই; দেখিবেন তাঁহার চিত্ত কত সুপুষ্ট, কত উদার, কত উন্মুক্ত, ঘটনাবলীর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝিবার কি অসামান্য ক্ষমতা; মত ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ; কার্য্যকারণবিচারের কি নৈপুণ্য। জেম্‌স্ দ্য বিত্রী আর এক প্রকার পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত। তিনি একজন সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত; শুধু ক্রুসেডের ঘটনাবলীর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে; তিনি রীতিনীতি, ভূবৃত্ত, জাতিতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি নানা তথ্যের

সন্ধান রাখেন; তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও বর্ণনা দিতেছেন। এক কথায় উভয় যুগের ইতিবৃত্তকারদিগের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বৃহৎ—এত বৃহৎ যে ইতিমধ্যে মানসিক জগতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

উভয়যুগের ইতিবৃত্তকারগণ যেভাবে মুসলমানদিগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেই এই পরিবর্ত্তনের বিপুলত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথম যুগের ইতিবৃত্তকার ও ক্রুসেডারগণের চক্ষে মুসলমানগণ কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা মুসলমানদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; তাহারা যে বিরুদ্ধধর্ম্মী ইহাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট, অন্যদিক দিয়া তাহাদিগকে বুঝিতে বা বিচার করিতে তাহারা চেষ্টা করে নাই; উভয় পক্ষের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না; তাহারা মুসলমানকে ঘৃণা করিত ও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিত, মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। টায়ারবাসী উইলিয়াম, জেম্‌স দ্য বিত্রী, কোষাধ্যক্ষ বের্ণার (Treasurer Bernard) প্রভৃতি পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তকারগণ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অন্যভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় যে তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুসলমানকে অমানুষ রাক্ষস মনে করেন নাই; তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমানের ভাব ও চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছেন; তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন এবং উভয় সমাজের মধ্যে একপ্রকার মানবসম্বন্ধ, একপ্রকার সহানুভূতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। টায়ারবাসী উইলিয়াম নুর-উদ্দীনকে হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করিয়াছেন, কোষাধ্যক্ষ বের্ণার সালাদিনকে প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা মুসলমানদিগের রীতিনীতির সহিত খৃষ্টানদিগের রীতিনীতির তুলনাও করিয়াছেন; টাসিটাস যেমন জার্ম্মানদিগের রীতিনীতির সহিত রোমীয়দিগের রীতিনীতির তুলনা করিয়া রোমীয়দিগকে লজ্জা দিয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খৃষ্টানদিগকে লজ্জা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাদের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেড অভিযান তাহাদের প্রতি এই যে উদারতা ও অপক্ষপাতিতা ইহা পূর্ব্বযুগের ক্রুসেডারগণ দেখিলে ক্রোধে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে উভয়যুগের মধ্যবর্ত্তীকালে কত বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

মানবচিত্তের এই যে মুক্তিসাধন,—উদারতর, ব্যাপকতর ধারণার দিকে এই যে গতি, ইহাই ক্রুসেডের প্রথম ও প্রধান ফল। ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে এ আন্দোলনের আরম্ভ, কিন্তু ইহার ফলে মানুষের মন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একান্ত আধিপত্য হইতে উন্মুক্ত হইয়া গেল। অবশ্যই বহু অভাবিত কারণের সমবায়ে এ পরিণতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। ক্রুসেডারদিগের সম্মুখে যে বিশাল দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইয়া পড়িল, তাহার নবীনত্ব, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই এই পরিণতির প্রথম কারণ। পর্য্যটকদিগের যেমন হয় তাহাদিগের ও সেইরূপ হইয়াছিল। এ কথা সকলেই মানেন যে নানাদেশ পর্য্যটন দ্বারা চিত্তের উদারতা সাধিত হয়; বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রীতিনীতি, বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করিতে করিতে মানুষের ধারণা [illegible] হয়,

মানুষের বিচার বুদ্ধি পুরাতন কুসংস্কারের কবল হইতে উন্মুক্ত হয়। বিদেশপর্য্যটক এই সকল ক্রুসেডারদিগের মধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। নানা নূতন বস্তু, নানা অপরিচিত রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের চিত্ত উন্মুক্ত ও উন্নত হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তাহারা দুইটি বিভিন্নপ্রকৃতি উন্নততর সভ্যতার সম্পর্কে আসিল—একদিকে গ্রীক সভ্যতা, অপরদিকে মুসলমান সভ্যতা। যদিও তখন গ্রীক সমাজ বলবীর্য্যহীন, বিকারগ্রস্ত ও ক্ষয়োন্মুখ তথাপি ইহাতে সন্দেহ নাই যে ক্রুসেডারদিগের চক্ষে সে সমাজ পশ্চিম ইউরোপ অপেক্ষা মার্জ্জিত ও আলোক প্রাপ্ত বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। মুসলমান সমাজও তাহাদের সম্মুখে ঐপ্রকার দৃশ্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। মুসলমানগণের চক্ষে খৃষ্টান ক্রুসেডারগণ কিরূপে প্রতিভাত হইত প্রাচীন ইতিবৃত্তের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা প্রথমে তাহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিত; তাহাদের মত অসভ্য, ক্রূর ও নির্ব্বোধ জাতি তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। এদিকে ক্রুসেডারগণ মুসলমানদিগের ঐশ্বর্য্য, ও আমীরী চালচলন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পরস্পর সম্বন্ধে এই প্রথম ধারণার পর উভয় জাতির মধ্যে ক্রমশঃ নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক ঘটিতে থাকিল। এই সকল সম্পর্ক ক্রমশঃ কিরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা নাই। শুধু যে প্রাচ্য খৃষ্টানদিগের সহিত মুসলমানদিগের সম্পর্ক ঘটিতে লাগিল তাহা নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডের সহিত প্রাচ্যখণ্ডের পরিচয়, যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিল। বেশীদিন নহে, সেদিন ফ্রান্সের ইউরোপ খ্যাত পণ্ডিত আবেল রেমুসা (Abel Remusat) আবিষ্কার করিয়াছেন যে মঙ্গোল সম্রাট দিগের সহিত খৃষ্টান ভূপতিগণের আদানপ্রদানসম্পর্ক ছিল। সঁ্যালুই ও অন্যান্য ফ্রাঙ্ক নরপতিগণের নিকট মঙ্গোল রাজদূত আসিয়া যাহাতে মঙ্গোল ও খৃষ্টানদিগের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার্থ তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় ক্রুসেড আরম্ভ করা হয় তদুদ্দেশ্যে সন্ধিবন্ধন করিতে চাহিয়াছিল। তাহা ছাড়া শুধু যে রাজায় রাজায় রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নহে, জাতিতে জাতিতে ও নানাপ্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবেল রেমুসার উক্তি উদ্ধৃত করা যাউক:—

"অনেক ইতালীয়, ফরাসী ও ফ্লেমিশ সন্ন্যাসী—মঙ্গোল খাঁয়ের নিকট রাজনৈতিক দৌত্যে প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মঙ্গোল রোম, বার্সিলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, লিয়ঁ, পারী,—লণ্ডন ও নর্দাম্টনে আসিয়াছিলেন; এবং নেপল্‌স্ রাজ্যের একজন ফ্রান্সিস্কান ভিক্ষু পিকিনের আর্চবিশপ হইয়াছিলেন। পরে সেই পদে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও কত অখ্যাতনামা ব্যক্তি, হয় ক্রীতদাস রূপে না হয় ধনার্জ্জন কামনায়, না হয় কৌতুহলবশবর্ত্তী হইয়া নানা অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দৈবক্রমে কাহার ও কাহারও নাম এখনও পাওয়া যায়। ক্রুসেডারদিগের পক্ষ হইতে প্রথম যে মঙ্গোলাধীর রাজসভায় উপস্থিত হয় সে একজন ইংরেজ; কতকগুলি গুরুতর অপরাধের জন্য স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়, ও এশিয়ায়

নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মঙ্গোলদিগের দাসত্ব গ্রহণ করে। একজন ফ্লেমিশ চর্ম্মকার তাতার দেশের অন্তঃস্থলে পাকেট (Paquette) নাম্নী একজন মেৎস্ (Metz) নগরবাসিনী স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পায়; স্ত্রীলোকটিকে তাতারেরা হঙ্গারী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহা ছাড়া সে তাতার দেশে একজন পারীনগরবাসী স্বর্ণকার ও রুয়ঁনগরবাসী যুবককেও দেখিতে পায়। যুবকটি তাতার কর্ত্তৃক বেলগ্রেড বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে অনেক রুশীয়, হঙ্গারীয় ও ফ্লেমিং এর ও সাক্ষাৎ পায়। রবার্ট নামক একজন গায়ক প্রাচ্য এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জীবনলীলা সম্বরণ করিবার জন্য শার্ত্রেনগরীর ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা সুশ্রী ফিলিপের সেনা মধ্যে একজন তাতার শিরস্ত্রাণ জোগাইত। জন্ ড প্লাঁকার্পাঁ (John de Plancarpin) গায়ুকের নিকট টেমার নামক একজন রুশকে দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। ব্রেসলাউ, পোলাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বহু বণিক তাঁহার তাতার যাত্রা পথে সঙ্গী হইয়াছিল। রুশিয়ার ভিতর দিয়া যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন অনেক জেনোয়াবাসী, পিসা-বাসী ও ভেনিশীয় বণিক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দুইজন বণিক দৈবক্রমে বোখারা গিয়া পড়িয়াছিল; তাহারা কুলাগুবর্ত্তৃক কুবিলাইএর নিকট প্রেরিত একজন মঙ্গোলরাজদূতের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর চীন ও তাতার দেশে প্রবাস যাপন করেন এবং ফিরিবার সময় কুবিলাই খাঁ এর নিকট হইতে পোপের নামে পত্র লইয়া আসেন; পরে পুনরায় তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে একজনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মার্কো পোলোকে সঙ্গে লইয়া খাঁএর নিকট ফিরিয়া যান এবং অবশেষে কুবিলাইএর রাজসভা ত্যাগ করিয়া ভেনিশে ফিরিয়া আসেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও এইরূপ পর্য্যটনের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহার মধ্যে স্যার জন মাণ্ডেবিল নামক ইংরাজ বৈদ্য, ফ্রিউলি বাসী ওডেরিক পেগোলেট্টি ও উইলিয়ম ও বুল্ডেনসেল্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটা বেশ ধরিয়া লওয়া যায় যে যে সকল পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহা অপেক্ষা যাহাদের কোন লিপিবদ্ধ নিদর্শন নাই তাহাদের সংখ্যাই অধিক। ভ্রমণকাহিনী লিখিবার ক্ষমতা অল্পলোকেরই ছিল, ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের ছিল সন্দেহ নাই। এই সকল ভবঘুরেদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে বাস করিয়া সেইখানেই জীবনলীলা সাঙ্গ করে; কেহ কেহ যেমন নিঃসম্বল ভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তেমনি নিঃসম্বলভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে; কিন্তু তাহারা বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা কল্পনার ভাণ্ডার ভরিয়া আনিয়া পরিবার পরিজনের নিকট সেই সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে। তাহাদের বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জিত তথ্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নানা অসঙ্গত অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এমন অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ রাখিয়া যায় যাহা ভবিষ্যতে কাজে লাগিল। এইরূপে জার্ম্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সের সন্ন্যাসীদিগের মঠে, ভূস্বামীদিগের দুর্গপ্রাসাদে, এমন কি নিম্নতম শ্রেণীর কুটীরের মধ্যেও অনেক মূল্যবান বীজ আহৃত হইল যাহা অল্পকাল মধ্যেই অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। এই

সমস্ত অজ্ঞাত পর্য্যটক স্বদেশের শিল্প বিদ্যা দূরতম বিদেশে লইয়া গেল ও ফিরিবার সময় বিদেশের শিল্প বিদ্যা স্বদেশে লইয়া আসিল। এইরূপে তাহারা যে আদানপ্রদান ব্যাপার চালাইতে থাকিল তাহা বাণিজ্যের আদান প্রদান অপেক্ষা অনেক বেশী লাভজনক। এই উপায়ে শুধু যে রেশম, চীনা মাটি ও ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্য বিস্তৃত হইল এবং বাণিজ্যের জন্য নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইল তাহা নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর হইতে ইউরোপের চিত্ত একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল; সেই চিত্তের সম্মুখে এখন নানা বিদেশী রীতিনীতি, নানা অজ্ঞাত জাতি, নানা অদ্ভুত শিল্পসামগ্রী ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভূমণ্ডলের চতুঃখণ্ডের মধ্যে যে খণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি সেই এশিয়া খণ্ডের মূল্য তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এশিয়ার শিল্প, এশিয়ার ধর্ম্ম বিশ্বাস, এশিয়ার ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল; এমন কি পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাতার ভাষার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবারও কথা উঠিল। প্রথমাবস্থার অতিরঞ্জিত অদ্ভুতরসাত্মক বর্ণনাগুলি যথারীতি আলোচিত ও পরীক্ষিত হইয়া তাহা হইতে নানা যথার্থ তথ্য উদ্ঘাটিত ও চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে থাকিল। পূর্ব্বদিকে বিশ্বের কবাট যেন খুলিয়া গেল; ভূগোলবিদ্যা দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং ইউরোপীয়দিগের অসমসাহসিকতা ও সঙ্কটপ্রিয়তা এখন নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের পথে ধাবিত হইল। পৃথিবীর প্রাচ্য গোলার্দ্ধের সহিত পরিচয় যত বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই আর অপর গোলার্দ্ধের ধারণা অসম্ভব কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইল না। মার্কোপোলোকথিত জিপাংরির সন্ধানেই কলম্বস নূতন গোলার্দ্ধ আবিষ্কার করিলেন।"

ক্রুসেডের ফলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিত্তের সম্মুখে কি এক নূতন বিশাল জগৎ খুলিয়া গেল তাহা এই সকল পূর্ব্ববর্ণিত তথ্য হইতে সহজেই উপলব্ধি করিবেন। এই বিরাট ঘটনার পরে ইউরোপীয় চিত্তের যে স্বাধীন বিকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহার প্রধান কারণ যে এই ক্রুসেডজনিত চিত্তবিপ্লব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আর একটি কারণ আছে, সেটিও লক্ষ্য করা উচিত। ক্রুসেডের সময় পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র পোপের রাজসভা সাধারণ লোকসমাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে নাই। যাহা কিছু সম্পর্ক তাহা রোম হইতে প্রেরিত পোপদূত, বা বিশপ প্রভৃতি যাজকবর্গের মধ্যস্থতায় ঘটিয়াছে। অবশ্য কোন কোন সাধারণ লোকের রোমের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু মোটের উপর সমস্ত সমাজ ধরিতে গেলে যাজকবৃন্দের মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের সহিত রোমের সম্পর্ক চলিত। ক্রুসেডের সময়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্রুসেডারের পক্ষে রোমই ছিল যাতায়াতের পথে প্রধান আড্ডা। বহু সংখ্যক লোক এখন পোপসভার আচার ব্যবহার, নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইল। ধর্ম্ম লইয়া যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ তাহার মধ্যে কতটুকুই বা ধর্ম্মভাবের প্রেরণা আর কতটুকুই বা

ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণা তাহাও তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিল। নিশ্চয়ই এই নবলব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে অনেকের মনেই এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাহস ও দৃঢ়তা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ক্রুসেডের পরে সাধারণতঃ এবং বিশেষ করিয়া ধর্ম্মশাসন বিষয়ে লোকের মনের যে অবস্থা ঘটিল তাহার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হইল না; পুরাতন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। অথচ লোকের মন এখন অনেক বেশী স্বাধীন। এই স্বাধীন উন্মুক্ত চিত্ত কেবল আর ধর্ম্মালোচনার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিল না। ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না বটে, কিন্তু মানুষের মন এখন ধীরে ধীরে ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃথক্ হইয়া অন্যত্র সরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুসেডের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের প্রেরণা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল; ইউরোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থায় এক গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল।

ইউরোপের সামাজিক অবস্থাতেও ঐরূপ এক পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এ বিষয়ে ক্রুসেডের প্রভাব কতটুকু তাহা লইয়া অনেক অনুসন্ধান আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ক্রুসেড অভিযানের ব্যয় সংগ্রহের জন্য কিরূপে বহু ফিউড্যাল ভূস্বামীকে রাজার নিকট স্বীয় ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল অথবা নূতন পৌরসংঘের নিকট অধিকারপত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাও দেখান হইয়াছে যে কেবল অনুপস্থিতির দরুণ অনেক ভূস্বামীকে পূর্ব্ব ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হারাইতে হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা কয়েকটি সাধারণ তথ্যের দ্বারা ক্রুসেডের সামাজিক প্রভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রুসেডের কালে ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল এবং অল্পসংখ্যক কয়েক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ভূসম্পত্তি আসিয়া জমা হইয়াছিল। ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ভূস্বামীর আবির্ভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার অনেক সময় দুঃখ হয় যে ভূসম্পত্তি বণ্টন হিসাবে ফ্রান্সের একটি মানচিত্র প্রস্তুত হয় নাই। মানচিত্রে যেমন ডিপার্টমেন্ট, ক্যাণ্টন, পল্লী প্রভৃতি দেখান হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি এক একটি ভূসম্পত্তির বিস্তৃতি ও পরিবর্ত্তনপরম্পরা দেখান হয় তাহা হইলে সুবিধা হয়। এইরূপ একটি মানচিত্রের সাহায্যে যদি ক্রুসেডের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ফ্রান্সের অবস্থা তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখিব কত ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এবং মধ্যবর্ত্তী ও বৃহৎ ভূসম্পত্তিগুলি কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রুসেডের অন্যান্য পরিণামের মধ্যে এটি একটি বৃহত্তম পরিণাম।

এমন কি যে সমস্ত ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ তখন পর্য্যন্ত স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ

হইয়াছে তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না। বড় ভূস্বামীগণ এখন সমাজের এক একটি কেন্দ্র স্বরূপ। সেই কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে গ্রহউপগ্রহস্বরূপ ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের অবস্থান। ক্রুসেডের সময় সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী নেতার অনুসরণ করা ও সাহায্য গ্রহণ করা তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুসেড অভিযানে এই অধিনেতার সঙ্গে তাহাদিগকে বাস করিতে হইয়াছে, তাহার ভাগ্যাভাগ্যের অংশী হইতে হইয়াছে, তাহার বিপদ সঙ্কটে সঙ্গী হইতে হইয়াছে। ক্রুসেড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের এই সামাজিকতা, ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার এই অভ্যাস দৃঢ়রূপে মজ্জাগত হইয়া গেল। এইরূপে বড় বড় ভূসম্পত্তির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ভূস্বামীগণের দুর্গ প্রাসাদের মজলিস ক্রমশঃ জমকাইয়া উঠিল; সে মজলিসে তখন অনেক ক্ষুদ্রভূস্বামী—অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ; ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিল বটে, কিন্তু তাঁহারা আর স্বরাট্ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ দুর্গে বাস করেন না।

বড় বড় ভূসম্পত্তির বিস্তৃতি ও পূর্ব্বতন বিচ্ছিন্ন সমাজের পরিবর্ত্তে কতকগুলি বড় বড় সামাজিক কেন্দ্রের সৃষ্টি—ফিউড্যাল পদ্ধতির সম্পর্কে ক্রুসেডের এই দুই প্রধান ফল।

পৌরসমাজেরও এইরূপ একটা পরিবর্ত্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ক্রুসেডের পূর্ব্বে যে সামান্য আকারে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত তাহাতে ফ্লাণ্ডার্স ও ইটালীর বড় বড় নগরের মত নগর গড়িয়া উঠে না। বৃহদাকারে সামুদ্রিক বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যখণ্ডের সহিত বাণিজ্যের দ্বারাই এই সকল পুরীর উদ্ভব। ক্রুসেডের দ্বারা সামুদ্রিক বাণিজ্য যে উন্নতিবেগ পাইয়াছে সেরূপ প্রবল সহায়তা আর কিছুতে পায় নাই।

মোটের উপর ক্রুসেডের অবসানকালে সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ সমাজের পরিবর্ত্তে এক নূতন সমাজের আবির্ভাব হইল; এ সমাজের গতি কেন্দ্রমুখী, সংহতিমুখী। সমস্তই এখন পরস্পর সান্নিধ্যের দিকে, একাকারের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্বা হয় বৃহত্তর সত্বার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, না হয় তাহার চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছে। সমাজের গতি এখন এইদিকে, সমাজের সমস্ত উন্নতি এখন এই কেন্দ্রীকরণ নীতির বশবর্ত্তী।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেন যে রাজা প্রজা কেহই আর ক্রুসেডে যাইতে চাহে না, এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। এখন তাহাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তিও নাই প্রয়োজনও নাই। ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়, সমগ্র জীবনের উপর ধর্ম্মবিশ্বাসের একাধিপত্যের দরুণই তাহারা এই ক্রুসেড আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল; এখন সে আধিপত্য শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা ক্রুসেডের মধ্যে একটা ব্যাপকতর, বিচিত্রতর নূতন জীবনের আস্বাদ পাইতে চাহিয়াছিল; এখন তাহারা ইউরোপের মধ্যেই নূতন নূতন সামাজিক বন্ধন ও আদানপ্রদানের মধ্যে সেই নূতনত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিল। এই সময়েই রাজগণের চক্ষের সম্মুখে রাষ্ট্রীয় পরাক্রমবৃদ্ধির আদর্শ ফুটিয়া উঠিল। নূতন নূতন রাজ্যের

সন্ধানে এশিয়া যাওয়ায় প্রয়োজন কি? ঘরের পাশেই ত কত রাজ্য পড়িয়া আছে, জয় করিয়া লইলেই হইল। ফিলিপ অগষ্টস্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রুসেডে গিয়াছিলেন; ইহা অপেক্ষা আর স্বাভাবিক কি হইতে পারে? তাঁহাকে যে ফ্রান্সের রাজা হইতে হইবে। সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যেও ঐ একই ব্যাপার। তাহাদের সম্মুখে নব নব উপায়ে ধনার্জ্জনের পন্থা খুলিয়া গেল। তাহারা তাই এখন বিপদ সঙ্কটের পথ ছাড়িয়া দিয়া কাজে লাগিয়া গেল। রাজগণ সঙ্কটাভিযান ত্যাগ করিয়া রাজনীতির জাল বুনিতে লাগিলেন; প্রজাগণ ভবঘুরে স্বভাব ত্যাগ করিয়া বৃহদাকারে শিল্প বাণিজ্য ফাঁদিতে লাগিল। কেবল একদল লোকের তখনও সঙ্কটলিপ্সা মিটে নাই। যে সমস্ত ফিউড্যাল ভূস্বামীর রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবার মত অবস্থা নহে, অথচ কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহারা তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী আঁকড়াইয়া রহিল। তাহারা তাই দলে দলে ক্রুসেডে ছুটিল ও ক্রুসেডের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমার মতে ক্রুসেডের ইহাই যথার্থ ও প্রধান পরিণাম। একদিকে চিন্তার বিস্তৃতি, চিত্তের মুক্তিসাধন; অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার স্থানে বৃহত্তর সত্তার প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের উপযোগী একটা বিশাল ক্ষেত্রের উন্মোচন। ক্রুসেডের ফলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও বাড়িয়া গেল, রাষ্ট্রীয় ঐক্যও বাড়িয়া গেল। মানুষের স্বাধীনতাও অগ্রসর হইয়া গেল, সমাজের কেন্দ্রীকরণও অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়েরা এই সময়ে প্রাচ্য দেশ হইতে সভ্যতার কি কি উপকরণ সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমদানী করিয়াছিল তাহা লইয়া অনেক অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কম্পাশ, মুদ্রাযন্ত্র ও বারুদ প্রভৃতি যে কয়টি বড় বড় আবিষ্কারের দ্বারা ইউরোপীয় সভ্যতার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই নাকি পূর্ব্ব হইতে প্রাচ্যদেশে পরিজ্ঞাত ছিল, এবং ক্রুসেডাররা সম্ভবতঃ সেখান হইতে এগুলিকে আমদানী করিয়াছে। একথাটা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কোন উক্তি তর্কসাপেক্ষ। যাহা তর্কসাপেক্ষ নহে তাহা হইতেছে ক্রুসেডের পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণ প্রভাব, একদিকে মনের উপর প্রভাব, অপর দিকে সমাজের উপর প্রভাব। ক্রুসেড ইউরোপীয় সমাজকে একটা সঙ্কীর্ণ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া নানা নূতন নূতন সুবিস্তীর্ণ পথে চালাইয়া দিল। একদিকে শাসিত জনবর্গ, অপর দিকে শাসনতন্ত্র, আধুনিক কালে ইউরোপের সমাজ এই উভয় দলে বিভক্ত, নানা বিচিত্র উপাদান হইতে এই দুইটি মাত্র দলের সৃষ্টি ক্রুসেডের ফলেই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই রূপান্তর সাধনের প্রধান সহায় যে রাজতন্ত্র তাহাও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। আগামী অধ্যায়ে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির জন্মকাল হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিব।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

খোলাপথ

মেয়েদের কোথাও প্রেমময়ী, কোথাও পাষাণী, কোথাও দেবী, কোথাও দানবী বলিয়া এক নিঃশ্বাসেই খতম করা হয়। কিন্তু ইহার সবই ত সত্য। পুরুষেরাও যেমন দেব দানব সবই আছেন, মেয়েদের মধ্যেও তেমনি দেবী ও দানবী আছে ও থাকিবে। যত কিছু মানুষিক গুণ, দোষ পুরুষের মত তাঁহাদের মধ্যেও দেখা যায় ও যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের বেলা তাহাই পরমাশ্চর্য্য আবিষ্কার বলিয়া ধরিয়া, প্রত্যেকটি দোষ গুণকে আলাদা আলাদা করিয়া বাহির করিয়া, তাহা এক একটি খোপে ভাগ করিয়া, এক এক রকম নমুনা হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা হয় বলিয়াই ত যত গোল হয়। শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সুলক্ষণা, কুলক্ষণা ইত্যাদি রূপে তাঁহারা যেমন পরিপাটি রূপে দফায় দফায় ভাগ হইয়াছেন, পুরুষের মধ্যেত তেমনটা করিতে দেখা যায় না। অথচ তাঁহাদের মধ্যে শক্তি, প্রকৃতি, দোষ, গুণের তারতম্য বোধ করি বেশী ছাড়া কম নাই।

"ব্রহ্মবাদিনী' ও "সদ্যোবধূ" মেয়েদের সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত মূর্ত্তির কথাও শোনা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই মাঝামাঝিরা,—যাহারা এ দুয়ের কোন কোঠাতেই পড়ে না,—(অথচ সংখ্যায় কিন্তু তাহারাই বেশী) তাহাদের উপায় কি? যাহারা ঠিক দেবীও না হইলেও দানবীও নয়, বধূ হইয়াও ব্রহ্মবাদিনী হইবার দুরাশা রাখে, ব্রহ্মবাদিনী হইলেও যাহাদের হৃদয় মরুভূমি নয়—প্রেমের আকাঙ্খাও করে, সুতরাং বধূও হইতে চায়, তাহারা করিবে কি? মেয়েদের সবদিকেই এই রকম দুই চরম পথ ভিন্ন আর উপায় রাখা হয় নাই। আর একবার যে যে কোঠায় পদার্পণ করিবে, অমনি তাহাতে শিকল পড়িয়া যাইবে। তাহা হইতে বাহির হইবার, বিশ্বপৃথিবীর মধ্যে স্বাধীন দানগ্রহণে বাড়িয়া বহিয়া চলিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। 'দেবী' হইলে মরিয়া গেলেও তাহার আর মর্ত্ত্যমানবী হইবার জো নাই।—হইতে গেলে একেবারে দানবী হইয়াই চিরকাল গড়াইতে হইবে। উঠিয়া দাঁড়াইবারও আর উপায় থাকিবেনা। বধূ হইলে ব্রহ্মবাদিনীত্ব লাভের পথ চিররুদ্ধ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মবাদিনী হইতে গেলেও বধূত্ব ও মাতৃত্বের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আসিতে হইবে (আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মবাদিনীরা কিন্তু বধূও ছিলেন।)—মেয়েরা জীবনে এই যে সময়ের সুবিধা ও খোলাপথ পায় না, একেবারেই তাহাদের উপর চিরকালের মত শিলমোহর মারিয়া দেওয়া হয়, ইহার বাড়াই বা আর অন্যায়, অত্যাচার কি হইতে পারে? মানুষ কি এতই সহজ, যে তাহাকে খোপে পোরা যাইবে, আর তাহারই মাপে মাপে সে ঠিক ধরিয়া যাইবে? কিন্তু মহাসাগরের তলও মাপা হইয়াছে, মানুষেরই এ পর্য্যন্ত তল বা মাপ, জোখ কিছুই নিঃশেষ করিয়া পাওয়া যায় নাই। প্রথম হইতেই চারিদিকে বাঁধন দিয়া তাহাকে ছাঁদে

মেয়ের পায়ের অবস্থায় পরিণত করা যায় বটে, তাহাতে সৌন্দর্য্য কতদূর লাভ হয় বলা শক্ত, কিন্তু পা আর পা থাকে না।

মানুষকে কোঠায় কোঠায় ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে এক একপ্রকার বিশেষ গুণাবলীর চাষ করাইলেও ফসল কেমন হয় বলা যায় না,—কিন্তু তাহার মনুষ্যত্বের দিকটা খাটো না হইয়াই পারে না। মানুষ তাহার নিজের কাছেও জানিত, অজানিত, পরস্পরবিরোধী বিচিত্র শক্তি প্রকৃতির আধার বনস্পতি। তাহাকে টবের মধ্যে বসাইয়া পরিপাটীরূপে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইতে চাহিলে সে ড্রয়িং রুমের শোভা হইতে পারে, কিন্তু নিজের কাছে সে উপহাস্যই হইয়া উঠে। এতদিন পুরুষকেই বনস্পতি এবং মেয়েদের টবের গাছ বা ফুল-দানীর ফুল বলিয়া মনে করা হইত,—তাহাতেই এত আপদ জমিয়াছে।

শিক্ষাও যতই দেওয়া হউক, বাহিরের বৃহৎ জগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগ না থাকিলে মনের আকাশের ক্ষুদ্রত্ব দূর হইবার নয়। বৃহৎ পথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে সঞ্চরণ না করিতে পাইলে মানুষ কি কখন মানুষ হইতে পারে? তাহার শিক্ষাও অচিরে মুষড়াইয়া পড়ে। তাই তাহাতে ফুলের সৌন্দর্য্য, ফলের স্বাদ বা গাছের ছায়া কিছুই মিলে না। সে ছিন্নমূল লতার মত দুইদিনেই শুকাইয়া, অদৃশ্য হইয়া কোনই কাজে লাগে না। নতুবা অস্থানজাত গাছপালার মত একভাবেই গুটি মারিয়া কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা করে মাত্র। স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র না পাইয়াই মেয়েদের শিক্ষা অফলা হইয়া থাকে। সেইজন্য বিশেষ কোন প্রাণের পরিচয় দিতে না পারায় আবার লোকের তাহার প্রতি আস্থাও জন্মে নাই। কিন্তু কেন যে তাহার প্রাণ নাই, বল নাই, তাহা কি কেহ দেখিতে চেষ্টা করেন? এই বৃহতের সহিত বিচ্ছেদেই শিক্ষার মত মেয়েদের এত দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেমও অসংস্কৃত ও অমার্জ্জিত হইয়া মলিন হইয়া আছে। যাহা স্রোতস্বিনীর মত বহিতে পারিত, সঙ্কীর্ণ স্থানে আটকা পড়িয়া তাহা কাদা হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তি না পাইয়া শক্তি ও প্রকৃতি ভেদে মেয়েদের ভিতর যে কি অস্বাস্থ্য, অমঙ্গল, দুঃখ, ক্ষোভ, ক্ষুদ্রতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহার ইতিহাস কি কম শোচনীয়? মানুষ যে অমৃতের পুত্র পুত্রী, তাহাকে এত বেড়া, এত বিশেষের মধ্যে আটকাইবার এত বিরাট আয়োজন কেন? বৃহৎ জগৎ ক্ষেত্রে নামিলে ব্যক্তি ভেদে তাঁহারা সকলেই, বা প্রকৃতির সর্ব্বাংশেই অনবদ্য না হইতে পারেন। ব্যক্তিগত রূপ যাদোঃ দ্বৈতঃ মিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াই সম্ভব। কিন্তু তবু তাহা বদ্ধজল না থাকিয়া অর্ণবতা লাভ করিবে। এখনকার অবস্থাতেই কি নারীর সর্ব্বত্রই কেবল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, দেবীত্বই ঝলমল করিতেছে? বরং তাহার কি দীন, কি মলিন এমন কি কুৎসিৎ মূর্ত্তিই না অহরহ চোখে আসিতেছে!

ঘরসংসার ভিন্ন আর কোন অবলম্বন না থাকায় সেই অত্যন্ত চঞ্চল ঘরসংসার লুপ্ত হইলে বা মেঘাবৃত হইয়া জ্বালা, যন্ত্রনা, অপমানের যন্ত্রই হইয়া উঠিলে মেয়েদের অনেকেরই

যে ধর্ম্মকে আঁকড়াইতে দেখা যায়,—তাহাও কি শোচনীয় নয়? তাহাকে কি সকল স্থলেই সত্যই যথার্থ ধর্ম্মভাব বলিতে পারা যায়? ধর্ম্ম কি কেবল ঐরকম করিয়া আঁকড়াইবার বস্তু? তাহার বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ উহাতে কতটুকু আছে? ইহাও একরকমে বাঁচাইয়া রাখে বটে,—কিন্তু তবু কি তাহা দেখিয়া আত্মার সমাধি বলিয়া মনে হয় না? বৃদ্ধি ও জীবনের মধ্য দিয়া যে পরিণতি তাহাই যথার্থ পরিণতি। হঠাৎ একজনের গলায় দড়ি দিয়া বৈতরণী পার করাইলে কি তাহা মোক্ষধামেই গিয়া পৌঁছে? ইহাতে লোকে অত্যন্ত ভালমানুষও বনিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা মানুষের প্রাণের মূল্যে,—ইহা যেন মনে থাকে। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা শুচিবাই ও আনুষ্ঠানিক বাহুল্যের সহিত হৃদয়ের বিষম কার্পণ্য, শুষ্কতা, রুক্ষতা ইত্যাদিই আনিয়া থাকে না কি?

আত্মীয় স্বজন, পরিবার ও আমাদের একাকিত্ব হইতে উদ্ধার করে বটে,—কিন্তু কেবল তাহারাই যদি মাত্র সম্বল হয়, তাহা হইলে কি পরম একাকিত্বই আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে। তাঁহাদের নিঃসঙ্গতার মত চরম নিঃসঙ্গতা,—নিরুপায়, বাধ্যতামূলক নিঃসঙ্গতা আর কোথায় আছে? তেমনি আবার সঙ্গ যেখানে আছে, সেখানে আপনাকে একটুখানি মেলিয়া দেখিবার,—এতটুকু একা পাইবার স্থানও থাকে না। বাহিরে পর্দ্দা,—কিন্তু ভিতরে সবই সদর ও একাকার।

আত্মীয় স্বজন সকল সময় প্রাপনীয় নহেন। তারপর শারীরিক উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত মনের দূরত্ব যথেষ্টই থাকিতে ও আসিতে পারে। আর নিকটের জন দূর হইয়া পড়িলে তাহা যেমন অবাঞ্ছনীয়, যন্ত্রণাময় দূরত্বের সৃষ্টি করিতে পারে, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয়ও তেমন দূর, তেমন অনধিগম্য হয় না। আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই নিরত নিঃশেষে বদ্ধ থাকিতে হওয়ায় ইহার সবগুলিই মেয়েদের পূর্ণমাত্রায় লাভ হইয়াছে। অথচ আপনার ব্যক্তিত্বের আবডালটুকু রাখিবার স্থানও তাঁহাদের থাকে না।

কিন্তু উদার বিশ্বে সন্তরণ করিতে পাইলে কি অভাবিতরূপেই আমাদের পরমাত্মীয়দের দর্শন সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। ঘরের আত্মীয়দের কাছে যখন অবজ্ঞা, বৈরূপ্যমাত্রই পুরস্কার মিলিয়া নিজেকে কীটানুকীটের মত মনে হইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতেই ইচ্ছা করে সেই সময়ে সহসা তাঁহাদের কাছে গণিত পরিগৃহীত হইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়। জীবনে যেন বিশ্বাস ফিরিয়া আসে,—আপনাকে আবার মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাই আত্মীয়েও যদি মানুষের প্রয়োজন থাকে, উদার বিশ্ব খোলা না থাকিলে কি তাহাদের লাভ করা যায়? এমনিই ত অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত আত্মীয় আমাদের কতই রহিয়াছেন যাহাদের অস্তিত্বও হয়ত কোন দিন জানিতে পাইব না। কিন্তু তবু তাহার কিছু আশা অন্ততঃ ইহাতে থাকে।

এখন যে আর ঘর ও আত্মীয়স্বজনেই মানুষকে ধরিতেছে না,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বলোক-বাসী তাহার কার্য্যক্ষেত্রেও প্রতিবেশী, ঘরকন্না ও ভাইবন্ধু সবই হইয়া উঠিতেছে,

সুতরাং ঘরকন্নার ভাবেও যে সেখানে নারীর ডাক আসিতেছে। তাহার আহ্বান শুনিতে হইলেও নারীকে শরীর, মনে সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করিতে হইবে। নারীভাবে নারীত্বের মামুলি আদর্শের দিক দিয়াও ইহাতে নারীভাব কতই বেশী! ব্যক্তিগত ঘরকন্না, সন্তান পালন, স্নেহের রাজ্যও যেমন মনের সহিত মুক্তদৃষ্টির সংযোগে অনেক বেশী সম্পূর্ণতার দিকে যাইতেছে ঐ ঘরকন্না, সন্তানপালন, স্নেহের রাজ্য তেমনি সমস্ত পৃথিবীময়ই প্রসারিত হইতেছে। ইহা কি বণিগ্‌বৃত্তির চিহ্ন? এখনকার মহত্তম আদর্শের গতি কোনদিকে? তারপর বর্ত্তমানে যদি বণিগ্‌বৃত্তির প্রাবল্যই ঘটিয়া থাকে, বিশ্বের জ্ঞানকর্ম্মরাজ্যে নারীর অবতরণের মধ্যে তাহার প্রতিশোধেরই ইঙ্গিত কি পাওয়া যাইতেছে না? নারীও উহাতে বৈষয়িক হইয়া উঠিবেন বলিলে বলিতে হয়,—যতই তাহা হউন, তবুও ঘরে বাহিরে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সেই হাওয়াবাতাসের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে পাইলে তাহার মোট ফলে অনেক পরিবর্ত্তন, সৎভাবের চিহ্ন নিশ্চয়ই দেখা যাইবে।

বঙ্গনারী।

ধর্ম্ম-প্রচার

হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাসে ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় নাই। শাস্ত্রবচন, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রানুযায়ী আচার ও অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু তাহা স্বদেশ ও স্বধর্ম্মিদের মধ্যে, বিশেষ বিশেষ গুরু এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। নিজের দলের বা দেশের বাহিরে অপরকে ধর্ম্মের বার্ত্তা শুনাইবার জন্য, অহিন্দুকে হিন্দুত্ব, অদ্বিজকে দ্বিজত্ব দান করিবার জন্য, রাজ-কর্ত্তৃক বা পুরোহিত শ্রেণী কর্ত্তৃক প্রচারক নিয়োগের প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদেশে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিদের মধ্যে প্রচারার্থ যাত্রার কথাও কোন কাব্য বা পুরাণে পাওয়া যায় না। এই প্রথা তৎপূর্ব্বযুগে ভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যেই অত্যুজ্জ্বল ঐতিহাসিক প্রমাণ সহ পাওয়া যাইতেছে।

বৌদ্ধের মৈত্রী কেবল তাহার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের জন্য নহে, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বজীবে উহা প্রসারিত ছিল, তাই সে নিজে যে মুক্তির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছে, তাহা স্বদেশে, বিদেশে, সর্ব্বত্র প্রচার না করিয়া শান্তি থাকিতে পারে নাই। তাই সিংহলে তিব্বতে, চীনে জাপানে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রচারক

ও পরিব্রাজক স্বধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিতে গিয়াছেন। সম্রাট অশোক কেবল ধর্ম্মপ্রচার নহে দৈহিক রোগ নিবারণের জন্য ভৈষজ্য প্রচারও একটী বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন।

অহিংসা অর্থাৎ হিংসা না করা—অভাবাত্মক; মৈত্রী তাহার বহু উর্দ্ধে, হৃদয়ে সর্ব্ব জীবের জন্য মিত্রতার অনুভূতি, সর্ব্বজীবের মিত্র হওয়া—ভাবাত্মক। করুণা ইহার সহচরী। যেখানে মৈত্রী বা প্রেম আছে, সেখানে অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধ না হইয়া পারে না; ইহাই করুণা। যেখানে করুণা সেখানে পরের দুঃখ মোচনের ইচ্ছা ও চেষ্টা অতি স্বাভাবিক। এই মৈত্রী ও করুণাই জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচারের প্রেরণা। এই মৈত্রী ও করুণার স্থানে হিন্দুর ছিল এবং এখনও আছে স্বজাতি গৌরব, আপনার দ্বিজত্বের অভিমান, এবং অন্য জাতির প্রতি অনাদর এবং স্থানবিশেষে ঘৃণা। যে হিন্দু হইয়া জন্মে নাই সে তো কখনই হিন্দু হইতে পারিবে না। উচ্চজাতি ত্রয়ের মধ্যে তাহার স্থান হওয়া তো দূরের কথা।

যাহারা এই ভারতের আদিম নিবাসী অথবা যে আর্য্যেরা তাহাদের সহিত মিশিয়া বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, বা অন্য প্রকারের ভ্রষ্টাচারিতা বশতঃ জাতিচ্যুত হইয়াছে, তাহারা উচ্চবর্ণত্রয়ের, সেবা করিবারই কেবল অধিকারী। এই সেবক জাতির জন্য অনেক কঠিন বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীতে উঠাইয়া লইবার কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। পাতিত্যের বা অবনয়নের ইতিহাস অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ-ঘটিত জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভই সমস্ত পুরাণের মধ্যে উন্নয়নের একমাত্র দৃষ্টান্ত। ইংরাজিতে বলে Exception proves the rule; এদেশেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় থাকাই সাধারণ বিধি বা rule, না থাকাই একটা ব্যতিক্রম বা exception শম্বুক শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত তপস্যা করিতে ছিল সেই অপরাধে রামচন্দ্র তাহাকে, হত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ বিধির প্রণেতা, ক্ষত্রিয় তাহার নিয়োজিত যন্ত্ররূপে দণ্ডের বিধাতা।

উপনিষদে সত্যকামের আখ্যায়িকাতে দেখা যায় জাতিভেদের বেড়া তখনও নমনীয় এবং উল্লঙ্ঘনীয়, কঠোর এবং অনলঙ্ঘনীয় হয় নাই। আরম্ভে কর্ম্মগত ও চরিত্রগত হইলেও কালে জাতি জন্মগত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুর সন্তান না হইলে হিন্দু হওয়া তো সম্ভবই নহে হিন্দুর আচার মানিয়া চলিলেও যে হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে জন্মগত হীনতা হইতে এজন্মে তাহার নিষ্কৃতি নাই। সে যদি ব্রাহ্মণোচিত ধ্যান অধ্যয়ন যজন যাজন ও তপস্যা করে, তবে অনধিকার চর্চ্চা হেতু সে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডনীয়। শূদ্রের কর্ণে বেদধ্বনি প্রবেশ করিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত পারদ ঢালিয়া দিবার বিধি আছে।

এদেশ চিরকালই একচেটিয়া অধিকার বা 'মনোপলির' দেশ। কেবল ব্যবসায়ে নহে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও। হইতে পারে এই জাতি বিভাগ ও মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হয় কিন্তু মোটের উপরে ইহাতে দেশের ক্ষতি। ইহাতে ভারতের এক অখণ্ড জাতিগঠন (nation building) বাধা পায়। এ যেন সমতল ভূমির স্থানে স্থানে পর্ব্বত চূড়ার স্থাপন। এই চূড়া ধারণ ও বহন করিবার মত ভূগর্ভ প্রোথিত ক্রমোন্নত বিস্তৃত ভিত্তি নাই। ইহাদের ঝড় ঝটিকা হইতে অটুট রাখিবার উপায় নাই। একটা বিশেষ পরিবারে বা বংশে যে জ্ঞান বা কলানৈপুণ্য আবদ্ধ আছে, যদি কোন সংক্রামক-রোগে সেই পরিবারের লোকগুলি মরিয়া যায় তাহাদের জ্ঞান ও কলা-কৌশল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়। কোন গুরু যদি উপযুক্ত বহু সন্তান বা বহু শিষ্য না রাখিয়া যাইতে পারেন তবে এক সন্তান বা শিষ্যের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার গোপনে রক্ষিত জ্ঞান বা কলা-কৌশল নষ্ট হইয়া যায়। মন্ত্রগুপ্তির আতিশয্য জন সাধারণকে মূর্খ রাখিয়া দেয়, ভীরু ও কুসংস্কারাপন্ন করে, জাতিকে বড় হইতে ও চৌকোষ হইতে দেয় না। অপাত্রে অনধিকারীতে বিদ্যার অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু সেই আশঙ্কায় জাতি বা বংশ বিশেষের মধ্যে কোন বিদ্যাকে আবদ্ধ রাখিলে তদ্বারা জ্ঞানের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগ সূচিত হয় না। জ্ঞানের যে প্রকৃত অনুরাগী সে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার চাহে। আমি যাহাকে মূল্যবান্ অথবা সুন্দর মনে করি, দশজনেও তাহাকে তাহাই মনে করুক, আমি যে সাধনায় আনন্দ লাভ করি, আর দশজনেও সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আনন্দিত হউক, ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। এ ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মায় স্বার্থ ও প্রভুত্বপ্রিয়তা। ব্যবসায় ঘটিত রহস্য (Trade Secret) কোন বিশেষ দলের বা বংশের সুবিধার জন্যই গোপন রাখা হয়। ধর্ম্মকে ও trade বা ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া কতকগুলি বিশেষ পরিবারে বা বংশে বা একটা বর্ণ বা জাতিতে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। তাই পুরোহিত বংশের সন্তানেরা পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছে। মোহান্তগণের পক্ষে চির ব্রহ্মচর্য্যই বিধান, কার্য্যতঃ পালিত হউক কি না হউক। কিন্তু গৃহত্যাগী অবিবাহিত সন্ন্যাসী হইয়াও তাহারা সচরাচর বিলাসী, বিষয়াসক্ত ও কুচরিত্র হইয়া থাকে। দেবত্র জমী মঠ বা মন্দিরের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি তাহারা নিজেরা তো ভোগ করেই, আবার অধিকাংশ স্থলে শিষ্যরূপে গৃহীত ভ্রাতা কি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সে সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া যায়।

অর্থলাভের আশা না থাকিলে ধর্ম্ম যাচিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই। কৌলিক প্রথার বাহিরে, মানুষ যেখানে বিশেষ আগ্রহে ধর্ম্মলাভ করিতে যায়, সেখানে সে ভয় পাইয়া, বিপদে পড়িয়া, শোকের আঘাতে অথবা স্বাভাবিক মুক্তির স্পৃহাবশতঃ উপযাচক হইয়া, ধর্ম্মে দীক্ষা অথবা পুণ্য অর্জ্জনে শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছে বোধ

যায়। অর্থ বা উপহারাদি লইয়া ধর্ম্মার্থীকে গুরু মন্ত্রদান করেন, পুরোহিত পূজাসামগ্রী লইয়া দেবতাকে বিহিতবিধানে প্রসন্ন করেন। ইহারা দেবতা ও মানুষের ভিতরে দেনা পাওনা, কেনা বেচার মধ্যবর্ত্তী। ইহারা ধর্ম্মের দালাল। গরিব স্ত্রীলোকের পুত্র পীড়িত, কিছু পয়সা লইয়া পুরোহিত ঠাকুর তাহার হইয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন। মা কালী পাঁঠা বলি পাইয়া মোকদ্দমা জিতাইয়া দিবেন, সে পাঁঠার অনেকখানি খান পাণ্ডা। পূজকের দান এবং দেবতার বা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ পুরোহিতের গ্রহণ, ইহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিতে অনেকেই সঙ্কুচিত হইবেন। কিন্তু এদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে স্নান, দান, বলি, নৈবেদ্য, উপবাসাদি দ্বারা দেবতা প্রসাদনই ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। সেই জন্য দুষ্ক্রিয়াসক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার একত্র সমাবেশ অনেক সময়েই দেখা যায়। অবশ্যই ধর্ম্মের অর্থ এখানে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান মাত্র। যাহাতে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের আর্থিক ও ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য তাহা দ্বারাই পূজকের পারমার্থিক লাভ। সাধারণের হিতোদ্দেশে যে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না তাহা নহে। শ্রাদ্ধাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে দরিদ্রদের অন্নবস্ত্রদান, পুষ্করিণী খনন, পথে বৃক্ষ রোপন, অন্নসত্র জলসত্র স্থাপন সেতুনির্ম্মান, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জন হিতকর কর্ম্ম হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল স্থলে জনহিতৈষাই একমাত্র প্রেরণা নহে। আপনার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ইচ্ছা ও যশোলিপ্সা এই সকল কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং যাহারা এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা আশু উপকৃত হইবে, তাহাদের প্ররোচনার প্রভাবও কম নহে।

এদেশে প্রায়ই ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুল ভক্ত স্বয়ং কোন গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, গুরু তাহার কাছে ধর্ম্ম লইয়া উপস্থিত হন না। স্থলবিশেষে গুরুর অনুচরেরা গুরুর শিষ্য বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী, অনাসক্ত ও মুমুক্ষু তাঁহাদের নিজের মোক্ষই সাধনার বস্তু। আপনাকে লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত, সংসারের আসক্তি ও বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার জন্য তাঁহারা আপনাকে লইয়া কোন নিরালয় স্থলে গমন করেন। দশ জনকে লইয়া ধর্ম্মসাধন সম্ভব কি না এবিষয়ে বর্ত্তমানেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আমি যাহা জানিয়াছি যে মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা দশ জনকে জানাইতে হইবে; আমার আশা, আমার শান্তি, আমার আনন্দ দশ জনের প্রাণে সঞ্চার করিতে হইবে; আমার ধর্ম্মের বার্ত্তা দেশবিদেশে প্রচার করিতে হইবে; সকলকের না শুনাইলে আমার শান্তি নাই, আনন্দ নাই, আমার জ্ঞান, আমার মুক্তি ব্যর্থ তাই প্রাণ দিয়াও দশ জনকে মুক্তির সমাচার দিতে হইবে,—এই ভাবটি বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে আছে। এই মানবপ্রীতি ও জনহিতৈষা বৌদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও পাওয়া যায়। কীর্ত্তন মহোৎসবাদি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; জাতিভেদের প্রাচীর না থাকাতে মানুষে

মানুষে আত্মীয়তাবোধ সহজ হইয়াছে। শাক্ত শৈবাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দয়া ও দানের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও জনহিতৈষা ও মানব প্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। সংসার ত্যাগ ও গৃহী জীবনের প্রতি অবজ্ঞা বৌদ্ধ মতে এবং প্রথম যুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের মত বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তথাপি প্রচারের পথ নিরোধ হয় নাই।

আমার মনে হয় হীন জাতির প্রতি ঘৃণা, অধিকারভেদ, কর্ম্মফল ও ললাট-লিপিতে বিশ্বাস এদেশে স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণা বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। তাই প্রচারের চেষ্টাও বিরল ছিল।

এক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কোন পণ্ডিত বা সাধুর সহিত অপর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের তর্ক ও সত্যাসত্য বিচারের দ্বারা অবশ্যই এক রকম প্রচার হইত, কিন্তু উহা নিতান্তই মতগত। সেই জন্য তাহাকে ঠিক ধর্ম্মপ্রচার নামে অভিহিত করা গেল না।

নূতন কতগুলি লোক কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইলেই যে সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রচার হইতেছে মনে করিতে হইবে, এমনও নহে। বর্ত্তমান ইউরোপ নামে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইলেও ইউরোপবাসী সকলেরই মত ও বিশ্বাস খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী নহে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণের অধিকাংশ নিরীশ্বরবাদী অথবা সংশয়বাদী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারে ব্রতী বহুলোক বাইবেলে বীতশ্রদ্ধ, আবার বিশ্বাসীদলেরও অভাব নাই। ইহারা কেহবা অন্ধভাবেই পূর্ব্বপুরুষের মত, বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছেন, কেহবা নানা রূপ ব্যাখ্যা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ সংস্কৃত আকার ধারণ করিতেছে। ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ও অর্থহীন মতবাদের পরিবর্ত্তে, মানবপ্রীতি, জনহিতৈষা, চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও আকাঙ্খার উচ্চতাই ঈশ্বরপ্রীতির নিদর্শনরূপে গণ্য হইতেছে। অনন্ত নরক, ঈশ্বরের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, বিশেষ অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি অনেক মত পরিত্যক্ত হইতেছে। বাইবেলের বিজ্ঞানবিরোধী অংশ বর্জ্জিত বা নূতন রূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজে আর্য্যসমাজে এবং বিবেকানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে কতকটা খৃষ্টান মিশনারীদের অনুকরণেই ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকহিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ও আর্য্যসমাজে বিশেষভাবে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রচারক নিযুক্ত হইতেছেন। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের সকলে না হউন, কেহ কেহ অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে। অন্য দেশ বা অন্য জাতির মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর ভিতরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে লৌকিক শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম্মে দীক্ষাদানের প্রয়োজন।

কিন্তু সেজন্য কেবল দুই একদিনের বক্তৃতা বা কীর্ত্তন, একদিনের শুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্ত নামক অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নহে। যিনি ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন, তাঁহাকে শিষ্যদের সুখ দুঃখের ভাগ লইয়া, পিতা যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের তত্ত্বাবধান করেন ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। সন্তান চিরকাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকেনা, ধর্ম্মশিষ্য ও চিরকালই শিক্ষণীয় রহেনা। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে গুরুশিষ্যের মধ্যে মিত্রভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে যেমন এক শিক্ষক বহুকাল অধ্যাপনা করেন বলিয়া, যাহারা তাঁহার প্রথমকার ছাত্র পরবর্ত্তী কালে তাহাদের পুত্রদেরও ছাত্ররূপে শিক্ষা দিতে হয়; যেমন আজ যিনি পিতারূপে পুত্রের চরিত্র গঠন করিয়া দিতেছেন, পিতামহরূপে অনেক সময় তাঁহাকে পৌত্রের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতে হয়; সেইরূপ ধর্ম্মাচার্য্যকেও একপুরুষের পর আর এক পুরুষ, কখনও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষা দিতে এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করিতে হয়। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দিয়া, সঙ্কটে ও সংশয়ে চিত্তে বল-সঞ্চার করিয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত রাখিয়া, সকল অবস্থায় সকলের জন্য আপনার হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মাচার্য্য ও প্রকৃত গুরু বা পুরোহিত নামের যোগ্য হইয়া থাকেন।

খৃষ্টান প্রচারকদের মতে যাহারা অজ্ঞ, ধর্ম্মহীন, অথবা উপধর্ম্মে রত তাহাদের মুক্তির বার্ত্তা শুনাইবার জন্য উঁহারা কেবল অখৃষ্টান সভ্যজাতির মধ্যে নহে, অসভ্য বর্ব্বর দিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছেন, তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে প্রেম দিয়া তাহাদিগের চিত্ত জয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেক সময়ে এই সকল করিতে গিয়া নিজেরা প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। এখনও খৃষ্টান প্রচারকদের মধ্যে এইরূপ ত্যাগী, মানবপ্রেমিক লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইঁহাদের নিস্বার্থতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও মানবপ্রীতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণেরও চিন্তা করিবার, শ্রদ্ধা করিবার এবং অনুসরণ করিবার বিষয়।

এই প্রচার ব্যাপারের সঙ্গে অনেকে জিগীষা বৃত্তির চিহ্ন দর্শন করেন। কিন্তু সে জিগীষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার নামে চিত্তরাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা, ভূমিলাভেচ্ছা নহে। অন্ততঃ যে সকল ঋষিতুল্য লোক প্রথমে নানা বিঘ্ন বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নদী পর্ব্বত, সমুদ্র মহাসমুদ্র পার হইয়া, ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্নভাষী, অপরিচিত অনাত্মীয়দিগের মধ্যে, এমন কি অসভ্য ও নরমাংসাসীদের নিকটেও খৃষ্ট ধর্ম্মের সমাচার লইয়া গিয়াছেন, ভূমিলাভ বা বিজাতিজয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কালক্রমে অসভ্য জাতির সহিত সভ্য জাতির, দুর্ব্বলের সহিত সবলের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে এই জয় পরাজয় সংঘটিত হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, Go you into all the world and preach the gospel to all creatures— সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া সকল জীবের নিকট সুসমাচার প্রচার কর। এই উক্তি শিরোধার্য্য করিয়া উঁহারা জগতে সকল

লোককে আপনাদের ধর্ম্মের সুসমাচার শুনাইবার জন্য ছুটিয়াছেন। সুদূর যাত্রী কয়েক জন বিখ্যাত খৃষ্টীয় প্রচারকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে।

মোরেভিয়ানগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মিশনরীদের পথ প্রদর্শক। গত ১৭০ বৎসর কালের মধ্যে ইহারা নানা স্থানে ২৭০০ মিশনারী পাঠাইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ডেনিশ জাতীয় হ্যান্স এগিড বিশেষ বিখ্যাত। ইনি এসকুইমোদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে, নরওয়ের বার্জেন নামক স্থান হইতে জাহাজে চড়িয়া, উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং তুষারাবৃত গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানকার কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগকে বাইবেলের কথা শুনাইতে ও তাহাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে তাঁহাকে বহুকাল প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। বহু বৎসরের নিষ্ফল চেষ্টা কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ বা নিরস্ত করিতে পারে নাই। একবার যখন সেখানে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন তিনি নিজের বাড়ীটি হাসপাতালে পরিণত করিলেন এবং পরমযত্নে পীড়িতদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কারুণিক আচরণ দেখিয়া লোকগুলির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। তিনি অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, সরল বিশ্বাসে, অতি নম্রচিত্তে কাজ করিয়া যাইতেন, কোন আড়ম্বর তাঁহার মধ্যে ছিল না। যে সময়ে মিশনারীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং উত্তরমেরু প্রদেশে কেহই যাইতে সাহস করে নাই, সেই সময়ে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে দেশ ত্যাগ করেন, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃতার দেহ আত্মীয়গণের মধ্যে সমাধিস্থ করিবার জন্য দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ইহারই অল্পকাল পরে, ১৭৫৮ সনের ৭ই নবেম্বর, তাহারও জীবলীলা শেষ হয়। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি স্বেচ্ছায় সভ্য জগৎ হইতে আপনাকে এমন এক স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন যেখানে বহিঃ-প্রকৃতি তুষারাবৃত, দিবালোক বিরল ও মানব প্রকৃতি নিরানন্দ ও কুসংস্কারান্ধ।

ডেভিড ব্রেইনার্ড ছিলেন আমেরিকার ইয়েল কলেজের একজন ছাত্র। ১৭১৮ সনে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন, স্বাস্থ্যও ইহাঁর সবল ছিল না। উত্তর আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ আদিম নিবাসীদের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে ইনি কৃত-সংকল্প হন। পথ পর্য্যটনের ক্লেশ, অনাবৃত স্থানে নিদ্রা, অল্প আহার ইত্যাদিতে তাঁহার দুর্ব্বল দেহ দুর্ব্বলতর হইতে লাগিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষা শিখিতে বড়ই পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি ধৈর্য্য সহকারে তাহা শিখিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহার শিক্ষক ছিলেন তাঁহার বাড়ী যাইতে তাঁহাকে অন্ধকার বনের ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে ২০ মাইল যাইতে হইত। স্বজাতির মধ্যে ধর্ম্মযাজন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রস্তাব আসিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। রেড ইণ্ডিয়ানদের ভিতরে ইহাঁর কর্ম্ম বৃত্তান্ত এক অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী। কৃতকার্য্যতার আশ্বাস লেশমাত্র না পাইয়াও ইনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে আশার আলোক দেখা দিল। বনবাসী ইণ্ডিয়ানরা হাজারে হাজারে

তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

উইলিয়ম কেরীর নাম এদেশে সকলেই জানেন, না জানিলে জানা উচিত। ইনি ইংলণ্ডে নর্থহ্যাম্পটনের নিকট পলারস্পিউরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কেরাণীর কাজ করিতেন, একটা স্কুলের শিক্ষকতাও করিতেন, তাই পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। উইলিয়ামের যেমন পাঠে অনুরাগ ছিল তেমনি বাগান করিবার সখও ছিল। এদিকে জুতা মেরামতের কাজও করিতেন। যখন তিনি এই কাজ করিতেছিলেন ; তখন নিজের চেষ্টায় কিছু গ্রীক ও লাটিন শিখিয়া ফেলিলেন। তখন বৎসরে ১৬ পাউণ্ড বেতনে তিনি ব্যপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ের একজন পাদ্রি হইলেন। তাঁহার এই সামান্য বেতনে চলিত না বলিয়া তিনি জুতা প্রস্তুত ও মেরামতি কাজ করিয়া আরও কিছু উপার্জ্জন করিতেন।

১৭৯২ সনের জুন মাসে নটিংহাম সহরে ধর্ম্মাচার্য্যদের এক সম্মিলনে কেরী যে উপদেশ দিয়াছিলেন উহা আধুনিক মিশনারী ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা। ইহাই ব্যাপটিষ্ট-মিশনারী-সোসাইটী গঠনের মূল এবং এই প্রচারকসংঘই এই জাতীয় সংঘের সর্ব্ব প্রথম। তাঁহার উপদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমটির বচনীয় বিষয় ছিল। 'Expect great things from God'—ভগবানের নিকট হইতে মহৎ কর্ম্মের প্রত্যাশা কর। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল 'Attempt great things for God'—ভগবানের নামে মহৎ কর্ম্মসকল আরম্ভ কর। এই দুইটি বাক্য উক্ত সংঘের মটো বা মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল।

উইলিয়ম কেরী বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে—এই বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া, বাঙ্গালায় বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষর করিয়া মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। লোক শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান রচনা করিয়া ছিলেন। যাঁহাদের একান্ত চেষ্টায় সতীদাহ নিবারণ হয়, তাঁহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীও একজন ছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেইজন্য তাঁহারই জীবন একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইতেছে। এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা ছিল কিনা, হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় খৃষ্টধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট সে বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। খৃষ্টান মিশনরীদের পরধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা অনুদারতার কথাও উল্লেখ করিবনা। তাঁহারা ধর্ম্মার্থ যে ত্যাগস্বীকার ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, খৃষ্টের প্রীতির কামনায় দীন দরিদ্রদের যে সেবা ও উপকার করিয়াছেন, রোগ, শোক দারিদ্র্য ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে যে ভীত বা কাতর হন নাই, তাহাই আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য এবং শিক্ষা করিবার মত মহত্ব।

সেইদিনের (৩১শে মে ১৭৯২) উল্লিখিত বক্তৃতা এমন হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল, যে উপস্থিত

আচার্য্যগণ সেই স্থানে সেই ক্ষণেই সংকল্প করিলেন, যে পরবর্ত্তি সম্মিলনে একটি মিশনারী সোসাইটী বা প্রচারক সংঘ গঠনের জন্য কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবেন। তাহাই করা হইল।

সেই বৎসর ২রা অক্টোবর কেটারিং নামক স্থানে আবার সকলের সম্মিলন হইল। ভজনালয়ের উপাসনার পরে বার জন লোক কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের না ছিল এসম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন অভিজ্ঞতা, না ছিল অর্থ, না ছিল প্রতিপত্তি ও প্রভাব। কেবল ছিল তাঁহাদের উপাস্য দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম ও মহিমা প্রচার করিবার একান্ত আকাঙ্খা। পরস্পরের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশ্বর সমক্ষে ও পরস্পরের সমক্ষে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন যে, যেখানে যেখানে খৃষ্ট ধর্ম্মের বার্ত্তা পৌঁছে নাই এমন সকল স্থানে উহার প্রচারের জন্য প্রত্যেকেই আপনার সাধ্যানুসারে প্রচেষ্টা করিবেন। এইরূপে সেই প্রচারকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। Andrew Fuller (Secretary), John Ryland, John Sutcliffe, Reginald Hogg (treasuer), ও William Carey—এই পাঁচজনকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইল। সেইখানেই একটা চাঁদার ফর্দ্দ ধরা হইল, দেখা গেল ১৩ পাউণ্ড ২ সিলিং ৬ পেন্স উঠিয়াছে। এই ফর্দ্দে কেরী ছাড়া উপস্থিত আর সকলের স্বাক্ষর ছিল। অন্যদের স্বাক্ষর গৃহীত হইবার পরে কেরী উঠিয়া বলিলেন "আমি আমাকে দিলাম। এই সংঘ পৃথিবীর যে কোন অংশে আমাকে পাঠাইতে চাহেন, আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত।"

এই প্রচারসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া উহাদের সহৃদয় বন্ধুগণ স্বেচ্ছায় অর্থ দান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহর হইতেও কিছু কিছু টাকা আসিতে লাগিল। তাহা হইলেও জনকতক নগণ্য যুবকের উৎসাহে গঠিত এই সংঘের সহিত বড় সহরের, বিশেষ লণ্ডনের বড় ধর্ম্মযাজকগণ যোগ দেন নাই। ইহাদের মধ্যে নামে পদে বা খ্যাতিতে কেহই সম্ভ্রান্ত ছিলেন না, বরং তাহার বিপরীত। একজন ছিলেন ব্যবসায়ে পাদুকা নির্ম্মাতা বা মুচি। সম্ভ্রান্ত পাদ্রিরা যোগ দিয়া মান খোয়াইবার ভয়ে একটু তফাতে থাকিয়া ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে চাহিলেন। দেশের অনেক লোকই হিদেনদিগের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করে নাই। কিন্তু প্রচারসংঘের সহিত সহানুভূতি করিবার লোকও ছিলনা তাহা নহে।

কেটারিংএ যখন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জন টমাস্ নামক এক জাহাজের ডাক্তার ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ছিলেন। ইনি নটিংহাম শাখারের এই প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে পারিয়া কেরীকে চিঠি লিখিয়া বঙ্গদেশের—বিশেষ তিনি যেখানে একটু প্রচারের চেষ্টা করিয়া ছিলেন, সেই মালদার কথা জানাইলেন। ১৭৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে সংঘের সম্মতি ক্রমে কেরী টমাসের সহিত ভারতবর্ষে

আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহার ইচ্ছার সহিত সায় দিলেন না, বলিলেন, আমি স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়িব না। কেরী অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া পত্নী ও অপরাপর সন্তান দেশে রাখিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। এদিকে এই যাত্রার ব্যয় কুলাইবার মত অর্থ গচ্ছিত ছিলনা। কেরীর এই মত ছিল যে প্রচার যাত্রীরা কেবল পাথেয় এবং গন্তব্য স্থানে গিয়া স্থির হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা পর্য্যন্ত যাহা লাগে তাহাই লইবেন অতঃপর নিজেদের জীবিকা নিজেরাই উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু তখন জাহাজের খরচ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। যদি এই বৎসরের বসন্ত কালেই যাত্রা করিতে হয় তবে আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলেনা, তাই টমাস কে মিশনের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতে পাঠান হইল। তিনি ব্রিষ্টল পর্য্যন্ত গেলেন, কেরীও এই কাজে উত্তর দিকে চলিলেন। এই যাত্রার মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ড নামক এক প্রিণ্টারের (মুদ্রাকর) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে বলিলেন—"কিছুদিন পরে তোমাকে আমাদের চাই।" এই ওয়ার্ডই ভবিষ্যতে শ্রীরামপুরে কেরীর সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। মিশনের আর এক কর্ম্মী ফুলার লণ্ডন নগরে গিয়া বড় বড় চার্চ্চের সভ্যদের দ্বারে দ্বারে শ্রান্ত পদে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অনেকের কাছে অনাদর ও লাঞ্ছনা সহিয়া গোপনে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া অবশেষে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিলেন অর্থসমস্যার সমাধান হইলে লিষ্টার সহরে যাত্রীদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা হইল। সে দিনের নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য্য এবং বক্তাদের হৃদয়ের আবেগ ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

সমদর্শী

কৃত্রিম চিনি ও উহার প্রস্তুত প্রণালী।

চিনি আমরা সাধারণতঃ আখ ও বীট পালঙ এর (Beet root) রস হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নানা কৃত্রিম উপায়ে উহা প্রস্তুত করিতেছেন। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক চিনি কতকটা একই পদ্ধতিতে তৈয়ার হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের পরীক্ষাগারে উহার অনুসরণ করেন, তারপর সেই পদ্ধতি জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া সকলকে অবাক করিয়া দেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যাহা প্রাকৃতিক ব্যাপারের হুবহু অনুকরণ। আমরা এখানে চিনি প্রস্তুতের যে নূতন পদ্ধতির আলোচনা করিতে যাইতেছি উহাও গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুকরণ।

গাছপালারা যে ফুলে, ফলে, পত্রে, কাণ্ডে ও মূলে চিনি সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা আমরা জানি। ইক্ষু, বীটপালঙ, সূর্য্যমুখী ফুলের পাতা, গোল আলু, কাসাভা প্রভৃতির মূল ও খেজুর নারিকেল প্রভৃতি কোন কোন তালজাতীয় গাছের কাণ্ড ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেমন করিয়া গাছপালারা চিনি তৈয়ারী করে তাহা অতি কৌতুহলজনক। চিনির প্রধান উপাদান অঙ্গার, বাতাসে অঙ্গারঅম্লজানে (carbon dioxide) এই অঙ্গার বর্ত্তমান আছে। গাছের পত্রহরিৎ (Cholorophil) সূর্য্যালোকের সাহায্যে বাতাস হইতে অঙ্গার অম্লজান আহরণ করিয়া উহাকে চিনিতে পরিণত করে। অঙ্গারঅম্লজান কিন্তু একেবারেই চিনিতে পরিণত হয় না। পত্রহরিৎ প্রথমে এক অণু (Molecub) জলের সাহায্যে অঙ্গার অম্লজানকে অঙ্গার দ্রাবকে (Carbonic Acid) পরিণত করে। এই অঙ্গার দ্রাবক হইতে এক অণু (Molecule) অম্লজান পৃথক করিয়া লইলে উহা ফর্ম্মেল্ডেহাইড নামক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়। এই ফর্ম্মেল্ডহাইড স্বতঃই চিনিতে formaldehyde পরিণত হয়।

প্রকৃতির চিনি তৈয়ারীর এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা যে চিনির কথা আলোচনা করিতেছি তাহা এই ফর্ম্মেল্ডেহাইড হইতে এক অভিনব উপায়ে প্রস্তুত।

এই কৃত্রিম চিনি প্রস্তুতের আবিষ্কর্ত্তা ইংলণ্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আচার্য্য ই, সি, সি, বেলি (E. C. C. Baly)। বেলি সাহেব ১৫ ইঞ্চি চৌড়া ও ৮ইঞ্চি লম্বা একটি চৌবাচ্ছার জলে অঙ্গার দ্রাবকের বাষ্প (Carbonic Acid Gas) মিশাইয়া উহার উপর বিদ্যুতের আলো ফেলিয়া চিনি তৈয়ার করিয়াছিলেন। বিদ্যুতের আলো প্রথম এই অঙ্গার দ্রাবকের বাষ্পকে ভাঙ্গিয়া ফর্ম্মেল্ডেহাইডে ও তাহার পর ঐ ফর্ম্মেল্ডেহাইডকে চিনিতে পরিণত করিয়াছিল। বিদ্যুতের আলোর দ্বারা চিনি প্রস্তুতের এই নূতন পদ্ধতি গাছপালার চিনি প্রস্তুত প্রণালীরই অনুরূপ, তবে কিছু দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। এই প্রণালী বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, আশা করা যায় কালে ইহার কল্যানে চিনি জলের দরে বিকাইতে পারিবে।

শ্রী ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস্ সি।

বৈদেশিকী।

গাজী মুস্তফা কামাল পাশা ও লতিফা খাতুন

সাধারণতঃ আমরা লোকের কথায় ও কাজে এবং পূর্ব্বের সহিত পরের সামঞ্জস্য খুঁজি। যাঁহার কথায় ও কাজে এবং পূর্ব্বের সহিত পরের সামঞ্জস্য পাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র হন। অতি মন্দ লোকের ও কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকিলে আমরা তাহার প্রশংসা না করিয়া পারি না। পক্ষান্তরে যাহারা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন তাঁহাদিগের কাজের সমালোচনা আমরা সকল সময়ে করি না, যদিও সকল বিষয়েই উহাদিগকে আদর্শস্থানীয় দেখিবার একটা আশা ভিতরে ভিতরে পোষন করিয়া থাকি। গাজী মুস্তাফা কামালপাশা যে কেবল যুদ্ধ এবং রাজনীতি বিশারদ তাহাই নহে, তিনি স্বদেশ-প্রেমিক এবং সমাজ সংস্কারক। সুতরাং অন্য সকল প্রশ্ন বাদ দিয়া কেবল সামঞ্জস্যের দিক দিয়া দেখিলেও পর্দ্দাপ্রথার বিরোধী, স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারের পক্ষপাতী এবং প্রাচীন রীতিনীতি পোষাকপরিচ্ছদ, আচারব্যবহার প্রভৃতির স্থলে ইউরোপীয় রীতিনীতি, পোষাকপরিচ্ছদ, আচার ব্যবহারের প্রবর্ত্তন দ্বারা তুরস্কবাসীকে সকল বিষয়ে ইউরোপের অনুরূপ করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী কামালপাশা যখন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সকলেই অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া থাকিলেও উহার কাজের ঔচিত্যানৌচিত্যের প্রশ্ন কেহই তুলেন নাই, এমন কি তাহার পত্নীও ন।

কামালের সহিত লতিফা খানুমের বিবাহ যেমন রোমাণ্টিক, উহার বর্জ্জনও তেমনি আকস্মিক। পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য এই বিবাহ ও বিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

'লতিফা স্মার্ণার জনৈক ধনকুবেরের কন্যা। তিনি আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা ও ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষিতা হইয়াছেন। বিদ্যার্জ্জন উপলক্ষে তিনি তাঁহার শৈশবজীবনের অধিকাংশই লণ্ডন ও প্যারীতে অতিবাহিত করিয়াছেন। এইভাবে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার যতটা তাঁহার স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল, প্রাচ্যের রীতি-নীতি ততটা স্বভাবগত হইতে পারে নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে যে প্রাচ্য-মনোবৃত্তির সঙ্গে তিনি স্বীয় চিন্তা-ধারার সমন্বয়-সাধন করিতে পারেন নাই।

গ্রীকেরা যখন স্মার্ণা, অধিকার করে, লতিফা তখন স্মার্ণায়। গ্রীকসৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া যেদিন কামালপাশা বিজয়িবেশে স্মার্ণা প্রবেশ করিলেন, সেই দিন সমবেত

জনতার মধ্যে একটী তেজোদৃপ্ত তরুণ মুখ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই লতিফা খানুম। তারপর অল্পদিনের পরিচয়ে নিমজ্জমান তুর্কীতরণীর শক্তিশালী কর্ণধার, বিশ্ব-বিশ্রুত বীর কামালপাশা এই তরুণীর সৌন্দর্য্যের পদতলে বীরত্বের অস্ত্রত্যাগ করিয়া তাহারই প্রেম-কারাগারে বন্দী হইলেন। তিনি লতিফার নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। লতিফার পিতামাতা এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন; পরম সুখে তাঁহাদের কাল-কাটিতে লাগিল কিন্তু এই সুখের দিন স্থায়ী হইল না। লতিফা খানুম কামালের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফলে অল্পদিনেই তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর হইতে লাগিল এবং এই মতান্তর ক্রমে মনোমালিন্যে পর্য্যবসিত হইল। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক মতবাদে লতিফা তাঁহার স্বামী হইতে এতই বিরুদ্ধপন্থী যে কামাল স্ত্রীর প্রতি ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, তাঁহার ঔরসে লতিফার গর্ভে কোনও সন্তান হইলে সে সন্তানের দ্বারা তাঁহার যশোগৌরব কলঙ্কিত হইবে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন।' এই 'তালাক' লতিফা কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন পাঠক তাহাও দেখুন।*

"তালাকের পরে লতিফা আঙ্গোরা ত্যাগ করিয়া স্মার্ণায় পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে নির্জ্জন গৃহকোণে নিতান্ত সঙ্গীহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি সেই একই ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। উপবিষ্ট লতিফাকে দর্শন করিলে এ কথাই মনে হয় যেন তিনি অনুতাপ, অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে অনুদিন দগ্ধীভূত হইতেছেন। উদ্যানের নির্জ্জন প্রান্তে প্রায়ান্ধকার বৃক্ষচ্ছায়ায় নিতান্ত ব্যর্থজীবন হতভাগিনীর মত হস্তোপরি ললাট স্থাপন করতঃ বসিয়া থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি যে ভাবে উন্মাদিনীর মত উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠেন, তাহাতেই বুঝা যায় ঐ স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলার প্রাণে শোক-নৈরাশ্যের কি তুমুল ঝটিকা বহিয়া যাইতেছে। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিয়াছেন "আমি এই যুগের যোসেফাইন এবং আমার স্বামী নেপোলিয়ান। আমাকে দেশের ও জাতির উন্নতির পথের কণ্টক মনে করিয়া তিনি শুদ্ধমাত্র দেশের কল্যাণের জন্যই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের বেদীতে আমার সমস্ত সুখ-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি।"

---

* সম্মিলনী, ২১শে কার্ত্তিক।

মরক্কো ও স্পেন

মহাবীর গাজী আব্দুল করিম যেরূপ অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। ফ্রান্স অথবা স্পেন উহাকে যে আখ্যাই দিন না কেন, এই একনিষ্ঠ স্বদেশসেবী সকল নিরপেক্ষ নরনারীরই শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিবেন এবং সকলেই উহার অস্ত্রবলের সাফল্য কামনা করিবেন। যুদ্ধের সংবাদ যেরূপ বিকৃত হইয়া আমাদের নিকট আসে তাহা সত্ত্বেও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় ফরাসী ও স্পেনের এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা হইয়াছে, এবং কোন একটা অজুহাতে মানে মানে উহারা মরক্কো পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচেন। ফরাসী খুব দম্ভ করিয়াই মরক্কোয় লড়িতে গিয়াছিলেন; আব্দুল করিমকে পরাজয়ের উদ্দেশ্য ত উহাদের সফল হয়ই নাই, তাহা সত্ত্বেও যে উহারা —এখন সৈনিকের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে, বাকী কাজের ভার এখন রাজনীতিজ্ঞদের উপর—এই বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছেন, ইহার আর কোনই মানে থাকিতে পারে না। পাঁচ মাস পূর্ব্বে আব্দুল করিমের সৈন্যদল ফরাসীর ব্যূহ ভেদ করায় যখন ফ্রান্স ও স্পেন একযোগে মরক্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কথা হয়, তখন ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ মহলেও বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল এবং শোনা গিয়াছিল যে ফরাসী ও স্পেন মরক্কো অবরোধের যে কোন ব্যবস্থা করিবেন ইংরেজ তাহাতেই সায় দিবেন। এরকম শক্তিশালী যোগাযোগ সত্ত্বেও যে মরক্কো এ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভগবানকে ধন্যবাদ দিবেন এবং উহাদের সাফল্য কামনা করিবেন।

মরক্কোর অধিবাসিগণ এক সময়ে মূর নামে পরিচিত ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ জাতি যখন বর্ব্বর যুগ অতিক্রম করে নাই, তখন মূরেরা এক সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি ছিল। যে স্পেন এখন মরক্কো করতলগত করিবার চেষ্টায় আছে, সেই স্পেনও বহু শতাব্দী মরক্কোর অধীন দেশ মাত্র ছিল। স্পেনদেশে মরক্কোর অনেক কীর্ত্তির অবশেষ এখনও রহিয়াছে, এবং সভ্যতার জন্য স্পেন—শুধু স্পেন নয়, সমগ্র ইউরোপ মূর সভ্যতার নিকট বহুপরিমানে ঋণী। কর্ডোভা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে ইউরোপে বিখ্যাত ছিল, এবং দেশ দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানান্বেষণে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন। কালক্রমে অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে মূরেরা স্পেন হইতে বিতাড়িত হইল। মাঝে উহারা এমনই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিল যে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বেওয়ারিশ মালের মত উহাকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। "বর্ত্তমান অবস্থার সুত্রপাত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর মরক্কোর সুলতান আব্দুল আজিজ কতকগুলি স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যদল পুনর্গঠনের নিমিত্ত ফরাসীর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করেন। এই সূত্রে ফরাসী জাতি মরক্কো প্রবেশের একটা সূত্র পাইলেন। ইংরাজের ইহাতে ঈর্ষা জন্মিল। ইহার ফলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল লণ্ডন নগরীতে

ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিতে ফরাসীরা ইংরেজকে ইজিপ্টে কতগুলি সুবিধা দেওয়ায় ফরাসী ও মরক্কো সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজ নিরস্ত থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। মরক্কোর শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই এইরূপ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ফ্রান্স মরক্কোর শাসকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং শাসন ও সৈন্য সংক্রান্ত নানা প্রকার সংস্কারের নামে উহার সর্ব্বাঙ্গে বন্ধন রজ্জু জড়াইতে লাগিলেন। এদিকে একটি পৃথক বন্দোবস্তে স্পেনের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও হইল। তখন কোন শক্তিই ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু একবৎসর পরে জার্ম্মানী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন, এবং উহার পরামর্শে মরক্কোর সুলতান ফরাসীর সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং আবশ্যকীয় সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য সকল শক্তিকে আহ্বান করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফরাসীর আধিপত্য-স্পৃহা ও জার্ম্মানীর সকলের জন্য সমান অধিকার দাবী—এই দুয়ের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য এক বৈঠক বসিল। ইংরাজ ফরাসীর ও অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর সমর্থন করাতে প্রথমে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে জার্ম্মানী মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্তে ফরাসীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়ায় একটা রফা হইল এবং যথাকালে মরক্কোর সুলতান ও ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ উহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

ইহার পরে মরক্কোর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এখন কার্য্যতঃ ফরাসীরা মরক্কোয় সর্ব্বেসর্ব্বা। ইজিপ্টে নিজ নীতি প্রবর্ত্তনে ফরাসীর সমর্থন পাইবার জন্য মরক্কো সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ইংরাজ ফরাসীর সমর্থন করিতেছেন। সম্প্রতি ইজিপ্টে ইংরাজের অবস্থা যেরূপ সঙ্গীন মরক্কোয় ফরাসী, শুধু ফরাসী কেন, সকল ইউরোপীয় শক্তির অবস্থাই সেইরূপ সঙ্গীন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই রফা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদিও মূল স্বাক্ষরকারী সকল শক্তির পক্ষে উহা এখন সমান কার্য্যকরী নহে।" * পাঠক এখন বুঝিতে পারিতেছেন ফরাসীর পরাজয়ে ইংরাজের এত চাঞ্চল্য কেন দেখা গিয়াছিল।

এই চাঞ্চল্যের আর একটা গূঢ় কারণ আছে। পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ দীর্ঘকাল স্পেন ইরাক, ও সিরিয়া প্রায় নির্ব্বিবাদে অ-শ্বেত জাতি সমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রভুত্বের ভিত্তি অনেক পরিমাণে উহাদের অস্ত্রবল, সমরনীতি, রাজনীতি জ্ঞান, স্বজাতি-প্রীতি, অধ্যবসায় প্রভৃতি, আবার অনেক পরিমাণে উহাদের ইজ্জৎ। অ-শ্বেত জাতির চক্ষে উহাদের ইজ্জৎ যদি একবার নষ্ট হয় তাহা হইলে পরাজয়টা আপাততঃ ফরাসী বা স্পেনের হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজ বা ইটালীকেও উহা স্পর্শ করিবে। তা ছাড়া এই সূত্রে জগতের অ-শ্বেত জাতিসমূহের মধ্যে যে

---

* মুসলমান, ১৯,৬.২৫ ইং

নূতন জাগরণ এবং পরস্পর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, উহাও উহাদের চাঞ্চল্যের একটা অতিরিক্ত কারণ। আবদুল করিম লড়িতেছেন একা, কিন্তু উহার পশ্চাতে সমস্ত পরাধীন জাতির, বিশেষতঃ সমগ্র মুসলমান সমাজের সহানুভূতি রহিয়াছে। আর কামালের নেতৃত্বে বিজিত তুরস্কের শক্তিশালী জাতিতে পরিণতি, ইজিপ্টের স্বাধীনতা-প্রয়াস, মরক্কোর ফরাসী-স্পেনের নাগপাশ-ছেদন-চেষ্টা, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্তাইনে অনুষ্ঠিত ঘোরতর অন্যায়, চীনের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রভৃতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইহাদের একের উপর অপরের প্রভাব আছে, এবং প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা পরবর্ত্তী ঘটনাকে অধিকতর সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ইউরোপ-আমেরিকার বর্ত্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির সার্থকতা-বিরোধী এবং উহাদের ইজ্জতের প্রতিকূল, তাই যেখানে যেখানে উহাদের প্রভাব এখনও আছে নিজেদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য সেখানে উহারা কোন অন্যায় করিতেই কুণ্ঠিত হন না। এই জন্যই আমরা বিশ্বজনীন শান্তি লাভেচ্ছার সকল প্রকার হট্টগোলের মধ্যেও আমেরিকা ও ইংরাজ উপনিবেশ হইতে ভারতের বহিষ্কার, সাঙ্ঘাই সহরে নিরস্ত্র চীন জনসঙ্ঘের উপর সতর্ক না করিয়া গুলিবর্ষণ, মেসোপটেমিয়ায় কর আদায়ের জন্য আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ, ক্রমান্বয়ে ৫৭ ঘণ্টা শেলবর্ষণে একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীর ধ্বংসসাধন এবং বহুসংখ্যক নিরস্ত্র অধিবাসীর প্রাণনাশ,† স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত ইজিপ্ট ও ইরাকের আভ্যন্তরীন শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ ইত্যাদির কথা শুনিতে পাই। লোকহিত, অভিভাবকত্ব প্রভৃতির নামে যে সকল নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে, সকল প্রকার কাটছাঁট এড়াইয়া উহাদের যেটুকু আমাদের কাছে পৌঁছে, তাহাতেই আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। পক্ষান্তরে সুসভ্য, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সমরকুশলী ও সজ্ঘবন্ধনপটু ফরাসীর সহিত মুষ্টিমেয় সিরিয়াবাসী যেরূপ সাহস, দৃঢ়তা, ত্যাগ-স্বীকার ও অধ্যবসায়ের সহিত লড়িতেছে তাহাতেও আমরা বিস্ময়, গর্ব্ব, ও শ্রদ্ধায় অভিভূত না হইয়া পারিনা। ত্রিশ কোটী ভারতবাসী জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঁচশত ভারতবাসীর মৃত্যুতে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সিরিয়া আয়তন ও লোকসংখ্যায় ভারতের যে কোন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও স্বাধীনতা-চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যে পঁচিশ হাজার নাগরিক আহুতি দিয়াও নিরুদ্যম হয় নাই। ইতিমধ্যেই উহারা অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং অব্যবস্থিত সমরনীতির অনুসরণে ফরাসীর অভিভাবকত্ব হাস্যাস্পদ এবং নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছে। উহাদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা যদি অটুট থাকে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ফরাসীর অভিভাবকত্ব-স্পৃহা

† আরব্য উপন্যাসের খালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দামাস্কাস নগরী সম্প্রতি ফরাসীর গুলিবর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ২৫০০০ হাজার নিরস্ত্র নাগরিক এই ব্যাপারে নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ও একটী বহুমূল্য প্রাচীন পুস্তকালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে।

সংযত হইয়া আসিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। ‡

দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ও উহার প্রতিক্রিয়া দেখিয়া অনেক সময় আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়। মনে আশঙ্কা হয়, আমরা বুঝি চিরকালই সুদূর বর্ব্বর যুগেরই মত নিজেদের সামান্য সামান্য অধিকারের জন্য পরস্পর কথায় কথায় মরামারি কাটাকাটি করিয়া মরিব, স্বজাতির সুবিধার জন্য অপর জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে থাকিব, এবং ধন ও প্রাধান্য লাভের জন্য স্বার্থ-দেবতার, নিকট নরবলি দিতে থাকিব। কিন্তু বাহিরের সকল সঙ্ঘর্ষের মধ্যেও, থাকিয়া থাকিয়া, আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জগতের জ্ঞানপিপাসুদিগের সাময়িক সম্মেলন ও ভাবের আদান প্রদান, সমগ্র জগতের শূদ্রজাতির অভ্যুত্থান ও উহাদের মধ্যে জাতি-নিরপেক্ষ ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নানাপ্রকার আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ—এই সকলের ভিতর দিয়া সমগ্র জগৎ ধীরে ধীরে এক বিশ্বজনীন আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভিতরের এই পরিবর্ত্তনের পরিচয় বাহিরের কাজেও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার পরিচয় আমরা পাই ভারত ও ইজিপ্টের স্বাধীনতা লাভেচ্ছায় সহিত ইংরেজ শ্রমজীবি সঙ্ঘের এবং লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত মরক্কো ও সিরিয়াবাসীর সহিত ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীর সহানুভূতিতে। সকল দেশেই এমন একটা দল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নিজেদের অধীনস্থ স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, এবং এই দলের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতিসঙ্ঘ কিছুদিন পূর্ব্বেও কার্য্যতঃ ইংরেজ-ফরাসী-ইতালির স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রমাত্র ছিল, কালের প্রভাবে উহাও উত্তরোত্তর ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

আশার কথা

জাতিসংঘ—গ্রীক বুলগেরিয়া বিরোধ—লোকার্ণো সন্ধি—

সর্ব্বজাতিসংঘের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিসম্বাদ আপোষে মীমাংসা হইতে পারে ও এক জাতি যাহাতে অন্য জাতির স্বাধীনতা অন্যায়রূপে হরণ করিতে না পারে তাহার জন্য। এই উদ্দেশ্যের পূর্ণ-সিদ্ধির পথ বহুদূর, তবে সূচনা কিছু কিছু এখনই দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি গ্রীক-বুলগেরিয়া সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ বাঁধিয়াছিল, সর্ব্ব জাতিসংঘ উহার আপোষ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন আগেও ইহা সম্ভবপর হইত না। দুই প্রবল শক্তির বিবাদের, বিশেষতঃ শ্বেত জাতির সহিত অ-শ্বেত জাতির বিবাদে উহারা যে বিশেষ কিছু করিতে

---

‡ এই মন্তব্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের পর সংবাদ আসিয়াছে ফরাসীর প্রতিনিধি সিরিয়ার স্বাধীনতা সমরের নেতার নিকট সন্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। যে ফরাসী জাতি একদিন জগৎকে মুক্তির বার্ত্তা শুনাইয়াছিল সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই স্বাধীনতাকামী জাতির অভীষ্ট লাভের পথ মুক্ত করিয়া দেয় তাহাতে উহার ইজ্জৎ বাড়িবে বই কমিবে না। দামাস্কাসের যে সকল নিরীহ অধিবাসী হতাহত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে উহাদের ক্ষতিপূরণ করাও ফ্রান্সের কর্ত্তব্য, সিরিয়ার যখন ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার ক্ষমতা নাই, আর জাতিসংঘেও যখন এক্ষেত্রে নিরুপায় তখন এরকম একটা কিছু যে ঘটিবে তাহা সম্ভাবনার অতীত।

পারিবেন, সে সম্ভাবনা এখনও খুব বেশী নয়, তবে সম্প্রতি লোকার্ণোয় ইংরেজ-ফরাসী-ইতালী-বেলজিয়াম-জার্ম্মানীতে যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে তাহাতে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সন্ধিবদ্ধ শক্তিপুঞ্জ আত্মরক্ষার্থ সনাতন ব্যবস্থার অনুসরণে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত না হইয়া, একযোগে কতকগুলি সর্ত্ত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন। যে কোন শক্তি এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে অপর সকল শক্তি উহার বিরুদ্ধে যাইবেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা হইয়াছে কেবল পাঁচটী শক্তির মধ্যে, কালক্রমে এমন একটা সাধারণ ব্যবস্থা হইতে পারে, যাহাতে অতি প্রবল শক্তিও ক্ষুদ্রতম দেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইবে না। তবে সে ব্যবস্থা এখনও বহুদূর। ইজিপ্ট, ভারত, সিরিয়া অথবা চীনের ব্যাপারে যে সর্ব্বজাতিসংঘ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন তাহা এখনও সম্ভবপর নয়। কারণ এই জাতিসংঘ এখনও ফরাসী,ইংরেজ ও ইটালির ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। ন্যায়ের কাছে এই জাতিত্রয়ের মুখাপেক্ষা না করিবার মত স্বাধীনতা যদি উহার থাকে, সিরিয়ার ব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীঅর্ব্বাচীন

প্রাপ্তি স্বীকার

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রথম **চারি** অধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র বেদান্ত-রত্ন, বি. টি, কর্ত্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্যঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত, দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার **শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ** কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

এক শত বৎসরের অধিক হইয়াছে, যুগ প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় বেদান্ত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মূল বেদান্ত-সূত্র বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮১৬ সালে উহা সংক্ষিপ্ত আকারে কেবল বাঙ্গলায় নহে উর্দ্দু ও ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সমগ্র বেদান্ত দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিচার বিতর্কের অবসরে, তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য উপনিষদ্ গুলির মধ্যে ১৮১৬।১৭ সনে কেবল কেন

ঈশ, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশে শাস্ত্র-চর্চ্চা হইতে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের দিকেই লোকের অধিক মনোযোগ ছিল। কালক্রমে রাজর্ষির আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজ আমরা ভারতের প্রাচীন দর্শন আমাদের পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিতে শিখিয়াছি।

ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে অনেকেই এখন আগ্রহান্বিত। কিন্তু বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পঠনের দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় দশখানি উপনিষদের সহজ সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালীদের জন্য বঙ্গানুবাদ সহ, এবং যাঁহারা বাঙ্গলা জানেন না কিন্তু ইংরাজী জানেন, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকে ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রচার করিয়া, প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ও গ্রন্থকার। আধুনিক গবেষণা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া, ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের আলোকে তিনি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবিদ্যাকে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে দেখিয়া, অপরকে দেখাইবার জন্য বহুবৎসর ধরিয়া যত্ন করিতেছেন। তাঁহার লিখিত "**বেদান্ত ও আধুনিক চিন্তার সহিত তৎসম্বন্ধ**", "**উপনিষদে ব্রহ্মবাদ**" ইত্যাদি ইংরাজী গ্রন্থ তাঁহার এই মহৎ ব্রতের নিদর্শন। বেদান্তরত্নোপাধিক শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ বি. এ, বি. টি মহাশয়ও বহুকাল স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অধ্যয়নের ফল বঙ্গের মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়া আমরা আস্বাদন করিয়া লাভবান্ হইতেছি। তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য সম্বলিত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্দ্বয় প্রচলিত হইয়া তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের আরব্ধকর্ম্ম পূর্ণতর করিবে।

কেবল শাব্দিক ব্যাখ্যাই মূলের অর্থোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে। ব্যাখ্যাকারের, অধ্যয়ন ও চিন্তালব্ধ জ্ঞানালোক-পাতও আবশ্যক। প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র বাঙ্গলা অর্থ, সমগ্রের তাৎপর্য্য, ব্যাকরণ-ঘটিত টীকা ও মন্তব্যগুলি এই পুস্তক খানিকে সাধারণের পক্ষে সহজ বোধ্য ও উপভোগ্য করিয়াছে।

বেদান্তের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ অথবা শিরোভাগ। উপনিষদ্ বেদের শেষ দিকে স্থিত, সেই জন্য কিম্বা যে ছয়টি হিন্দু দর্শন আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ বলিয়া উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য দর্শনকে বেদান্ত দর্শন বলা হয়।

"বেদের দুই ভাগ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ছন্দ অর্থাৎ বেদগান করেন তাঁহাদের নাম ছন্দোগ। ছন্দোগদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে ছান্দোগ্য বলা হয়। সাধারণভাবে সামবেদের সমুদয় শাখার নামই ছান্দোগ্য হইতে পারে, কিন্তু এই শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দশটি অধ্যায় আছে শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম

ছান্দোগ্য উপনিষৎ। * * ছান্দোগ্যের এই প্রথমার্দ্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে সে গুলি বেদান্ত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং পরমার্থতত্ত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়।" জবালার পুত্র সত্যকামের আখ্যায়িকা ইহাতেই আছে।—"দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ তিনটি অধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক আরুণির 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিবৃতি, সপ্তমাধ্যায়ে সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং অষ্টমাধ্যায়ে ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে প্রজাপতির আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা। এই তিনটিই বেদান্ত সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।"

উদ্ধৃতাংশ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মুখবন্ধ হইতে। তিনি একটী দীর্ঘ ভূমিকায় উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি বিশদ ভাষায় প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই গ্রন্থ জ্ঞানানুরাগী পাঠকবর্গের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

উত্তরা। সচিত্র মাসিক পত্রিকা. লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত এবং প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনী কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন বার-য়্যাট-ল এবং ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. আর. এস, পি এইচ. ডি। সহঃ সম্পাদক শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমরা এই নূতন মাসিক পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যা পাইয়া ও পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বাস করিলেও এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জানিলেও, তাহার বাঙ্গালীত্বরূপ বৈশিষ্ট্য সে ভুলিতে পারে না, ভোলা কর্ত্তব্য ও নহে। বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালার প্রতি তাহার বিশিষ্ট মমতা, বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য তাহার সাধনার বস্তু, যত নূতন ভাষাই তাহার আয়ত্তীকৃত হউক না কেন, যত দূরান্তরেই সে বাস বা বিচরণ করুক না কেন। বাঙ্গালার মাটী জল বাতাসে গঠিত তাহার জীবন, বাঙ্গালার ভাষায় তাহার প্রথম বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাই এই ভূমি আর এই ভাষা তাহার একান্ত আপন। এদেশের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, তীক্ষ্ণ মেধা, বিদ্রোহপ্রবণ চিন্তাশক্তি, ভাবপ্রবণ সাহিত্য, এসকলের সে কেবল উত্তরাধিকারীই নহে, সে ইহাদের ন্যাসরক্ষকও বটে। তাই বাঙ্গালার বাহিরে বাস করিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীরা আপনাদের সাহিত্য-সাধনার দ্বারা বঙ্গের ভাষা, বঙ্গের চিন্তাধারা বঙ্গের শিল্প চর্চ্চা, বঙ্গের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করিয়া এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া চলিতে চাহে। জীবনসংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মরক্ষার জন্য, সামাজিক আদান-প্রদানের আনন্দের জন্য, সাহিত্য সম্মিলনের ভিতর দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা ও আত্মীয়তা চাহে। আর চাহে, প্রবাসের সঙ্গে নিবাসের, পূর্ব্বের সহিত উত্তরের, পশ্চিমের, এবং সকল দিকের নূতন ঐক্যানুভূতি; চাহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশান্তচিত্তে চারি দিক চাহিয়া আপনাদের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি দৈন্য জড়াইয়া আছে তাহার স্বীকার ও সংস্কার। প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলন সাহিত্যক্ষেত্রে মিলনের জন্য আহূত হইয়া, সাহিত্যের পথে এই মহত্তর প্রচেষ্টার

দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা সম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ আমাদের নব সহযোগিনী উত্তরার দীর্ঘজীবন ও সাফল্য প্রার্থনা করি। আশ্বিন মাসের সংখ্যার আরম্ভেই কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "আশীর্ব্বাদ" কবিতা। সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণ ও প্রবন্ধ দ্বারাই এই সংখ্যার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে। সে গুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। শ্রীযুক্ত রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রবন্ধ ও সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর অভিভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্ত্তিক সংখ্যার 'কৃষকের স্বরাজ' তথ্যপূর্ণ। অন্যান্য সুলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে 'প্রবাসী বাঙ্গালী'তে বাঙ্গালীর প্রবাস জীবনের সমস্যা স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে।

বিবিধ চিন্তা

তরুণ জীবন

১

আনন্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। বিশ্বকে সুন্দর করিয়া বিধাতা তাঁহার আনন্দরূপ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ও সৌন্দর্য্য দেখিব, সম্ভোগ করিব, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিব; আনন্দ পাইব, আনন্দ বিতরণ করিব। আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া জরাজীর্ণের মত, নিষ্প্রভ নির্জ্জীবের মত কেন থাকিব? পরিবার সমাজ এবং দেশকে কেন নিরানন্দ শ্মশানে পরিণত করিব? সৌন্দর্য্যের সহিত পবিত্রতার বিরোধ নাই; আনন্দ পুণ্যের শত্রু নহে, সহচর।

২

তোমরা পাপের পঙ্কে ডুবিতেছ, এই বলিয়া তরুণবয়স্কদের ভয় দেখাইলে চলিবেনা। তাহাদের সম্বন্ধে নিরাশ হইলে চলিবেনা। ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া আশাপূর্ণ অন্তরে তাহাদের মঙ্গলকামনা করিতে হইবে। সকল বিষয়ে লঘুতা ও সংশয়বাদ আজ-কালকার একটা সাময়িক ব্যাপার, একটা phase, একটা ফ্যাসান। এটা চলিয়া যাইবে। কেবল একটু ধৈর্য্যের আবশ্যক। অসহিষ্ণু হইয়া, অপ্রিয়কে অপ্রিয়তর, অসুন্দরকে অতীব কদর্য্য বলিয়া নিজের কাছে প্রমাণ করিওনা। যে শিশু সে ধূলা বালু গায়ে মাখিয়া আনন্দ পায়। বালক নীতিগর্ভ উপাখ্যান হইতে হাসির গল্প গান ভালবাসে। বৃদ্ধ যাহাতে আনন্দ লাভ করে, যুবক তাহাতে আনন্দ না পাইলে বিস্ময়ের বা ভীতির কারণ নাই। ধর্ম্মশিক্ষার নামে কোন চেষ্টা অস্বাভাবিক উপায়ে না করাই শ্রেয়ঃ। শান্ত হও, নিরাশ হইও না। কেবল তুমি একলা নহ, আরও শিক্ষক, অভিভাবক, শুভদাতা কেহ আছেন! তাঁহার উপর নির্ভর কর।

ক্রমশঃ

নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] কার্ত্তিক ১৩৩২ [৭ম সংখ্যা

কল বনাম চরকা *

'ভারতীয় বস্ত্রশিল্প' নামক মাসিক পত্রিকায় বর্ত্তমান অবস্থায় একটী নূতন সূতার কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে তাহার একটী হিসাব দেওয়া হইয়াছে। চরকা প্রচারে যাহাদের অনুরাগ আছে তাহাদের সকলেরই উহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধলেখকের মতে ২০,০০০ টেকো চলে এমন একটা কল প্রতিষ্ঠা করিতে ২০,০০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। এই টাকা বিভিন্ন হিসাবে নিম্নলিখিত রূপে খরচ হইবে:—

১। ইঞ্জিন এবং তুলার গাঁট খোলা হইতে আরম্ভ করিয়া সূতা গাঁটবন্দী করা পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপযোগী কলকব্জা—		৮,৩৯,৯২৫৲
২। জাহাজ ভাড়া, শুল্ক, বীমা, এবং স্থলপথে বহনাবহন ব্যয়, আনুমানিক ১০৲ ০/০ হিঃ		৮৩,৯৯২৲
৩। জায়গা খরিদ, বাড়ী তৈরি, রেলওয়ে সাইডিং ইত্যাদি—		২,২৫,০০০৲
৪। তুলা, কয়লা ও অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত রাখার দরুণ		৫,০০,০০০৲
৫। কলকব্জা বসাইবার খরচ—		১২,৩০০৲
৬। মাসিক পরিচালন ব্যয়—		
(ক) মজুরী—	১২,০০০৲	
(খ) তত্ত্বাবধারণ—	৩,০০০৲	
(গ) আফিস খরচ—	২,০০০৲	
(ঘ) বিবিধ সরঞ্জাম মেরামতি ইত্যাদি—	১০,০০০৲	
(ঙ) কয়লা—	৭,৫০০৲	
	৩৪,৫০০৲	
		১৬,৭০,২১৭৲

* নবজীবনে শ্রীযুক্ত ছগনলাল গান্ধী লিখিত একটী হিন্দি প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ হইতে

জের— ১৬,৬০,৯১৭৲

মাসিক ব্যয় জের— ৩৪,৫০০৲

(চ) তেল— ৩,৫০০৲

(ছ) ট্যাক্স ইত্যাদি— ৫০০৲

(জ) ৮ ব্যবহারজনিত মূল্য হ্রাস, কলকব্জার মূল্য ১৯,২৩,৯১৭৲ টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ৫৲ হিঃ— ৩,৮৫০৲

(ঝ) ৮ ঐ জমী ও বাড়ীর মূল্য ২,২৫,০০০৲ টাকায় বার্ষিক ২॥০ ০/০ শতকরা হিঃ— ৪৭০৲

(ঞ) বাড়ী, কলকব্জা, ও মজুত কার্পাসের মূল্য ১৬,৭০,২০০৲ টাকার বীমা খরচ, বাৎসরিক শতকরা ৷০ হিঃ— ১০৪০৲

মাসিক ব্যয়, মোট— ৪৩,৮৬০

৬ মাসের পরিচালন ব্যয়— ২৬৩,১৬০৲

১৯,২৪,০৭৭৲

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে গড়পড়তা মাসিক মজুরী ১২০০০৲ টাকা মাত্র। ২০,০০০৲ টেকো আছে এমন একটী কল চালাইতে সকল বিভাগে ৬০০ মজুর খাটিবে, সুতরাং গড়ে প্রত্যেক মজুর মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাইবে। আহমেদাবাদে এক একজন কাটুনি ২২৲ হইতে ২৫৲ টাকা রোজগার করে। বালক ও স্ত্রীলোকেরা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা পায়। সুতরাং গড়পড়তা ২০৲ নেহাত বেহিসাবী হইবে না।

এইরূপ কলের প্রতি টেকোয় দিনে ৶১। ছটাক ২০ নম্বরে সূতা হইবে, সুতরাং বৎসরে (৶১। × ৩৬০ × ২০,০০০) ২,৩৪,০০,০০০ ছটাক বা ১৪,৬২,৫০০ সের (৩৬,৫৬২, মন) সূতা হইবে। লাভ লোকসানের হিসাবে দেখিতে পাই :—

প্রতি সের সূতা তৈরি খরচ— ।/৮ পাই

মিশাইবার খরচ, প্রতি সের— ১।০

লোকসানি শতকরা ১৫ ভাগ— ৶০

খরচ, মোট— ১৵৮ পা

প্রতি সেরে লাভ— ৶৪ পা

বিক্রয় মূল্য— ২৲ সের

লাভের টাকা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টিত হইবে দেখিতে পাই :—

১। ৬০০ শত মজুর গড়ে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে— ১২,০০০৲

২। এজেন্টের মাসিক কমিশন ২৫৩৯৲ টাকা ২,৫৩৯৲

৩। অংশীদারদের ডিভিডেণ্ট ২০,০০০ হাজার ১০০৲ টাকার অংশে বার্ষিক শতকরা ১৩'৭৲ টাকা হিসাবে মাসিক— ২২,৮৫১৲

উপরের হিসাবে মাসের ৩০ দিনেই কল চলিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ফ্যাক্টারী আইন অনুযায়ী ছুটী, ধর্ম্মঘট, অতিরিক্ত উৎপাদন, কল মেরামত ইত্যাদির দরুণ উৎপাদন আরও কম হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মজুর যেখানে ১৲ টাকা পায় অংশীদার ও এজেণ্ট সেখানে পান ১৷৵০ এবং আপিস খরচ, কর, তেল ও কয়লা, এবং বিদেশ হইতে যে সকল সরঞ্জাম আমদানী করিতে হয় তাহার জন্য খরচ পড়ে ২৷৷৵১০ আনা।

এবারে দেখা যাউক এই ২০,০০,০০০৲ টাকা চরকা প্রচলনে নিয়োজিত করিলে কি করা যাইতে পারে। কল প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই ২০,০০,০০০৲ টাকার সমস্তটা হাতে না আসা পর্য্যন্ত কিছুই করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাহা আছে তাই লইয়া আমরা কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারি। ২০,০০০ হাজার কলে টেকো বসাইতে ২০,০০,০০০৲ টাকা খরচ হইবে অর্থাৎ টেকো প্রতি ১০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। এই ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া আমরা দিনে ১৬৷০ তোলা ২০ নম্বরের সূতা পাইতেছি। এই টাকা যদি চরকায় খরচ করা যায়, তবে আশ্রমের ১৪টী, বিহারের ২০টী, ও খাদি প্রতিষ্ঠানের ২৫টী চরকা পাওয়া যাইতে পারে। মান্দ্রাজ, বর্ম্মা অথবা অন্যান্য যেখানে কাঠ ও মজুরী শস্তা সেখানে এই খরচে আরও বেশী চরকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং ১৬,০০,০০০, টাকায় ১,৫৬,০০০ চরকা খুবই পাওয়া যাইবে। বাকী ৪,০০,০০০৲ টাকার মধ্যে প্রতি ১০০শত চরকায় ৪০৲টাকা হিসাবে তত্ত্বাবধারণ ব্যয় ১,১২,৪০০৲ টাকা রাখিয়া বাকি ৩,০০,০০০৲টাকা দিয়া তুলা কিনিয়া রাখা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলে যে তুলায় ২০ নম্বরের বেসি সূতা হয়না চরকায় সেই তুলায়ই ৩০ নম্বরের সূতা অনায়াসে তৈয়ার হয়, সুতরাং চরকায় কল অপেক্ষা শস্তা দরের তুলা ব্যবহারেও অনেক টাকা বাঁচিবে। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণকে নিজ নিজ গৃহের প্রাঙ্গনে কার্পাস বসাইতে প্রয়োজিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে কাঁচামালের খরচও অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে।

সূতা কাটা শেখা অতি সহজ। ইচ্ছা থাকিলে অল্প সময়েই বেস্ হাত আসিয়া যায়। এক কাঁচ্চা সূতা কাটিতে এক হইতে দুই ঘণ্টার বেসি সময় লাগেনা। প্রতিপরিবার যদি ২০ নম্বরের সূতা দৈনিক এক কাঁচ্চা করিয়া কাটেন তাহা হইলে বৎসরে ৩২০ দিন কাজ করিলে প্রতি পরিবারে ৵৫সের সূতা হইবে। কলের মত নানাবিধ কর, কমিশন, গাঁট বাঁধিবার খরচ, রাহা খরচ, ভাড়া, মধ্যবর্ত্তী লোকের লাভ প্রভৃতি একেবারেই থাকিবে না। চরকা যখন অবসর থাকিবে তখন প্রতিবেশী অথবা বাড়ীর

অন্যান্য লোকেরা উহা ব্যবহার করিলে যে অতিরিক্ত সুতা পাওয়া যাইতে পারে তাহার কথা বাদ দিলেও ১,৫৬,০০০ চরকায় বৎসরে ১৫,৬০,০০০ পাউণ্ড সুতা অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এইরূপে সুতা কাটিবার দিকে একটা ঝোঁকের সৃষ্টি হইয়া যদি টেকোয় সুতাকাটা জনপ্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে উৎপন্ন সুতার পরিমান আরও অধিক হইবে। মিলের বেলা দেখিতে পাই বৎসরে ৩৬০দিন পূর্ণমাত্রায় কাজ করিলে ঠিক এই খরচে মিল হইতে মাত্র ২৯,২৫,০০০ পাউণ্ড সুতা পাওয়া যাইতে পারে।

প্রতি ইঞ্চিতে ৪২টী সুতা দিলে ২০ নম্বরের ১০ পাউণ্ড সুতায় ৩৬ ইঞ্চ বহরের ৫৬ গজ বা ৩০ ইঞ্চ বহরের ৩৬ গজ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। বুনন পাতলা হইলে লম্বায় আরও বেসি কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। সুতা মোটা হইলে দৈর্ঘ্য একটু কম হইবে। মিতব্যয়ী এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র পরিবারে এই পরিমাণ কাপড়ই বৎসরের কাপড় যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। চরকা তৈয়ারের জন্য আবশ্যকীয় শ্রম ও কাঠের খরচ দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে ? কিন্তু কলপ্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক ব্যয় নয় দশ লক্ষ টাকা একেবারেই দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। কেবল ইহাই নহে। কল মেরামত রাখিতে প্রতিবৎসর যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইবে তার ও অধিকাংশই বিদেশে যাইবে। কেবল একটা কলেই ৯০,০০০৲টাকার কয়লা ও ২৪,০০০৲টাকার তেল ব্যবহৃত হয়, এবং এই সকল সরবরাহ, করিতে যে শ্রমের দরকার হয় তাহার কথাও ভাবিয়া দেখুন। তারপর অনেক দেশী কলকে দীর্ঘতন্তু কার্পাসের জন্য আমেরিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। চরকা ব্যবহারে এই সকল অসুবিধা আদৌ নাই। কলঘর নির্ম্মাণের ব্যয় ২৫,০০০৲ টাকাও ইহাতে বাঁচিয়া যায়। কলের বেলা যে ৩,০০,০০০৲টাকা এজেণ্ট এবং অংশীদারের পকেট ভর্ত্তি করিতে যাইবে চরকায় তার সমস্তটাই সহস্র সহস্র দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

কলে এমন অনেক কার্য্যগত অসুবিধা আছে যাহা ভাবিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। শ্রম-ঘটিত-বিবাদ-জনিত ধর্ম্মঘট ও কাজবন্ধ এবং উহার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ শ্রমিকবৃন্দের দুর্দ্দশার একশেষ, দুর্ঘটনা ঘটিয়া শ্রমিকের প্রাণনাশ, বিনিময়ের পরিবর্ত্তন-শীলতা-ঘটিত লোকসান, মূলধন ও শ্রমিকের সংঘর্ষ, কার্য্যাভাব, মূল্যের অসাধারণ-পরিবর্ত্তন-জনিত ফট্‌কাবাজী দ্বারা শত শত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সর্ব্বনাশ, জটিল-বাণিজ্য-সম্পর্ক-জনিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী মোকদ্দমা, তৈরী ও কাঁচামাল প্রভূত পরিমাণে গুদামজাত করিবার ফলে চুরি ও উহার কিনারা করিবার জন্য নিরর্থক টাকার শ্রাদ্ধ—Industrialismএর সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় এগুলি তাহার কয়েকটী মাত্র। গৃহ শিল্পের প্রসার আমাদিগকে এই সকল সমস্যা হইতে রক্ষা করিবে।

কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমশিল্প কেন্দ্রীকরণের যে প্রয়োজন উপস্থিত হয় উহা হইতেই বড় বড় সহরে লোকাধিক্যের সূত্রপাত হয়। যে সকল শ্রমিক অধিক পারিশ্রমিকের লোভে বা অন্য প্রলোভনে পড়িয়া বাড়ীঘর ক্ষেতখামার ছাড়িয়া কলে কাজ করিতে আসে উহাদিগকে চরম অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কাজ করিতে হয়, স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় ক্রন্দনশীল শিশু সন্তানকে বাড়ী ফেলিয়া যাইতে অথবা অস্বাস্থ্যকর কল ঘরে লইয়া যাইতে হয়। কলের শ্রমিকদিগের মধ্যে পান ও অন্যবিধ দোষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে এবং উহাদিগের নিকট হইতে গুরুতর করভার আদায় করিয়া লয়। এইসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ঘরে ঘরে চরকা প্রতিষ্ঠা।

যে শিল্প স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করিয়াছি চরকার প্রচলন দ্বারা আমরা উহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিব। ইহার প্রচলনে বহু পরিবারকে আর্থিক দুরবস্থাজনিত বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবে, এবং এই অভিশপ্ত দেশের প্রাণান্ত-পরিশ্রমকারী কোটী কোটী দরিদ্রের পক্ষে সুখশান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্যজীবন সহজলভ্য করিয়া তুলিবে।

ছগনলাল কে

চয়ন

মৌলানা শৌকত আলি নিখিল-ভারত কাটুনীসমিতির কার্য্যকরী সভায় স্থান লাভের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। খদ্দরে তাঁহার বিশ্বাস তিনি কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। এতদিনও তিনি অল্পাধিক নিয়মিত ভাবে সূতা কাটিয়া আসিয়াছেন, এখন হইতে তিনি কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সহিত সূতা কাটিবেন। তিনি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ৩০০০ সহস্র খাঁটি 'এ' শ্রেণীর সভ্য সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি মৌলানা সাহেবকে বলিয়াছি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ৩০০০ সহস্র প্রকৃত 'এ' শ্রেণীর সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে উহাতে আমি পূর্ণ-সন্তোষ লাভ করিব কিন্তু আমি একথাও তাঁহাকে বলিয়াছি যে অভ্যস্ত কাটুনী না হইয়াও যাহারা নিয়মিত সূতা কাটিবে এবং মাসের পর মাস নিয়মিতভাবে সূতা পাঠাইবে এইরূপ ৩০০০ সহস্র সভ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। এখন সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের খাতায়

বিরাটকায় ভ্রাতার প্রতিশ্রুতি

স্ত্রী পুরুষ মিলাইয়া এমন ৩০০০ হাজার সভ্য নাই যাহারা মাসিক দেয় ২০০০ গজ আজ পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়াছেন। এই পরিণাম শোচনীয়, কিন্তু যথার্থ। পরিমাণ অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়ায় পরিবর্ত্তন অবশ্যই আসিবে, কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায় উৎসাহের আবেগে লোকে স্বেচ্ছায় অনেক কিছু করিতে পারে, কিন্তু দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস ধৈর্য্য সহকৃত নিয়মনিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইবার ক্ষমতা বহু লোকের থাকেনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতির মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া উহা পরিপূরণ করাকে যাহারা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন এইরূপ লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা খুব অগ্রসর হইতে পারিবনা। অতএব আমি মৌলানা সাহেবের সঙ্কল্পের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। (মোঃ কঃ গান্ধী ৮।১০।২৫ ইং)

হিন্দুর একচেটিয়া ?

একজন মুসলমান বন্ধু মৌলানা সাহেবকে বলিয়াছিলেন খাদি বোর্ডের মত কাটুনী সমিতির কাজও হিন্দুর একচেটিয়া হইবে। মৌলানা সাহেব জানিতেন শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কার অনেক চেষ্টা করিয়াও মুসলমান কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এই যে খদ্দরের কাজের জন্য কোথাও মুসলমান কর্ম্মী পাওয়া যায় না। খাদি প্রতিষ্ঠানের কয়েক জন কর্ম্মী আছেন, অভয় আশ্রমেও ২।১ জন আছেন। আসল কথা এই যে খাদির কাজ এখনও লোকপ্রিয় হয় নাই। এ কাজে টাকা নাই। আমি যেসকল হিসাব পাইয়াছি তাহাকে দেখিতে পাই সর্ব্বোচ্চ মাসিক বেতন ১৫০৲ টাকা দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ খদ্দরকর্ম্মীগণ সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাসবক। কাজের সর্ত্তও কাজেকাজেই কড়া। যাঁরা সূতা কাটেন না অথবা নিয়মিত খদ্দর পরেন না তাঁহাদের সকল সময়ে কাজের জন্য লওয়া যায় না। যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানেরা যদি বহু সংখ্যায় কাজ করিতে অগ্রসর হন তাহাতে আমি সুখীই হইব। উহারা সকলেই যেন মৌলানা সাহেবের নিকট আবেদন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সকলের আবেদন পরীক্ষা করিয়া কার্য্যকরী সমিতির নিকট সুপারিশ করিবেন। আমি কিন্তু সকলকেই সাবধান করিয়া দিতেছি উহাদের উদ্যম, যোগ্যতা অথবা প্রীতির অভাবে যদি খদ্দর কর্ম্মীসঙ্ঘ হিন্দুদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে তজ্জন্য তাহারা কার্য্যকরী সভাকে দোষ দিবেন না। (মোঃ কঃ গান্ধী, ৮।১০।২৫ ই)

সূতাকাটা পরীক্ষকের প্রতি ইঙ্গিত

জনৈক পত্র প্রেরক নিম্নলিখিত 'ইঙ্গিত' গুলি প্রেরণ করিয়াছেন। সূতাকাটা সম্বন্ধে তিনি কিছু চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। "শিক্ষা এবং পরীক্ষায় ও কংগ্রেস সপ্তাহের প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত কার্য্যধারার অনুসরণ করা যাইতে পারে :—

শিল্প হিসাবে সূতাকাটাকে 'তুলাধোনা,' 'সূতাকাটা', এবং 'কলকব্জা',—এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

তুলাধোনার পরীক্ষা

১। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বীচি ছাড়ান ; ধোনাতুলার সূক্ষ্মতা ও পরিমান।

২। শক্ত ও নরম পাঁজের পার্থক্য

৩। 'ধুনুরী'র বিভিন্ন অংশের ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির ব্যবহার।

সূতাকাটা

১। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজে ধোনা তুলার পাঁজ, ও অপর পাঁজ হইতে কাটা সূতার পরিমাণ, সমতা ও সূক্ষ্মতা।

২। নমুনা মত কোন বিশেষ নম্বরের সূতাকাটার ক্ষমতা।

কলকব্জা

১। অব্যবহৃত চরকা ঠিক করিতে দেওয়া (যে কাজে ছুতারের আবশ্যক হইবেনা।)

২। চরকার অংশগুলি ঢিলা করিয়া মেরামত করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এইজন্য বিভিন্ন নমুনার চরকা ব্যবহৃত হইতে পারে। (টাইপ-রাইটিং, এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমূহের কার্য্যকরী পরীক্ষা এইরূপ করা হইয়া থাকে।)

কালক্রমে প্রতিযোগিতায়ও এই সকল পরীক্ষার প্রচলন করা হইতে পারে"

(মোঃ কঃ গান্ধী, ৪।১০।২৫ ইং)

মালকাচক ও অন্যান্য কেন্দ্র

চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকিলে কতদূর কাজ করিতে পারা যায় তাহা আমরা মাল্‌কাচকে দেখিতে পাই। মাল্‌কাচক পাটনা হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। মাল্‌কাচকের লোকসংখ্যা মাত্র এক হাজার হইলেও এখানে চারি শত চরকা চলিতেছে, ও ত্রিশজন তাঁতী পূর্ণ খদ্দর বুনিতেছে। চরকা গুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও কাটুনিদের উহাতেই বেশ খুসী দেখা গেল। উহারা সূতা কাটিয়া গড়ে মাসে আটশত বা বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত উপার্জ্জন করে। একসহস্র লোক অধ্যুষিত একটী গ্রামের পক্ষে এই অতিরিক্ত আয় সামান্য নহে। তন্তুবায়গণ খদ্দর বুনিয়া বৎসরে যে ৫,৫০০৲ টাকা রোজগার করে সেটা হয়ত অতিরিক্ত আয় নয়, তাই আমি আর উহা গণনায় আনিলাম না। এখানকার কর্ম্মীরা কেবল চরকা প্রচলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেদের সামান্য সম্বল এবং ততোধিক সামান্য চিকিৎসা-জ্ঞান লইয়া উহারা পল্লীবাসীর পীড়ায় ও যথাসম্ভব চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। উহাদের কাজের সূচনা হইয়াছিল ১৯২১ ইংরাজীতে। এখন উহারা ছয়টী বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ করিতেছেন। উহারা ১৯২২ ইংরাজীতে ৬২,০০০৲ টাকার ১৯২৩ শে ৮৪,০০০৲ টাকার, এবং ১৯২৪ শে ৬৩,০০০৲ টাকার খদ্দর উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এ বৎসর প্রথম আট মাসেই কিন্তু এক লক্ষ টাকার খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২৪ শে উৎপাদন হ্রাসের কারণ তুলার অভাব। নিয়মিত তুলা পাইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্য তৎপরতার সহিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে উহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারের সম্ভাবনা একরূপ অসীম। উহাদের বিশ্বাস নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামেরই লোক এইরূপ কর্ম্মীর আগমনে উৎসাহিত হইবে। উহাদের উৎপন্ন খদ্দরও উৎকৃষ্ট, এবং সকলগুলিই মোটা নয়। কতকগুলি কাপড় খুবই মিহি। উহারা প্রতি সের ১০ নম্বর সূতায় আট আনা হিসাবে, ও আড়াই হাত বহরের কাপড় প্রতিগজে দশ পয়সা হিসাবে মজুরী দিয়া থাকেন। আহার, ভ্রমণ ব্যয় প্রভৃতি সহ প্রতি কর্ম্মীর জন্য মাসে গড়ে ২৫৲টাকা করিয়া খরচ পড়ে। এই সকল কেন্দ্র লোকদানের উপর চলেনা, নিজেদের খরচ নিজেরাই পোষাইয়া লয়। উৎপন্ন খদ্দর বিক্রয়ের ব্যবস্থাও উহারা নিজেরাই করিয়া থাকেন। উৎপন্ন সূতার উৎকর্ষও প্রতিমাসেই বাড়িতেছে। জনসাধারণ ও সরকারের শিল্প বিভাগকে আমি এই সকল গ্রামের অবস্থা অধ্যয়ন করিতে ও উপরিলিখিত তথ্য-সমূহের সত্যতা নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি। এই কর্ম্মী-সঙ্ঘের চেষ্টায় ৭,০০০ চরকা চলিতেছে এবং ২৫০ তাঁতে খদ্দর বোনা হইতেছে।

বিহারের অবস্থায় অসাধারণ কিছু নাই। বাঙ্গালা, তামিল, অন্ধ্র এবং যুক্ত-প্রদেশেরও অনেক স্থানেরই অবস্থা বিহারেরই অনুরূপ। যাহারা চরকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগের অবস্থা এই সকল স্থানে পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, তাই আমি ইহাদের উল্লেখ করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ একই অবস্থা দেখা যাইবে। 'নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা'-পরায়ণ উড়িষ্যা কেবল দক্ষ কর্ম্মী ও নিপুণ সঙ্ঘবন্ধনের অপেক্ষায় আছে। বহু-সংখ্যক কোটিপতির বাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও রাজপুতানার জনসঙ্ঘ অতি দরিদ্র, এবং সেখানে চরকার ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে। রাজা মহারাজাগণ যদি শুধু এই আন্দোলনে আন্তরিক সহায়তা করেন, নিজেদের রাজ্যে খাদি ব্যবহারে উৎসাহ দান করেন, এবং যেখানে খাদি প্রচারের পথে কোন বিঘ্ন আছে তাঁহা দূর করেন তাহা হইলে প্রচুর মূলধন নিয়োগ ব্যতিরেকেও চির অনাবৃষ্টি অধিষ্ঠিত এই দেশের দরিদ্রকুল প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় করিতে পারে।

মোঃ কঃ গান্ধী, ৮।১০।২ ইং।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লেখকগণের প্রতি

১। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে। লেখা ভাল হইলে নূতন লেখক গণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।

২। সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক রচনা গৃহীত হইবে না।

৩। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত মোড়ক বা লেপাফা পাঠান প্রয়োজন।

৫। প্রবন্ধ হারাইয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৬। প্রবন্ধ, ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকানা।

সম্পাদক, নব্যভারত

২১০।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

অতিরিক্ত পত্র

নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [৮ম সংখ্যা

দর্শনের কথা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ

দর্শন শব্দের সাধারণ বা মৌলিক অর্থ দেখা বা সাক্ষাৎকার, কিন্তু উহার আর একটী বিশেষ অর্থ প্রচলিত আছে, যে অর্থে আমরা 'ষড়্‌দর্শন', 'ভারতীয় দর্শন', 'পাশ্চাত্য দর্শন' প্রভৃতি শব্দে দর্শন শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অর্থে ইংরাজী Philosophy শব্দের প্রতিশব্দরূপেও ইহার বহুল প্রয়োগ হয়। এই বিশেষ অর্থেই আমরা আলোচ্য বিষয়ে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিব। এই অর্থে সকল প্রকার দেখাকে দর্শন বলা চলেনা, শুধু তত্ত্বদর্শনকেই দর্শন বলা যায়। তত্ত্ব অর্থ সত্য, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় 'thatness' বা 'reality'. সুতরাং দর্শন অর্থ তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্ববিজ্ঞান, Science of Reality. সত্য বা 'reality'র অনন্ত রূপ, অনন্ত আকারে তাহার অভিব্যক্তি। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অতীন্দ্রিয় মানসিক জগৎ পর্য্যন্ত, পথের ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া মনের ইচ্ছাবাসনা পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বজগৎই সত্যের অন্তর্ভুক্ত। এক একটী বিজ্ঞান সত্যের এই অনন্ত রূপের মধ্যে এক একটী বিশিষ্ট রূপের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রসায়ন (Chemistry) জগতে জড়পদার্থের রাসায়নিক গুণ সমূহের আলোচনায় রত। পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) জড় পদার্থের আলোক, উত্তাপ, বৈদ্যুতিকক্রিয়া প্রভৃতি সম্পত্তির গবেষণায় প্রবৃত্ত, জীববিজ্ঞান (Biology) জীবনের উৎপত্তি বিকাশ ও পরিণতির তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত, মনোবিজ্ঞান (Psychology) সঙ্কল্প, বিকল্প, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের আলোচনায় নিযুক্ত। এই প্রকার প্রাণি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি যত বিজ্ঞান আছে তাহার প্রত্যেকটীই সত্যের বিশেষ একটী দিক লইয়া সেই সীমাবদ্ধ

ক্ষেত্রের সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল বিশেষ বিজ্ঞানের প্রত্যেকটীই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহার কোনটী দ্বারাই সমগ্র জগতের একটী অখণ্ড জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটেনা। কারণ ইহাদের প্রত্যেকটীই জগৎকে খণ্ডদৃষ্টি দিয়া দেখিতেছে, সুতরাং অখণ্ড গোটা জগৎটা সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েনা। সেই জন্য এই প্রত্যেকটী বিশেষ বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী সাধারণ বিজ্ঞানের প্রয়োজন যাহাতে এই খণ্ডদৃষ্টিলব্ধ বিশেষ বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের চিত্রগুলিকে ভিত্তি করিয়া সংযোজিত আলোকচিত্র বা Composite Photography'র ন্যায় সমগ্র বিশ্বজগতের একটা অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করার চেষ্টা করা যায়। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই দর্শন বা Philosophy শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট ও সরল হইবে। একটী সজ্জিত যুবক রাজপথে বাহির হইয়াছে। নাপিত তাহাকে দেখিয়াই তাহার চুল, গোঁপ, দাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিল, মুচি তাহার জুতার দিকে তাকাইয়া তাহাতে সেলাই, পট্টি, ব্রাস, কালী প্রভৃতি কিছুর অসদ্ভাব আছে কি না দেখিতে লাগিল, ডাক্তার তাহার রক্তাল্পতা বা মেদ বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলেন, হোমিওপ্যাথ তাহার মুখে চোখে পালসেটিলা বা নক্স-ভমিকার লক্ষণ খুঁজিতে লাগিলেন, স্বদেশানুরাগী তাহার গায়ের কাপড় দেশী কি বিলাতী, মিলের কি খদ্দরের, দেখিতে লাগিলেন, আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাহার কুল, গোত্র, বিদ্যা (পাশ), অবস্থা প্রভৃতির অনুমান করিতে লাগিলেন। ইহাদের সকলেই যুবকটীকে নিজেদের দৃষ্টি-কেন্দ্র (stand point) হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যেকটীই সত্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতে গোটা যুবকটীকে দেখা হইল না, তাহা বাকী রহিয়া গেল। সেই প্রকার প্রত্যেকটী বিশেষ বিজ্ঞান এক একটী বিশেষ বিষয় নিয়া একটা বিশেষ দৃষ্টিতে জগৎকে দেখে। তাহাতে সমগ্র জগতের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে না; করিতে গেলে ভুল হয়। সেইজন্য সমগ্র জগতের বা মানবের সমগ্র অভিজ্ঞতার (totality of human experiences) একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত ধারণা করার জন্য দর্শনের প্রয়োজন।

জগতের স্বরূপ কি, তাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে কি না, তাহার কোন স্রষ্টা বা নির্মাতা আছে কি না, থাকিলে তাহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ, মানবের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি বিষয়ই দর্শনের আলোচ্য। কোনও বিশেষ বিজ্ঞান এই সব সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। দিতে গেলে হস্ত্যন্ধ ন্যায়ের দোষ ঘটিবে। 'হস্ত্যন্ধ' ন্যায় একটা সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের গল্প। কয়েকজন অন্ধ একটা হাতীর বিভিন্ন অংশ ধরিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যাহারা পায়ে ধরিল তাহারা বলিল হস্তী স্তম্ভের মত, যাহারা কাণে ধরিল

দর্শনের বিষয়

তাহারা বলিল হাতী কুলার মত, যাহারা লেজে ধরিল তাহারা বলিল হাতী একটা মোটা লতার মত। এই নিয়া তুমুল বিবাদ। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কথাতেই আংশিক সত্য আছে। গোটা হাতীটাতে এই সমস্তই আছে। তবে তোমরা প্রত্যেকে যা মনে করিতেছ তার চেয়ে অতিরিক্ত অনেক আছে। অংশ দেখিয়া তাহা হইতে সমগ্রের কল্পনা করিলে তাহাতে অতি-ব্যাপ্তি বা over generalibiation দোষ ঘটে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যইতে পারে রসায়ণ শাস্ত্রের indestrucitbility of matter বা জড়পদার্থের অবিনশ্বরত্ব হইতে যিনি জগতের অবিনশ্বরত্ব অনুমান করেন তাহার পক্ষে এই ভ্রান্তি ঘটিবে। কারণ জগতে শুধু জড় পদার্থই নয়, অ-জড় পদার্থ ও আছে, শুধু matter নয় mind ও আছে যাহার সম্বন্ধে এই কথা না খাটিতে পারে।

দর্শন ও বিজ্ঞান

দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি তাহা এখন বোঝা যাইতেছে। বিশেষ বিজ্ঞান গুলির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া দর্শন জগতের বিভিন্ন দিকের জ্ঞান হইতে একটা একীভূত সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং বিশেষ বিজ্ঞানগুলি দর্শনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপজীব্য। যেমন দর্শনের নিকট বিজ্ঞান প্রয়োজনীয়, তেমনই আবার বিজ্ঞানের নিকট দর্শনের প্রয়োজন আছে। কারণ, দর্শন ভিন্ন বিজ্ঞানের চরম পরিণতি বা সার্থকতা ঘটেনা। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান যে সকল কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লয় (যেমন জড় পদার্থের অস্তিত্ব প্রভৃতি) সেই সকল কথা বাস্তবিকই সত্য কি না ইহা যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুঝাইবার ভার ও দর্শনের উপর। সুতরাং বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ। পরস্পরের পরিপুষ্টি ও পরিণতির জন্য পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

দর্শনের সফলতা ও মতভেদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যের বিভিন্ন রূপের অনুভূতি হয়। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া যুক্তির সাহায্যে সত্যের একটী নির্ব্বিরোধ সমঞ্জস অভিমত বা ধারণা বা theory গঠন করাই দর্শনের কাজ। সেই জন্য দর্শনের উদ্দেশ্য সাধন করা বড়ই দুষ্কর। দর্শন সাধনার জন্য মনের উদারতা, দৃষ্টির ব্যাপকতা ও যুক্তি-শক্তির প্রখরতা একান্ত আবশ্যক। আমাদের জন্মগত, জাতিগত, বা শিক্ষাগত এমন অনেক কুসংস্কার বা বিশ্বাস প্রবণতা থাকে যাহাতে নিরপেক্ষ বা উদার ভাবে সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারি না। সত্য-সাধনার এইগুলি প্রধান অন্তরায়। ইহাদিগকে দূর করা দর্শন চর্চ্চার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের দেশে এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসুর মন তাহার উপযুক্ত করিয়া নিবার ব্যবস্থা ছিল। রাগ, দ্বেষ, আসক্তি প্রভৃতি অন্তরায় প্রশমিত করার উপদেশ দেওয়া হইত। পাশ্চাত্যেও ইহার প্রয়োজনীয়তা

কখনও কখনও স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো তত্ত্বজ্ঞানের কে অধিকারী তাহার বিচার করিয়াছেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম উদ্বোধয়িতা লর্ড বেকন নিরপেক্ষ চিন্তার বিরোধী চার প্রকার কুসংস্কারের (the four idols) উল্লেখ করিয়া তাহা দূর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মনের উদারতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও যথাসম্ভব ব্যাপক হওয়া চাই। না হইলে একদেশ-দর্শিতা দোষ ঘটে। আমি আজ কতকগুলি অভিজ্ঞতা বা Experience হইতে সত্যের এক ধারণা করিয়া নিলাম, কিন্তু কাল হয়ত এমন আরও অভিজ্ঞতা আমার হইতে পারে যাহাতে প্রাচীন মতের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। তখন সত্যের অনুরোধে, সুযুক্তির অনুরোধে, নূতন ও পুরাতন অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এক অভিনব মত গঠনের আবশ্যকতা হইবে।

এই জন্য মানবের ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্রমপরিবর্ত্তনের ও বুদ্ধিশক্তির ক্রমবিকাশের সহিত দর্শনের মতবাদ পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইতেছে। এই অনিবার্য্য মতভেদ ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই দর্শন-সাধনা যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। অনেকে জগতের সমস্ত রহস্যের একটা শেষ বা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত লাভ করার আশায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল পরিবর্ত্তনশীল মতভেদের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। কিন্তু তাহাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে সত্যের বিকাশ পরিবর্ত্তনশীল ও অনন্ত, তাহা গ্রহণ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মানবের বুদ্ধিও পরিবর্ত্তনশীল ও বিভিন্ন-রুচিসম্পন্ন। সুতরাং এই স্থলে কোন একটা যুগান্তস্থায়ী স্থিরসিদ্ধান্ত আশা করা অসঙ্গত। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সারবত্তা ও যুক্তিবত্তা পরীক্ষা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত গঠন করা বা স্বেচ্ছায় বুদ্ধিপূর্ব্বক যে কোন একটা সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই। পরীক্ষা, যুক্তি, বিচার, ইহাই দর্শনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রসাধন করিবার উপায়স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি সকল মানবের সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রে নিজ স্বাধীন বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগ করিয়া তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, অন্যের ধার করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছাই অত্যন্ত অসঙ্গত ও অগৌরবকর। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, তাহার বিষয়গুলিও অনেকাংশেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত। ইহা সত্ত্বেও প্রতিবৎসর বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত মতভেদ ও সিদ্ধান্তপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। সুতরাং দর্শনের এই বিপুল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, যেখানে অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় বিষয়েরই প্রাচুর্য্য, সেখানে মতভেদ ও সিদ্ধান্তচ্যুতি ঘটিবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

দর্শনের সহিত জীবনের সম্বন্ধ } দর্শনের বিষয় যদি এতই জটিল হইয়া থাকে এবং তাহার মীমাংসা যদি এতই দুঃসাধ্য হইয়া থাকে, তবে এই নিষ্ফল চেষ্টায় কালক্ষয় না করিয়া ইহার আলোচনা পরিত্যাগ করাই বিধেয়—কেহ কেহ এইরূপ বলেন শুনা

যায়। এমন কি দর্শনের ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে জটিল সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় অধীর হইয়া, বা দুরূহ চিন্তাজাল হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া, নৈরাশ্যের আবেগে কোন কোন দার্শনিক কালাপাহাড়ের ন্যায় দর্শনের অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সমস্ত কল্পনা ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দর্শনের চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের কোম্‌টে (Comte) ও আমাদের চার্ব্বাক মুনি এই জাতীয় দার্শনিক। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও দার্শনিক চিন্তার ধারা রুদ্ধ হয় নাই। বাধাবিপত্তি সম্মুখে পড়িলে তাহা ছাপাইয়া, অতিক্রম করিয়াই অব্যাহত-গতিতে চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি বা জানিবার কৌতূহল মানুষের মনে এতই বদ্ধমূল যে তাহার প্রেরণা অবহেলা করিয়া মানুষের পক্ষে বেশীদিন থাকা চলেনা। তাহারই ফলে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, দর্শন চর্চ্চাও তাহারই অনিবার্য্য প্রেরণার ফল।

দর্শন চর্চ্চার অন্য কারণ এই যে, জড় বিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মানুষ যেমন তাহাকে দৈনন্দিন কাজে লাগাইয়া সুখ সুবিধা ভোগ করিতে চায়, তেমনই মানুষ গ্রাসাচ্ছাদনে একটু নিশ্চিন্ত হইলে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া জীবনে সফলতা লাভ করিতে চায়। বর্ত্তমান ভোগ্যসামগ্রী নিয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে না। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে, নিজের ও বিশ্বের সঙ্গে, কি সম্বন্ধ তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হয়। সেই জন্য গ্রাস, আচ্ছাদন, ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-চিন্তাও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই জন্য সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবি প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিলেও বুঝা যায় তাহাদেরও প্রত্যেকেরই জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, এবং নিজ জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা না একটা অস্পষ্ট, অমার্জ্জিত ধারণা আছে। মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ত্তমান বিষয়রাশিতে যতই বিভোর থাকুক তার জীবনের এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন সেই উপনিষদের ঋষির ন্যায় সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠে:—

'কেন ইষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ যুক্তিঃ প্রৈতি।
কেন ইষিতাং বাচং ইমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবং যুনক্তি।'

—'কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া মন বিষয়ের দিকে পতিত হয়, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হয়, কাহার অভিপ্রায়ে বাক্য উক্ত হয়, কোন দেবতা চক্ষু ও শ্রোত্রকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন?'

দৃশ্য জগতের মোহনরূপে ও ভোগবিলাসের মোহ সত্ত্বেও ইহার বাস্তবিক সত্বা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে মানুষ কখনও কখনও বৈদিক ঋষির কণ্ঠে সুর মিলাইয়া প্রার্থনা করে:—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং তত্ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥'

—'সত্যের মুখ চাকচিক্যময় সুবর্ণ আবরণে আবৃত আছে। হে পূষণ, এই আবরণ অপসারিত কর, তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত কর, সত্যকে দেখিতে দাও।'

দর্শনের চিন্তা ও সিদ্ধান্তসমূহ শুধু দার্শনিকের মনে বা গ্রন্থে অথবা তাহার কতিপয় শিষ্যমণ্ডলীর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার গুলি যেমন বাজারে ছড়াইয়া পড়ে, দার্শনিকের চিন্তার ধারা তেমনি জাতির মধ্যে আত্মপ্রভাব বিস্তার করে। দর্শনের সিদ্ধান্ত গুলির প্রভাব এত ব্যাপক ও ক্রীয়াশীল. ইহাতে ব্যক্তির ও জাতির চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালী এত নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং জাতির সভ্যতা ও সংস্কার, ধর্ম্ম ও সমাজ গঠনে ইহার এত প্রবল প্রভাব, যে ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতির অনুরোধেও দর্শনচর্চ্চা অবহেলা করা যায় না। এই সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা বর্ত্তমান আলোচনার উপসংহার করিব।

গত জার্ম্মান যুদ্ধে জার্ম্মানীর যে ক্ষাত্রবীর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা তদ্দেশীয় দার্শনিক নিট্শের (Nietsch)? দর্শন দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা তত্ত্বজ্ঞ লোক মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার দর্শনের উপদেশ এই, যে শক্তি বা বলই মানব জীবনের একমাত্র কাম্য। নিজের বল বাড়াইতে যদি পরকে উৎপীড়িত করিতে হয় তাহাতে বাধা নাই। কারণ তাঁহার মতে দয়া করুণা প্রভৃতি বৃত্তি দুর্ব্বলতারই প্রচ্ছন্ন রূপ। সুতরাং এইগুলিকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া মানুষ যথাশক্তি বল সঞ্চয় করিয়া অতি-মানব বা superman হইতে চেষ্টা করিবে। ইহাই মানব-জীবনের চরম সাধনা। এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রভাবে জাতি গড়িয়া উঠিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি তাহা গত মহাসমরেই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আবার আমাদের দেশে মহারাজা অশোকের রাজত্ব কালের কথা স্মরণ করুন। বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে, গৌতমের মৈত্রী, করুণা, অহিংসা, বিশ্বপ্রেমের উপদেশে যে ভ্রাতৃত্ব ও সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব আসিয়াছিল, অশোকের যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ও তাহার প্রতিষ্ঠানে জলাশয়, পথ, চিকিৎসালয়, শিক্ষালয়, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি অশেষ ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, সেই গৌরবময় যুগের ইতিহাস সকলেই জানেন। বৌদ্ধ-প্রভাবে শিল্প ও সুকুমার কলার যে উন্নতি সাধনা হইয়াছিল অজন্তা গুহাই আজ সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অনেকের মনেই একটা ধারণা হইয়াছে যে অতিরিক্ত মাত্রায় দর্শন চর্চ্চায় আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই ধারণার একটা বাস্তবিক ভিত্তি আছে, কিন্তু সেটি ঠিক যে কি তাহা জানা উচিত।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে অধীনতার নির্ম্মম পেষনে ও দারিদ্র্যের পীড়নে জাতির

নিৰ্জ্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে মনও অবসন্ন ও বিকারগ্রস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে দর্শনের প্রাণস্বরূপ স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইল। পুরাতনের আবৃত্তিই দর্শন চিন্তার স্থান অধিকার করিল। নূতন যাহা হইল তাহা নিৰ্জ্জীব মনেরই অনুরূপ, পুরাতনের কতকগুলি বিকৃতি। উপনিষদের যে সজীব দর্শন বেদান্ত—যাহা এক সময়ে আত্মশক্তি, কৰ্ম্ম ও আনন্দে মানুষকে সতেজ ও উচ্চাভিলাষী করিয়া তুলিত, তাহাও এই নিৰ্জ্জীব মনের হাতে পড়িয়া জগৎটাকে মিথ্যা স্বপ্ন করিয়া তুলিল; কর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া সকল উৎসাহ উদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করিল; চারিদিকে নৈরাশ্যের বাণী ছড়াইল। ফলে জাতীয় অধঃপতনের গতি দ্রুত হইল। অতীতের এই দুঃখময় ইতিহাস পড়িয়া দর্শন জিনিষটাকেই অবহেলা করা ভুল হইবে। কারণ যে নিস্তেজ, নিৰ্জ্জীব দর্শনের প্রভাবে জাতির অধঃপতন হইয়াছিল এবং যাহার প্রভাব এখনও ভারতের আপামর সাধারণ মনকে অধিকার করিয়া উন্নতির ও পুনরুজ্জীবনের অন্তরায় হইয়া আছে তাহাকে দূর করিতে হইলে আবার তেমনই একটা সতেজ, সজীব দর্শনের প্রচার নিতান্ত অপরিহার্য্য। আবার দর্শন ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহাইতে হইবে; নতুবা পূর্ব্বসঞ্চিত মল দূর হইবে না।

সুখের বিষয় এই প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের কর্ম্মের, আনন্দের, ও আত্মশক্তির বাণী পুনরুদ্ধার ও নূতন ভাবে প্রচার করিয়া জাতীয় জীবনে উৎসাহের ও জীবনের স্রোত ফিরাইয়া আনিয়াছেন। অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে ও বাক্যে একটা নূতন সজীব দর্শন আত্ম-প্রকাশ লাভ করিয়াছে। দর্শনক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার ধারা আবার লক্ষিত হইতেছে; ইহা ক্রমেই পুষ্টি লাভ করিয়া ভারতের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবন—ধৰ্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি—সকলকেই আবার জাগ্রত করিয়া তুলিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শনের সঙ্গে জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তাহার অনুশীলন করাও অন্যান্য কার্য্যকরী বিদ্যার ন্যায়ই প্রয়োজনীয়।

(যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পঠিত)

তাঁহারি জয় হোক

মা জননি,
ও ছেলেটি তোমার একার নয়।
আমার বলে শক্ত করে
ঘরে ঘরে রাখবে ধরে,
মা জননি, পাগলিনি, তাও কি কভু হয়?
দশের তরে, দেশের তরে,
বিশ্ব লাগি বিশ্বঘরে
শুভক্ষণে যারা জনম লয়,
ঘরের পরের নাইকো জ্ঞান,
সবার ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ,
সবার কাজটা আপন ভাবে,
সবার বোঝা বয়,
নাইকো কুল নাইকো জাতি
দেবতাদেরই হবে জ্ঞাতি
নিজের পুণ্যে পরের পাপ করে যারা ক্ষয়,
একটি ঘরের গণ্ডী মাঝে
তারা কি মা রয়?
অনেক মায়ের ছেলে সে সে
একলা তোমার নয়।

সেইতো তোমার পরম গর্ব্ব
মুছে ফেল চোখ,
প্রাণ বা হারায় বলে কেন
আগেই কর শোক?
যাহার হাতে সবারি প্রাণ
তোমার মাণিক তাঁরি তো দান,
তাঁর কোলেই একূল ওকূল ইহ পরলোক
মা জননি, তাঁহারি জয় হোক্।

শ্রীকামিনী রায়

ধর্ম্ম প্রচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফুলার খ্রীষ্টের বাক্যে মিশনরীদের বলিলেন—"শান্তি তোমাদের হউক। আমার পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমি তোমাদের প্রেরণ করিতেছি।"—ভাবের আবেগে ফুলারের বিশাল দেহ কাঁপিতে লাগিল, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক কঠোর মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"কি মধুর অভিভাষণ!—'শান্তি তোমাদের হউক।'—যেন তিনি বলিতেছেন—অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা শুভ, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহাও সর্ব্বথা শুভ। মধুর তোমাদের এই কর্ম্ম দীক্ষা। যাহারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে তাহাদের পক্ষে তাঁহার দ্বারা এই রকম কাজে নিযুক্ত হওয়ার মত আর কি এমন রুচিকর হইতে পারে? খ্রীষ্ট যে ব্রত সাধন করিতে আসিয়াছিলেন তোমরা সেই ব্রত গ্রহণ করিলে।"

এই সময় এক বিপদ উপস্থিত। ভারতবর্ষের রাজশক্তি তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। এই বণিক্‌সংঘ বাণিজ্য করিতে আসিয়া, অদৃষ্টগুণে এক বিশাল সাম্রাজ্য পাইয়া বসিয়াছে। ইহাদের একমাত্র কাম্য ছিল ছলে বলে কৌশলে অর্থসঞ্চয়। এদেশের উপকার করিতে তাহারা আসে নাই, এদেশে জ্ঞান, সুনীতি বা ধর্ম্মের প্রচার হয় তাহাও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। কারণ নিজেরা এসকল মানিয়া চলিলে এবং এদেশের লোকদের মানিতে শিখাইলে তাহাদের ক্ষতিরই সম্ভাবনা ছিল। কোন নব আগন্তুকের দ্বারা যদি তাহাদের স্বার্থে যদি আঘাত পড়ে, একচেটিয়া ব্যবসায় নষ্ট হয়, বা সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার হানি হয়, সেই জন্য ইহারা সকলকে এদেশে আসিতে দিত না। আপনাদের কর্ম্মচারী প্রভৃতি বাদে অপর সকলকে 'লাইসেন্স' বা অনুমতি পত্র লইয়া আসিতে হইত। বহু চেষ্টা করিয়াও কেরী ও টমাস লাইসেন্স পাইলেন না। অগত্যা বিনা লাইসেন্সে যাত্রা করা স্থির করিয়া ইহারা জাহাজে চড়িলেন। কোন কারণে দুই মাস কাল জাহাজ বন্দরে আবদ্ধ রহিল। ইতিমধ্যে কাপ্তানের কাছে এক বেনামা চিঠী আসিল—তুমি বিনা লাইসেন্সে যাত্রী লইয়া যাইতেছ বলিয়া তোমার নামে নালিস করা হইবে। ইহার ফলে কেরী টমাস এবং তাঁহাদের আর এক সহযাত্রী মালপত্র সহিত জাহাজ হইতে বহিষ্কারিত হইলেন। টমাসের পত্নী ও কন্যা পূর্ব্বেই নামিয়া গিয়াছিলেন।

আপাততঃ মনে হইল ইহাদের যাত্রাপথ রুদ্ধ এবং সংকল্প ব্যর্থ হইল। কিন্তু তাহা হইল না। কিছু দিন পরেই একখানি দিনেমার (Danish) জাহাজ দিনেমার ও নরওয়েজিয়ান নাবিক দ্বারা বাহিত হইয়া শ্রীরামপুরে আসিতেছিল। কিছু অধিক ভাড়া দিয়া কেরী ও টমাস ইহাতে উঠিলেন। এবার তাঁহার পত্নীও সন্তানগণসহ

স্বেচ্ছায় তাঁহার সহগামিনী হইলেন, সঙ্গে নিজের ভগিনীকেও লইলেন। ১৭৯৩ সনের ৯ই জুন তাঁহাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। তখন ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্বের (Reign of Terror) পূর্ণ মধ্যাহ্ন কাল। ১২ই নভেম্বর জাহাজ কলিকাতা পৌঁছিল। যখন সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রমের পর সম্মুখে নারিকেল-তরুশোভিত তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইল তখন কেরীর অন্তর হইতে এই প্রার্থনা উঠিল—আমার হৃদয় যেন গৃহীত ব্রত সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমি যেন এই দেশে খৃষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

ইঁহারা নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতা প্রবেশ করিলেন, কারণ ইঁহারা এতই নগণ্য যে কেহ ইহাদের লক্ষ্যই করিল না। প্রথমতঃ ইহারা এমন একটা ভাড়াটিয়া বাড়ী খুঁজিয়া লইলেন যাহাতে দুই পরিবার একত্র বাস করিতে পারে। টমাস সংসার দেখিবার ভার লইলেন, কেরী বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে নিযুক্ত রহিলেন। শিক্ষার আরম্ভ ইতিপূর্ব্বে জাহাজেই হইয়াছিল। এখন রামরাম বসু নামক এক ব্যক্তিকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। এই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার খৃষ্টান ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম সঙ্গীত ইহারই রচনা। কিন্তু ইহার খৃষ্ট বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

যে সামান্য অর্থ লইয়া ইঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই কেরী বুঝিলেন কলিকাতার মত স্থানের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তখন কোথায় অল্পব্যয়ে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ হইবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং পর্টুগীজদের স্থাপিত পুরাতন ব্যাণ্ডেল সহরে যাওয়া স্থির করিলেন। ভাবিয়াছিলেন সেখানে অল্প খরচ হইবে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারেরও সুবিধা হইবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না, কাজেই কয়েক মাস পরেই আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। জনৈক ধনী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার মাণিকতলাস্থ একটি ছোট বাড়ীতে ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। বাড়ীটি ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ভাল ছিলনা। এখানে এই পরিবারের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। অস্বাস্থ্যকর বাড়ী, সকলে রোগে পড়িতেছে, হাতে টাকা নাই, কোথাও পরিচিত বন্ধু বান্ধব নাই, এই দুঃখ দুর্ভাবনার মধ্যে আবার কেরীকে তাঁহার পত্নী ক্রমাগতই গঞ্জনা দিতেছেন—কেন আমাদের এমন সর্ব্বনাশের মধ্যে আনিলে?—টমাস কোন কারণে এদেশবাসী ইংরাজদের বিরাগ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার সংশ্রবে থাকাতে কেরীকেও তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে এই সময়ে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। কিছুকাল বিষম দারিদ্রে ও দুর্ভাবনায় কাটাইবার পর কেরী টমাসের কাছে কিছু টাকা পাইয়া রাম রাম বসুর সঙ্গে সপরিবারে কলিকাতা হইতে চল্লিশ মাইল দূরে, সুন্দরবনের সীমাসংলগ্ন দেহাট্টা নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। এই স্থানটি রাম রাম বসুর কোন আত্মীয়ের অধিকারে ছিল। সুন্দরবন গঙ্গা নদীর বহু শাখাদ্বারা খণ্ডীকৃত, উহার জমীর ১২০ ফুট, নীচে শক্ত মাটীর পরিবর্ত্তে তরল কর্দ্দম, তথাকার বাতাস জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ। নদীপথে দেহাট্টা যাইতে বিষাক্ত বায়ু সমাচ্ছন্ন গভীর অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া নৌকার পথ। ইঁহারা যখন গিয়া দেহাট্টা পৌঁছিলেন তখন সঙ্গে মাত্র আর একটি দিনের

আহার্য্য অবশিষ্ট আছে। এই সংকট কালে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বন্ধু পাওয়া গেল। লবণ বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, মিঃ শর্ট নামক এক জন ইংরাজ অনতিদূরে বাস করিতেছিলেন। ইনি ভারতীয়সুলভ আতিথ্য-সৎকারে সকলকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং যতদিন না ইহাদের অন্য কোন বন্দোবস্ত হয়, ততদিন তাঁহার অতিথিরূপে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

এখানে জমীর অভাব ছিলনা। কেরী যমুনা নদীর অপর পারে বিস্তৃত একখণ্ড জমী লইলেন এবং নিজেদের বাসের জন্য অবিলম্বে কাঠের খুঁটি, চাঁচের বেড়া ও খড়ের চাল দিয়া ঘর তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একখানি চিঠিতে আছে :—

"এ স্থানটির জমী উর্ব্বরা হইলেও সম্প্রতি ইহা প্রায় জনশূন্য। ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ভয়ে লোকেরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এসকল পশুরা বন্দুকে ভয় পায়, শীঘ্রই এস্থান হইতে বিতাড়িত হইবে। জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, এক পাঁউরুটী ছাড়া তাহার সবই এখানে পাওয়া যাইবে, পাঁউরুটীর পরিবর্ত্তে ভাত খাইতে হইবে। আমার বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হইলেই আমার অবসর বাড়িবে, এখানকার সকল লোকের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিবে, প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিব। এখানে নিজকে কাজে লাগাইবার এক বিপুল ক্ষেত্র বিস্তৃত। কত যে বিপুল তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। আমি যেখানে বাড়ী তৈয়ার করিতেছি, সেখান হইতে সুন্দর বন নামক দুর্ভেদ্য বনভূমি কেবল সিকি মাইল দূরে। যদিও লোকেরা বাঘের ভয়ে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল আমার দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া এখন ফিরিয়া আসিতেছে। শীঘ্রই আমার কাছাকাছি তিন চারিশত লোক পাইব। আমার নিজের শারীরিক কুশল সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, আমি ইংলণ্ডে যেমন ছিলাম, এখানেও ঠিক সেইরূপ আছি, আমার স্বাস্থ্য কোন দিন এখনকার চেয়ে বেশী ভাল ছিল না। এ দেশের আবহাওয়া যদিও খুব গরম তথাপি অসহনীয় নহে; কিন্তু আমি নানা বাধাবিঘ্ন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও যে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছি কিছুতেই তাহা হইতে নিরস্ত হইব না।"

ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে এ স্থানটি একেবারেই অনুকূল ছিল না। এই জল জঙ্গল ও ম্যালেরিয়ার নিত্য বাসস্থানে বেশী দিন থাকিলে এই নবাগত ইংরাজ পরিবার ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া সত্বর মৃত্যুমুখে পড়িতেন। কিন্তু ইহাঁদিগের বেশী দিন এখানে থাকিবার প্রয়োজন হইল না। মিঃ টমাস কেরীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধু অডনি (Udney) সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়াই বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহাদের মধ্যে আবার সদ্ভাবের সঞ্চার হইল। মিঃ অডনি মিঃ টমাসকে মালদহের নিকট মহীপাল দীঘি নামক স্থানের নীলকুঠীর ম্যানেজার করিয়া দিলেন এবং টমাসের কাছে মিঃ কেরীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকেও মদনাবাটী নামক স্থানে ঐরকম একটি চাকরী দিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই চাকরী লইয়া কেরী প্রচার সংঘের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যেন তাঁহারা আর তাঁহাকে অর্থ সাহায্য না করেন, যে অর্থ তাঁহাকে দেওয়া হইত তাহা অন্য কোন স্থানে ব্যয়িত হউক। তাঁহারা যেন মূল্য লইয়া তাঁহাকে চাষের উপযোগী যন্ত্রাদি এবং সারা বছরের

জন্য কিছু কিছু বীজ পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রহিল এই মনে করিয়া তিনি আনন্দবোধ করিবেন এবং চিঠী পত্রও পূর্ব্বের মতই লিখিবেন। কেরীর এই পত্র পাইয়া বিলাতের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন সোসাইটী কিছু ভীত হইলেন, ইঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া পাছে বা অত্যন্ত সংসারী হইয়া পড়েন,—এবং উত্তরে এই আশঙ্কা জানাইয়া, ও নির্লিপ্ত থাকিবার উপদেশ দিয়া চিঠী লিখিলেন। এদিকে কিন্তু ১৭৯৩ সনের মে হইতে ১৭৯৬ সনের মে মাস পর্য্যন্ত তিনবৎসরে এই দুই প্রচারকের জন্য মাত্র ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তখনকার হিসাবে ২০০০৲ টাকা পাঠাইয়া ছিলেন। কেরী পত্র পাইয়া একটু ব্যথিত হইলেন কিন্তু আত্ম-সমর্থনের কোন চেষ্টা করিলেন না, কেবল নিজের দৈনিক লিপিতে লিখিলেন—"নিজের মত বা কর্ম্ম সমর্থনের চেষ্টা আমি করিব না। আমার আচরণ যদি আপনি আপনার সমর্থন না করে, যুক্তিতর্ক দ্বারা ইহার সমর্থন করা অনাবশ্যক—আমি চিরদিন এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যে, যাহা করিতেছি তাহা সংঘের সকলেরই অনুমোদিত। আমরা অলসই হই আর পরিশ্রমীই হই, অথবা বণিকবৃত্তিই আমাদের প্রচারের সংকল্পকে গ্রাস করিয়া ফেলুক, আমার এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। আমাদের কাজগুলিই সাক্ষ্য দিবে। আমি কেবল এই জানি যে আমার পরিবারের জীবনধারণের জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক তদতিরিক্ত আমার আয়ের সমস্তটাই বাইবেলের প্রচারে নিয়োজিত হইবে। আমি একান্তই দরিদ্র, এবং যতদিন না বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষাতে বাইবেল প্রকাশিত হয় এবং এ দেশের লোকদের শিক্ষার আবশ্যকতা না দূর হয়, সে পর্য্যন্ত আমি দরিদ্রই থাকিব।"

বৎসরে তিনমাস তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে কিছু অধিক মনোনিবেশ করিতে হইত। বাকী নয় মাস তিনি যথেষ্ট অবসর পাইতেন। এই অবকাশকালে তিনি বাইবেলের অনুবাদ করিতেন এবং নানা স্থানে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি যে অঞ্চলে ছিলেন সেখানে জঙ্গল সমাকীর্ণ প্রায় দুইশত গ্রাম ছিল। তিনি এই গ্রামগুলির মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেন এবং কখন কখনও আরও শতাধিক মাইল উত্তরে চলিয়া যাইতেন। এ সকল স্থানে ইতি পূর্ব্বে কোন ইয়োরোপীয় পদার্পণ করেন নাই, খ্রীষ্টধর্ম্মের বার্ত্তাও পৌঁছে নাই। ১৭৯৭ সনে টমাসকে সঙ্গে করিয়া তিনি একবার ভুটানের সীমান্তে উপস্থিত হন, সেখান হইতে তুষারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ সকল দর্শন করেন। তিনি সেখানকার 'সুবা' বা শাসনকর্ত্তার সহিত উপহারাদি বিনিময়ের দ্বারা সদ্ভাব স্থাপন করিলেন এবং পরে পত্রাদি বিনিময় করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই স্থানে একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। মনে রাখিতে হইবে, যে তখন রেলপথ ছিলনা এবং রাস্তাঘাট দুর্গম ছিল এবং কেরী ছিলেন দরিদ্র। যখন নদীপথে তাঁহাকে চলিতে হইত, তখন সঙ্গে দুইখানি ছোট নৌকা রাখিতেন, একখানি রাত্রে নিদ্রা যাইবার জন্য অপরখানি রন্ধনের জন্য। নিজে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজেই যাইতেন। দিন ১০ হইতে ২০ মাইল চলিয়া লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, আলাপের সুযোগ দীর্ঘ হইলে পথ চলা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কোন কোন রবিবার দিন পাঁচশত লোক সমাগত হইত। ইহাদের ভিতর হইতে জনকতককে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে

পারিবেন বলিয়া মনে খুবই আশা হইত এবং প্রায়ই তাহা নিরাশায় পরিণত হইত।

যাহাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি দেখিতেন তাহারা কুসংস্কারাপন্ন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের কোন উচ্চ ধারণা নাই। দেবতা যেন খেলার পুতুল। তাহারা এক দিকে মিথ্যা কথা বলিতেছে, চুরি ও প্রতারণা করিতেছে আর একদিকে ঠাকুরকে ভোগ দিতেছে, বিধিমত পূজা অর্চ্চনা করিতেছে। কতগুলি বাহ্যিক কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেছে অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান বা বিবেক যেন ঘুমাইয়া আছে। তিনি ভাবিতেন ভিতরে ধর্ম্মজ্ঞান কি রূপে জাগিবে?—পাপ বোধ কি রূপে জাগিবে? একদিন একজন জানিতে চাহিল—প্রার্থনা কেমন করিয়া করিতে হয়। কেরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কোন অপরাধের জন্য লাট সাহেবের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়, তখন কি করিবে?" সে বলিল, "মুখখানা খুব ভার করিয়া দেখাইব যেন খুব দুঃখ হইয়াছে, আর কেন অন্যায় কাজটা করিয়া ফেলিয়াছি তার জন্য অনেক মিথ্যা কারণ দেখাইব।"

এই লোকটি হয়তো কেরীর নিকট বোকা সাজিয়া একটু তামাসা করিতেছিল, কিন্তু মিথ্যা কথাটা যে একটা পাপ, এ ধারণা তিনি সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাইতেন না এবং সেজন্য হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতেন। দেবতাদের সম্বন্ধে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লোকের মুখে শুনিতেন তাহাতে ছলনা, মিথ্যাবাদ এবং দুশ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সে সময় প্রচলিত ছিলনা, অন্ততঃ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা, মূর্খলোকেরা উহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইত। তাই—

দেবতার বেলা লীলা খেলা
যত দোষ মানুষের বেলা

এই প্রবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কেরীর মনে হইত, এদেশে দেবতারা আদর্শহীন, সেইজন্য মানুষের নৈতিক জীবনের এই দুরবস্থা। দার্শনিক তত্ত্ব সকলের গূঢ়মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হইলেও জনসাধারণের মধ্যে অদ্বৈতবাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।—সকলই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মই একমাত্র কর্ত্তা, আমার পাপ পুণ্য কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি,—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ইহার সহিত অদৃষ্টবাদ এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে বিশ্বাসও জড়িত ছিল।

হিন্দু ধর্ম্মের উদারতার দিক হইতেও পরধর্ম্ম গ্রহণের এক প্রকাণ্ড বাধা আছে। সকল নদী যেমন এক সমুদ্রের দিকে যায়, সেইরূপ সকল ধর্ম্ম এক ঈশ্বরের নিকটেই লইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মের একটা বাছাই অনাবশ্যক। এটা ভাল, ওটা মন্দ, এটাই একমাত্র গ্রহণীয়, এমন কথা হিন্দুর মনে আসেনা। ধর্ম্মগুলি এক একটা রাস্তা, যাহার যে রাস্তা দিয়া যাইতে ইচ্ছা যাউক। এই ভাবের মধ্যে উদারতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা গতানুগতিকতা, মানসিক জড়তা এবং নৈতিক দুর্ব্বলতারও কারণ হয়। কেরী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া এই দুর্ব্বলতায় আসিয়া বাধা পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

আর একটী ব্যাপার তাঁহাকে বিষম আঘাত দিয়াছে। তিনি যখন আশা ও উৎসাহে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, দেখা যাইত অনেকে আগ্রহে তাহা শুনিয়াছে, পরে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস ও অনুরাগ জানাইয়াছে। এইভাবে অনেক দিন মাস হয়তো কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর তাহাদের কথায় ও আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহারা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, বিশেষ অর্থলোভে, এতকাল তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য তাহাদের কিছু মাত্র ব্যাকুলতা নাই।

এই সময়ে কি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, যাঁহারা নিজ জীবনে এ রকম অবস্থায় কখন পড়িয়াছেন কেবল তাঁহারাই বুঝিবেন। কেরী একস্থানে লিখিয়াছেন :—

যে দৃশ্য দেখিয়া প্রচারকের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হওয়া উচিত, ক্রমাগতই তাহা দেখিয়া দেখিয়া আমার মন যেন অসাড় হইয়া যাইতেছে। ইহাদের দুষ্কার্য্য ও ইহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া এক এক সময়ে মনে হয় ইহাদের দুর্দ্দশার প্রতীকার অসম্ভব। মনে মনে ইহাদের নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া ধিকার দিই, তাহার পর বুঝিয়া বসিয়া নিজের নিরুৎসাহতাজনিত অপরাধের কথা ভাবি। * * * তবু আমি একথা মনে করিতে পারিনা, যে ইহাদের মধ্যে আমরা যে আসিয়াছি সেটা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে। হয়তো পরে যাঁহারা আসিবেন আমরা তাঁহাদেরই পথ প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছি। সে যাহা হইক ভগবানের অঙ্গীকার ব্যর্থ হইবে না—তাহা হইতে পারেনা। আমি তাঁহারই বলে বলীয়ান হইয়া চলিব। প্রচারক জীবন আমার কাছে সহজ ও স্বচ্ছন্দই বোধহয়। বিধর্ম্মীদিগের (Gentiles) মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের দুর্ল্লভ ধন বিতরণ করিবার মহা গৌরব ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি ইংলণ্ডীয় সমাজের জন্য—সে সমাজ যতই প্রিয় হউক—আমার এই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহিনা—সমস্ত পৃথিবীর সম্পদের জন্য ও না। আমি যেন ভারতবর্ষে খৃষ্টের ভজনালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারি, ইহার অতিরিক্ত পুরস্কার চাহিনা, ইহার বাড়া সম্মান ও আর নাই। * * * যদি দায়ুদের মত আমি কেবল উপকরণ সংগ্রহ করিবার যন্ত্র হই এবং অন্যে গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতেও আমার আনন্দ কিছু কম হইবে মনে করিনা।"

প্রকৃত প্রচারকের মনোভাব এইরূপই হওয়া চাই। —সমদর্শী

স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, বি.এ. লিখিত

বিগত কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখে রবিবার মধ্যাহ্নে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার আত্মীয়স্বজন, সহকর্ম্মী এবং প্রাণপ্রিয় ছাত্রগণকে শোকার্ত্ত করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়।

সারদারঞ্জন ১২৬৩ সালে ময়মনসিংহান্তর্গত মসূয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীনাথ রায়। তিনি জমিদার ছিলেন। সারদারঞ্জন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। বাল্যকালে কিশোরগঞ্জ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া সারদারঞ্জন ময়মনসিংহ জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হন্। তথা হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজ হইতে ক্রমে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কয়েকজন সমপাঠীর প্ররোচনায় তিনি সংস্কৃত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হন্। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার ম্যান সাহেব ফিস্ দিবার সময়ে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের নামে পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন্। শীঘ্রই তিনি আলিগড় এম্. এ.ও. কলেজে গণিতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তথায় কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিতেছিলেন এমন সময়ে একদিন উক্ত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হয় এবং তিনি পদত্যাগ করিবামাত্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। কিছুদিন পরে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বদলী হইবার আদেশ প্রাপ্ত হন্, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা-গুণে কৃষ্ণনাথ কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে দেখিয়া উক্ত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করেন যেন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা না হয়। তাঁহার প্রার্থনা সফল হইয়াছিল। এখানে কিছুকাল অতীত হইলে তিনি ঢাকা কলেজে গমন করেন। তখন তাঁহার গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্ব কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এইরূপ বলেন যে সময় থাকিলে তিনি নিজেও উহার নিকট গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র কি হইতে পারে!

ঢাকা কলেজে আসিয়াও তিনি বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। কলেজের অধ্যক্ষ বুথ (Booth) সাহেবের সহিত কোন কারণে তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়, এই উপলক্ষে তিনি কটকের র‍্যাভেন্-শ কলেজে যাইতে আদিষ্ট হন্। কিন্তু সারদারঞ্জন কলিকাতা আসিলে

গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটন্ কলেজে গণিতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় হইতে সারদারঞ্জন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত কলেজেই গণিতশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের (Vice Principal এর) পদে নিযুক্ত হন্ এবং পরে প্রিন্সিপাল নগেন্দ্র নাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তিনি অধ্যক্ষ (Principal) হইয়া এতদিন কার্য্য করিতেছিলেন।

এতক্ষণ আমরা তাঁহার কর্ম্ম জীবনের এবং গণিতবিদ্যারই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তিনি যে শুধু গণিতবিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, সংস্কৃত শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ও ব্যাকরণের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটক, রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, শিশুপালবধ; ভট্টি, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি কাব্য বহুদিন হইতেই ছাত্রদিগের এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছে। তারপর তাঁহার সিদ্ধান্তকৌমুদীর নবীন টীকা সরলতা ও জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের জন্য ব্যাকরণ-পাঠার্থীদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল এবং যদি তিনি উক্ত টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে এই টীকাই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারিত। তাঁহার সম্পাদিত কাব্য ও নাটকগুলিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। উহাদের ইংরেজী অনুবাদে তাঁহার ইংরেজীজ্ঞানের গভীরতাও সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। অনেকে মনে করেন যাঁহারা গণিতশাস্ত্র বা সংস্কৃত ভাষায় অধিক ব্যুৎপন্ন তাঁহারা ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু কিথ (Keith) সাহেব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার ইংরেজী অনুবাদের যে ভূয়ো-ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া সে ভ্রান্ত ধারণা একেবারেই দুরীভূত হয়।

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কেবল জ্ঞানমন্দিরেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি যে আজকালকার তথাকথিত ভাল ছেলের মত জীর্ণশীর্ণদেহ গ্রন্থকীট মাত্র (Book-worm) ছিলেন তাহা নহে, ক্রীড়াক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রিকেট খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত এবং এরূপ প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন। আমাদের মনে হয় তাঁহার এই sportsman like spirit অর্থাৎ খেলোয়াড়ের মানসিক ভাবই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যায় ভাষা বা ব্যবহার চুপ করিয়া সহিতে দেয় নাই, তাই তিনি স্বল্প কারণে পদত্যাগ করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহাকে ছাত্রদের সহিত ক্রীড়াক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইত, আর ছাত্রগণ ক্রীড়ায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। অবসর মত অধ্যয়ন করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত কলেরা চিকিৎসা গ্রন্থ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকেরও প্রশংসালাভ করিয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার বাল্যোচিত সারল্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অকুতোভয়তা, এবং ছাত্র ও সহকর্ম্মিগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁহাকে সকলেরই প্রিয় করিয়া রাখিয়া ছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

নবম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা গত অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি ইউরোপীয় সমাজের নানা বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া শেষে দুইটি প্রধান উপাদানে পরিণত হইয়াছে—একদিকে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রজাবর্গ। এখন ভূস্বামী বা যাজকসংঘ বা রাজা বা পৌরসংঘ বা দাসবর্গ, কেহই আর সমাজে প্রধান বা শক্তিশালী নহে—আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কেবল দুইটি শক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাই—শাসনতন্ত্র ও প্রজাশক্তি।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইহাই যখন শেষ পরিণাম, তখন আমাদেরও অনুসন্ধান এই দিকে পরিচালিত করা আবশ্যক। এই মহৎ পরিবর্ত্তনের উৎপত্তি ও পরিণতি কিরূপে ঘটিল তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে যুগে এই ব্যাপারের সূচনা এখন আমরা সেই যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্নভাবে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এবং সর্ব্বপ্রথম যে ঘটনাদ্বারা ইউরোপ এই পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের বিস্তৃত আলোচনা গত অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

এদিকে আবার ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাববৃদ্ধি ঘটে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শাসনতন্ত্র ও প্রজাশক্তি এই উভয় শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে রাজতন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে রাজতন্ত্র যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই সমাজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রাজশক্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছে; উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ।

শুধু যে উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ তাহা নহে। যখনই সমাজ তাহার আধুনিক বিশিষ্ট স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজশক্তিও বিস্তৃতি ও

সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যখন এই পরিণতি সম্পূর্ণতা লাভ করিল, যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে প্রজাশক্তি ও শাসনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ শক্তির অস্তিত্ব রহিল না, তখন দেখা গেল রাজতন্ত্রই একমাত্র শাসনতন্ত্র।

ফ্রান্সে ত এ ব্যাপার সুস্পষ্ট; কিন্তু শুধু ফ্রান্সে নহে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এইরূপ ঘটিল। কোথাও বা কিছু পূর্ব্বে, কোথাও বা কিছু বিলম্বে, কোথাও বা এক আকারে, কোথাও বা অন্য আকারে, ইংলণ্ড, স্পেন, জার্ম্মাণী সর্ব্বত্রই সামাজিক ইতিহাসের এই এক পরিণাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন ইংলণ্ডে টিউডরদিগের সময়েই ইংরাজ সমাজের নানা প্রাচীন, বিশিষ্ট ও স্থানীয় উপাদান বিকৃতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া একটা ব্যাপক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিণত হইল, এবং এই সময়েই ইংলণ্ডে রাজশক্তির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জার্ম্মাণী, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য বড় বড় রাজ্যে এই একই ব্যাপার দেখা যায়।

ইউরোপ ছাড়িয়া জগতের অবশিষ্টাংশে দৃষ্টিপাত করিলেও এতৎসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সর্ব্বত্রই দেখিব রাজশক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে; সমাজের যত কিছু প্রতিষ্ঠান তন্মধ্যে রাজতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও স্থায়ী; যেখানে ইহা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে সেখানে ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা যেমন দুঃসাধ্য, যেখানে ইহা পূর্ব্ব হইতে আছে সেখানে ইহার উচ্ছেদ সাধন করাও তেমনি দুরূহ। আদিম কাল হইতে ইহা সমগ্র এশিয়াখণ্ড অধিকার করিয়া আছে। যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন দেখা গেল সেখানেও নানা বিচিত্র আকারে রাজতন্ত্রেরই প্রাধান্য। আফ্রিকার মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া যেখানে যেখানে ব্যাপক বিস্তৃত জাতির সন্ধান পাই, সেই খানেই রাজতন্ত্রের প্রাধান্য। রাজতন্ত্র যে সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা নহে, সে নানা বিচিত্র অবস্থা, সভ্যতার নানা বিচিত্র স্তরের পক্ষে নিজকে উপযোগী করিয়া লইয়াছে; কোথাও বা সভ্যতার প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা বর্ব্বতার; কোথাও বা চীনের মত শান্তিপ্রিয় জনসমাজ, কোথাও বা দুর্দ্দান্ত সামরিক সমাজ —সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জাতিভেদসঙ্কুল শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও ইহার যেমন প্রতিপত্তি, সাম্যধর্ম্মী সর্ব্ব প্রকার স্থায়ী শ্রেণীবৈষম্যের প্রতিকূল জনসমাজেও ইহার তেমনি প্রতিপত্তি। কোথাও বা ইহা যথেচ্ছা-চারী অত্যাচারী, কোথাও বা ইহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার অনুকূল। ইহা এমন ভাবে গঠিত যে যেকোন দেহের উপর ইহাকে মস্তকের মত বসাইয়া দেওয়া যায়; ইহা এমন একটী ফল যাহা নানা বিভিন্ন প্রকারের বীজ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

ইহা যদি সত্য হয়, বাস্তবিক পক্ষে যদি রাজতন্ত্রের প্রভাব এতটা ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে শুদ্ধমাত্র ইহা হইতেই আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আমি কেবল দুইটী সিদ্ধান্তের কথা তুলিব। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে—রাজতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রভাব শুদ্ধমাত্র কোন আকস্মিক কারণ বা বলপ্রয়োগ

বা জোরজবরদস্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। নিশ্চয়ই রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার সহিত ব্যক্তিমানব বা মানবসমাজের একটা প্রকৃতিগত মিল আছে। রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সহিত অবশ্য বলপ্রয়োগের যোগ আছে, এবং ইহার উন্নতির ইতিহাসেও যে বল একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখিতে পাই একটি প্রতিষ্ঠান বহু-শতাব্দী ধরিয়া নানা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তখন এ ব্যাপারটা শুধু বলের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে বলা যায় না। মানবব্যাপারে বলের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু কোন মানবব্যাপারই মূলতঃ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হয় না। বল যে ক্ষেত্রে কাজ করে তাহার ঊর্দ্ধে একটা নৈতিক শক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং এই নৈতিক শক্তির দ্বারাই বৃহৎ বৃহৎ মানবব্যাপারের গতিপরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিমানবের পরিণতির ইতিহাসে দেহের যে স্থান, সমাজের ইতিহাসে বলের সেই স্থান। মানুষের জীবনে দেহের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে, তথাপি দেহ জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি নহে। জীবনীশক্তি দেহের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু দেহ হইতে তাহার উদ্ভব নহে। মানবসমাজের পক্ষেও তদ্রূপ। মানব সমাজের ইতিহাসে বল যত বড় স্থানই অধিকার করুক না কেন, সে সমাজ বল দ্বারা শাসিত নহে, বল মানবসমাজের চরম ভাগ্যনিয়ন্তা নহে। মানুষের চিন্তাশক্তি, মানুষের নৈতিকশক্তি বলের বাহ্য আস্ফালনের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রাজতন্ত্র যে এতটা সফলতা লাভ করিয়াছে তাহার মূলে শুধু বল নহে, এইরূপ একটা নৈতিক কারণ বর্ত্তমান।

রাজতন্ত্রের সফলতাসম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ইহার নমনীয়তা। নানা বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া লইয়া ইহা সর্ব্বাবস্থার পক্ষে উপযোগিতা লাভ করিতে পারে। এ দিকে দেখুন ইহার স্বরূপ কেমন সরল, সুনির্দ্দিষ্ট, অপরি-বর্ত্তনশীল; অথচ কত বিসদৃশ সমাজে ইহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবকাশ রহিয়াছে, মানবমনের বা মানবসমাজের নানা বিচিত্র উপাদানের সহিত নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃতিগত যোগ আছে।

এ পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠান সমগ্রভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই। একদিকে দেখিতে হইবে ইহার বিশিষ্ট স্থায়ী প্রকৃতিটি কি, নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে যাহা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছে, রাজতন্ত্রের সেই মৌলিক সত্বাটি কি। অন্য দিকে দেখিতে হইবে অবস্থা ভেদে ইহা কি কি বিচিত্র আকার ধারণ করিতে পারে, কোন্ কোন্ বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের সহিত ইহা সংযোগসম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এই উভয় দিক দিয়া রাজতন্ত্রের এইরূপ ব্যাপক আলোচনা হয় নাই বলিয়াই, জগতের ইতিহাসে ইহার স্থান

কতটুকু, তাহা সকল সময়ে উপলব্ধ হয় নাই, ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা পোষিত হইয়াছে।

আমি এখন আপনাদের সহিত এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এই রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব সম্বন্ধে একটা যথাযথ ও সমগ্র ধারণা যাহাতে হয় আমি সেই চেষ্টাই করিব। এই প্রভাবের কতটুকুই বা রাজতন্ত্রের মূলপ্রকৃতিসম্ভূত কতটুকুই বা অবস্থাভেদজনিত তাহা বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজতন্ত্রের প্রভাবের মূলে একটা নৈতিক শক্তি বিদ্যমান। এই নৈতিক শক্তি কোথায় নিহিত? যে মানুষটী আজ রাজা হইয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছেন, শুদ্ধমাত্র তাঁহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যেই কি নৈতিক শক্তি নিহিত? নিশ্চয়ই না। একটী মাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ, অব্যবস্থিত, অসংলগ্ন ও অজ্ঞানান্ধ। সমগ্র জনসমাজ যখন রাজতন্ত্রকে একটা সুব্যবস্থ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, দার্শনিকগণ যখন ইহাকে শাসনপদ্ধতি হিসাবে সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই রাজতন্ত্র বলিতে একজন মাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার শাসন বুঝেন নাই।

রাজশক্তি শুদ্ধমাত্র একজন ব্যক্তি মানবের ইচ্ছাশক্তি নহে, যদিও বাহ্যতঃ ইহা সেই আকারে দেখা দেয় বটে; ন্যায়ধর্ম্মই রাজা; মানুষ রাজা ন্যায়ধর্ম্মের বিগ্রহ মাত্র। যে রাজশক্তি সমাজশাসনের একমাত্র অধিকারী তাহা এমন একটা ইচ্ছাশক্তি যাহা স্বভাবতঃই জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, অপক্ষপাতী, বিশেষ বিশেষ মানবের ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট। এই উৎকর্ষের বলেই সে সমাজ শাসনের অধিকারী। সুতরাং ইহা কখনও রাজনামধারী ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা হইতে পারে না। জনসমাজ রাজা বলিতে এই আদর্শ সত্তাই বুঝিয়াছে এবং এই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই তাহারা রাজতন্ত্রের শাসন মানিয়া আসিতেছে।

ইহা কি সত্য যে ন্যায়ধর্ম্মের রাজত্ব বলিয়া কোন একটা পদার্থের অস্তিত্ব আছে? বাস্তবিক কি কোথাও এমন একটা আদর্শ ইচ্ছাশক্তি আছে যাহা মানুষকে শাসন করিবার ন্যায্য অধিকারী? মানুষ যে ইহা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ মানুষ বরাবরই এই আদর্শ ইচ্ছাশক্তির অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে, এবং না চাহিয়া থাকিতে পারে না। একটা সমগ্র জাতির কথা ছাড়িয়া দিউন, শুদ্ধমাত্র একটি ক্ষুদ্রতম জনমণ্ডলীর ধারণা করুন। মনে করুন সেই মণ্ডলী এমন একজন রাজা দ্বারা শাসিত যাহার অধিকার শুদ্ধমাত্র বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে যুক্তিও মানেনা, ন্যায়ধর্ম্মও মানে না, সত্যও মানে না। মানব প্রকৃতি এ প্রকার শাসনের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে অনিচ্ছুক। সে কেবল ন্যায়ের

শাসন মানিতে চায়, যেখানে ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নহে। ইতিহাস এই সার্ব্বজনীন সত্যের প্রত্যক্ষ বিবৃতি ভিন্ন আর কি? জাতীয় জীবনে যে সকল বড় বড় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে গুলি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মানুষের সাগ্রহ চেষ্টা ভিন্ন আর কি? শুধু যে বিভিন্ন জাতি এই ন্যায় রাজত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাহা নহে, দার্শনিকগণও ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এবং অনবরত ইহার সন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। নানা বিভিন্ন পদ্ধতির রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি এই ন্যায়শাসনাধিকারার সন্ধান ভিন্ন আর কি? সমাজ শাসন করিবার ন্যায্য অধিকারী কে, এই প্রশ্ন ভিন্ন রাজনীতিশাস্ত্রের অন্য কি আলোচ্য বিষয় আছে? রাজকতন্ত্রবাদী বলুন, রাজতন্ত্রবাদী বলুন, অভিজাত তন্ত্রবাদী বলুন আর গণ-তন্ত্রবাদীই বলুন, সকল পদ্ধতির রাজনীতিবেত্তাই দাবী করেন যে তাহারাই কেবল ন্যায্য শাসনাধিকারার সন্ধান পাইয়াছেন। সকলেই সমাজকে আশ্বাস দিতেছেন যে তাঁহারা ন্যায্য অধিকারীর হস্তে সমাজের শাসনভার অর্পণ করিতে চান। তাই পুনরায় বলি, রাজনীতিবিদের চিন্তা ও জাতিসমূহের চেষ্টা উভয়ের এই একই লক্ষ্য।

ন্যায্য শাসনাধিকারার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া তাহারা থাকিবে কেমন করিয়া? এবং তাহারই সন্ধানে অবিরতভাবে নিযুক্ত না থাকিয়া তাহার উপায় কি? একটা নিতান্ত সামান্য বিষয় ধরুন; ধরুন একটি সমগ্র সমাজ বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি লোক অথবা একটিমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাই বা একটা নূতন প্রভাব সঞ্চার করিতে চাই। ইহা করিতে হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র একটা নীতি অনুসরণ করিতে হয়, একটা ন্যায়সঙ্গত আদর্শ অনুসরণ ও পালন করিতে হয়। সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশ লইয়াই ব্যাপৃত থাকুন অথবা বড় বড় ঘটনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকুন, সর্ব্বত্রই দেখিবেন হয় কোন একটা নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে না হয় কোন একটা ন্যায়যুক্তিসঙ্গত নূতন ভাবকে বাস্তব আকৃতি দিতে হইবে। এই আদর্শই সেই ন্যায্য শাসনাধিকারী যাহার সন্ধানে একদিকে দার্শনিক অন্যদিকে মানবসমাজ নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে।

এই যে আদর্শ শাসনাধিকার ইহা কতদূর পর্য্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে একটা পার্থিব শক্তি বা একটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে? এরূপ ধারণা কি পরিমাণে অসত্য ও বিপজ্জনক? বিশেষ করিয়া রাজতন্ত্রের মধ্যে এই আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি মনে করা উচিত? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও কতটুকু সীমার মধ্যে একজন বাস্তব মানুষকে এই আদর্শ রাজাধিকারের প্রতিরূপস্বরূপ মানিয়া লওয়া চলে? এ সকল বড় বড় প্রশ্ন, এ সকল প্রশ্নের সমাধান করা এখানে আমার

উদ্দেশ্য নহে। তথাপি এগুলির উল্লেখ না করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১ বিবেকানন্দ স্মৃতি

আমেরিকা প্রবাসের বিপুল পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বামীজি ভারতে ফিরিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসে শ্বাসকষ্ট রোগে পীড়িত হইয়া তিনি কিছুদিন দেওঘরে বাস করেন। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশত্যাগী হইয়া এণ্ট্রান্স ক্লাসে নাম লিখাইয়া সেই সময় আমি কিছুদিন দেওঘরে পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী-প্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তখন আমাদের হেড মাষ্টার। যোগীন বাবু, যতদূর মনে হয় নরেন্দ্র নাথের ছাত্র জীবনের বন্ধু। তিনি একদিন ক্লাসে আসিয়া বিবেকানন্দের দেওঘর আগমনের সংবাদ দিলেন এবং আমাদিগকে সুবিধামত গিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলেন। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী না হউক, অন্ততঃ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইব, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা তখন স্কুলের ক্ষুদ্র ডিবেটীং ক্লাবটীর প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। তাই বিশ্ববিশ্রুত বক্তা বিবেকানন্দ সহরে আসিয়াছেন শুনিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। স্বামীজি অসুস্থ হইয়া আসিয়া ছিলেন, তাই তাঁহার নিকট দলবদ্ধ হইয়া যাইতে সাহস হইল না। একটী মাত্র সঙ্গী লইয়া মহাপুরুষ দর্শনে বাহির হইলাম। দেওঘর সহর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একটী বড় রাস্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। সহরের পশ্চিম প্রান্তে ঐ রাস্তার উপর ক্ষীণকায়া দাড়োয়া নদীর নিকট একটী গৃহ বিবেকানন্দের বাসস্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রথমটা সে বাড়ীতে আমাদের ঢুকিতে সাহস হয় নাই। খানিকটা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বাড়ীতে ঢুকিতেই একজনকে দেখিয়া স্বামীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি অদূরে যাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন তাঁহাকে দেখিয়া বিবেকানন্দ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না। বিবেকানন্দ তখন তাঁহার পূর্ব্বস্বাস্থ্য

অনেকটা হারাইলেও তাঁহার উন্নত দেহ ও সৌম্যমূর্ত্তি রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তখনও নিষ্প্রভ হয় নাই। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থামিয়া গেলেও যেমন তাহা প্রথমটা উত্তপ্ত থাকে, বিবেকানন্দের নিকট গিয়া যেন সেইরূপ উত্তাপ অনুভব করিলাম। যতদূর মনে হয় স্বামীজি আলেষ্টার রকমের একটা লম্বা কোট পরিয়া ছিলেন, হাতে ছাতা ও মাথায় পাগড়ী ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমরা অভিবাদন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি চাও?" সভয়ে উত্তর করিলাম—"আমরা স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

"চল আমরা একটু বেড়াইয়া আসি"—এই কথা বলিয়া আমাদিগকে লইয়া দাড়োয়া নদীর দিকে চলিলেন। পথ চলিবার সময় দেখিলাম তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার কি হার্টের (হৃদপিণ্ডের) অসুখ?"

তিনি বলিলেন—"না, আমার ফুস্‌ফুসের অসুখ হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে কোথায় থাক?"

বলিলাম—"স্কুল বোর্ডিংএ।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"পূর্ব্ব বঙ্গে"—

"আমি পূর্ব্ব বঙ্গে গিয়াছি। তোমরা খুব চাইন মাছ খাও—না?"

"আজ্ঞে না।"

দূরে পশ্চিমদিকে আকাশের গায় ডিগ্‌রিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছিল। উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি ঐ পাহাড়ে গিয়াছ?"

উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে না।"

বলিলেন—"সে কি হে, তোমরা এখনও ঐ পাহাড়ে যাও নাই? ছুটীর দিনে কিছু খাবার নিয়ে দল বেঁধে ঐ পাহাড়ে যাবে, সমস্ত দিন ওখানে থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরবে।"

"হোষ্টেলে খাওয়া দাওয়া কিরূপ হয়?"

বলিলাম—"মন্দ নয়।"

"ঘি টি পাও?"

"পাই, কিন্তু তত ভাল নয়।"

"ঘি খাওয়া ভাল নয়—ঘি-টা indigestible (দুষ্পাচ্য)। মাখন খাবে।"

আমরা তাঁহার নিকট বেদান্ত ও গীতার মস্ত মস্ত কথা শুনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু যে পাত্রে যাহা শোভা পায় তাহাই দিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমরা কি মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসিতে পারি?"

বলিলেন—"হঁ, এসো। তবে আমার শরীরটা আজ কাল ভাল যাইতেছে না, আমি কিছুদিন বিশ্রাম করি তারপর তোমাদের সঙ্গে ভাল করে দেখাশুনো হবে।"

দেখিলাম তাঁহার হাঁটিতে কষ্ট হইতেছে তাই আবার গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। এইখানে সামান্য একটী ঘটনা ঘটিল তাহা হইতে স্বামীজির মহানুভবতার পরিচয় পাইয়াছি। একজোড়া নূতন পাদুকা আমার পায়ে ছিল—কিন্তু তাহার ফিতা ঠিক বাঁধা ছিলনা। ফিতার দুটা প্রান্তই একদিকে বাঁধা ছিল ইহা স্বামীজির চক্ষু এড়ায় নাই।

তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"ওহে তোমার জুতোর ফিতে তো ঠিক বাঁধা হয় নাই।" আমি সে কথা কাণে না তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আবার বলিলেন—"ওহে ফিতে ঠিক করে বেঁধে নাও।"

ফিতে বাঁধার কোথায় গোল হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই—তাই স্বামীজির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু স্বামীজি ছাড়িবার পাত্র নন, দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি মহতো মহীয়ান হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত যেন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"পা টা এই দিকে দাও তো?"

আমি আড়ষ্ট হইয়া মন্ত্রবৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম—

তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"Well let me have it."

আমি পুত্তলিকার মত দক্ষিণ পদ তাঁহার দিকে সরাইয়া দিলাম। তিনি চট্ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহূর্ত্তের মধ্যে ফিতার দুটা মাথা দুদিকে দিয়া বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিবেকানন্দকে আমার পাদুকা স্পর্শ করিতে দেখিয়া আমার দেহে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল, আমি শশব্যস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম—তিনি দূরে সরিয়া গেলেন, প্রণাম করিতে দিলেন না।

আজ ২৭ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—কিন্তু সুদূর সন্ধ্যার সেই ঘটনাটী মনে হইলে, আমার শরীর এখনও রোমাঞ্চিত হয়—ও স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত মূর্ত্তি আমার মানসপটে উদিত হয়।

তাঁহাকে সে বার আর একদিন মাত্র দেখিয়াছিলাম—সে তাঁহার দেওঘর ছাড়িবার দিন। একদিন শুনিলাম স্বামীজি সেই দিন দুপ্রহরের ট্রেনে দেওঘর ছাড়িতেছেন। যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া দেখি স্বামীজি ও নাট্যকার বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এক কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া আছেন। এবার স্বামীজির অন্য বেশ; আলখেল্লার মত পোষাক ছাড়িয়া হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়াছেন, ও ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে পান খাইতেছেন ও ধূম্র পান করিতেছেন। তারপর স্বামীজিকে দেখার সৌভাগ্য আর হয় নাই।

স্বামীজিকে দেখিয়া তাঁহার বীর্য্য ও সরলতার পরিচয় অতি সহজে পাওয়া গিয়াছিল। শিবোহম্ শিবোহম্ যাঁহার জপমন্ত্র ছিল, তিনি যে জরা ব্যাধির নিকট সহজে পরাজিত হইতে রাজি নন, তাহা ক্ষুদ্র বালক হইয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সেই বার রোগশয্যাশায়ী শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুকে এক বার দেখিতে যাই। যত দূর মনে হয় তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ ঔষধপত্রে তত বিশ্বাস করিতেন না। Sister Niveditaর লেখা পড়িয়াও মনে হয় সাধারণ চিকিৎসকের প্রতি স্বামীজির তত আস্থা ছিল না। একস্থানে ভগ্নী নিবেদিতা লিখিতেছেন—"For the sake of the work that constantly opened before him, the swami made a great effort, in the spring of 1902, to recover his health and *even undertook a course of treatment* under which, throughout April May and June he was not allowed to swallow a drop of cold water." বিবেকানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। পরমহংস দেবকে কোনও মতবাদের কোঠায় ফেলা যায় না। কিন্তু স্বামীজি আপনাকে বৈদান্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি আপনাকে শঙ্করের মতাবলম্বী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগের 'Neo vedantism' এর অন্যতম নেতা। আমেরিকার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ William James তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The paragon of monism is the Vedanta and Swami Vivekananda is the paragon of vedantists" * এই নবীন বেদান্তের ধারা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া স্বামীজির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

অ-দ্বৈত তত্ত্ব ভারতের সাধনার চরমতত্ত্ব—দ্বৈতকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা ও চিন্তাধারা একের পানে ছুটিয়াছে। তাই অনেক বৈদান্তিক ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কেন না জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ জনিত সীমাবদ্ধ, তাই আত্মাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা হইয়াছে। আত্মাতে ইচ্ছাশক্তি আরোপ করিতেও তাঁহারা রাজি নন। শঙ্করাচার্য্য আপনার গীতাভাষ্যে নৈয়ায়িকদিগের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন—"যচ্চাহুঃ 'আত্মীয়ৈঃ স্বতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা কর্ম্ম করোতি' ইতি, ন; তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয় পূর্ব্বকত্বাৎ।"—"নৈয়ায়িকগণ যে বলিয়া থাকেন, আত্মা নিজেই জ্ঞান, ইচ্ছা, এবং প্রযত্ন এই তিনটী গুণের দ্বারা বাস্তবিক কর্ত্তা হইয়া থাকেন, এই মতটিও সঙ্গত নহে। আত্মার যে গুণ কয়টির উল্লেখ তাঁহারা করিয়া থাকেন, ঐ তিনটী গুণও মিথ্যা প্রত্যয়ের ফল।" (গীতা, ২৮।৬৬) এই মতানুযায়ী তাহারা মনে করিতেন একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ লাভের উপায়,—"কুতঃ সন্দেহঃ 'যজ্জ্ঞাত্বা অমৃতমশ্নুতে,' 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'—ইত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাৎ জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি।"—"এই প্রকার সন্দেহ হইতেছ কেন?—'যাহাকে জানিয়া অমৃতলাভ করে' 'তাহার পর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার অনন্তর ভাবে প্রবেশ

*Varieties of Religious Experiences.

করে' এইরূপ অনেক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বাক্য সকল প্রতিপাদন করিতেছে যে, কেবল জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়।" (গীতা শঙ্করভাষ্যম্, ২৮।৬৬)।

স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের মত অগ্রাহ্য না করিয়া মনে করেন প্রেম এবং সেবাও মোক্ষ লাভের সহায়। স্বামীজি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"Religions in India culminate in Freedom. But even this comes to be given up, and all is love, for loves sake. Last of all comes love without distinction, the self. There is a Persian poem that tells how a lover came to the door of his beloved and knocked. She asked 'Who art thou?' and he replied—'I am so and so, thy beloved!' and she answered only, 'Go! I know none such!' But when she had asked for the fourth time, he said—'I am thy-self, O my beloved, therefore open thou to me!'—and the door was opened."

কর্ম্মযোগ নামক তাঁহার উপাদেয় গ্রন্থে স্বামীজি বলিতেছেন,—"সকল কর্ত্তব্যই পবিত্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরোপাসনা। উহা যে বদ্ধ জনগণের অজ্ঞানভারাক্রান্ত আত্মাকে উদ্ধার ও উহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * * * যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্ত্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। আর সে তাহার সারা জীবনটা নিশ্চিতই কোন কার্য্যে সফল-কাম হইতে পারিবে না। এস, আমরা কাজ করিয়া যাই—আমাদের কর্ত্তব্য যাহাই হউক না কেন, তাহাই যেন করিয়া যাইতে পারি, আর সর্ব্বদাই যেন ঘাড় পাতিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চিত আলোক দেখিতে পাইব।"

অদ্বৈত তত্বের ভূমিতে প্রেম ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাতে সেবাধর্ম্ম এক অভিনব প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডয়সেন তাঁহার বেদান্তের বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—"আমরা বাইবেল হইতে শিখিয়াছি, ঈশ্বরকে সমগ্র শক্তি, সমগ্র মন ও সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে। কিন্তু এই উপাদেয় উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম আমরা বেদান্তের 'তত্বমসি' বাক্যে দেখিতে পাই। যখন আমার প্রতিবেশীর ভিতর আমারই আত্মার প্রতিরূপ দেখিতে পাই তখন তাহাকে আত্মবৎ প্রীতি করা আর অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।"

মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলকও এই Neo-Vedantism এর অন্যতম নেতা। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গীতারহস্যে কর্ম্মের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি পরমাত্মা তিনি শুধুই দ্রষ্টা নহেন,—তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি বিশ্বকর্ম্মা। বিপুল বিশ্বের তরঙ্গায়িত শক্তিতে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। তিনি অনন্তকর্ম্মপ্রস্রবণ। তাঁহার সহকর্ম্মী হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষার ভিতর এই Neo-Vedantism এর প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। আধুনিক Nationalism কে

জড়বাদ ও ক্ষণিক সুখবাদের ভিত্তি হইতে উঠাইয়া আনিয়া ভারতের প্রাচীন সাধনা ও সিদ্ধির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

চা-পান।

শ্রীসুশোভন চৌধুরী *

বহুদিন হইতে এদেশে চায়ের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেমন লাভজনক হইয়াছে এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে এই দেশব্যাপী নেশার দোষগুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেকে বলেন ও অনেকের ধারণা যে চীনদেশ চায়ের আদি জন্মস্থান কিন্তু অতি-পুরাকালে ভারতবর্ষ হইতে চা চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে 'বোধিধর্ম্ম' নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করিয়া তথায় ইহা প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৎকালীন চীনসম্রাটের শ্বশুর ওয়াংব্রেং সর্ব্বপ্রথম চা পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান। প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল চা চীনদেশ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। তখন ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। বহুদিবস পর্য্যন্ত একমাত্র চীনদেশ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র চা প্রেরিত হইত। ইংরাজেরা চীনদেশবাসী হইতে চা পান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এখন কিন্তু উহারাই আমাদের শিক্ষাগুরু। আমরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় তাই কোনরূপ বিচার না করিয়াই এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজেরা শীতপ্রধান দেশবাসী, তাহাদের পক্ষে চা পান করা অনুপকারী হইলেও আবশ্যকীয় কিন্তু চা পান না করিয়াও শীতপ্রধান দেশে অনেকের তেমন বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না। আমরা প্রথমে অনুকরণের অভিপ্রায়ে চা পান করিতে আরম্ভ করি কিন্তু পরিশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে ইচ্ছা হইলেও এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি না।

এদেশে চায়ের প্রচলন বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। এখন আসাম, সিংহল ও বঙ্গদেশের কয়েক জেলায় (প্রধাণতঃ দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে)

---

* এই প্রবন্ধটী যিনি পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার নাম আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। শ্রীযুক্ত সুশোভন চৌধুরী প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত নূতন করিয়া লেখায় উহার নামেই ইহা প্রকাশিত হইল। প্রথম লেখকের নামটী পাইলে আমরা সুখী হইব। নঃ সঃ

যথেষ্ট চা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি ও ত্রিবাঙ্কুরে চায়ের বাগান আছে। পার্ব্বত্য জায়গাতে চা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সকল প্রকার চায়ের মধ্যে দার্জ্জিলিংয়ের চা-ই অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু।

চা একপ্রকার গাছের পাতা। সেই পাতা বিশেষ প্রণালীতে শুষ্ক ও বাছাই হইয়া বিক্রয়ের জন্য চায়ের আকারে বাজারে প্রেরিত হয়। সাধারণতঃ চা তিন প্রকার,—সবুজ, কাল ও হলদে। ইহাদের পার্থক্য প্রধাণতঃ চারাগাছ হইতে পাতা বাছাই করার ও নানাবিধ প্রণালীতে শুষ্ক করার উপর নির্ভর করে। চায়ের নিজের কোন গন্ধ বিশেষ নাই, উহাতে সুগন্ধ করিতে হইলে নানারকম সুগন্ধী ফুলের পরাগ মিশ্রিত করিতে হয়। সাধারণতঃ ময়োণ (moyone), উলোঙ্গ (Oolong), ম্যানুমা (manuma) এবং সুগন্ধ পিকো (pe-koes) প্রভৃতির চূর্ণ করিয়া (dust) চায়ের পাতায় মিশ্রিত করিয়া উহা সুগন্ধী চা রূপে বাজারে বিক্রয় হয়।

রসায়ণবিদ্ পণ্ডিতগণ চায়ের পাতা বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ পাইয়াছেন। Essencial oil, Theine, Beheic acid, Quercetine, Tannin, Adenine, Quercitannic acid, Gallic acid, Oxalic acid, Gum, Chlorophyll, Wax, Albumin, Colouring matters এবং Ash. পানীয় চার মধ্যে এই সকল পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণেই থাকে।

কোনিগ (koenig) নামক জনৈক রসায়ণবিদ্ চায়ে এই সকল দ্রব্য কোনটা কি পরিমাণে আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

জল	Water	11·49%	grammes.
যবক্ষার ঘটিত পদার্থ	(Nitrogenous substance)	21·22 "	"
থেয়িন	(Theine)	1·34 "	"
ঈথার সম্পর্কিত তৈল	(Etherial oil)	·67 "	"
চর্ব্বি, পত্র-হরিৎ, মধুথ	(Fat, chlorophyll, wax)	3·62 "	"
গম ও ডেক্সট্রিন	(Gum & dextrine)	7·13 "	"
ট্যানিন	(Tannin)	12·36 "	"
যবক্ষার ঘটিত অন্যান্য দ্রব্য	(Other nitrogenous matters)	16·75	grammes.
	(Woody fibres)	20·30 "	"
ছাই	(Ash)	5·11	
		99·99	

এই উপাদানগুলির মধ্যে আমরা কেবল থেয়িন ও ট্যানিন এই দুইটী দ্রব্যের বিষয় আলোচনা করিব। অপরিমিত মাত্রায় এই দুইটী পদার্থই মানুষের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। Oudry নামক জনৈক পণ্ডিত থেয়িন প্রথম আবিস্কার করেন। চারা গাছ হইতে যে নুতন পাতা বাছাই করা হয়, তাহার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে থেয়িন থাকে। বৃক্ষ

পুরাতন পাতায় উহা অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে থেয়িন বিষজাতীয়, প্রচুর পরিমাণে উহা খাইলে মানুষ মারা যায়। জনৈক রাসায়নিক ·২৫ গ্রাম থেয়িন ভক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহা পাকস্থলীতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উৎপাদন করে, সমস্ত শরীর উত্তেজিত করে, সকল জিনিষেই দৃষ্টিভ্রম ঘটায়, ও অবশেষে নিদ্রাবেশ আনয়ণ করে। একটি বিড়ালকে ·২৫ গ্রাম থেয়িন খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে বিড়ালটী ৩৫ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাতেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে পানীয় চার মধ্যে একটি বিষ জাতীয় পদার্থ আছে। অনেক চা-পানাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপায়ীকে ঘৃণা করেন, কিন্তু তাহারা নিজেরা যে কতক পরিমাণে মদ্য জাতীয় পদার্থ পান করিতেছেন তাহার দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই। থেয়িনের ন্যায় ট্যানিন বা ট্যানিক এ্যাসিডও একটী তীব্র বিষ। পাকস্থলীর পক্ষে ইহা বড়ই অপকারী। চা পাতায় এই পদার্থটী বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার পরিমাণ লাঘব করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু সে চেষ্টা সামান্যই সফল হইয়াছে। এই ট্যানিনই চামড়া পাকাইবার প্রধান উপাদান। খুব ভাল চায়ের সঙ্গেও আমরা কিছু কিছু ট্যানিন উদরস্থ করি, চা কড়া হইলেত প্রচুর পরিমানেই করি।

আমরা যাহা পান করি তাহা অন্নবহা নলী (gullet) দিয়া পাকস্থলীতে যায়। এই নলী ও পাকস্থলী অতি সূক্ষ্ম সংযোজক তন্তুর ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। এই ঝিল্লীর (membrane) শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। প্রচুর পরিমাণে অথবা কড়া চা পান করিলে তাহাতে যে ট্যানিক এসিড (tannic acid) আছে ক্রমাগত উহার সংস্পর্শে আসিয়া এই ঝিল্লী কষা (পাকান) চামড়ার মত শক্ত হইয়া যায়। তখন এই ঝিল্লীর শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ফলে পাকস্থলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে। অনেক স্থলে ইহাই ডিস্পেপ্‌সিয়ার একটী প্রধান কারণ। অনেকে সকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়া খালি পেটেই চা পান করেন। ইহার মত কু-অভ্যাস আর নাই। খালি পেটে চা পান করিয়া পরে যাহা কিছু আহার করা যায় তাহা রীতিমত পরিপাক হয় না। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে পাচক-রস নির্গমের ব্যাঘাৎ জন্মে, সুতরাং পরিপাকেরও ব্যাঘাৎ জন্মে। তা ছাড়া ইহাতে পূর্ব্ব রাত্রে সঞ্চিত মুখগহ্বরের সমুদয় মল পরিত্যক্ত না হইয়া উদরস্থ হয়, ও ফলে নানাপ্রকার উদরের পীড়া জন্মিতে পারে। ইহাও ডিস্‌পেপসিয়ার আর একটী কারণ। যাহাদের পরিপাক শক্তি অল্প তাহাদের পক্ষে চা পান করা একেবারেই অনুচিত। গরম তীব্র চা পান করা বড়ই অনিষ্টকর। কারণ চা যত তীব্র হইবে তাহার অনিষ্ট করিবার শক্তিও ততই বেশী হইবে। অত্যধিক চা পান কারলে বুক ধড়ফড়, মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, শিরঃশূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন স্মরণশক্তি হ্রাস প্রভৃতি স্নায়বিকদুর্ব্বলতামূলক ব্যাধিসমূহ উপস্থিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হয়, ধমনীর স্ফীতি বশতঃ বহুল পরিমাণে রক্ত মূত্র-কোষের মধ্য দিয়া যাওয়াতে অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। ইহাতে অজীর্ণ ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যাহাদের হৃদ্‌রোগ বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে তাহাদের পক্ষে চা পান একেবারেই নিষিদ্ধ। অধুনা ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতার বড়ই

প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অপরিমিত চা পান করাও উহার জন্য অনেক পরিমানে দায়ী হইতে পারে। ছাত্র সমাজে পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগিবার জন্য চায়ের প্রচলন অত্যন্ত অধিক এবং সেই জন্যই উহাদের অম্ল, অজীর্ণ, শূলবেদনা, ডিস্‌পেপসিয়া, উদরাময় ও কোষ্টকাঠিন্য প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। ক্যাফেইন (Caffeine) চায়ের আর একটী উপাদান। উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে হৃদ্‌পিণ্ড উত্তেজিত হয় এবং অধিক রক্ত মস্তকে গিয়া মস্তিষ্ক উত্তেজিত করে এবং তাহারই ফলে অনিদ্রা আসিয়া থাকে। ডাক্তার আল্‌মন্ বলেন প্রত্যেক পেয়ালাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্যাফেইন্ থাকে এবং সেই ক্যাফেয়িন্ পান করিয়া লোকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। জনৈক পাশ্চাত্য রসায়ণবিদ্ পণ্ডিত বলেন চা-য়ে নাকি একটি অম্ল বিষাক্ত পদার্থ (Uric Acid ?) আছে, উহা নিয়মিত পরিমাণে মানব দেহে সঞ্চিত হইলে বাত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চা ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হয়। মাথা ধরা নিবারণের জন্য ডাক্তারগণ তীব্র চা পান করিতে বলেন। গরম জলে তৈয়ার করিবার পরিবর্ত্তে, গরম দুধে তৈয়ার করিলে চা রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর পানীয়। অধুনা কলিকাতায় প্রচুর চায়ের দোকান হইয়াছে। তাহাতে সাধারণতঃ একই চা বার বার সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই নিয়মে চা তৈয়ার করিয়া পান করা যে কত অনিষ্টকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আজকাল চা পান করা একটি ব্যসন হইয়া উঠিয়াছে। এই অভ্যাস ভাল কি মন্দ, আবশ্যকীয় কি অনাবশ্যকীয়, উপকারী কি অপকারী সে বিচার সহৃদয় পাঠকবর্গ করিবেন। *

* মদ্য পানের ন্যায় চা পানের সার্থকতা সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যথানিয়মে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট জাতীয় চা পরিমিত সেবনে যে কোন অপকার হয় তাহা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে। অনেকের মতে প্রতিদিন প্রত্যুষে এক পেয়ালা গরম চা নিয়মিত পান করিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। চা পানে যে শরীরের অবসাদ দূর হয়, মনে স্ফূর্ত্তি আসে ইহাও সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন এই স্ফূর্ত্তি আসে শরীরে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির বিনিময়ে (at the expense of the reserve energy). ইহা কতক পরিমাণে সত্য হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু মদ্য পানের পর যেরকম অবসাদ আসে, চা পানের পর তেমন অবসাদ আসেনা, সুতরাং এই শক্তিক্ষয়ের কথা সত্য হইলেও উহা এত সামান্য হওয়াই সম্ভব যে উপকারের তুলনায় উহা ধর্ত্তব্য নহে। কড়া চা, নিকৃষ্ট জাতীয় চা, অথবা অত্যধিক পরিমানে চা পান যে শরীরের অনিষ্ট করে তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মদ্য পানের বাতিকের (dipsomania) ন্যায় চা পানের বাতিকও পাশ্চাত্য দেশে সময় সময় দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ইহার কথা কোথাও শোনা যায় নাই। তা ছাড়া উহা একটী রোগ, সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। নঃ সঃ

বিবিধ চিন্তা

তরুণ জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

তরুণ জীবনগুলি আপনার জ্ঞানসম্পদে, ভাববৈভবে এবং চঞ্চল উচ্ছ্বাসমান কর্ম্মশক্তির আবেগে, অধীরভাবে যখন পথ খুঁজিতে থাকে তখন তাহাদিগকে বার্দ্ধক্যসুলভ বিরস বৈরাগ্যের উপদেশ দিলে সুফল ফলিবে না। শান্ত সমাহিত হইয়া নাম জপের সময় তাহাদের নয়। দুর্ভাবনা ও ভয় তাহাদের নবীন জীবনের মধ্যে রন্ধ্রপথ কাটিয়া প্রবেশ করে নাই, প্রতিকূল ঘটনার সহিত এখনও তাহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই, শ্রান্তি নৈরাশ্য ও অবসাদ এ লোক হইতে লোকান্তরের দিকে তাহাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই। তাহারা ছুটিতে চায়—জয় ধর্ম্মের জয়, জয় কর্ম্মের জয়, জয় সুনীতির জয়, জয় সুকৃতির জয়, জয় দুঃসাধ্য-সাধনের জয়, জয় অসাধ্যসাধনে প্রাণপাতের জয়, বলিয়া সিংহনাদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ুক।

(৪)

যুবকেরা সমাজের সৈনিকদল। তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় রাখিলে বিপদ। সৈনিক পুরুষেরা আবশ্যক হইলে প্রাণ দিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করে কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ তো প্রতিদিনের ঘটনা নয়, শান্তির দিনে তাহারা কি করে? তাহাদের বলিষ্ঠ দেহ, তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র যাহাতে নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া না যায় সেজন্য অস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী রাখে, ব্যায়াম ক্রীড়া কুচ কাওয়াত ও কৃত্রিম যুদ্ধাদির আয়োজন করিয়া অঙ্গের চালনা ও বুদ্ধির চালনা দ্বারা দেহের দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা, পটুতা, মনের সপ্রতিভতা ও আশুকর্ত্তব্যকারিতা রক্ষা করে।

যুবকেরা সমাজের সৈনিকদল। তাহাদিগকে ক্ষুধিত রাখিলে বিপদ। তাহাদের দেহ মনের উপযুক্ত খোরাক দিতে হইবে। সে খোরাকের পরিমাণ বৃদ্ধের খোরাকের তুলনায় একটু বেশী হওয়াই আবশ্যক। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের আনন্দ তাহাকে সঞ্চয় ও ব্যয় করিতে দেওয়া প্রয়োজন। যদি অমিত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মবল তাহাকে অনাচারী ও অত্যাচারী করে, যদি অতিরিক্ত আনন্দ স্পৃহা তাহাকে বিলাসিতা ও দুর্নীতির পথেই লইয়া যায়, এই ভয়ে তাহাদিগকে দেবতার ধ্যান আরাধনায় বহুক্ষণ নিযুক্ত রাখিবার প্রয়াস পাইলে সে প্রয়াস সফল হইবে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের পথে ধ্যান আরাধনা আপনা হইতেই তাহাদের চঞ্চল গতিকে থাকিয়া থাকিয়া স্তব্ধ করিবে।

(৫)

প্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দ স্পৃহা যদি ক্রমে দূষিত আমোদের স্রোতে ভাসাইয়া লয়, যদি নীতির বাঁধ ভাঙ্গে, তখন কি করা যাইবে? তখন?

নদীর জল যখন কূল প্লাবিত করিয়া লোকালয়ের দিকে ধাবিত হয়, নগর ও গ্রাম নষ্ট করে, তখন লোকে কি করে? ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত বর্ষার জল সঞ্চিত হয়, কি করে? যে দিকে জলকে প্রবাহিত হইতে দিলে ক্ষতি নাই, পথ কাটিয়া সেই দিক দিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করে।

যে অবস্থা প্রবহমান জীবনের উপচীয়মান শক্তিরই পরিচয়, সে অবস্থার জন্য নূতন ব্যবস্থা চাই। একদিন এক ব্যবস্থা করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে আসে নাই। তাহা যদি হইত উন্নতির ও সুনীতির অর্থ থাকিত না, সভ্যতার বিকাশ দেখা যাইত না। নূতন নূতন অবস্থা আর সঙ্গে সঙ্গে নূতনতর ব্যবস্থা, মানব জাতির যাত্রাপথে নূতন নূতন বিঘ্ন বিপদের অভ্যুদয়, আর তাহার উপর জয় লাভ, ইহাই তো সভ্যতা, ইহাই তো উন্নতি।

(৬)

দেবতাকে ডাকিতেই হয়, কিন্তু সে আশার ডাক, নির্ভর হইবার ডাক। আমি যে একাকী নই, কাহার ও দৃষ্টি যে আমার উপরে আছে সেই আনন্দের, সেই নির্ভরের ডাক কিন্তু যে কর্ম্মভীরু, সংশয়ী, সে আপনার সকল শক্তি রোধ করিয়া চোখ বুজিয়া যদি কেবল দেবতাকে ডাকে, সে দেবতার সাড়া বুঝিবা পায়না। শিশু শক্তিহীন, সে কেবল মাতার উপর নির্ভর করে, ভয় পাইলে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যুবক যদি ভয় পাইয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে, মাতা প্রসন্ন হন না। দেবতা যে শক্তি দিয়াছেন,—জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রেমের বল, কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত দেহযন্ত্র,—তাহা নিষ্ক্রিয় রাখিবার জন্য নহে। দেবতা যাহা দিয়াছেন তাঁহার নাম করিয়া, সেই শক্তি লইয়া তাঁহার উপর আরও শক্তির জন্য নির্ভর করিয়া চলিব, ইহাই দেবতার অভিপ্রায়। নহিলে তিনি মানুষকে শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান বুদ্ধি দিলেন কেন?

(৭)

গতিতে জীবনের পরিচয়, নিষ্ক্রিয়তাই নির্জ্জীবতা। কর্ম্মে জীবনের পরিচয়, কর্ম্ম যেখানে সমাপ্ত সেখানে মৃত্যু—হইতে পারে নির্ব্বাণ। জ্ঞানের চর্চ্চা, জ্ঞানের দান ও গ্রহণ, শিল্পের অনুশীলন, আর্ত্তের সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন, এগুলিও কর্ম্ম—শক্তির সঞ্চালন, গতির প্রসার—স্থিতি নহে, নিষ্ক্রিয়তা নহে, জীবন্মৃত্যু নহে। একটা সুদূর, সমুচ্চ লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া নিরন্তর অভিযান, ইহাই জীবন—মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বিশিষ্ট জীবন। অতএব তরুণদিগের বিশেষ শিক্ষনীয় তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা। দিনে দিনে ইহাই তাহাকে চিন্তা করিতে, বুঝিতে, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীতি করিতে হইবে। প্রেমের মাধুর্য্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, ত্যাগের মহিমা, পুণ্যের গৌরব সে কোথায় শিখিবে? জীবিতদিগের জীবনে আর অতীতের ইতিহাসে। তাই প্রবীণদিগের জীবন দর্শনীয় ও অনুসরনীয় হওয়া আবশ্যক।

(৮)

সন্তানের জীবন পথ সর্ব্বপ্রযত্নে সুগম ও সুখকর করিয়া রাখিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইও

না। তুমি যে পথ রচনা করিতেছ সে পথে হয়তো সে চলিবেনা। স্বেচ্ছাবশে হউক ঘটনার তাড়নায় হউক সে হয়তো অন্যপথ খুজিয়া লইবে। তুমি কেবল তোমার পরিচিত পথটি নির্দ্দেশ করিতে পার, পথের সুগমতা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পার, পথের বিপদ সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক করিতে পার। সে আপনার চক্ষে দেখিবে, আপনার পায়ে চলিবে, আপনার রুচি অনুসরণ করিবে। যতদিন সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত ধরিয়াছে সে সময়ে যদি তোমার রুচি, তোমার পুণ্যে প্রীতি, তোমার দুর্নীতির ঘৃণা, তোমার আশা ও আকাঙ্খা তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিয়া থাক তবে ভয় পাইও না। ধৈর্য্য ধরিয়া, আশাতে হৃদয় ভরিয়া প্রতীক্ষা কর।

(৯)

দুঃখের মত শিক্ষক ও উপকারী নাই। দুঃখকে ভয় করিতে দিওনা! তরুণ কে শিখাও, দুঃখের ভিতর দিয়া পথ করিয়া চলাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়, মানুষের গৌরব। গ্রানিট পাথর কাটিয়া ফাটাইয়া দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ রচনা করিয়া মানুষ রেল গাড়ীর রাস্তা করিয়াছে। ঘটনা চক্র পাহাড়ের মত যখন পথ রোধ করে, কাটিবার কাজে লাগিয়া যাইতে হয়—পাষাণের উপর মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিলে কিছু হয় না—ভিন্ন পথ খুঁজিলেও গন্তব্যে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটে। বুদ্ধিবলে মানুষ জড়শক্তিকে নিয়ত জয় করিতেছে, সেখানেও বুদ্ধি একলা নহে। মানবের ইচ্ছাশক্তি, প্রতিজ্ঞার বল তাহার সহায় না হইলে বুদ্ধি সফল হয় না। এই কথা শৈশব হইতেই তাহাকে বুঝিতে দাও। ব্যথা ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া সে আনন্দ ও সাফল্য সঞ্চয় করিতে শিখুক। তাহার স্বচেষ্টা স্বাবলম্বনের পথই তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গল। সাহায্য করিতে গিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিও না।

সমবায় সমিতি

ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পিএচ-ডি

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ফট্কাবাজ, মূলধনিক প্রভৃতি সকল প্রকারের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে (middlemen) বাদ দিয়া ধনের বাহক সমূহ (instruments of wealth) সাধারণের আয়ত্তে আনা ও উহার সামঞ্জস্যত পরিচালন ব্যবস্থা করা। বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা বিচার করিতে গেলে সমবায় সমিতি যৌথ কারবারের অনুরূপ মনে হয়, কিন্তু যৌথ কারবারের ন্যায় ইহার সভ্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সভ্যের মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যৌথ কারবারে (Joint-stock Company) সভ্যদের অংশের পরিমাণ প্রধান, সমবায় সমিতিতে ব্যক্তিই প্রধান। কার্য্যপরিচালনব্যবস্থায় যৌথকারবারে অংশের প্রভাব প্রধান,

আর সমবায় সমিতিতে ব্যক্তিগত চরিত্র ও কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবই অধিক। সমবায় সমিতির সভ্য গ্রহণের ভার একটী নির্ব্বাচনচক্রের (Board) উপর ন্যস্ত থাকে, এবং নির্ব্বাচন অর্থবল, জাতি, ধর্ম্ম, রাজনৈতিক মতামত অথবা সামাজিক স্তরের উপর নির্ভর না করিয়া সভ্যপদ প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবসায় দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব কোন জন সমষ্টির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগের উপর নির্ভর করে, এই খানেই মূলধনসাপেক্ষ (Capitalistic) কারবারের সহিত ইহার পার্থক্য। ইহার মুলধনও ভিন্ন শ্রেণীর এবং উহার নিয়োগ ও হয় ভিন্ন ভাবে। সমবায় সমিতির ভিত্তিস্বরূপ মুলধন অর্থ নহে, সভ্যগণের ব্যক্তিগত দায়ীত্ব। সমাজের আস্থা অর্জ্জন করিবার শক্তি ইহারই উপর নির্ভর করে এবং এই ভিত্তি যত দৃঢ় হয় সমিতির কার্য্যকরী শক্তিও তত প্রবল হয়

সমবায় সমিতির সম্পত্তি নানাপ্রকারে অর্জ্জিত হইতে পারে। কারবারের প্রসারের ফলে কারবারের যে অংশ মুলধনীভূত (Capitalised) হইয়াছে তদ্বারা এবং সভ্যগণের নিকট হইতে মুলধন গ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা। ইহার সম্পত্তি সভাসংখ্যার উপর নির্ভর করে বলিয়া কাঁচালাভ(gross gain) হইতে সঞ্চিত একটা রক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) ও সভ্যদের চাঁদা অথবা খাঁটী লাভ net gain) হইতে ক্রমশঃ সঞ্চয় করিয়া একটা কার্য্যকরী তহবিল (Working Fund) গড়িয়া তুলিতে হয়, এবং সমিতির বাহিরের ও নিজের মূলধনের মধ্যে যাহাতে একটা সামঞ্জস্য থাকে পরিচালকবর্গের (Directors) সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। আবার সহরের সমিতির যত নিজস্ব মূলধনের প্রয়োজন হয় গ্রাম্য বা কৃষি সমবায় সমিতির তত হয় না।

অনেক অর্থনিতিবিদ্ বলেন যে সমবায় সমিতির কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের আশা নাই বলিয়া তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজকে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন জীবজগতের ভিত্তি যে সংহতির (collectivism) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জীবন ধারণের জন্য সহযোগিতাই যে জীব বিজ্ঞানের একটি প্রধান নীতি (Biological Principle) তাহা বিস্মৃত হন। মানুষ যে কেবল ব্যক্তিগত লাভের তাড়নায়ই (Stimulus of Individual Profit) কাজ করে এই ধারণা যে যথার্থ নহে জগতে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য তাহা প্রমাণ করিতেছে। অপর পক্ষে সমবায় মূলক ব্যবসায় হইতে ব্যক্তিগত ব্যবসায় অধিক সংখ্যায় অকৃতকার্য্য হয় দেখা যায়। * আর সংহতির ভিতরেও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা উদ্যমের (initiative) স্থান আছে

ব্যক্তিগত স্বার্থ বর্জ্জিত বলিয়া সমবায় মূলক প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্রটী লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার পরিমাপ (measure) হয় 'ধনস্বামিত্বে'র (Capitalism) মাপকাটিতে। ভবিষ্যতে জগতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে সমবায় মূলক কর্ম্মে সাধারণের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ নিমজ্জন স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীত হইবে। এই ক্রটী সত্ত্বেও সমবায়মূলক কর্ম্মে অনেক সুবিধা আছে। ইহাতে একপক্ষে

* এ বিষয়ে ১৮।১।১৮ ইংরেজীর "Konsumgenorsenschäfts Runndschain" নামক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

কটকাবাদী বা bad stock-এর * জন্য লোকসান খাইতে হয় না, অপর পক্ষে capitalistic (মহাজনী) কারবারের মত অল্পব্যয়ে সৎ ও কর্ম্মক্ষম পরিচালকের অভাব হয় না। সমবায়মূলক কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্থনৈতিক শৃঙ্খলা (order) আসে, এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার শক্তি লাভ হয়। বেশীর ভাগ সভ্য ইহাকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখসুবিধা বৃদ্ধির সোপানস্বরূপে দেখিলেও অবশিষ্ট সভ্যেরা ইহার সহিত ন্যায়সঙ্গত আর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমবায় দেখিতে চাহেন। ইহাতে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থলে সমষ্টিগত অভাব পূরণরূপ উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিজ্ঞাপন, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়া ব্যবসায়ে সততা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়।

সভ্য

সমবায় সমিতির মূলনীতি সভ্যদের সাম্যভাব। এই সাম্যভাব রক্ষার জন্য অংশের পরিমাণ নির্ব্বিশেষে সকল সভ্যই একটীমাত্র ভোটের অধিকারী। যৌথ কারবারে কেবল বড় বড় অংশীদারেরাই পরিচালক সভায় প্রবেশের অধিকারী, কিন্তু সমবায়মূলক কর্ম্মে পরিচালক সভায় প্রবেশের অধিকার অংশের পরিমাণ নিরপেক্ষ। নূতন সভ্যেরা পুরাতন সভ্যদের মত সমান নিয়মাধীনে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তাহাদের সহিত সমান অধিকার ভোগ করেন।

সভ্যগণের দায়ীত্ব

'ব্যষ্টি সমষ্টির জন্য, এবং সমষ্টি ব্যষ্টির জন্য' এই নীতির উপরে—সমবায় সমিতির ভিত্তি। প্রচলিত প্রথায় সভ্যদের দায় নির্দ্দিষ্ট (limited liability) কিন্তু ঋণদান সমিতি সমূহ (credit societies) অনির্দ্দিষ্ট দায়ীত্ব লইয়া গঠিত হইতে পারে।

মূলধন

সমবায় সমিতির মূলধন প্রধানতঃ সভ্যদের অংশের টাকা লইয়া গঠিত হয় কিন্তু অন্যান্য উপায়েও উহা সংগৃহীত হইতে পারে। (১) সভ্য হইবার কালে অংশ স্বরূপে দত্ত চাঁদা, (২) আমানতরূপে গচ্ছিত অথবা মূলধনে রূপান্তরিত লভ্যাংশ (dividen left on deposit or converted into shares), এবং (৩) সভ্যদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ, এই তিনের যে উপায়েই হউক সমিতির কার্য্যের সফলতার জন্য পর্য্যাপ্ত মূলধন আহরণ করা দরকার।

অনেক সমিতি নিয়ম প্রণয়ণ দ্বারা সভ্যদের অংশসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সাধারণতঃ একজন সভ্য পাঁচটী মাত্র অংশ লইতে পারেন। এই নিয়মের উদ্দেশ্য মূলধনিকের (capitalist) প্রাধান্য নষ্ট করা। কারণ ধনের প্রাধান্য বর্জ্জন করিয়া সকলের সমভাবে সেবা করাই সমবায় আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য

সমবায় সমিতির বৈধ উদ্দেশ্য সমবেত ভাবে কারবার করিয়া সভ্যদের আয় বৃদ্ধি

(*) Bad-stock—'নির্ম্মূল' অংশ।

করা অথবা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সভ্যগণকে সস্তায় সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা। ইহার কার্য্যক্ষেত্র আর্থনৈতিক প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ। সকল প্রকারের সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানকে—যেমন সঙ্গীতশিক্ষালয়, পাঠাগার, ক্লাব প্রভৃতিকে—সমবায় সমিতি গণনা করা হয় না। সমবায় সমিতি আর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন অপর উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিতে পারে কিনা সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। এইরূপ করা আইনের চক্ষে খুব সঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষা এবং সামাজিক উদ্দেশ্যও সমবায় সমিতির লক্ষ্য হইয়াছে এমন দেখিতে পাওয়া যায়। 'রকডেল সমিতি' (Rochdale society) ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সভ্যদের আয় বৃদ্ধি করিয়াও ইহা আসল লাভের ২.৫ অংশ শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করে। সমবায় সমিতি বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার করিবে কিনা সে প্রশ্নও উঠিতে পারে। এ সম্বন্ধে মোটামুটীভাবে এই বলা যাইতে পারে যে বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার করা সমবায় সমিতির মূলনীতি বিরুদ্ধ নহে। সাধারণতঃ ঋণদান সমবায়, শ্রমজীবি সমবায় ও গ্রাহক বা ব্যবহারক সমবায় (Credit, Workers & Consumers Co-operative Societeis) ভিন্ন সকল প্রকার সমিতিই বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার করিয়া থাকে। ক্ষতিগ্রস্থ না হইবার জন্য অনেক সময় ইহাদিগকেও বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। বেশী টাকা জমিয়া গেলে ঋণদান সমিতি অতিরিক্ত টাকা বাহিরের লোককেও ধার দেয়, চুক্তিপূরণের জন্য প্রয়োজনানুসারে শ্রমজীবি সমবায়কে বাহিরের লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, আবার যে সকল দ্রব্য অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে, সভ্যেরা তাহা খরিদ না করিলে গ্রাহক সমবায়কে তাহা বাহিরের লোকের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। মোটের উপর সমবায় সমিতির অস্তিত্ব ও সুনাম (credit) রক্ষার জন্য বাহিরের লোকের সহিত কারবার করিতে হইলে তাহাকে কোন অবস্থায়ই সমবায়ের মূলনীতি বিরোধী বলা যাইতে পারে না।

গঠন ব্যাপার (Constitution)

সমবায় সমিতির ব্যাপারকে ক্রিয়াবৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায়:— বিধি (Law), পরিচালন (Administration) ও পরিদর্শন বা নিয়মন (Control)। কার্য্যের সুবিধার জন্য সকল সমিতিই তিনটী ভাগে বিভক্ত থাকা প্রয়োজন—সাধারণ সভা (Full Assemly), কার্য্য নির্ব্বাহক সভা (Executive Board) ও তত্ত্বাবধায়ক সভা (Council of Supervision)। এই তিনের মধ্যে সাধারণ সভাই সর্ব্বেসর্ব্বা, শেষের দুইটী সাধারণ সভার অধীন মাত্র।

এই সাধারণ সভাকে সমিতির ব্যবস্থাপক সভা বলা যাইতে পারে। এই সভায় বিধিব্যবস্থা প্রণীত হয়, বার্ষিক হিসাব পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হয়, বিতরণীয় লভ্যাংশ (Dividend) নির্দ্ধারিত হয়, কার্য্য নির্ব্বাহক ও তত্ত্বাবধায়ক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এই উভয় সভার সভ্যের পরিবর্ত্তন, এবং যাহারা সভ্যশ্রেণী হইতে অপসৃত হইতে চান তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সাধারণ সভার প্রতিনিধিরূপে, উহার প্রণীত বিধিব্যবস্থা অনুসারে, সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে। তত্বাবধায়ক সভার কাজ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যথারীতি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন কিম্বা তাহার তত্ব লওয়া। উহার স্থান কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উপরে নহে, উহার সহিত সমান। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্যে উহা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, কোন গুরুতর ত্রুটী লক্ষ্য করিলে উহা সাধারণ সভার গোচরে আনিতে পারে মাত্র।

সমিতি-সঙ্ঘ (federation)

সমবায়-আন্দোলন কতক অগ্রসর হইলেই সমবায় সমিতি সমূহ "পরস্পর সাহায্য সমিতি" এবং 'শ্রমিক সঙ্ঘ' সমূহের ('Trades Union) অনুসরণে উচ্চতর সঙ্ঘ বা সমিতি সঙ্ঘ (Federation) গঠন করিতে আরম্ভ করে। এই উচ্চতর সঙ্ঘ গঠনের দুইটী দিক আছে, একটী সামাজিক ও একটী ব্যবসায়িক। এক পক্ষে ইহাতে যেমন একযোগে কাজ করিয়া সমগ্র আন্দোলন একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়, অপর পক্ষে তেমনি ক্রেয় দ্রব্য আয়ত্তাধীন করা ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা (Organisation of Production) সম্ভবপর হয়।

লাভ বণ্টন

আর্থনৈতিক বিষয়ে সমবায় সমিতির সভ্যদের সাম্য লাভের বণ্টনেই পরিস্ফুট হয়। সমিতির বিধান অনুযায়ী লাভের ভাগবাটোয়ারা হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য ও অধিকার বিষয়ে আইন সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে, এবং লাভের বণ্টনও সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। কোন হারে এই লাভ বণ্টন করিতে হইবে তাহা সমিতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ এই হার সভ্যের অংশের পরিমানে না হইয়া কারবারে কোন সভ্য কতটা সময় দিয়াছেন তদ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এইরূপ ভাগবণ্টনে ব্যক্তিগত সমবায় ও সাম্যবাদ, উভয়েরই লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। সভ্যেরা সমিতির কর্ম্মপ্রসূত উপকার (benefit) মূলধনে দান করিয়াছেন বলিয়া নয়, সমিতির কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়াই লাভ প্রাপ্ত হইবেন। এই নিয়মের প্রতিষ্ঠায়ই capitalistic কারবারের সহিত সমবায় সমিতির পার্থক্য। কিন্তু সহরের ঋণদান সমিতি সমূহ সভ্যদের লভ্যাংশ প্রদান করে কারণ এইরূপ সমিতিতে 'খরিদ্দার সমিতি' (Consumers Society) প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়, এবং লাভের আশা না দেখাইয়া লোকের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করা যায় না। ঋণদান সমিতিতে কি হারে লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ সুদ হিসাবে অংশের শতকরা ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া [illegible]

বিরোধ

গ্রাহক বা ব্যবহারক সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য থাকে সকল প্রকার কারবারকে নিজের করায়ত্ত ও অধীন করা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রত্যেকারেই সন্তোষজনক [illegible]। এই চেষ্টার ফলে যে স্বার্থবিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সকল

সময়ে ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ের (honorablemeans) অনুসরণ করে না। বৃহদায়তনে সমবায় করিতে গেলে এইরূপ প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

চরিত্রবল (Character)

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পক্ষে সভ্যদের চরিত্রবল একটি প্রধান জিনিষ। চরিত্রবল সভ্যদের প্রয়োজনের প্রলোভন বা উৎকোচ গ্রহণেচ্ছা হইতে রক্ষা করে, নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ উহাদিগকে সৎ পরিচালক নিয়োগে প্রবৃত্ত ও গৃহবিবাদ হইতে নিবৃত্ত করে, মূল্যাল্পতা ও অন্যান্য সুবিধা সত্ত্বেও বাহিরের দোকান হইতে জিনিষ পত্র কিনিবার প্রলোভন হইতে উহাদের রক্ষা করে, এবং সামাজিক সকল ব্যপারের অংশী হইতে প্রবুদ্ধ করে।

সমবায় প্রচেষ্টায় কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য নিম্নলিখিত গুণের প্রয়োজন—শৃঙ্খলাস্পৃহা (love of order), সুনিয়ন্ত্রিত একতাস্পৃহা (disciplined spirit of solidarity) এবং সঙ্ঘবন্ধনপটুতা (passion for organisation)

আবেষ্টন

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উপর আবেষ্টনেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। কৃষিজীবি অধ্যুষিত জনপদ (Agricultural Districts) অপেক্ষা শিল্পপ্রধান স্থান সমূহ (Industrial Dristricts) ব্যবহারক সমবায়ের (Consumers' Combine) অধিকতর অনুকূল। শেষোক্ত স্থান সমূহে অনেক সময়ে ইহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ইহার কারণও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শিল্পকেন্দ্রে শ্রমজীবিরা কর্ম্মস্থলে ও বাস করিবার স্থলে সমষ্টিবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। ইহাতে উহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে। তারপর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে খরচের আধিক্য বশতঃ ও সমবায়ের দিকে তাহাদের ঝোঁক হয়। অপর পক্ষে গ্রাম্যলোকের অভাবও অল্প, এবং তাহা পরিপূর্ণও হয় সহজে। তাহাদের অধিকাংশ অভাবই চাষের উৎপন্ন দ্রব্যে পরিপূরণ হয়, বাকীটা ফেরীওয়ালাদের (travelling salesman) কাছ হইতে সংগৃহীত হয়, অথবা সহরে বা হাটের দিনে খরিদ করে। সমবায় সমিতিতে যাইবার তাহাদের সময় নাই, আর তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনেও সমবায় স্পৃহার স্থান নাই। ইহা সত্বেও ফ্রান্সে কৃষীদের মধ্যে কৃষীসমবায় (Sydicats Agricoles) এবং অন্যান্য কোন কোন স্থানে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহার কারণ এই সকল সমবায়ের ফলে উহার সভ্যেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায়। এ ছাড়া কৃষিজীবিরা ক্রেতা অপেক্ষা উৎপাদনকারীর স্বার্থ বেশী দেখে। ইহারা স্বভাবতঃই 'রক্ষা ব্যবস্থা'র অনুরাগী (protectionists), উহারা উৎপন্ন দ্রব্যের বেশী দাম চায় এবং উহা সরাসরি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ক্ষুদ্র কারবারীদের সরবরাহ করে। জনবিরল প্রদেশে (sparsely populated disctricts) সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা দোকান প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হয় না, এবং লোকে খুদে দোকানদার বা ফেরিওয়ালার নিকট হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে।

বিধিপ্রণয়ণ (Legislation)

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম মান্য করিয়া চলিতে হয় :—

১। কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আনুষ্ঠানিক খরচ (Preliminary Expenses) ও আনুষ্ঠানিক বিধি (formalities) যথাসম্ভব কমাইতে হয়।

২। সমিতির পক্ষে কোন চুক্তি গ্রহণের সময় সভ্যদের দায়ীত্ব যাহাতে যথাসম্ভব কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

৩। অংশের মূল্য এত নিম্ন রাখিতে হয় যাহাতে শ্রমজীবিরাও অংশ খরিদ করিতে পারে।

সমবায়ীরা (Ardent Co-operators) এই নিয়মের তাদৃশ পক্ষপাতী নহেন। সেই জন্য বিধিপ্রনয়ণকালে অনেক সময়েই এইরূপ ব্যবস্থা (rule) থাকে যে—(১) সমবায় সমিতি আবহমানকাল থাকিবে (shall exist, in perpetuity), উহা কখনও উঠাইয়া দেওয়া হইবে না; অথবা (২) সমিতি যদি কখনও উঠিয়া যায় বা বিনষ্ট হয় তাহা হইলে উহার সম্পত্তি (assets) অন্য কোন সমবায় সমিতি বা "সমিতি-সঙ্ঘ" (federation) বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে (Common or Local Government bodies) দান করা হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সবমেরিণ বা ডুবোজাহাজের সমুদ্র সমাধি

বিগত ১২ই নবেম্বর তারিখে সকাল বেলা, ইংরাজ নৌসেনা বিভাগের এম—১ সংখ্যক অন্তঃসমুদ্র তরী (Submarine M 1) বা ডুবো জাহাজ ডেবনসায়ারের দক্ষিণে ষ্টার্ট অন্তরীপের ১৫ মাইল দূরে ডুব দেয়। কিন্তু তাহার পর আর তাহাকে উঠিতে দেখা গেল না। এই জাহাজে প্রায় ৭০ জন লোক ও একটি প্রকাণ্ড কামান ছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন চিহ্ন বা মজ্জন স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল না। বোধ হয় উপরের চলন্ত অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া ইহা এমন জখম হইয়াছিল যে আর উঠিতে পারে নাই। কলকারখানা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে ভিতরের লোকেরা বে-তার সংবাদ পাঠাইয়া নিজেদের অবস্থাও জানাইতে পারে নাই। এই জাহাজখানি উঠাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর সমুদ্র গর্ভে সমাহিত লোকদের জন্য বিধিমত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং মৃতদের উদ্দেশে রাশি রাশি পুষ্প মাল্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এই দুর্ঘটনায় সহৃদয় মাত্রেরই যুদ্ধের এই উৎকট উপকরণের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় অনেকে এই ডুবা জাহাজের ব্যবহার উঠাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন এবং জাতীয় পরিষদে এজন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কতদূর কি হইবে বলা যায় না। ভিন্ন ২ দেশের মধ্যে, কেবল বাহ্যিক সদ্ভাব নহে, আন্তরিক বিশ্বাস না জন্মিলে, যুদ্ধ ব্যাপার অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত না হইলে, অর্থাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিয়া গেলে যুদ্ধের উপকরণগুলি যতই [illegible] হউক উহাদের বিদায়ের সম্ভাবনা অল্প। [illegible] বিদায় করিতে হইলে একযোগে

সকল দেশ হইতেই বিদায় করিতে হইবে; কিন্তু সকল দেশ তাহাতে সম্মত হইবে মনে হয় না। সর্ব্বজাতীয় সংঘে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার (Disarmament Question) এখনও সমাধান হয় নাই।

পরলোকগতা সম্রাটজননী

বিগত ২০শে নবেম্বর সম্রাটজননী মহারাণী আলেকজান্দ্রা একাশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই উদারপ্রাণা সুশীলা নারী ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইঁহার যখন জন্ম হয় তখনও ক্রিশিয়ান রাজপদে আরোহণ করেন নাই। সেই জন্যই হউক অথবা তাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি বশতঃই হউক, যুবরাজ ক্রিশ্চিয়ান ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সন্তানদিগকে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের নানা আড়ম্বরের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে দেন নাই, লিখন পঠন শিল্প চর্চ্চার সঙ্গে যাহাতে নীতিশিক্ষা ধর্ম্মভাব দ্বারা চরিত্র সুন্দররূপে গড়িয়া উঠে, যাহাতে পারিবারিক প্রেম দৃঢ় হয়, পারিবারিক কর্ত্তব্যের বোধ প্রবল হয়, অতি যত্নে সেইরূপ শিক্ষাই দিয়াছেন। উনিশ বৎসর বয়সে আলেকজান্দ্রা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধূ হইয়া ইংলণ্ডে আগমন করেন। রাজকবি টেনিসন ইহাঁর আগমনী সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ইয়োরোপের ইনি একজন বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সুমধুর চরিত্র এবং অন্তরের সৌন্দর্য্যই ইঁহাকে ইংলণ্ডের ধনী নির্ধন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়াছিল। আজীবন তিনি ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই শ্রদ্ধাপ্রীতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একদিকে কর্ত্তব্য সাধন ও পারিবারিক সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন আর একদিকে সাম্রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধূ ও প্রতিনিধিরূপে এবং পরে স্বয়ং সাম্রাজ্ঞীরূপে জাতীয় জীবনের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মহারাণী সর্ব্বত্র যাইতেন না, তাঁহার স্থানে ইহাঁকে ইহার স্বামী তদানীন্তন যুবরাজের সহিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার সৎ ও মহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে। তাঁহার ব্যবহার সৌজন্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত ছিল, দীন দুঃখী রুগ্নদিগের জন্য তাঁহার হৃদয় স্নেহ ও করুণায় পূর্ণ হইত, হাসপাতালের কাজের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পাইত। রাজ পরিবারে এমন অনাড়ম্বর কর্ত্তব্যশীল জীবন, এমন নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রাণতা সচরাচর দেখা যায় না। মহারাণী আলেকজান্দ্রা যখন যুবরাজ্ঞী মাত্র ছিলেন, সেই সময় ইয়র্ক শায়ারে কোন এক কৃষি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত উত্তম মাখন দেখিয়া উহার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাখন কিন্তু ডেনমার্ক হইতেই আসে।" যাহার মাখন সেই ব্যক্তি বলিল—"হুজুর, অপরাধ লইবেন না, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাজকন্যা ডেনমার্ক হইতে আসেন কিন্তু সব চেয়ে ভাল মাখন ইয়র্ক শায়ার হইতে।"

সত্য সত্যই ইনি এই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে শোক দুঃখের আঘাতও পাইয়া গিয়াছেন। প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ এবং পরে বৈধব্য ঘটিল। কিন্তু ইহাতে মুহ্যমানা না হইয়া যত দিন শরীরে শক্তি ছিল পূর্ব্বের ন্যায় রুগ্ন ও দরিদ্র-দিগের সাহায্যার্থ নানা অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন।

নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

দ্বিতীয় খণ্ড] অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [৮ম সংখ্যা

চয়ন।

কাটুনীদিগের প্রতি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবানুযায়ী যে সকল সূতা গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল অসমতার জন্য উহার কতক এখনও কোন কাজে লাগে নাই। যাহারা নিখিল ভারত সূতাকাটা সমিতিতে যোগদান করিবেন বা কংগ্রেসের সভ্য হইবার জন্য সূতা পাঠাইবেন উহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সূতার পরিমাণের দিকে যেমন লক্ষ্য রাখিবেন, উৎকর্ষের দিকেও তেমনি লক্ষ্য রাখিবেন। যে সূতা কোন কাজে লাগে না সে সূতা প্রেরণে সময়, শক্তি ও অর্থ, সকলেরই অপচয় হয়। সূতা পাঠাইতে সভ্যগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন ;—

১। কোন শ্রেণীর সভ্য হইতে চান, এবং কংগ্রেসের সভ্য হইতে চান কি না জানাইবেন ;

২। প্রত্যেক ফেটীর সঙ্গে মোটা কাগজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া দিবেন :—

(ক) নাটাইয়ের মাপ, (খ) গজের হিসাবে দৈর্ঘ্য, (গ) ওজন, (ঘ) নম্বর, (ঙ) ব্যবহৃত তুলার জাতি, এবং (চ) চরকায় না টেকোতে কাটা হইয়াছে।

যে সূতার সঙ্গে এই সকল বিবরণ পাওয়া যাইবে না, সেই সূতা চাঁদা বলিয়া গণ্য হইবে। যাহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার দরখাস্তের ফারম অথবা সমিতির নিয়মাবলী চাহেন তাহারা—শ্রীযুক্ত জওয়াহিরলাল নেহেরু, সম্পাদক, নিখিলভারত সূতাকাটা সমিতি, ১০৭, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ—এই ঠিকানায় পত্র দিবেন।

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ যদি ডাক খরচ বাঁচাইতে চাহেন তাহা হইলে মাসে মাসে সূতা না পাঠাইয়া এক বৎসরের সূতা এক সঙ্গে অগ্রিম পাঠাইতে পারেন, আর কোন এক স্থানে বহু সভ্য থাকিলে কোন এক জন সভ্য উদ্যোগী হইয়া সকল সভ্যের সূতা একসঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। যে সকল পার্ব্বত্যজাতীয়েরা কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন উহারা পশমী সূতা দিয়াও কংগ্রেসের অথবা নিখিলভারত কাটুনী সমিতির সভ্য হইতে পারেন। আসল জিনিষ তুলা নয়, হাতে কাটা সূতা। (২২।১০ ও ২৯।১০।'৫)

লক্ষৌ মহিলা কলেজ — লক্ষৌয়ে অবস্থান কালে আমি আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত একটী মহিলা কলেজ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে এশিয়ায় এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে ভারতের সকল প্রদেশেরই বালিকাই আছে। আমার স্বাক্ষর লইবার জন্য উহারা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমার স্বাক্ষর পাইতে হইলে যে নিয়মিত সূতা কাটিতে এবং খদ্দর পরিধান করিতে হইবে এইরূপ কথা শুনিয়া অনেকেই পিছাইয়া যান। কিন্তু ইহারা তাহাতেও পিছাইল না, এবং উহাদের Lady Superintendent (তত্ত্বাবধায়িকা) আমাকে আশ্বাস দিলেন বালিকারা যাহাতে এই সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। (U. P. Notes, Lucknow. 22. 10. 25.)

উভয়সঙ্কট — একটী বন্ধু কোন দেশীয় কারবারে কাজ করেন। সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাজ করিতে হয়, মধ্যে খাওয়া দাওয়ার জন্য কিছু সময় পান মাত্র। একটী বিদেশী কারবারে তাঁহার কাজ পাইবার সম্ভাবনা আছে। সেখানে তিনি বেতন প্রায় দ্বিগুণ পাইবেন, কিন্তু কাজ করিতে হইবে কম সময়। ইহাতে তিনি সূতা কাটিবার অধিক অবসর পাইবেন, কিন্তু উহারা উহাকে খদ্দর পরিতে দিবে না। এক্ষেত্রে উহার কর্ত্তব্য কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণ দেখি না। খদ্দরের কথা বাদ দিলেও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই বৈদেশিকের এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে পারেন না। এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অনুচিত হস্তক্ষেপের প্রয়াস আছে, বিশেষতঃ এই প্রয়াস জাতীয় স্বার্থের বিরোধী এবং খদ্দরের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত। সাময়িকভাবে যদি সূতাকাটা বাদ দিতে হয় তাহা হইলেও আমি খদ্দর পরিধানের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষপাতী। লোকে যদি খদ্দর ব্যবহার ত্যাগ করে তাহা হইলে সূতাকাটার কোন অর্থই থাকিবে না। খদ্দর বিক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোককে সূতা কাটিতে বলা উপহাস মাত্র। সূতাকাটা এবং খদ্দর ব্যবহার, যেখানে এই উভয়ের মধ্যে একটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে সেখানে শেষেরটীরই দাবী বেশী। পত্র লেখকের যদি সূতা কাটিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সময়ও তিনি করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাকে যদি ট্রাম অথবা রেলগাড়ীতে কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়, তিনি পথে যাইতে যাইতে টেকোতে সূতা কাটিতে পারেন। আমি আশা করি পত্র লেখক কোন প্রলোভনেই খদ্দর ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন না। কলিকাতায় যে সকল ইউরোপীয় সওদাগরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে উহাদের মধ্যে খদ্দরের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করি নাই। এই মন্তব্য যে সকল ইউরোপীয় সওদাগরের নজরে পড়িবে উহারা এই বিদ্বেষভাব দূর করিতে প্রয়াস পাইবেন আশা করি। দেশীয় কারবারীদের প্রতিও আমাদের নিবেদন উহারা যেন এমনভাবে কাজের ব্যবস্থা করেন যাহাতে উহাদের কর্ম্মচারীদের কাজের সময় এইরূপ অনুচিত দীর্ঘ না হয়। কাজের সময় (working hours) অতিরিক্ত দীর্ঘ হইলে তাহাতে কাজের ক্ষতি হয়, ইহাই জগতের অভিজ্ঞতা। স্বেচ্ছায় এবং উদারতা প্রণোদিত হইয়া এই সংস্কার সাধন না করিলেও একদিন বাধ্য হইয়া ইহা করিতে হইবে, তখন আর তাহাতে কোন মহত্ব থাকিবে না। এই জগদ্ব্যাপী আন্দোলনের গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। ভারতীয় বণিকগণ অথবা অন্য কোন বণিকসভা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিবেন কি?—(সংক্ষিপ্ত, ২২-১০-২৫)

স্বরাজ ও বিদেশী — জনৈক গোয়ানিজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে সকল গোয়ানিজ জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যে এদেশে আছেন স্বরাজের অধীনে উহাদের অবস্থা কি হইবে। গোয়ানিজরা অপর একটী বিদেশী শক্তির অধীন হইলেও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মতই

ভারতবাসী, সুতরাং উহারাও অপর ভারতবাসীর মতই ব্যবহার পাইবেন। স্বরাজ জাতির্নির্বিশেষে সকলের জন্য। এমন কি ভারত যাহাদের জন্মভূমি নয় অথবা ভারতকে যাহারা স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, যে সকল অনুচিত অসুবিধা উহারা এখন ভোগ করিতেছেন তাহা ভিন্ন উহাদের অপর সকল স্বার্থ আমরা বর্ত্তমান সরকারের মতই যত্নে রক্ষা করিব। ইহাই আমার স্বরাজের আদর্শ। পরিণামে স্বরাজ দাঁড়াইবে কিরূপ তাহা অবশ্য ভারতের চিন্তাপরায়ণ জনগণের উপর নির্ভর করিবে। গোরানিজদের নিজেদের উপরেও উহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্ব্বোধ অথবা নির্ব্বীর্য্য (imbecile) ভিন্ন কেহই অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না,— রাজশক্তি কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে সে উহার প্রতিরোধ করিবে। যতদিন বহুলোক এইরূপ প্রতিরোধের শক্তি লাভ না করিবে ততদিন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। (সংক্ষিপ্ত, ২২।১০।২৫)

জনৈকা মহিলা বন্ধু 'ডান গ্রিফিথ্‌স'এর লিখিত অপরাধ সম্বন্ধীয় কতকগুলি সরল সত্য ইয়ং ইণ্ডিয়াতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন। নিম্নের মত গুলি সত্যাগ্রহীরা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারেন।

অপরাধ ও দুর্নীতি

"রাষ্ট্রীয় বিধান হইলেই যে নীতিসঙ্গত হইবে তাহা কোন মানে নাই, আবার আইনের চক্ষে অপরাধ অপরাধ হইলেই যে তাহা দুর্নীতি হইবে তারও কোন মানে নাই"

"অ-বৈধতা ও দুর্নীতি উভয়ে সমার্থক নহে"

"সকল বে-আইনি কার্য্যই নীতিদুষ্ট নহে, পক্ষান্তরে সকল দুর্নীতিই অ-বৈধ নহে"

সরকারী কর্ম্মচারীদের আদেশে পেটে হামাগুড়ী দিতে অস্বীকার করা অবৈধ হইলে হইতে পারে কিন্তু উহা যে দুর্নীতির পরিচায়ক এমন কথা কে বলিবে? বিধিবহির্ভূত হইলেও উহা খুবই নীতিসঙ্গত, ইহাই কি বরং সত্য নহে?—"বিগ্রহ-পক্ষপাতী হত্যাকারীরই জাত ভাই, আর ঘাটপাড়ি ও অংশ (stock) লইয়া খেলা একই মনোবৃত্তির দুই দিক। বর্ত্তমানের সমাজব্যবস্থা অপরাধের জনক।"—এই উক্তিগুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য। আর একটি উক্তি এই—

"ধন আহরণের যে ব্যবস্থা সমাজের অনুমোদিত নয় সে উপায়ে ধনলাভেচ্ছা তৃপ্ত করিতে গেলেই আইনের চক্ষে চোর পরিগণিত হইতে হয়। যে সমাজে যা দেয় গ্রহণ করে তার চাইতে বেশী নেই কিন্তু প্রকৃত চোর"। কিন্তু সমাজ করে কি?—"যে সমাজের বিরক্তি উৎপাদন করে সমাজ তাহারই শাস্তি-বিধান করে, প্রকৃত অনিষ্টকারীর কোন শাস্তিবিধান করেনা,—আধুনিক সমাজব্যবস্থায় খুচরা অপরাধীই কেবল শাস্তি পায়, পাইকারী অপরাধী পায় না।" (Wheu Bıime is not Immoral. 22. 10, 25.)

চিরন্তন প্রশ্ন

[মো· ক· গান্ধী]

হিন্দু মুসলমান সমস্যা আমাকে কোন মতেই ছাড়িবে না। মুসলমান বন্ধুগণ ইহার সমাধানে আমাকে হস্তক্ষেপ করিতে বলেন। হিন্দুগণও আমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে বীজ আমি রোপন করিয়াছি, ফলও আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কলিকাতায় অবস্থানকালে বিহারবাসী জনৈক বন্ধু হিন্দু বাহক, ও বিশেষ ভাবে বালিকাদের অপহরণের উল্লেখ করিয়া আমাকে

দুঃখ ও ক্রোধ সূচক একখানি পত্র দিয়াছিলেন। উত্তরে আমি তাঁহাকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলাম যে আমি এসব কথায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু তিনি যদি এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ দিতে পারেন আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং প্রমাণ সন্তোষজনক হইলে সুস্পষ্ট প্রতিকারে অক্ষম হইলেও উহার প্রতিবাদ করিব। এর পরে আমি সংবাদপত্র হইতে আহৃত বহু অপহরণের বিস্তারিত বিবরণ পাইয়াছিলাম এবং বন্ধুটিকে বলিয়াছিলাম যে পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ প্রমান স্বরূপে গণ্য হইতে পারে না। বহু স্থলেই উহারা উত্তেজনাপূর্ণ, ভ্রান্তিজনক, এবং কোন কোন স্থলে একান্ত অসত্য। এমন অনেক হিন্দু ও মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাও আছে যাহারা মুসলমান বা হিন্দুকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিতে আনন্দানুভব করে। এই উভয় শ্রেণীর পত্রিকার কথায়ই যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় উভয় সম্প্রদায়ই যৎপরোনাস্তি জঘন্যচরিত্র। টিটাগড়ে কিন্তু এরূপ একটী ব্যাপার বাস্তবিকই ঘটিয়া ছিল। একটী হিন্দু বালিকা অপহৃতা হইয়াছিল এবং শোনা গিয়াছিল সে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আদালতের আদেশ স্বত্বেও উহাকে এযাবৎ হাজির করা হইয়াছে বলিয়া জানিনা। এ ব্যাপারে কয়েকজন সম্রান্ত লোক সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া শোনা যায়। আমি যখন টিটাগড়ে গিয়াছিলাম এই মেয়েটীর দায়িত্ব লইতে যে কেহ প্রস্তুত আছেন এমনত দেখি নাই। পাটনায় থাকিতে আমি প্রমাণ সহ কতকগুলি অভাবনীয় (startling) সংবাদ পাইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ প্রমাণ উপস্থিত আমার হাতে নাই বলিয়া আমি উহার আলোচনায় বিরত রহিলাম। এরূপ ঘটনায় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে, এবং দেশের হিতকামী সকলেরই এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। তারপর মস্‌জিদের সম্মুখে গান বাজনার কথা ধরুন। মস্‌জিদের সম্মুখে ধীর অথবা উচ্চ স্বরেই হউক সকল প্রকার গান বাজনা সকল সময়ে বন্ধ রাখিবার দাবীর কথা আমি শুনিয়াছি। নমাজের সময়ে মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী মন্দিরে আরতি বন্ধ করিবার দাবীর কথাও শোনা যায়। কলিকাতায় থাকিতে শুনিয়াছি প্রত্যুষে রাম নাম লইয়া মস্‌জিদের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে ছেলেরা বাধা পাইয়াছে।

এখন কর্ত্তব্য কি? এরূপ ব্যাপারে আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ভগ্ন যষ্টির উপর নির্ভর করারই অনুরূপ। আমার কন্যাকে যদি অবাধে অপহৃত হইতে দেই, তাহা হইলে আদালত আমাকে কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন? আর আমার কাপুরুষতায় বিরক্ত হইয়া যদি বিচারক আমাকে তাচ্ছিল্য সহকারে দূর করিয়া দেন তাহা অতি সঙ্গতই হইবে। আদালত সাধারণ অপরাধেরই প্রতিকার করিয়া থাকেন। বালক অথবা বালিকা হরণ সাধারণ অপরাধ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিকারের ভার লোকের নিজের হাতেই গ্রহণ করা উচিত। যাহারা আত্মনির্ভরপরায়ণ আদালত তাহাদিগেরই সহায়তা করিতে পারেন। আদালতের আশ্রয় আনুষঙ্গিক মাত্র, নিরপেক্ষ নহে। দুর্ব্বল লোক যতদিন থাকিবে উহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইবার লোকও থাকিবে। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই উহার একমাত্র প্রতিকার। অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষার সামর্থ্য না থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে চরম হিংস্র উপায়েরও সমর্থন করিতে আমি সক্ষম। দরিদ্র এবং নিঃসহায় মাতাপিতার সন্তান যেখানে অপহৃত হয় সেখানে অবশ্য ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিকার নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপরে নহে—সমগ্র শ্রেণীর (caste) উপরে এবিষয়ে জনমত গঠনের জন্য অপহরণের বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

গানবাজনা সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। অনবচ্ছিন্ন গান বাজনা, আরতি, অথবা রাম নাম গ্রহণ হয় আধ্যাত্মিক হিসাবে প্রয়োজনীয়, নয় ত প্রয়োজনীয় নয়। ধর্ম্মের দিক হইতে প্রয়োজনীয় হইলে এ বিষয়ে আদালতের নিষেধাজ্ঞার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ফলাফল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিতে এবং আরতি ও গানবাজনা করিতে হইবে। ধরুন যদি

রাম নামই বিবাদের কারণ হইত তাহা হইলে আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে গেলে অতি নিরীহ প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবে রাম নাম গ্রহণ করিতে করিতে মুসলমানদের সমস্ত ক্রোধ মাথা পাতিয়া লইত। আমার নীতি যদি উহারা গ্রহণ না করে তাহা হইলেও উহাদিগকে এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রতিপদে সংগ্রাম করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। গোলযোগের ভয়ে অথবা আদালতের আদেশে গান বাজনা বন্ধ করা ধর্ম্মের অবমাননা ব্যতীত কিছুই নহে।

কিন্তু এ প্রশ্নের আর এক দিক আছে। নমাজের সময়ে মসজিদের পাশ দিয়া যাইতেও কি নিরবচ্ছিন্ন গান বাজনা সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের দিক হইতে প্রয়োজনীয়? রামনাম গ্রহণও কি এই হিসাবে প্রয়োজনীয়? 'কেবল মুসলমানদের উত্তক্ত্য করিবার জন্যই শোভাযাত্রা বাহির করা আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে, আর ঠিক নমাজের সময়ে রাম নাম গ্রহণ ও আরতি করা হয় ধর্ম্মের দিক হইতে উহা প্রয়োজন বলিয়া নয়, মুসলমানদের সহিত বিরোধের একটা উপলক্ষ্য পাইবার জন্য,—এই অভিযোগের উত্তর কি? ইহাই যদি প্রকৃত কথা হয়, ইহার উদ্দেশ্য স্বতঃই বিফল হইবে,—স্বাভাবিক নিয়মে উৎসাহের অভাবে আদালতের আদেশ, সামরিক আয়োজন (military display) অথবা সামান্য প্রস্তর বৃষ্টিতেই এই অধর্ম্ম্য প্রচেষ্টার সমাধি হইবে।

অতএব ধর্ম্মের দিক হইতে প্রয়োজন বিষয়ে প্রথমেই নিশ্চিত হইতে হইবে, ক্রোধের অবকাশ একান্ত ভাবে এড়াইয়া চলিতে হইবে, আন্তরিক ভাবে আপোষের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং যদি উহা সম্ভবপর না হয় বিরুদ্ধ পক্ষের মানসিক অবস্থা (sentiments) বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া একটা নিম্নতম প্রয়োজন (irreducible minimum) নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অথবা আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়াই উহা লাভ করিবার জন্য লড়িতে হইবে। কেহ যেন এমন কথা না বলেন যে আমি দুর্ব্বলতায় অথবা মূলনীতি বর্জ্জনের (surrender) প্রশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক সামান্য বিষয়কেই যেন মূলনীতি পদবীতে আরূঢ় করা না হয়।†

The Eternal Question. 22. 10. 25.

নাগরিক জীবন

মো. ক. গান্ধী.

১

কংগ্রেস সম্পর্কিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে অভিনন্দিত করিবার যে প্রথা সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে তাহার ফলে আমি সমগ্র ভারতের নাগরিকসভা সমূহের (Municipalities) সংস্রবে আসিয়াছি। এই সংস্রবজনিত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে স্বাস্থ্যসমস্যাই এদেশের নাগরিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। কতকগুলি মন্দ অভ্যাস আমাদের মধ্যে জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। এই অভ্যাস গুলি আমাদের স্বভাবে এত বদ্ধমূল যে উহার প্রতিকার মানুষের সাধ্যাতীত। যেখানেই যাইনা কেন, কোন না কোন আকারে এই সকল অস্বাস্থ্যকর অবস্থা আমার নজরে পড়ে। পাঞ্জাব

† বলা বাহুল্য এই নীতি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযুজ্য যদিও এক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে উপলক্ষ করিয়াই ইহা বিবৃত হইয়াছে। সঃ সঃ

এবং সিন্ধুদেশে স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়ম সমূহ একান্ত উপেক্ষা করিয়া আমরা ছাদ ও চাল নোংরা করিয়া রাখি। এই ময়লা কোটী কোটী জীবাণু ও ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকার অবাসস্থল হয়। আরও দক্ষিণে আমরা পথ ঘাট নোংরা করিতেও ইতস্ততঃ করি না, এবং যাহার মধ্যে শ্লীলতাজ্ঞান বিকাশ পাইয়াছে তাহার পক্ষে প্রত্যুষে মলত্যাগরত সারি সারি লোকের মধ্য দিয়া পথ চলাও কঠিন বোধ হয়। বঙ্গদেশেরও ঐ একই অবস্থা। যে ডোবায় লোকে ময়লা ও বাসন ধোয় এবং গরুতে জল খায় মানুষের পেয় জলও সেই একই ডোবা হইতে আহৃত হয়। মান্দ্রাজে আমি যাহা দেখিয়াছি কচ্ছের স্ত্রী পুরুষও উহার পুনরাবৃত্তি করাটা বিশেষ আপত্তিজনক মনে করেন না। ইহারা সকলেই অজ্ঞান (ignorant) অথবা অশিক্ষিত নহেন, অনেকেই ভারতের বাহিরেও গিয়াছেন, কিন্তু তবুও স্বাস্থ্যের বিষয়ে উহারা একান্তই অজ্ঞ। স্বাস্থ্যরক্ষার মূলসূত্র বিষয়ে উহাদিগকে শিক্ষা দিবার দিকেও কাহারও দৃষ্টি নাই। নিজ নিজ সীমা হইতে অস্বাস্থ্যের মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক নাগরিক সভা ও লোকেল বোর্ডের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সহরে যদি বাস করিতে হয়, স্বাস্থ্য অথবা জ্ঞানে যদি আমাদের বড় হইতে হয় তাহা হইলে একদিন না একদিন আমাদিগকে অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে। যত শীঘ্র আমরা তাহা করিতে পারি ততই ভাল। আসুন স্বরাজ না আসা পর্যন্ত আমরা অপর সকল কাজ স্থগিত রাখি। কতকগুলি কাজ আছে যাহা কেবল স্বরাজ আসিলেই সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল কাজ স্বরাজ আসিলে যেমন করা যাইতে পারে এখনও তেমনি করা যাইতে পারে, যে সকল কাজে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসভ্য জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, সে সকল কাজে যদি আমরা অবহেলা করি তাহা হইলে স্বরাজ কখনও আসিবে না। নাগরিক সভাসমূহ যত ভালরূপে ও তৎপরতার সহিত এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন অপর কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। এবিষয়ে আবশ্যকীয় সকল ক্ষমতাই উহাদের আছে বলিয়া জানি, এবং প্রয়োজন হইলে অধিকতর ক্ষমতা উহারা লাভ করিতে পারেন। অভাব সঙ্কল্পের। যেখানে আদর্শ পাইখানা নাই এবং যেখানে রাজপথ ও গলি সমূহ দিবারাত্র সমভাবে পরিচ্ছন্ন থাকেনা সেই নাগরিক সভার অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হওয়া উচিত তা আমরা বুঝি না। নাগরিক সভা এবং লোকাল বোর্ড সমূহের সভ্যগণের অসীম উদ্যম ভিন্ন এই সংস্কার সাধিত হইতে পারে না। সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে গেলে এই সংস্কার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া পড়িবে। যাহাদের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য আছে উহারা আন্তরিকতার সহিত কাজ করুন, অপরে স্বতঃই উহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি অন্যত্র আহমদাবাদের ডাক্তার হরিপ্রসাদ দেশাই লিখিত কৌতুকাবহ প্রবন্ধটী নবজীবন হইতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিলাম। আহমদাবাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার অতিশয় কঠিন হইলেও সেখানকার নাগরিক সভা উহার সমাধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহার এক একটী পল্লী (পোল, parish) ময়লা এবং দুর্গন্ধে পূর্ণ। এমন ময়লা সহর আর কোথাও দেখি নাই। অপরিচ্ছন্নতা যেন এখানকার ধর্ম্মবিধান। এখানে অপরিচ্ছন্নতার সমর্থনে অহিংসানীতির দোহাই দিতেও দেখা যায়। পাঠককে এই অনুবাদ যত্নসহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলেই উহারা আহমদাবাদের সংস্কারকগণকে কত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে নাগরিক সভার যে সকল সভ্য স্বাস্থ্য বিষয়ে আহমদাবাদকে আদর্শ নগরীতে পরিণত করিতে চাহেন উহারাই অন্যান্য কার্য্যের অবসরে এই কাজ করিতেছেন। নিয়মিত ব্যবস্থার কর্ম্মচারীবর্গকে উপদেশ দিয়াই যদি সন্তোষ লাভ করিতে হয় তাহা হইলে কোন নাগরিক সভাই

উচ্চ শ্রেণীর কাজ দেখাইবার আশা করিতে পারেন না। এদেশের সহর গুলিকে যদি দরিদ্রতম লোকের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় বাসের উপযোগী করিতে হয় তাহা হইলে নাগরিক সভাসমূহের প্রত্যেক সভ্যকে নিজ নিজ নগরীর মুর্দ্দাফরাসের কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে হইবে।

আহমদাবাদের স্বাস্থ্য

আহমদাবাদ নাগরিক সভার স্বাস্থ্যচক্রের (Sanitation Committee) অন্যতম সভ্য ডাক্তার দেশাইয়ের যে পত্রের উল্লেখ উপরের প্রবন্ধে করা হইয়াছে উহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

"আহমদাবাদের ১৫০০টী পল্লীর মধ্যে ১৫৫ টী বা মোটামুটী দশ ভাগের এক ভাগ পরিষ্কৃত হইয়াছে! এই হারে কাজ চলিলে দশ বা বারো মাসের ভিতর সমগ্র সহর পরিষ্কৃত হইবে আশা করা যায়।

নাগরিক সভা সমগ্র স্বাস্থ্য বিভাগ আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নগরের ৫০০ শত ঝাড়ুদার গড়ে প্রতিদিন দশটী পল্লীর সমগ্র ময়লা পরিস্কার করে। গড়ে প্রত্যহ ১০০ শত ঝাড়ুদার পীড়া অথবা অন্যান্য কাজের দরুণ কাজে অনুপস্থিত থাকে। ময়লা স্থানান্তরিত করিতেও ১০০শত লোকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ৩,০০,০০০ লোকের ময়লা পরিস্কার করিতে আমরা কেবল ৩০০ শত লোক অর্থাৎ গড়ে প্রতি হাজারে একজন মুর্দ্দফরাস পাইতেছি।

সহরের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য ২০ জন তত্ত্বাবধায়ক ২৮ জন সহকারী ও ৩৯ জন 'মুকাদম' (জমাদার?) আছে।

আমি প্রথমে একটী সভায় তত্ত্বাবধায়কদিগকে (Inspectors) আহ্বান করিলাম। স্বাস্থ্য-চক্রের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি, ভি, মাভলঙ্কর এবং সভ্য শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম গজ্জর—ইনিই ১৯২১ সালের আহমদাবাদের কংগ্রেস মণ্ডপ নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত কালিদাস ঝাভেরী প্রভৃতি সকলেই গান্ধী টুপীওয়ালা।

আমি সহরের স্বাস্থ্যের দুরবস্থার বিষয় বিবৃত করিয়া একটা কাজের ধারা (modus operandi) নির্দ্দেশ করিলাম। গতবৎসর নাগরিক সভার অভিনন্দনের উত্তরে আপনি যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা, এবং রাজনৈতিক কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিলে যে আহমদাবাদের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার ভার আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন তাহা আমি উহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। 'নাগরিক সভায় আমার স্থান লাভ আকস্মিক মাত্র; সেখানে স্থান না পাইলেও আমি বাহির হইতেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করিতাম, এবং এই কাজে নাগরিক হিসাবে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতাম। আপনারা যে কেবল নাগরিক, তাহাই নহে, আপনারা নাগরিক সভার কর্ম্মচারী এবং আহমদাবাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা আপনাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি অভিজ্ঞ হিসাবেই আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি, কর্ম্মচারী হিসাবে নহে, এবং আপনারা সেবার ভাব হইতে কাজে নামেন ইহাই আমার অভিপ্রায়।' আমি যথার্থই ভাবের আবেগে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এবং উহার ফলও তেমনি হইয়াছিল। কিয়ৎকাল আলোচনার পর

সকলেই এ কার্য্যে আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাজ আরম্ভ হইল।

রাত্রিতে সংস্কৃত পল্লী সমূহের কোন প্রধান স্থানে সভা হয়। সভার ও অধিবাসীগণের কি কি নিয়ম পালন করা উচিত তাহার বিজ্ঞাপনী প্রতি গৃহে বিতরিত হয়। এপর্য্যন্ত এইরূপ ১২,০০০ বিজ্ঞাপন বিতরিত হইয়াছে। সকলে যাহাতে এই সকল বিজ্ঞাপনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা দেখা 'মুকাদাম' দিগের কাজ। এপর্য্যন্ত সভার বিজ্ঞাপন ১৭,০০০ বিতরিত হইয়াছে, এবং রাত্রি ৯।৩০ হইতে ১১টার মধ্যে ১৩টী সভা হইয়াছে। ৭০০০ হইতে ৮০০০ স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা এই সকল সভায় যোগদান করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পাটেল, সহকারী শ্রীযুক্ত বলুভাই ঠাকুর, এবং শ্রীযুক্ত জীবনলাল দেওয়ান ও হরি প্রসাদ মেহেতা প্রভৃতি অপর কয়েক জন বন্ধু এই সকল সভায় নিয়মিত যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় প্রতি সভায়ই স্বাস্থ্য, নাগরিক সভার অন্যান্য কাজ, এবং সাধারণের সহযোগিতার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তাঁহার বক্তৃতা সকল সময়েই ফলবতী হইয়া থাকে। তিনি সাধারণের অভাব অভিযোগ শুনিতে চাহিলে সময়ে সময়ে বেশ রহস্যজনক (amusing) প্রশ্ন শোনা যায়। কেহ কেহ আলোচনায় যথেষ্ঠ অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই সর্ব্বত্র জয় লাভ করে।

পরিদর্শকের মারফৎ কোন পল্লী সংস্কৃত হইতেছে সংবাদ পাইলেই আমি সেখানে গমন করি, এবং ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সেখানকার কার্য্য পরিদর্শন করি। আমার উপস্থিতির পূর্ব্বেই প্রতি পল্লী হইতে ৫০।৬০ মন ময়লা অপসারিত হয়, প্রত্যেক পাইখানা পরিষ্কার করিয়া ধোওয়া পোছা হয়, যে সকল আনাচ-কানাচ কেহ কখনও স্পর্শ করে নাই উহারা পরিষ্কৃত হয়, বীজাণুনাশক ঔষধ (disinfectants) সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং প্রতি গৃহে পরিচ্ছন্নতার বাণী পৌছে।

কিন্তু এত করিবার পরেও কিছু কিছু ময়লা থাকিয়া যায়। কোন কোন স্থানে পরিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই নূতন ময়লা নিক্ষিপ্ত হয়। আমি এই গুলি পরিষ্কার করাই, পাইখানা এবং পল্লীর সুবৃহৎ দরজা, মুত্রত্যাগের স্থান, বারান্দা প্রভৃতির আড়ালে স্থিত স্থান সমূহ পরিদর্শন করি, এবং কাগজ, ইট ও কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি সামান্য সামান্য জিনিষও পরিষ্কার করাই। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ আমাকে দেখিতে আসে। আমি উহাদের সহিত আলাপ করি এবং শিশুদিগকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে এই কার্য্যে যোগদান করিতে আহ্বান করি।

এই ময়লার ভিতর ইট, পাথর, কাঁদা, টালি, ন্যাকড়া, মাটী, বালতি ভাঙ্গা, ধুলি উচ্ছিষ্ট, বাসনপত্রের ময়লা, ও যুগান্তসঞ্চিত দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা—সবই আছে।

স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আবর্জ্জনাধার (waste bins) পরিষ্কার করিতে হয়, গর্ত্ত বুজাইতে হয়, ময়লা জল নিষ্কাশন করিতে হয়, ভিজা এবং স্যাঁৎস্যেতে যায়গা শুকাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, কাঁদা দূর করিতে হয়, এবং নর্দ্দমায় মশার দঙ্গল বিনষ্ট করিতে হয়। [ক্রমশঃ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] পৌষ ১৩৩২ [৯ম সংখ্যা

স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক †

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

সুবোধ চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ যখন এই সভা করবার কথা হয় তখন যে বন্ধুটী আমার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করেন তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই, কেননা সুবোধচন্দ্রকে বাঙ্গালী ভুলে গিয়েছিল। ভুলে যাবার প্রধান কারণ এই, সুবোধচন্দ্র বক্তা ছিলেন না, সাহিত্য রথী ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্যভাবে বহু লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের সেবা করবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

যেদিন তাঁর লক্ষ টাকা দানের কথা হয়, সেদিনের কথা এখনো আমার চোখে ভাসছে। আমরা তখন জাতীয় শিক্ষার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম। জাতীয় শিক্ষার প্রথম যে চেষ্টা হয়, সেটা আমরা গায়ে পড়িয়া করি নাই। ইংরেজের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিবার জন্য আমরা স্কুল কলেজের ছেলেদিগকে বা'র হতে ডাকি নাই। হীরেন বাবু ছিলেন—আমি সে কয়দিন কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলাম—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তাঁরা দিনের পর দিন প্রকাশ্য সভায় এবং ঘরোয়া বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছেলেদের নিয়ে এই পরামর্শ করেছিলেন—না, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আর সংশ্রব রাখা যায়না। এই জন্য রাখা যায়না যে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যে সব স্কুল কলেজ ছিল, তার শিক্ষার সঙ্গে আমাদের নূতন জাতীয় প্রেরণার একটা ঝগড়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট গায়ে পড়ে বাধিয়ে ছিলেন।

আমরা তখনো বোমা তৈরী করতে আরম্ভ করি নাই, তখন পর্য্যন্ত বোমার

---

† ১৪ই নভেম্বর তারিখে এলবার্ট ইনষ্টিটিউট গৃহে স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতি সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী গৃহীত সর্টহ্যাণ্ড লিপি হইতে।

কল্পনাই হয় নাই। কিন্তু এটা তখন ইংরেজকে বলেছিলাম, সাবধান করে দিয়েছিলাম,—দেখ, এই যে প্রকাশ্য আন্দোলন হচ্চে, একে জোর করে মাটীর নীচে পাঠিওনা, আন্দোলনকে বা'র হতে দাও, তাতে আমাদেরও ভাল তোমাদেরও ভাল। কিন্তু তাঁরা সেকথা শুনলেন না, জোর জবরদস্তি আরম্ভ করলেন। তার ফল যা হ'ল সেটা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। ছেলেদের শিক্ষা বিষয়ে তাদের জোর জবরদস্তির প্রধান চেষ্টা হ'ল। এই যে এরা ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দেশময় একটা আন্দোলন তুলেছে, যদি স্কুল কলেজের ছেলেদিগকে তাতে যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে দেশে যে নূতন শক্তি গড়ে উঠ্‌ছে এর স্রোত বন্ধ হবে। তাঁরা তাই ভাবলেন। ভাবা আশ্চর্য্য নয়, কারণ তখন বাঙ্গালী ইংরেজী পড়ে' ইংরেজের অফিসে চাকুরী করবে, ওকালতী করবে, এই বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ বৃদ্ধেরা আপনাদের অধীনস্থ ছেলে পিলে দিগকে এই লক্ষ্যের দিকেই নিয়ে যেতে চাইতেন এবং তার জন্যই লেখা পড়া শেখাতেন।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বেশী দূরদৃষ্টি ছিলনা—তখনো ছিলনা, এখনো নাই। তাঁরা ভাবলেন, এ যদি বন্ধ করে দিতে পারি, তাহলে ছেলেরা চলে আসবে। প্রথম গোলযোগ রংপুরে আরম্ভ হল। রংপুরে ৩০শে আশ্বিন, যেদিন বঙ্গভঙ্গের জন্য একটা জাতীয় যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হয়, যেদিন রাখী বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই রাখী বন্ধনের দিনে জিলা স্কুলের ছেলেরা খালী পায়ে স্কুলে গিয়েছিল, তারা উপবাস করে ছিল,—সেদিন দেশ শুদ্ধ লোকেই উপবাস করেছিল,—এই অপরাধে হেড মাষ্টার তাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অনুসারে তাদের পাঁচ টাকা করে জরিমানা হ'ল। এ ত ছেলেদের ছেলেখেলা ছিলনা,—দেশে একটা শক্তি জাগ্রত হয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে চঞ্চল করে তুলেছিল। অভিভাবকেরা বল্লেন এ বড় অপমানের কথা, ছেলেরা খালী পায়ে স্কুলে গিয়েছে তাতে ত কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই, কোন disciplineএ ব্যাঘাত হয় নাই;— স্কুলের এমন কোন নিয়ম নাই যে জুতো পায়ে স্কুলে যেতে হবে, তবে এর জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা কেন হবে? তাঁরা বল্লেন আমরা জরিমানা দেবনা। তার ফল 'রাষ্টিকেশন', অর্থাৎ বের হয়ে যেতে হবে। অভিভাবকেরা বল্লেন— "বহুত আচ্ছা, স্কুল থেকে ছেলেদের বের করে তোমরা স্কুল করবে? কর।" সেদিন রংপুরে জাতীয় শিক্ষার গঙ্গোত্রীর উদ্ভব হয়, তারপর স্বদেশী আন্দোলন খুবই আরম্ভ হল।

নন্দবসুর বাড়ীতে, বাগবাজারে, ৩০শে আশ্বিন খুব বড় মেলা হল। ফেডারেশন গ্রাউণ্ডে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু প্রায় একরকম মৃত্যু শয্যা থেকে এসে বাঙ্গালীর যে সঙ্কল্প—'We the people of Bengal' এই বলে আরম্ভ করে বল্লেন—তোমরা ভাঙ্গ্‌ছ, আমরা ভাঙ্গতে দেবনা। রবীন্দ্রনাথ গান করলেন—

বিধির বাঁধন ভাঙ্গবে তুমি এমন শক্তিমান?
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান?
গানের শেষপদ— "বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তরীখান।"

এই যে করছ, সইবেনা সে টান, এই ভাবের গান। (সকলের হাস্য) দেশময় আগুণ জলে উঠল। ৩০শে আশ্বিন খুব প্রকাণ্ড একটা আন্দোলন হল, সে আন্দোলনে ইংরেজ ভয় পেয়ে ছিল। আমরা কিন্তু কিছুই করি নাই। কোন রকম মারামারি করবার আমাদের কথা ছিল না।

৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে, ২৮শে কি ২৯শে আশ্বিন আমরা শুনেছিলাম চারিদিকে ভলান্টিয়ারেরা হানা দিচ্ছিল, কি জানি ৩০শে আশ্বিন কি একটা কাণ্ড হয়। দিল্লীতে ১৮৫৭ সালে যে ব্যাপার হয়েছিল, বুঝি ১৯০৫ সনের ৩০শে আশ্বিন কলিকাতায় তার পুনরাভিনয় হয়, তাই ইংরেজ তার জন্য সরঞ্জাম যোগাড় করিতেছিল। আমরা দেখ্‌লাম—বেশ হয়েছে। এতে কি প্রমান হল?—প্রতাপ। রাজ শক্তির দুইটী জিনিষ আছে, প্রতাপ আর দণ্ড। দণ্ড প্রতাপকে রক্ষা করে, প্রতাপ দণ্ডকে রক্ষা করে। আমরা বল্লাম বেশ হয়েছে, আমাদের ত দণ্ড নাই, কিন্তু প্রতাপ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন দণ্ডের প্রয়োজন নাই; যে রাষ্ট্রশক্তির প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে দণ্ড ধারণ করতে হয়না, দণ্ড তার পায়ের নীচে পড়ে থাকে, অলস হয়ে থাকে, তাকে ব্যবহার করতে হয়না। আমাদের প্রতাপ হয়েছে সুতরাং দণ্ডধারণ অনাবশ্যক। ৩০শে আশ্বিন সঙ্ঘর্ষ কিছু হল না।

আমাদের যারা এসব কাজ করিতে ছিলেন তাদের মনে একটা ভয় হ'ল—উৎসাহের মুখে ৩০শে আশ্বিন পর্য্যন্ত চলেছে, এখন কি হবে? এখন আমাদের এই উৎসাহ রাখতে পারা যাবে কি উপায়ে? আমার মনে আছে, ৩১শে আশ্বিন সকাল বেলা—তখন আমি ভবানীপুরে থাকতাম—মহারাজা সূর্য্যকান্তের নায়েব এসে হাজির; মহারাজা দেখা করতে চান, আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি গেলাম। যেতেই বল্লেন—"বিপিন বাবু, আগুন যাতে না নিভে যায় তার চেষ্টা করতে হবে।" আপনারা বুঝুন দেশে তখন কি একটা নূতন ভাব, নূতন জোয়ার, নূতন প্রাণ, কি একটা আকর্ষণ জেগে উঠেছিল। মহারাজ সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—যত রাজা মহারাজ—ইতিপূর্ব্বে যাঁরা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের রাঙ্গা চোখ দেখলে ভয়ে ত্রস্ত হতেন, তাঁরা বলছেন—"দেখবেন আগুন যেন না নিভে যায়।" আমি মহারাজকে হেসে বল্লাম, "মহারাজ ভাবনা নাই, বিধাতা সে ভার আপনার হাতে নিয়েছেন। আজকার সকাল বেলার কাগজ দেখেছেন কি? বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী কারলাইল সাহেব বড় একখানা কাঠের গোড়া আগুনে দিয়েছেন, এ আগুন নিব্‌বে না। কার্লাইল সাহেব সার্কুলার জারি করেছেন—যারা বন্দেমাতরং বলবে, যারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবে, তারা কোন স্কুলে পড়তে পারিবে না, ইউনিভার্সিটীতে

থাকৃতে পারবে না। কার্লাইল নিমিত্ত মাত্র, ভগবান অগ্নিকুণ্ডের যোগাড় করেছেন, এ তাল সামলাতে অনেকদিন লাগবে।"

পান্তির মাঠে প্রথম বক্তৃতা হয় নাই; প্রথম হয়েছিল ঘরে। আমরা তখন স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক রসুল সাহেবকে সভাপতি করে' বল্লাম—কার্লাইল সার্কুলারের জবাব জাতীয় ইউনিভার্সিটী। সেই যে আমাদের সংকল্প, সেই যে আমাদের জবাব, বাস্তবিক সেটা কার্য্যে পরিণত হতে পারত না, যদি সুবোধ চন্দ্র মল্লিক প্রথম এগিয়ে একলাখ টাকা না দিতেন। বলা সহজ জাতীয় ইউনিভারসিটী করব, কিন্তু তা করতে গেলে টাকা চাই, অধ্যাপকদেরও কিছু কিছু দিতে হবে। দুই মাস করেই না হউক কড়ার করে দেওয়া যাউক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন যা করছে, গভর্ণমেণ্টের টাকা আসবে সেই আশায় চলছে--এখন দুই মাস কাজ কর, গভর্ণমেণ্টের টাকা আসলে সেটা বাড়িয়ে পাঁচ বৎসর করা যাবে। যাউক, টাকা ত চাই। উৎসাহের মুখে আমরা অনেক কিছু বলি; বল্লাম, টাকার জন্য ভাবনা নাই, যদি বিধাতা চান এই জিনিষটা করতে হবে, টাকা তিনি দিবেন। আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম, "লক্ষ্ণৌ সহরে একজন ইংরাজ মিশনারী এক পয়সা করে' ভিক্ষা করে' এক দু'লাখ টাকা এনেছিল, আমরা এতগুলি লোক আছি, এক পয়সা করে ভিক্ষা করে কি দু'চার লাখ টাকা আনতে পারব না?" উৎসাহের মুখে বল্লাম বটে, কিন্তু প্রতিদিন এক পয়সা করে ভিক্ষা করা সহজ নয়। তখন সুবোধ চন্দ্র বল্লেন—"আমি এক লাখ টাকা দেব।" সে সভার কথা আমার মনে আছে—ঐ পান্তির মাঠে। (কোন কোন শ্রোতা সিনেট হলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন) ওদিকে নয়, এদিকে, (হাস্য)। এখন যেখানে মেট্রপলিটান কলেজের হোষ্টেল হয়েছে—তাকে পান্তির মাঠ বলত। এখানে লোকে লোকারণ্য হয়েছে, আর বক্তৃতা হচ্ছে, এমন সময়ে কে আমার ঠিক মনে নাই—তিনি উঠে বল্লেন—সুবোধ মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লাখ টাকা দান করতে প্রস্তুত আছেন। জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হল এই এক লাখ টাকা। এই লক্ষ টাকা বিধাতার আশীর্ব্বাদাপ্লুত হয়ে আমাদের নিকট এল। তার পর দু'চার দিনের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বল্লেন, তিনি আর তাঁর জননী মিলে পাঁচ লাখ টাকা দেবেন। শেষ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অভুতপূর্ব্ব দান। তার দরুণ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ চলছে।

এই যে ১৯০৫ সালে জাতীয় যজ্ঞের কুণ্ড জ্বলেছে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গড়ে উঠেছে, সুবোধ চন্দ্রের একলাখ টাকা তার ভিত্তি। যুবকেরা তাঁর নাম জানেনা একথা সত্য নয়, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ যতদিন থাকৃবে তাঁর নাম ততদিন থাকবে। কিন্তু সুবোধ চন্দ্র কি করেছিলেন, অনেকে তা জানে না, আজ তাঁর স্মৃতিসভা হয়েছে দেখে সুখী হয়েছি, যাঁরা এর অনুষ্ঠান করেছেন তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

যদি ওরা জানে

শ্রীকামিনী রায়

ওদেরে ও গড়েছেন নিজে ভগবান্,
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে, স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বিঁধে শল্য সম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ ওরা, মায়ের সন্তান।

ওরা যদি আপনারে শেখে সম্মানিতে
ওরা দেশভক্তরূপে জন্মভূমি হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম্ম, বাক্য নহে—দিবে কর্ম্ম,
আলস্য বিলাস আজো উহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে।

ওরা হ'তে পারে দ্বিজ যদি ওরা জানে,
ওরা কি সঙ্কোচে সরি রহে ব্যবধানে ?
ওরা হ'তে পারে বীর, ওরা দিতে পারে শির
জননীর ভগিনীর পত্নীর সম্মানে,
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে,—
যদি ওরা জানে !

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'

কুমারী নির্ম্মলা বসু এম-এ

কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, গভীর দার্শনিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ—সাহিত্যের সকল অঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের তুলিকাপাত হইয়াছে এবং সেই তুলির লিখন সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব সুন্দর। "লিপিকাতে" তিনি এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। চিত্রদক্ষ শিল্পীর প্রতিভার উৎকর্ষ

সেইখানেই—যেখানে তিনি গতানুগতিক রূপরেখার অনুকরণ না করিয়া তুলিকাসম্পাতে, বর্ণসমবায়ে নব নব রূপ ফুটাইয়া তুলেন। ছন্দোবদ্ধ প্রাণময়ী বাণীই কবিতা। গদ্যের আকারে রূপের ও রসের রকমের ভেদে সেই একই জিনিষে কথাসাহিত্য উপন্যাস ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। 'লিপিকা"কে ইহাদের কোথায় স্থান দেওয়া যায় ঠিক বলা যায় না। অতি সুকুমার (delicate) রেখাসম্পাতে বিশেষ একটী সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া, রসবিশেষের স্ফুরণ করাই বোধ হয় ইহার বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে এই শ্রেণীর কয়েকটী কথিকা রচনা পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া তাহার যে নাম দিয়াছেন—মনে হয় "লিপিকা" অপেক্ষা সেই নামটীই ইহার মর্ম্মকথার সুন্দরতর পরিচয় দিত। গোকুলচন্দ্র নাগের পুস্তিকার নাম "রূপরেখা"। শুধু রেখাদ্বারা রূপের বিশেষ বিচিত্রতাটুকু ফুটাইয়া তোলা—অবান্তর আবেষ্টন (Setting) অথবা পশ্চাদ্‌ভূমি (back-ground) বাদ দিয়া, মূলনিহিত সৌন্দর্য্যতথ্যটীকে তুলিকার রেখাপাতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—ইহাই এইশ্রেণীর সাহিত্যের বিশেষত্ব।

অনেক কথায় যাহা বলিয়া ফুরান যায় না, অনেক স্থলে সামান্য দুই একটী সহজ সরল কথায় তাহাকে চমৎকার অভিব্যক্তি দেওয়া যায়। কারণ, এই আড়ম্বরহীন সহজ সরল কথার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুর (mystic note) আছে।

মানুষের প্রাণের স্পন্দনের ভিতর যে অনন্ত ভগবানের অনন্ত নৃত্যলীলা চলিয়াছে—তিনি রসরূপী, এবং সেই রসই আনন্দ। কারণ রসই প্রাণ এবং প্রাণ যেখানে, আনন্দ সেখানে। জীবনের গুহাহিত যে উৎস প্রাণাধারকে সরস রাখিয়াছে, মানুষ অনন্তকাল ধরিয়া তাহারই অনুসন্ধিৎসু। কবি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ক্ষেত্রভেদে একই সন্ধানে নিরত। 'লিপিকা'তে সেই রসরূপী ভগবানের এক অভিনব রূপ দেওয়া হইয়াছে। রূপদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিরা ভাবময় অম্লানচক্ষে যাহা দেখিয়া আপনাদিগকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া গিয়াছেন, তাহা "illusion" বা দৃষ্টিভ্রম নয়—অভ্রান্ত সত্য। যুগের পর যুগ ধরিয়া ভাবুক শিল্পী এই সত্যেরই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। "প্রাণমন", "স্বর্গমর্ত্ত্য", "আগমনী"র লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথও এই একই সাধনা করিয়াছেন।

শিশু যেটা আকারে বড় দেখে তাহাকেই বড় বলে। সেটা তার অপরিপক্ক শিশুবুদ্ধিরই পরিচায়ক। বয়সে প্রবীণ মানুষেরও এ ভ্রম যায় না—তাই ক্ষুদ্রের ভিতর বিরাটের ইঙ্গিত অনেকেরই চক্ষে ধরা পড়ে না। অনন্ত ভগবান সান্ত বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর সর্ব্বত্র লীলাময়রূপে প্রকট। উত্তুঙ্গ পর্ব্বত ও বিশাল সাগর হইতে ক্ষুদ্র ধূলিকণা অবধি; কোথাও তাঁহার লীলার অভাব নাই। সে যে রসরূপের সমাবেশে কতবড় আনন্দের লীলা কেবল ভক্ত সাধকের অনুভূতিতেই তাহা ধরা পড়ে। তাই সাধক ভগবানের 'আনন্দ' ছাড়া নাম খুঁজিয়া পান না। ক্ষুদ্রের ভিতর বিরাটের এই যে অনন্ত

আনন্দের খেলা চলিয়াছে—"লিপিকার" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথিকার ভিতর তাহারই প্রকাশ হইয়াছে। কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন—

"আমার শুধু একটী মুঠি ভরি,
দিতেছ দান দিবস বিভাবরী"—

এই দুটী ছত্রেই লিপিকার সুন্দর পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা—যাহা সবারই জীবনে নিয়ত ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে—তাহার ভিতর যে অপরূপ বিরাট সত্য নিহিত আছে তাহা দিবস রজনীর নিত্য অভিযানেরই মত সত্য। এবং ইহার প্রকাশ আমরা পাই শুধু জ্ঞানের দিক দিয়া নয়—রূপের দিক দিয়া আনন্দের ভিতর দিয়া। "নতুন পুতুল", "নামের খেলা", "প্রশ্ন", "প্রথম শোক" "একটী দিন", "চাউন"—এ সবই এই সত্যের অতি সুন্দর অভিব্যক্তি। বিরাটকেও ক্ষুদ্রের পূজার অপেক্ষা করিতে হয়। মনে পড়ে Robert Browing এর Abt Voglerএর অতি সুন্দর একটী লাইন—

"And heaven yearns down"

ঐ *'yearns'* কথাটীর মাধুর্য্য বড় সুন্দর। সেই মাধুর্য্য এখানেও উপভোগ করি। ধরার টানে স্বর্গ আকুল হইয়া নামিতে চায়, সীমার প্রেমে অসীম আত্মহারা। মানুষ নইলে ত্রিভুবনেশ্বরের সাম্রাজ্য যে বৃথাই— মহৎকে, অনন্তকে তাঁহার সত্বার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুদ্রকে, সান্তকে যে হৃদয়ে সপ্রেম আসন দিতে হয়—এই প্রাণারাম পরম সত্য 'লিপিকার' রচণাগুলিতে ঝঙ্কৃত। তখন বেশ বুঝি—

"রূপের রেখায় রসের ধারায়
এমন সীমা কোথায় হারায়।"

তখন দেখি—"তোমার সাথে আমার জানাজানি।" তাই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ গন্ধের সৃষ্টি—নইলে প্রেমের প্রকাশ কোথায়? আর প্রেম যে প্রাণের উৎসমুখে—এ সত্য যে নিয়তই জাগ্রত। শুধু প্রাণের জগতে বিরাগীর—recluse এর—জীবনে পূর্ণতা নাই। বহির্জগতকেও সেই অন্তরের সুরে সুর মিলাইয়া না লইলে পরিপূর্ণতা আসেনা। তাই Browning Rabbi ben Ezra'র একস্থানে বলিয়াছেন—

Let us not always say,
'spite of this flesh to-day
I strove, made head, gained ground
upon the whole !'
As the bird wings and sings,
Let us cry, 'All good things

Are ours, nor soul helps flesh more, now,
than flesh helps soul.

"স্বর্গমর্ত্ত্য"তে এই কথাই বারবার করিয়া বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের কথায় কবির বক্তব্য অতি পরিষ্কার প্রাঞ্জল করিয়া বলা হইয়াছে—"আমি সেখানে গিয়ে তার (পৃথিবীর) দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটী রেখে আসতে চাই, যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতের স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান;—তাকে বেষ্টন করে ধরে' যে সমুদ্র রয়েচে সেই ত স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদ ক্রন্দনকেই ত সে মর্ত্ত্যে অনন্ত করে রেখেছে।"

এই যে অনাহত প্রেমের জয়বার্ত্তা—Wordsworth এর "True to the kindred points ot heaven and home"—কে বহুদূরে ছাড়াইয়া, Shelleyর "Intense Inane এর উপরও বোধ হয় এক অপরূপ রূপ রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তব অবাস্তবের মিলনে যেমন ইন্দ্রধনুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্বার সৃষ্টি—এ বুঝি তেমনি। কিন্তু ইন্দ্রধনু আকাশে মিলাইয়া যায়। রূপ রসের এই যে রাজ্য—ইহার ভিত্তি জ্ঞানের গাঁথনির উপর প্রাণের গভীরতার মধ্যে—ইহা মিলাইবার নয়, হারাইবার নয়।

শিল্পীর দক্ষতা সেইখানেই, যেখানে তিনি নূতন রূপে আসিয়া প্রাণের পুরাতন হর্ষ-ব্যথার স্থানগুলি স্পর্শ করিয়া বলেন—"তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।" 'লিপিকার' এই আকারে ক্ষুদ্র অথচ ভাবময় রচনা গুলির ভিতর দিয়া কবির এই নূতন রসরূপ সৃষ্টি 'Old familiar way'—তেই প্রাণ স্পর্শ করে—তাই এগুলি এত ভাল লাগে। কার্ত্তিকেয়ের কথায় আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে তন্বী শ্যামা ধরণী সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের পথ ধরে' স্বর্গের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—সে রাণী—সে দেবতার সাধনার ধন,—স্বর্গের চিরদয়িতা।" ইহাই 'লিপিকার' মর্ম্মবাণী; ইহারই অভিব্যক্তির জন্য অপর রেখা গুলির সম্পাত। একবার গোড়ায় আর একবার শেষে "স্বর্গমর্ত্ত্য" পড়িয়া লইলে 'লিপিকার' রূপটী ধরিয়া লইতে কষ্ট পাইতে হইবেনা, রেখা গুলির সমন্বয়ে এক অভিনব মধুর চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। "তখন দেখি তোমার সাথে আমার জানাজানি।"

এই যে একটুকু তুলির ছোঁয়াতে অখণ্ড 'সুন্দরের অভিব্যক্তি, ইহাই 'রোমান্সের' প্রাণ। স্পষ্ট করিয়া সব কথা বলিলে ত শেষ হইয়া যায়। যে অনুভূতি খানিকটা বুঝাইয়া, অনুভূতির রাজ্যে বাকীটুকুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দেয়—অসীমের আভাস আমরা তাহার ভিতরেই পাই। তাই শুধু রোমান্স কেন—দর্শনেরও সোণার কাঠি এই রেখাপাতের ভিতর। নইলে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর অনন্তের অভিব্যক্তি পাইব কেমন করিয়া? দর্শন ও রোমান্সের যে চমৎকার মিলন রবীন্দ্রনাথের সকল রচনায় পাই, তাহা অতি সুন্দরভাবে লিপিকাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "নতুন পুতুলে"র কাহিনীতে

নূতন কারিকরের পুতুল গুলি রাজকন্যাদের ভাল লাগিত ঐ জন্যই যে তাহারা কখনো ফুরাইয়া যাইবেনা, কারণ তাদের সবটা গড়িয়া শেষ করা হয় নাই। Keats এর সেই লাইনটী মনে পড়ে—"For ever thou shalt love and she be fair". "পায়ে চলার পথ"ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে সীমার মাঝখান দিয়া অসীমের যে আভাস পাওয়া যায় তাহারই ইঙ্গিত। সবটুকু বলা হইলে যে আর কিছু থাকেনা—গভীর শূন্যতা তাহার অনন্ত ধ্বংসপথে আকর্ষণ করে—"পরীর পরিচয়ে" কবি আর একদিক দিয়া এই একই কথা বলিয়াছেন। সুন্দরকে আমরা বুঝি, পাই প্রাণের গোপন গুহায়। সে বোঝার সঙ্গে বাহিরের রূপের কিছু আসে যায় না। তাই রাজপুত্র কালো পাহাড়ী মেয়ের ভিতর একবার দেখিয়াই পরীস্থানের পরীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রাণ যখনই একান্ত আকুল হয়, অনন্ত তখনই ধরা দেন। তাই রাজপুত্রের পরীলাভ হইল। কিন্তু প্রাণের পরিচয়ে তৃপ্ত না হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চোখের পরিচয় যখনই চাহিলেন— নিঃশেষ ভাবে দেখিয়া শেষ করিয়া দিতে—পরী তখন যে পরিচয় দিয়া গেল তাহার ভিতর অখণ্ড রূপের পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া গেল বটে কিন্তু সে তখন আয়ত্তের বাহিরে।

অপূর্ণ যেমন পূর্ণতাকে কামনা করে, পূর্ণও তেমনি আগ্রহে অপূর্ণকে চায়, অপূর্ণকে বক্ষে চাপিয়া তবে আপন পূর্ণতার উপলব্ধি করে, নইলে সে যে একা ও বৃথা। তাই সাগরের বুকে অনন্ত ক্রন্দন, আর তাই বিরাট আকাশের নীল নয়নের গাঢ় অভিনন্দন পৃথিবীর সাগরের বুকে, বৃষ্টিধারায় গলিয়া পড়ে। মানুষের ভিতর যে প্রাণ আছে সে নিয়তই কাঁদিয়া ফেরে, অতীন্দ্রিয় জগতে সেই যে একজন মাত্র আছেন, যাঁহাকে নইলে পৃথিবীর ধূলাখেলা সব বৃথা, তাঁহারই জন্য মানুষের বিরহী আত্মা তেমনি আপনার আধখানাকে লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য কাঁদিয়া ফেরে। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মুলই এই বিরহের উপর। "মেঘলা দিনে" মেঘদূতের সেই চিরনবীন অথচ চিরনূতন মর্ম্মবাণীর সুরটী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। 'In Earth the broken arc in heaven the perfect round". 'Perfect round'এর জন্য 'broken arc'এর এই যে ক্রন্দন - এ যুগ যুগ ধরিয়া বাজিতেছে।

'লিপিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরের কথিকাগুলি প্রধানতঃ সমালোচনা অথবা 'didacticism'. সাধারণতঃ কোনো নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কোনো কিছু শিখাইবার উদ্দেশ্যে রচিত লেখা (pulpit preaching) আর্ট হিসাবে অতি নিম্নেই স্থান পায়। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গী ও রচনা কৌশলে এই বিদ্রূপাত্মক কথিকাগুলির খোঁচার উপর হাস্যরসের মনোরম আবরণ পড়িয়াছে।

"গল্প"তে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়া অতি খাঁটী সত্য কথা বলা হইয়াছে। "মীনু" অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী। সহরের গণ্ডীবদ্ধ কচি তরুণ প্রাণ কেমন করিয়া শুকাইয়া যায় তাহারই চিত্র। এ যেন বনলতাকে উদ্যানলতা করিবার

প্রয়াসের শোচনীয় পরিণাম। আর "নামের খেলা" ও "ভুল স্বর্গ" অল্প কথায় ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়া বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক। "নামের খেলা" অক্ষরে অক্ষরে শিল্পীর ক্ষমতা ও দক্ষতা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। "রাজপুত্তুর" নূতন রকমের জিনিষ। বিচিত্র অথচ করুণ, অতি সত্য, অথচ অতি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র। Wordsworth এর 'Ode on Immortality' একটু একটু স্মরণ করাইয়া দেয়। "সুয়োরাণীর সাধ"এর আখ্যান ভাগ একটু নূতন রকমের। বড় মিষ্ট।

কবি যেমন করুণরস রচনায় সিদ্ধহস্ত—হাস্যরসেও তেমনি। "ঘোড়া"টী ইহার অতি চমৎকার উদাহরণ। "কর্ত্তার ভূত" বোধ হয় রাজনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ রচনা অথবা ভ্রমাত্মক সনাতন সামাজিক প্রথার দাসত্ব স্বীকারকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিত? দুই একটী ছত্রে মনে হয় প্রথম অনুমানই বোধ হয় সত্য। যথা—"এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুল এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল—কারো হুঁস ছিলনা।' (৮৫পৃঃ) "খাজনা দেব কিসে? শশ্মান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে,—বুকের রক্ত দিয়ে।" (৮৫, ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা)—ইহাও পূর্ব্বোক্ত ধারণাই বদ্ধমূল করে।

"তোতাকাহিনী"তে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। মনে হয় বিদ্রূপাত্মক এই সব রচনা গুলির ভিতরই অতি গূঢ়ভাবে করুণ রসের ফল্গুধারা প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত।

"সিদ্ধি" অতি অপরূপ কাহিনী। সিদ্ধি সন্ন্যাসে নয়, বৈরাগ্যসাধনে নয়;—আত্মায় আত্মায় অবিচ্ছিন্ন মিলনে নর-নারীর আত্মোপলব্ধির সাধনা সিদ্ধ হইলে সেইখানেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হয়। আর বাহিরের মিলনেই প্রাণের মিলন হয়না তাই মিলনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে কাঠকুড়নী তাপসের বাঞ্ছিত দর্শন ত্যাগ করিল। কারণ, সে বুঝিয়াছিল, তাহার ভিতর তপস্যা টলাইবার শক্তি আছে। সে যদি মেনকা উর্ব্বশীর মত সে শক্তির অপব্যয় করিত, তাহা হইলে উভয়েরই সাধনা ব্যর্থ হইত।

তপস্যা পূর্ণ হইল একদিন। সিদ্ধ তাপস বরগ্রহণের বেলা চাহিল কিন্তু সেই কাঠকুড়নীকে। স্বর্গের অধিকারে মানুষ না বাধা পায় এই ছিল তার পণ। কাঠকুড়নীকে চাহিয়া লওয়ায় স্বর্গের অধিকারে মানুষের প্রবেশাধিকার কি প্রশস্ত করা হয় নাই? অন্তর্জগতে সত্বায় সত্বায় যখন নরনারীর মিলন হয়, স্বর্গ ত সেখানেই সৃষ্টি হয়। সেই অধিকারে মানুষের বাধা ছিল, কারণ, মানুষ চায় বাহিরের মিলন, ভুল পাওয়া, যে পাওয়া মুঠির ভিতর লইলেই ফুরায়। মানবের মরণ বাণ মানবীর হাতে যে আছে সে নিশ্চয়। মানব ও মানবী যেই আপন আপন শক্তি

আপনাতে সংহরণ করিয়া সাধনা করিল, অন্তরের মিলনের পথ তখনই সহজ হইয়া গেল। তাই সিদ্ধকাম তাপস কাঠকুড়নীকে চাহিয়া লইয়া স্বর্গের অধিকার মানুষকে দান করিলেন।

'লিপিকা'র লেখা গুলির মর্ম্মকথা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের ভিতর পাওয়া যায়। গানের ভিতর যে সুর বাজিয়াছে এই লেখা গুলির ভিতরও সেই সেই সুরই বাজে। "মুক্তি"র বক্তব্য তাঁহার 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। "মেঘলা দিনে" তেমনি স্মরণ করায়—

"কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।
তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা"—ইত্যাদি।

'প্রাণমন' আগাগোড়া উপনিষদের বাণীতে ঝঙ্কৃত—অতি গভীর, অতি পরিচিত, চিরনূতন, চিরপুরাতন মহাসত্যের বাণী। তবে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া এখানে ইহার সাজ নূতন দেখাইতেছে। জ্ঞান প্রেমের সনাতন দ্বন্দ্বের অপরূপ মিলন জীবনের কেন্দ্রে, ব্যথার উৎসে, অশ্রুধারার মাঝখানে। মনে পড়ে—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।"

কবি মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মহামিলনের ক্ষেত্র রচিয়াছেন গানের স্বপ্নপুরীর মাঝখানে। সব চেয়ে সুন্দর ইহার উপসংহারে বনস্পতির সবুজ পাতার জয়গান—"গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেচে............এই স্বর সঙ্কটের মধ্যে তোমার তম্বুরাটী সরল তারে বলচে—ভয় নেই, ভয় নেই......এইত মূল সুর আমি বেঁধে রেখেছি,—আদি প্রাণের সুর—সকল উন্মত্ত তানেই এই সুরে সুন্দরের ধূয়োয় এসে মিলবে আনন্দের গানে।"

"আগমনী"তে আর একভাবে উপনিষদের আর এক মহা সত্য অভিনব সাজে প্রতিষ্ঠিত। সে ভগবানের আনন্দময় রূপ—রসরূপী ভগবান।

"স্বর্গমর্ত্ত্যে" লিপিকার [illegible] গুলি রেখা, বর্ণ, সুর, রস সমন্বয় হইয়া এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। রূপরেখার এইখানে সমন্বয়, তাই এইখানে শেষ। ধরণীর ব্যথার, কালিমার, ক্ষুদ্রতারও পরিণতি—অনন্ত পবিত্র শাশ্বত আনন্দের মাঝখানে—সৃষ্টিতে বিফল যে কিছুই নয়—এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মনে পড়ে Shelley-র বিশ্বাস

—"Evil is an accident". মনে পড়ে তাহারও উপরে Browning এর বিজয় তুরীর নিনাদ—সত্যের জয় ও প্রতিষ্ঠা, মিথ্যার ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর ভিতর দিয়া তাহার উপরে। মিথ্যাকে পদাহত পরাজিত করিয়া তাহার বক্ষের উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা খানিকটা "মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা রূপের মত। যেন শিবময় কল্যাণময়, পূর্ণসত্য মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করিলে, পাপকে এড়াইলে চলিবেনা। পাপ আছে তাই পুণ্যের মহিমা, ক্ষুদ্র আছে তাই বিরাটের গরিমা, ধরণী আছে তাই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। তাহাকে ত্যাগ করিলে "স্বর্গের লক্ষ্য চলিয়া যায়।" আর স্বর্গ ত্যাগ করিলে—"পৃথিবীও যে যায়—মানুষ এমনি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে যে......কেবল বস্তুর উপরই তার ভরসা...…স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে' আলোকের দিকে উঠতে পারচেনা।" সত্যের প্রতিষ্ঠা মিথ্যার জয়ের উপরে। যেখানে স্বর্গ আপন শুচিতা রক্ষার জন্য চারিধারে প্রাচীর গড়ে, সেখানে স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়েরই অসার্থকতা। প্রাণের স্পন্দনকে টিপিয়া মারিলে প্রাণও থাকে না। স্বর্গ সেই প্রাণ ও মর্ত্ত্য তাহার স্পন্দন। দুজনেরই দুজনকে চাই; দুই মিলিত হইলে তবে দুই জনেরই পরিপূর্ণতার অসীম শান্তি—সার্থকতা। নইলে উভয়েই মিথ্যা। তাই স্বর্গেরও জয় নহে, মর্ত্ত্যেরও জয় নহে। উভয়ের মিলনের জয় গানই শাশ্বত পূর্ণতার গান।

মোটের উপর 'লিপিকা' পড়িয়া মনে হয় উজ্জ্বল রৌদ্রের গলিত স্বর্ণধারার তীব্রতার উপর কোমল স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার সপ্রেম আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া রামধনুর হাসি-অশ্রুমাখা রূপ দেখিতেছি। এক একটী রূপরেখা উজ্জ্বল করুণ মধুর ভাবে অপর রেখার সহিত মিলিয়াছে—কতক ব্যক্ত কতক অব্যক্ত হইয়া অসীম, অখণ্ড সুন্দরের অভিব্যক্তি রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামধনুর শেষ যে কোথায়—কোন অব্যক্ত রাজ্যে তাহা যেমন খুঁজিয়া মেলেনা কিন্তু "আছে" যে সে বিষয়ে স্থির বিশ্বাসও যায় না—এও তেমনি ব্যক্তাব্যক্তের পরপারে অসীম অরূপরূপের সন্ধান বলিয়া দেয়। আমাদের কাণে বাজিতে থাকে—

"And heaven yearns down."

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র

উচ্চ কুলে জন্ম বলে' কত কাল আর,
ভাই বিপ্র, রবে তব এই অহঙ্কার?
কৃতান্ত চেনেনা জাতি, রাখেনা তো মান,
তার স্পর্শে দ্বিজ শূদ্র, পারিয়া সমান,
তার পর ভস্ম কিংবা মাটী যবে হবে
দ্বিজ চণ্ডালের মাঝে কি পার্থক্য রবে?

সেবা ধর্ম্ম

ওরে ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, ওরে শূদ্র ভাই
দেবত্বের পথে যেতে কারো বাধা নাই।
নিজ দোষে, পর রোষে, পাপে কিম্বা শাপে
জন্মিয়াছ হীনকুলে, এহেন প্রলাপে
পাতিও না কর্ণ তব। চন্দ্র সূর্য্য যাঁর
জ্ঞানের রচনা, সেই বিশ্ব বিধাতার
পুত্র তুমি; আছে তব উত্তরাধিকার
তাঁর জ্ঞান ধনে, প্রেম পুণ্য ধনে আর।
তোমার যে সেবা ধর্ম্ম, তুচ্ছ তাহা নয়;
সেবিছেন সর্ব্ব জীবে প্রেমানন্দময়
বিশ্বরাজ—অবিরাম, প্রতি নিশিদিন;
সেবা ধর্ম্ম দেব ধর্ম্ম, নাহি করে হীন—
যদি আসে প্রীতির আহ্বানে,—নহে লোভে
সুখের বা স্বরগের, নহে ভয়ে ক্ষোভে।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমার বিশ্বাস, এবং সামান্য জ্ঞানে ও বলে, যে এই ন্যায্য শাসনাধিকার সম্পূর্ণভাবে ও স্থায়ীভাবে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না। আমার মনে হয় এই আদর্শ অধিকার কোন মানবশক্তিতে আরোপ করা মূলতঃ মিথ্যা ও বিপজ্জনক। এই নিমিত্ত শাসনশক্তি যে আকার বা যে নামই ধারণ করুক না কেন তাহাকে বিধিনিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। এইজন্য বিজয়মূলক, উত্তরাধিকারমূলক, বা নির্ব্বাচন-মূলক, সর্ব্বপ্রকার একেশ্বর শাসনতন্ত্র মূলতঃ অবৈধ। ন্যায্যশাসনাধিকারীর সন্ধানপ্রণালী লইয়া বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে, দেশকালবিশেষে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু কোন কালে কোন দেশে কোন বৈধশাসনতন্ত্র একেশ্বর হইয়া থাকিতে পারে না।

একথা মানিয়া লইয়া ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাজতন্ত্র সর্ব্ববিধ পদ্ধতির মধ্যেই ন্যায্য শাসনাধিকারের বিগ্রহস্বরূপে দেখা দেয়। যাজকতন্ত্রের কথা শুনুন; সে বলিবে রাজা পৃথিবীতে ভগবানের বিগ্রহ; অর্থাৎ রাজা ন্যায়, সত্য ও মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। আবার ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌দিগের কথা শুনুন; তাঁহারা বলিবেন রাজা আদর্শ বিধির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ যে ন্যায়ধর্ম্ম সমাজশাসনের একমাত্র অধিকারী রাজা সেই ন্যায়ধর্ম্মের বিগ্রহ। রাজতন্ত্র নিজে কি বলে শুনুন; সে বলিবে রাজা রাষ্ট্রের অর্থাৎ জনসমাজের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিভূ। রাজতন্ত্রকে যে দিক দিয়া যে সম্পর্কেই দেখুন না কেন সর্ব্বত্রই সে একটা আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নিজকে প্রকটিত করিতে চাহে।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই যে ন্যায্য শাসনাধিকারী, ইঁহার প্রকৃতিগত লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ তিনি এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না; সত্য যখন এক, ন্যায়-ধর্ম্ম যখন এক, তখন ন্যায্যশাসনাধিকারীও এক। তিনি সনাতন, তাঁহার কোন পরি-বর্ত্তন নাই, কারণ সত্যের কখনও পরিবর্ত্তন হয়না। তাঁহার অবস্থান জগতের সমস্ত বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে; জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি কেবল সাক্ষী ও বিচারক। এখন দেখুন এই আদর্শ শাসনাধিকারীর যাহা কিছু প্রকৃতিগত লক্ষণ তাহা রাজতন্ত্রের মধ্যে বাহ্যতঃ কেমন সরলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন কনষ্টান্টের গ্রন্থ

খুলিয়া দেখুন ; দেখিবেন তিনি কেমন কৌশল সহকারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজতন্ত্র একটা নিরপেক্ষ সংযমধর্ম্মী-শক্তি ; সে সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত বিরোধ সংঘর্ষের উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া কেবল বড় বড় সঙ্কটকালে সমাজব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। মানব-শাসনে আদর্শ শাসনাধিকারীর ব্যবহারও কি এইরূপ নহে? এ ধারণার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহা মানবচিত্তকে আকর্ষণ করে, কারণ ইহা কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। একজন রাজা ব্রাজিলের শাসনতন্ত্রে এই ধারণার উপরেই তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ; সেখানে রাজশক্তি অন্যান্য সক্রিয় শক্তির উর্দ্ধে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী, বিচারক, এবং নিয়ামক-স্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটিকে যে দিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখুন, আদর্শ শাসনাধিকারীর সহিত যে দিক দিয়াই তুলনা করিয়া দেখুন, দেখিবেন উভয়ের মধ্যে অনেকটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে এবং ইহা যে মানুষের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ করিবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই জন্য যখনই মানুষের চিন্তা বা কল্পনা আদর্শ-শাসনাধিকারীর প্রকৃতি-পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে তখনই তাহারা রাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যখন মানুষের মনে ধর্ম্মভাবের আধিপত্য তখন ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষের মনের গতি এই রাজতন্ত্রের দিকেই পরিচালিত হইয়াছে। আবার যখন সমাজে ব্যবহারবিদের আধিপত্য তখন ন্যায়ধর্ম্মই সমাজের যথার্থ রাজা এই ধারণায় সকলে অভ্যস্ত হইয়া গেল, এবং রাজতন্ত্রই যে এই ন্যায়ধর্ম্মের বাস্তব মূর্ত্তি এ ধারণাও সহজে প্রসার লাভ করিল। যখনই মানুষ মনোনিবেশসহকারে এই আদর্শ শাসনাধিকারীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়াছে তখনই রাজতন্ত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ সাধারণের চক্ষে রাজতন্ত্র এই আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ।

তাহা ছাড়া এমন অনেক সময় আসে যখন সমাজের অবস্থা বিশেষ করিয়া এইরূপ ধারণার অনুকূল। মানব ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য নানা সঙ্কটসংশয়ের মধ্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায় ; তখন সমাজের ব্যক্তি মাত্রই অজ্ঞানের দরুণই হউক বা পাশবতার দরুণই হউক বা দুর্নীতির দরুণই হউক, আত্মসর্ব্বস্ব ভাবে জীবন যাপন করে। তখন সমাজ ব্যক্তিগত বিরোধে বিপর্য্যস্ত হইয়া, জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া এমন একটা রাজশক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে যাহার নিকট সকলকে বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। এমন সময়ে যখনই তাহারা এমন একটা শাসন শক্তির সন্ধান পায় যাহার মধ্যে আদর্শ শাসনাধিকারীর কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তখনই সমাজ সেই শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হইতে চাহে। জাতিসমূহের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকালের আলোচনায় আমরা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে সকল যুগে জাতীয় জীবন সতেজ অথচ

উচ্ছৃঙ্খল, চারিদিকে যখন অরাজকতার প্রাদুর্ভাব, সমাজ যখন নিজেকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চায় অথচ সমাজস্থ ব্যক্তি-সমূহের সম্মিলিত স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্য পায়না, সেই সেই যুগের পক্ষে রাজতন্ত্র বিশেষভাবে উপযোগী। আবার অনেক সময় আসে যখন সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে সমাজে রাজতন্ত্রের একই রূপ উপযোগিতা ঘটে। রোমীয় গণতন্ত্রের অবসানকালেই রোমীয় সাম্রাজ্য এক প্রকার বিলয়োন্মুখ বলা যায়; অথচ সেই সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া জীর্ণাবস্থায় সুদীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও টিকিয়া রহিল কেমন করিয়া? ইহা কেবল রাজতন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। সমাজ তখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রভাবে কেবলই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া চলিয়াছিল; কেবল রাজতন্ত্রই তাহাকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রোমীয় জগৎকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য সম্রাট্-শক্তি পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া লড়াই করিয়াছিল।

অতএব এমন অনেক সময় আসে যখন রাজতন্ত্রই কেবল ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, আবার অনেক সময় আসে যখন রাজতন্ত্রই সমাজের গঠন-ক্রিয়ার সহায়তা করে। অন্যান্য শাসনতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টতর ও প্রবলতর ভাবে আদর্শ-শাসনাধিকারের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইতিহাসে রাজতন্ত্রের এত প্রভাব।

অতএব যেদিক হইতে যে যুগেই রাজতন্ত্রের আলোচনা করুন না কেন, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ইহার যথার্থ গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে ইহা সেই আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিরূপ যাহারই কেবল সমাজশাসনে ন্যায্য অধিকার আছে।

এখন আর এক দিক হইতে রাজতন্ত্রের বিচার করা যাউক। ইহার গঠনবৈচিত্র্য, ইহার ক্রিয়াবৈচিত্র্য, ইহার প্রভাববৈচিত্র্য—এই বৈচিত্র্যের দিক হইতে ইহার আলোচনা করা যাউক। এই সকল বৈচিত্র্যের কারণ কি তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

এখানে আমাদের একটা সুবিধা আছে। আমরা একবারেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নামিয়া যাইতে পারি। নানা ঘটনার সমবায়ে এক ইউরোপের মধ্যেই রাজতন্ত্র সর্ব্বপ্রকার রূপই ধারণ করিয়াছে। রাজতন্ত্রের যত প্রকার রূপ হওয়া সম্ভব, ইউরোপের রাজতন্ত্র তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস একবার আলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। আপনারা দেখিবেন ইহা কত বিভিন্নরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে বৈচিত্র্য, জটিলতা ও বিরোধ সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি তাহাই বা ইহার ইতিহাসে কতখানি লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চম শতাব্দীতে জার্ম্মান আক্রমণের সময়ে দুইটী রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, একটি বর্ব্বর রাজতন্ত্র অপরটি রোমীয় সম্রাট্-তন্ত্র, ক্লোভিসের রাজতন্ত্র কনষ্টানটাইনের

রাজতন্ত্র। উভয়ের মূলনীতি ও পরিণামে মূলগত পার্থক্য। বর্ব্বর রাজতন্ত্র নির্ব্বাচন-মূলক; জার্ম্মাণ রাজগণ নির্ব্বাচিত হইতেন, যদিও নির্ব্বাচনপ্রণালী আধুনিক নির্ব্বাচন-প্রণালীর মত নহে। তাঁহারা ছিলেন সামরিক নেতা; তাঁহাদের বহুসংখ্যক সহচর যাহাতে তাঁহাদের শাসন স্বাধীনভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সেই জন্য শৌর্য্য সামর্থ্যের উৎকর্ষ দেখাইয়া তাহাদের সম্মতি তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইত। নির্ব্বাচন বর্ব্বর তন্ত্রের মূল, ইহাই তাহার আদিম ও বিশিষ্ট লক্ষণ।

অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতেই এই লক্ষণটি যে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হয় নাই বা রাজতন্ত্রের মধ্যে নানা বিভিন্ন উপাদান যে প্রবেশ লাভ করে নাই তাহা নহে। কিছু দিন ধরিয়া বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ দলপতি ছিল। কোন কোন পরিবার অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা ধনমানপ্রতিপত্তিতে উন্নত হইয়া ছিল। ইহা হইতে উত্তরাধিকারের সূত্রপাত হইল। এখন এই সকল পরিবার হইতেই দলপতি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। নির্ব্বাচননীতির সহিত যে সকল বিভিন্ন নীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে ইহাই প্রথম।

আর একটি উপাদান এই সময়ের মধ্যেই বর্ব্বর রাজতন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া ছিল, তাহা ধর্ম্ম। গথ্ প্রভৃতি কোন কোন বর্ব্বর জাতির মধ্যে দেখা যায় যে তাহাদের রাজপরিবার দেবপরিবার হইতে উদ্ভূত, অথবা ওডিন প্রভৃতি যে সকল বীরপুরুষকে তাহারা দেবতায় পরিণত করিয়াছিল সেই সকল বীরপুরুষ হইতে উদ্ভূত। হোমারবর্ণিত রাজগণও এইরূপ দেবতা বা উপদেবতার বংশধররূপে পরিচিত ছিলেন, এবং এই দৈব উদ্ভবের অধিকারেই তাঁহারা এক প্রকার ভক্তির পাত্র ছিলেন।

এই ছিল পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ব্বর রাজতন্ত্রের প্রকৃতি; তখনই ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও ইহার মূলনীতি তখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এইবার রোমীয় রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক; ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। রোমীয় রাজতন্ত্র রোমীয় রাষ্ট্রের বিগ্রহ স্বরূপ; ইহা রোমীয় জনবর্গের প্রভুত্বগৌরবের উত্তরাধিকারী। অগষ্টস ও টাইবেরিয়সের রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন সম্রাট্ অভিজাততন্ত্র সিনেট, জনতন্ত্র কমিশিয়া ও সমগ্র রোমীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধি, তিনি তাহাদিগের উত্তরাধিকারী ও সমষ্টিস্বরূপ। প্রথম সম্রাট্‌দিগের, অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও বিচারক্ষম তাঁহাদের, বিনয়-নম্র ভাষার মধ্যে এই তথ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। যে জনশক্তি রোমীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, সে যেন সম্রাট্‌দিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সম্রাট্‌গণ সেই পূর্ব্বতন প্রভুর সম্মুখে সর্ব্বদাই যেন সশঙ্কিত থাকিতেন; সম্রাট্‌গণ প্রতিনিধি স্বরূপে, অমাত্য বা মন্ত্রীস্বরূপে সেই জনশক্তিকে সম্বোধন করিতেন কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে

তাঁহারা জনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতাই স্বয়ং পরিচালন করিতেন। এই রূপান্তর বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে, আমরা নিজেই এইরূপ একটা রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমরা দেখিয়াছি কেমন করিয়া জনশক্তি জনসাধারণের হইতে একজন মানুষের হস্তে গিয়া ন্যস্ত হয়; নেপোলিয়নের ইতিহাস ত ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনিওত প্রভু জনসমাজের বিগ্রহ ও প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি জনবর্গকে সম্বোধন করিয়া কেবলই বলিতেন "আমার মত কে এক কোটী আশীলক্ষ লোকদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, আমার মত কে ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি?" এবং যখন তাঁহার মুদ্রার একপৃষ্ঠে পাঠ করি "ফরাসীগণতন্ত্র" এবং অন্য পৃষ্ঠে পাঠ করি "সম্রাট্ নেপোলিয়ান," তখন ইহার অর্থ কি এই বুঝি না যে জনসমাজই রাজা হইয়াছে?

সম্রাট্তন্ত্রের ইহাই মূলগত প্রকৃতি, এবং এই প্রকৃতি সে প্রথম তিন শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিল। ডায়োক্লিশিয়ানের পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে নাই। তখন কিন্তু ইহা একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছে; এক নূতন ধরণের রাজতন্ত্র তখন প্রায় দেখা দিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম তিন শতাব্দী ধরিয়া সমাজের মধ্যে একটা ধর্ম্মের ছাপ দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কন্‌ষ্টাণ্টাইনের সময়ে সে ধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য না হউক, ধর্ম্মকে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা বৃহৎ স্থান দিতে সমর্থ হইল। রাজতন্ত্র এখন আর এক রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইল। ইহার মূল এখন আর পার্থিব নহে; রাজা এখন আর স্বরাষ্ট্রগণতন্ত্রের প্রতিনিধি নহেন; তিনি এখন ভগবানের বিগ্রহ, ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধি। তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার এখন উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে; প্রাচীন সম্রাট্তন্ত্রে তাহা নীচে হইতে উঠিয়া আসিত। এই উভয় অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য এবং উভয় অবস্থার পরিণাম ও বিভিন্ন। ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাবর্গের স্বাধীন রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির সামঞ্জস্য সাধন দুরূহ, কিন্তু রাজতন্ত্রের মূলনীতি খুব উন্নত, নীতিসঙ্গত এবং কল্যাণকর। সপ্তম শতাব্দীতে ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের মধ্যে রাজা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল দেখা যাউক। টোলেডো সংসদের বিধানমালা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাউক।

"রাজাকে রাজা (rex) বলা হয় কারণ তিনি ন্যায়ধর্ম্ম (recte) অনুসারে শাসন করেন। তিনি যদি ন্যায়ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি রাজোপাধি ধারণের যথার্থ অধিকারী। যদি তিনি অন্যায়রূপে কার্য্য করেন তাহা হইলে তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রাজোপাধি হইতে বঞ্চিত হন। সেই জন্যই আমাদের পিতৃপুরুষেরা যুক্তিসহকারেই বলিতেন—'ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যপরায়ণতা এই দুইটিই প্রধান রাজগুণ।'

"প্রজাদিগের ন্যায় রাজা ও বিধিবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য। ভগবানের ইচ্ছা মানিয়া চলিলেই আমরাও আমাদের প্রজাবর্গ ভাল ভাল বিধিবিধান পাইতে পারি, এবং এই সকল বিধিবিধান আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীগণ ও সমগ্র প্রজাবর্গ মানিয়া চলিতে বাধ্য।

"সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান্ মানবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজাইবার সময় মস্তককেই উচ্চে স্থান দিয়াছেন, এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুগুলিকে এই মস্তক হইতেই নির্গত করাইয়াছেন। এবং তিনি মস্তকের মধ্যে মশালস্বরূপ চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন, যেন সেখান হইতে যাহা কিছু ক্ষতিবিঘ্নকর তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন এবং এই বুদ্ধির হস্তে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়াছেন। অতএব আমাদিগকে প্রথমে রাজসম্পর্কীয় বিষয়ে বিধিবন্ধন করিতে হইবে, রাজগণ যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরে প্রজাসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে যেমন রাজগণের রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল সেইরূপ রাজগণও আবার প্রজাগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।"

কিন্তু ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রায়ই রাজতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির অন্য একটি উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজশক্তির পার্শ্বে এক নূতন শক্তির সমাবেশ ঘটিল। সে শক্তি রাজশক্তির মূলস্বরূপ যে ভগবচ্ছক্তি তাহার সহিত আরও ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এই শক্তির নাম যাজকতন্ত্র। যাজকতন্ত্র ভগবান্ ও রাজার মধ্যবর্ত্তী, রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সুতরাং ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যে রাজা তাঁহারা ক্রমশঃ ভগবদ্বিধানের মানবব্যাখ্যাতা যাজকবৃন্দের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যপরিণতির বৈচিত্র্যের এই একটা নূতন কারণ জুটিল।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

সঙ্কলন

কুষ্টব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

কুষ্ঠ চিকিৎসাসাধ্য পীড়া। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ এই যে ইহা সহজে ধরা পড়ে না। সাধারণতঃ কুড়েরাই এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই পীড়া হইলে পুষ্টিকর খাদ্য

সেবন করা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা, উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম করা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত। কুষ্ঠরোগীর অন্যপীড়ার আক্রমণ বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত। শুষ্ক অপেক্ষা আর্দ্র দেশে ইহার অধিকতর প্রাবল্য দেখা যায়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় ইহা বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং ঐ অবস্থায় ইহা সংক্রামকও নহে, মধ্যম অবস্থায় ইহা অত্যন্ত সংক্রামক, এবং শেষ অবস্থায় উহা আদৌ সংক্রামক নহে। যাহাদের শরীরে কুষ্ঠ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—যেমন পথপার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষুকেরা—উহারাই কুষ্ঠের প্রধান বাহন, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই পীড়া সমানভাবে দেখা যায়। অত্যন্ত সংক্রামক অবস্থায় রোগীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে এই রোগ জন্মে। বঙ্গদেশে প্রতি লক্ষে ৫০জন কুষ্ঠি আছে। অনেক সময় লোকে এই পীড়া গোপন করে, তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় ইহা ধরাও পড়ে না, সুতরাং এই হিসাব কমের দিকেই হওয়া সম্ভব।

কুষ্ঠ শরীরের যে কোন অঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে। আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কুষ্ঠিরা চরম দুর্দ্দশায় কাল কাটায়। মন্দির মস্‌জেদের দ্বারদেশে অথবা পথের উপরে সাধারণের কৃপাপ্রার্থী যে সকল স্ত্রী-পুরুষ আমরা দেখিতে পাই তাহারা ছাড়া এমন অনেক কুষ্ঠরোগী আছে যাহারা গণনায় আসে নাই। যাহাদের দেহে ক্ষতচিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহারা কম বিপজ্জনক নহে, এবং ইহারা যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে তাহাও বর্ণনাতীত।

কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, এবং কর্কটিকা—এদেশে এই কয়টি পীড়ার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ক্ষয়রোগ এবং কর্কটিকা (Cancer) ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু কুষ্ঠ বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেহে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ দাগ দেখা দেয় অধিকাংশ চিকিৎসকই উহার প্রকৃতি ও গুরুত্ব অবগত নহেন, কিন্তু ইহাই পরিণামে পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

এই অবস্থায় প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমে চিকিৎসকগণকে নূতন চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তার পর জনসাধারণকে বক্তৃতা, ম্যাজিকলণ্ঠন ইত্যাদির সাহায্যে এই পীড়ার প্রকৃতি ও প্রসার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। তার পর যে সকল স্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারে সেই সকল স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রথমে একজন মাত্র উৎসাহী ও সুদক্ষ চিকিৎসক লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। পরে অধিক সংখ্যায় রোগী আসিতে আরম্ভ করিলে উহাকে একজন সহকারী দেওয়া যাইতে, এবং কালক্রমে একই সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে অথবা একই প্রদেশের বিভিন্ন সহরে নূতন নূতন চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা যাইতে পারে।

কোন [illegible]কের হাতে ছোট্ট একটি সাদা দাগ দেখা দিয়াছিল। উহার নিয়োগকারী, উহার চিকিৎসক, উহার পত্নী, সকলেই উহা[illegible] অবধান করিয়া [illegible]লেন যে, এই দাগে কুষ্ঠের সূচনা। [illegible]নের সঙ্গে কো[illegible]না বা যাত[illegible]

সাবধান বাণীকে একান্ত উপেক্ষা করিল। কিছুদিন পরে উহার অবস্থা আরও খারাপ হইল। উহার সংস্পর্শে উহার একটি ভাইয়েরও কুষ্ঠ হইয়াছিল, সে মনিবের উপদেশে উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল। তখন উহার চেতনা হইল, এবং উপযুক্ত চিকিৎসাধীন থাকিয়া সেও ক্রমে আরোগ্যলাভ করিল।

(১৫ই ডিসেম্বরের সার্ভেণ্ট হইতে গৃহীত)

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা ‡

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নেটালে ভারতীয়দিগের প্রতি যে অবিচার করিতেছেন আমি যথাসম্ভব সরলভাবে উহার একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এই অন্যায়ের ভরা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত বিল দুইটী এখনও আইনে পরিণত হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান সরকারের প্রভাব যেরূপ অপ্রতিহত তাহাতে ইহাদের আইনে পরিণতির পথে যে কোন বিঘ্ন ঘটিবে সে সম্ভাবনা কম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু সহস্র তামিল আছে। ইহারা সকলেই দক্ষিণ ভারত হইতে চুক্তি প্রথায় * সংগৃহীত মজুরদের সন্তান সন্ততি। এই চুক্তি প্রথা দাসত্ব প্রথার অনুরূপ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১,৭০,০০০ ভারতবাসীর মধ্যে ১,০০,০০০ লক্ষই তামিল। কয়েক হাজার হিন্দুস্থানীও আছে। উহাদের কতক চুক্তি প্রথায় আসিয়াছিল, ও কতক আসিয়াছিল স্বাধীন মজুর, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও দোকানী হিসাবে। ইহারা তামিল মজুর অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই দরিদ্র। যাহাদের নিজেদের যায়গা জমী আছে এবং যাহারা চাষবাস্ করিয়া উন্নতি করিয়াছে উহাদের বেলাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব অধিক গুজরাটী মুসলমানগণের। উহারা বাণিজ্যব্যপদেশে সে দেশে গিয়া ব্যবসায় দক্ষতায় মোম্বাসা ও জাঞ্জিবার হইতে ডেলাগোয়া উপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগে এবং ডারবান ও কেপটাউনে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহারা ইউরোপীয় দোকান অপেক্ষা সস্তায় পণ্য বিক্রয় করিয়া ভারতীয় ও ইউরোপীয়, উভয় শ্রেণীর দরিদ্র খরিদ্দারকে হাত

+ কলিকাতা School of Tropical Medicineএর অধ্যক্ষ ডাক্তার ই, মিউর সাহেবের বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত। কেহ কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করাইতে হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট সবিশেষ বিবরণের জন্য পত্র দিতে পারেন। এখানে জলাতঙ্ক, কালাজ্বর, যক্ষা, গোদ প্রভৃতির বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। নিঃসম্বল জলাতঙ্ক রোগীর ব্যয়ভার সরকার বাহাদুর বহন করিয়া থাকেন। সঙ্কলয়িতা

‡ The Wrong Done in Natal. ভারতহিতৈষী সি, এফ, এণ্ড্রুজ কর্ত্তৃক—'সার্ভেণ্টের জন্য বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।' চুক্তিপ্রথা—Indenture System.

করিয়াছেন; এই জন্য ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করেন। ইহাদের জীবনযাত্রা ও ব্যবসায় পরিচালন প্রণালী অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া বাজার হইতে অনেক সস্তায় উহারা পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে যে দুইটী বিল উপস্থাপিত হইতেছে উহাদের একটীর নাম 'বর্ণভেদ বিল' (Colour Bar Bill). এই বিলে ভারতীয় ও দেশীয়দিগকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। এই বিল অনুসারে যে কোন ব্যবসায় বিধিমতে ইউরোপীয়ের ব্যবসায় বলিয়া ঘোষিত হইবে এসিয়া অথবা আফ্রিকাবাসী উহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খনির উল্লেখ করা যাইতে পারে। খনিতে কোন কোন কাজের পথ এসিয়া ও আফ্রিকাবাসীর পক্ষে খোলা থাকিবে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সমস্ত কাজ উহাদিগের জন্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। গুণের আর কোন সমাদর রহিবেনা, একবার যে নিম্নস্তরে স্থান পাইবে, তাহাকে চিরকালই ঐ স্তরেই থাকিতে হইবে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে ইহা যে কিরূপ কু-ফলপ্রসূ হইবে তাহা দেখান শক্ত নহে।

'নিউক্লাস এরিয়াজ বিল' আরও মন্দ এবং ন্যায়-বিগর্হিত। এই বিলের বিধান অনুসারে কোন ভারতীয়কে নেটালের উপকূলভাগের বাহিরে বসবাস করিতে দেওয়া হইবেনা। উপকূলভাগ হইতে ৩০মাইল ব্যবধানে অঙ্কিত একটী কল্পিত রেখার বাহিরে উহাদিগকে বাস করিতে অথবা সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে দেওয়া হইবেনা। এই রেখার বাহিরে যে সম্পত্তি বর্ত্তমানে আছে তাহাও উহারা ভোগ করিতে পারিবে না। এইরূপে ক্রমশঃ সরাইতে সরাইতে ভারতবাসীকে উপকূলভাগের সর্ব্বাপেক্ষা গরম ও অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

এ ছাড়া এই নূতন বিলে সমুদয় সহরেই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় অধিবাসী হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে সম্পত্তি অর্জ্জন, গৃহ-নির্ম্মাণ, এমনকি ভাড়া দিয়াও ভারতবাসী বাস করিতে পারিবেনা। এই বিল আইনে পরিণত হইলে ইউরোপীয় খরিদ্দারের বেচাকেনা যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় ভারতীয়ের হাতে পড়িতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে।

ইহা অপেক্ষাও কঠোরতর কতকগুলি বিধি এই বিলে আছে যাহার বলে ভারতবাসীর Right of Domicile প্রত্যাহৃত হইয়া উহাদিগকে বিদেশী বলিয়া গণ্য করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে ও তাহার ফলে উহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বহিস্কৃত করা যাইতে পারে। এই শেষ বিধান অনুসারে বহু সহস্র ভারতবাসী এইরূপ উত্যক্ত হইবে যে উহারা চিরদিনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। এইরূপ অবিচারের সম্ভাবনা দেখিয়াই কোন প্রতিকার সুদূরপরাহত বোধ হইলেও

এই বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছি। এই সময়ে আমি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা কামনা করি। উহাদের সমবেত প্রার্থনা যে আমার বলরক্ষা করিবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

মরক্কো সমর

জাতিসঙ্ঘ এবং স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক আদালতের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও 'পরবর্ত্তী যুদ্ধ' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের ক্ষেত্র মরক্কো। চলমান দুর্গ (Tank), কলের কামান, বিষাক্ত বায়ু, এবং বোমানিক্ষেপকারী উড়োকল লইয়া ফরাসী সৈন্যদল 'রীফ'-এ যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী সেনানায়কগণ এই যুদ্ধে সেনা চালনা করিতেছেন।

ফরাসী উড়োকল কিরূপভাবে নেমাজের সময়ে রীফ সহরগুলিতে গোলাবর্ষণ করিয়াছে তাহার বিবরণ আমেরিকার কাগজে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়। দিনের প্রথম প্রার্থনায় যোগ দিবার জন্য যখন মুয়েজিন বিশ্বাসীগণকে আহ্বান করেন, ঠিক সেই সময়ে আকাশ হইতে শত শত গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিভীষিকার সঞ্চার করে। আফরিকায় ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচলন এই রূপেই হইতেছে। বিগত মহাসমরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহারই পুনরাভিনয় চলিতেছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে 'ওয়াশিংটন টাইম্‌স্‌' প্যারি হইতে নিমলিখিত খবর প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"কোন বাজারে দুই হাজার রীফ বেচাকেনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। একটী ফরাসী উড়ো বহর চল্লিশ মন বোমা লইয়া গিয়া সেখানে আটশত লোককে আহত ও নিহত করিয়াছে।"

অরক্ষিত খোলা বাজারে নিঃসহায় (প্রতিকারে অক্ষম) স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার উপর বোমা নিক্ষেপ কেবল জার্ম্মাণীর একচেটিয়া বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল, এখন দেখিতেছি সে ধারণা ভ্রমাত্মক। যশোলিপ্সু শিশুঘাতকের উপদ্রব আবার আরম্ভ হইয়াছে।

আবদুল করিম 'রীফ'-এর সুলতান যদিও ফরাসীরা উহাকে 'দস্যুদলপতি', 'বিদ্রোহী' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ভিন্সেণ্ট শীয়ান নামক জনৈক আমেরিকান সংবাদপত্রসেবী মরোক্কা গিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষ পরিচয়লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতেছেন :—

"প্যারী অথবা মাদ্রিদের সংবাদপত্র সমূহ যাহাই বলুন না কেন, আবদুল করিমের রাজ্যে রীতিমত শাসন প্রণালী বর্ত্তমান আছে। আবদুল করিম সনাতন পশু বলের সহায়তায় শাসনকারী ক্ষুদ্র দলপতি মাত্র, এই ধারণা যার পর নাই ভ্রমাত্মক। উনবিংশ শতাব্দীর দস্যুদলপতির সহিত উহার কোনই সাদৃশ্য নাই।"

তাঞ্জিয়ার হইতে মেলেলা পর্য্যন্ত স্থানে ইহার প্রতাপ অপ্রতিহত। তিনি সেখানকার জাতীয়দলের নেতা এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী। আবদুল করিম ও উহার পরিচরবর্গের যোগ্যতা খুব উঁচু দরের। উহার ক্ষমতার 'কম কদর' করিলে তাহা উত্তর আফ্রিকাবাসী ইউরোপীয়ের পক্ষে মারাত্মক হইবে।

স্পেন বার বৎসরে মরক্কোর জন্য যা করিয়াছে আব্দুল করিম গত তিন চার বৎসরের মধ্যে তার চাইতে অনেক বেশী করিয়াছেন। স্পেনের অধীনস্থ অঞ্চলে পোষ্ট আপিস, সাধারণ পুলিস, হাস্পাতাল, এমন কি সমগ্র দেশে নর্দ্দমা পর্য্যন্ত নাই। কয়েকটী ক্ষুদ্র সহর ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষার ত নামও নাই। 'স্পেনবাসীর মঙ্গলের জন্যই মরক্কোর অস্তিত্ব'—ইহাই স্পেনীয় শাসনের মূলমন্ত্র। অত্যাচার এবং অযোগ্যতাই মরোক্কোয় স্পেনীয় শাসনের বিশেষত্ব। এই চিত্রের সহিত করিমের শাসনের তুলনা করুন। করিম রীফদেশে একটী শক্তিশালী সেনাদল গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার শাসনে দেশে শিক্ষার প্রসার হইতেছে, সমগ্র দেশে 'হাশিস্' এর (সিদ্ধি ও ভাঙ্) প্রচলন রহিত হইয়াছে, দাসত্ব প্রথা দূর হইয়াছে রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হইতেছে। রীফ সরকারের সমগ্র কার্য্য-তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু সংক্ষেপে যাহা দেওয়া গেল তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আবদুল করিম বর্ব্বর দলপতি মাত্র নহেন। তিনি একটী সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের পরিচালক, এবং আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় পাইবার দাবী উহার আছে।

ক্রমশঃ

আকিঞ্চন

মূকের মুখে দুখের ভাষায় গাইতে দাও গান,
নয়ন ধারায় তোমার পানে চলুক তরীখান;
বুকের'পরে লাগুক পরশ ঘূর্ণী-বায়ু বেগে,
প্রেমের ব্যথায় তোমার কথা চিত্তে রহুক জেগে

শ্রীসরোজকুমার সেন।

* The war in Morocco. ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সার্চ্চেন্টের জন্য বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। সার্চ্চেন্ট, ১৬।১২।২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ।

খাঁটী কথা—

কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারে খিলাফত কমিটীর একটী অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহোদয় কয়েকটী বড় খাঁটী কথা বলিয়াছেন। হিন্দুতে হিন্দুতে অথবা মুসলমানে মুসলমানে মারামারি বা দাঙ্গা অনেক সময়েই হইয়া থাকে, কিন্তু সেটাকে আমরা বিশেষ আমল দিই না, অথচ হিন্দু-মুসলমানে সামান্য কোন বিরোধ ঘটিলেই সেটাকে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোঠায় ফেলিয়া ব্যাপারটাকে ঘোরালো, এবং কোথাও কোথাও সাংঘাতিক করিয়া তুলি। দিল্লীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছিল কোন কূয়ার কাছে একজন হিন্দু এক মুসলমান ছেলেকে প্রহার করিয়াছে এই জনরব হইতে। এই মনোভাবের পরিবর্ত্তনে অগ্রণী হওয়া উচিত দেশের শিক্ষিত সমাজের, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই এই মনোভাবের পরিচয় পাই বেশী।

নারী নির্য্যাতন ও মুসলমান—

এই মনোভাব যে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কতদূর বদ্ধমূল তাহার পরিচয় নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধীয় আলোচনায় কতক পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা পাঠ করিলে মনে হয় মুসলমান সমাজ বুঝি হিন্দু নারীর মানসম্ভ্রমনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সুদূর পল্লীগ্রামে এ রকম মনোভাব খুব কম দেখা যায়, ইহার বিষ ছড়াইতেছে প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে। নারী নিগ্রহের যে সকল কাহিনী আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, উহার হিসাব নিকাশ করিলে দেখা যাইবে হিন্দু নারীর উপর অনেক অত্যাচার হিন্দুর দ্বারাও হইয়া থাকে। মুসলমান দ্বারা কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলেই আমরা সাম্প্রদায়িক অন্ধতাহেতু সেটাকে বড় করিয়া দেখি। লোকমত গঠনের গুরুভার যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে এইরূপ মনোভাব হইতে উহাদের মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার সম্পত্তি যদি হিন্দুতে অপহরণ করে তাহাতে আমার সান্ত্বনার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে পারে না, আর হিন্দু কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলেও নারীর মনের ধিকার কিছু লঘু হয়না। সুতরাং অপরাধ যেই করুক না কেন, সম্প্রদায়ের কোন কথা না তুলিয়া অপরাধের গুরুত্ব হিসাবেই তাহার আলোচনা করা উচিত। শুধু 'ভাত' 'ভাত' বলিলে যেমন পেট ভরেনা, তেমনি 'জাতিগঠন' 'জাতিগঠন' বলিলেই জাতিগঠন হয় না। জাতি গঠনের জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন, এবং সেই সাধনার প্রথম ধাপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন।

অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু নারী নির্য্যাতন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান যে অত্যাচারের সমর্থন করিয়াছেন এমন অপবাদ অতি বড় বিরোধীও দিতে পারিবেন না। বরং এবিষয়ে উঁহারা অনেক সময়ে যে রকম উদারতার পরিচয় দেন তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। কুড়িগ্রামের

সুহাসিনী দুইবার মুক্তিলাভ করিয়াছিল একটী মুসলমান যুবকের সহায়তায়। যুবকটী কি আশায় উহার মুক্তির সহায়তা করিয়াছিল ? ধরা পড়িলে নির্য্যাতন ভিন্ন অপর পুরস্কার উহার লাভ হইত না। এই সেদিন একটী মেয়েকে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন একটী মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি না থাকিলে মেয়েটীকে উহার রক্ষকের সম্মুখেই লাঞ্ছিতা হইতে হইত। কয়েকমাস আগে নদীয়া জিলার একটী যুবক উহার একটী অবিবাহিতা নিকট আত্মীয়াকে লইয়া পলাইয়া যায়। বৎসর দুই পরে সে মেয়েটীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে এবং একদিন উহাকে একা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মেয়েটীর অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, সে বার-বিলাসিনীর মনোবৃত্তি লইয়া বাড়ী ছাড়ে নাই, নিতান্ত নিকট আত্মীয় না হইলে মনুর আমলে ইহাদের সম্বন্ধ বৈধ বলিয়াই পরিগণিত হইত। বৈধ বা অবৈধরূপেই হউক, যে যাহাকে, জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল সে উহাকে এইরূপে ছাড়িয়া যাইলে উহার অবস্থা যে কিরূপ হইল সহৃদয় পাঠক তাহা নিজেই অনুমান করিতে পারিবেন। ছেলেটীত স্বচ্ছন্দে সমাজে ফিরিয়া গেল, কিন্তু সে পথ মেয়েটীর চিরদিনের মতন বন্ধ হইয়া গেল। এই বিপদে একজন সহৃদয় মুসলমান চিকিৎসক উহাকে আশ্রয় দেন। এই আশ্রয় দেওয়া ব্যাপারে যে তাঁহার অন্য কোন গৌণ উদ্দেশ্য ছিলনা এমন কথা হয়ত সকলে বিশ্বাস না করিতে পারেন, সুতরাং আর একটী দৃষ্টান্ত দিব যেখানে এরূপ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ঘটনাটা নিতান্ত আধুনিক, দুমাসের পুরাতন ও হয় নাই। একটী মহিলা ৬০ বর্ষ বয়স্কা একটী কন্যাসন্তান লইয়া বিধবা হন। পক্ষাঘাতগ্রস্তা হইয়া তিনি চিকিৎসার্থ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আসেন। মাস দেড়েক পরে যখন উহাকে হাঁসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, তখনও তিনি একেবারে অচলা। স্ত্রীলোকটী অসহায় অবস্থায় ক্যাম্বেল স্কুলের ফটকের কাছে পড়িয়াছিলেন। ক্যাম্বেলস্কুলে এত হিন্দু ছাত্র আছেন কিন্তু এই দুঃখিনীর দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকান নাই। শেষে একটী মুসলমান ছাত্র স্ত্রীলোকটীকে এই অবস্থায় পাইয়া গাড়ীতে করিয়া নিজেদের মেসে লইয়া যান, এবং নিজের ঘর ও বিছানা উহাকে ছাড়িয়া দেন। মহিলাটী যে কয়দিন উহাদের নিকট ছিলেন সে কয়দিন উহার যত্নের কোন ত্রুটী হয় নাই, বিশেষতঃ উহার ধর্ম্ম অথবা জাতের সংস্কার যাহাতে কোনরূপে ক্ষুন্ন না হয় সে বিষয়ে উহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এখানেই কিন্তু ইহাঁর চেষ্টার শেষ হয় নাই, একটী ভাল আশ্রমে উহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে ইনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

সম্প্রতি নারী নির্য্যাতনের যে কয়টি দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে আসিয়াছে এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একটি ঘটিয়াছিল কালীঘাটে। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাহার যজমান পত্নীকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করে। তিনি স্বামীকে এই কথা জানাইয়া দিলে তাহার যজমান বাড়ীতে আসা নিষিদ্ধ হয়। পুরোহিতনন্দন ইহাতে কুপিত হইয়া এক দিন যজমানের অনুপস্থিতিতে কুড়ুল লইয়া, দেয়াল টপ্‌কাইয়া উহার বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহার হয়ত আশা ছিল কুড়ুল দেখিয়া মেয়েটীর প্রতিরোধ শক্তি লোপ পাইবে, কিন্তু তাহার সে আশা সফল হয় নাই। মেয়েটী আর উপায় না দেখিয়া একটি বঁটী লইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। এই দুঃসাহসের জন্য তাহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে।

সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বদ্বারা যে কতটা হইতে পারে তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। একটী স্ত্রীলোক বিকালবেলা কয়েকটী শিশুসন্তান সহ বারান্দায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাহাদের দরজায় কয়েকজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন। এ রকম অবস্থায় অনেক সময় মেয়েদের অসহায় অবস্থায় চেঁচামেচি করিতে দেখা যায়। ইনি কিন্তু অপরিচিত

লাক দেখিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। উহারা দরজায় খিল দিবার আগেই ছুটিয়া আসিল, এবং কোন সুযোগে দরজা একটু ফাঁক হইতেই উহাদের একজন দরজার মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া দিল। মেয়েটী কিন্তু ইহাতেও দমিলেন না, এমন জোরে দরজা ঠেলিয়া উহাতে খিল দিয়া দিলেন যে উহাদের বেগতিক দেখিয়া হাতের আঙ্গুল কয়টা রাখিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল।

কিন্তু এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় সকলেই দিতে পারেন না। একজন হিন্দু মহিলা একটা রিক্স ভাড়া করিয়া তাঁহার আত্মীয় বাড়ী যাইতেছিলেন। রিকসওয়ালা উহাকে অনেক ঘুরাইয়া এক গলির ভিতর লইয়া গেল, এবং কোন অছিলায় রিক্স রাখিয়া চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর একজন লোক সঙ্গে লইয়া আসিল। সেই লোকটী মহিলাটীর পাশে বসিয়া শাসাইয়া দিল যে চীৎকার করিলে উহার বিপদ ঘটিবে, তারপর একটী নির্জ্জন বাড়ীতে লইয়া গিয়া উহার উপর অত্যাচার করিল। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, স্ত্রীলোকটী আত্মরক্ষার কোনই চেষ্টা করেন নাই, এমন কি ডাক হাঁক করিয়া লোক জড় করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে হয়ত অন্য রকম বিপদ ঘটিত, কিন্তু যা ঘটিল সেটা কি অন্য কোন বিপদ হইতে লঘু? সকল বিপদেরই দাগ মুছিতে পারে, কিন্তু এই যে মর্ম্মপীড়া ইহা হয়ত চির জীবনেও দূর হইবে না।

এই নিশ্চেষ্টতা যে কেবল নারীদেরই একচেটিয়া এমন নহে, পুরুষের মধ্যেও ইহা কম দেখা যায় না। সেদিন একটী ভদ্রলোক একটী মেয়েকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কলিকাতা আসিতেছিলেন। গাড়ী কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে আসিলে একজন ইউরোপীয় আসিয়া মেয়েটীকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় লইয়া যাইতে বলেন, বলেন তিনি মালদহের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মেয়েটীকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় না পাঠাইলে উহাকে ১০৭ ধারায় চালান দিবেন। ভদ্রলোকটী ইহাতে সম্মত না হওয়ায় সাহেবটী মেয়ের গায়ে হাত দিতে উদ্যত হন। ভদ্রলোকটী যে ইহাতে বাধা দিবার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন কথা প্রকাশ নাই, বরং দেখিতে পাই একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী এই সময় আসিয়া সাহেবকে বলপূর্ব্বক কামরা হইতে বাহির করিয়া দেন। বাবুটীর অভিযোগেও দেখিতে পাই এই মুসলমান ভদ্রলোকটী না থাকিলে মেয়েটীকে লাঞ্ছিতা হইতে হইত। এই অক্ষমতার পশ্চাতে যে কত বড় লজ্জার কথা রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতেছি না। আদালতের ও সংবাদপত্রের মারফতে নিজের অক্ষমতার কথা প্রচার করিয়া মনে করিতেছি বড়ই বাহাদুরি হইয়াছে।

উপরের ঘটনা দুইটীর সহিত নিম্নলিখিত ঘটনাটীর তুলনা করুন। একবার বারাকপুর বা দমদম ষ্টেসনে একটী গৌরাঙ্গ মেয়েদের গাড়ীতে উঠিয়া মেয়েদের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া রসালাপের চেষ্টা করিতেছিল। মেয়েরা ইহাতে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তবে একজনের এটা আদৌ বরদাস্ত হইল না, তিনি উঠিয়া সাহেবের মুখে প্রচণ্ড এক লাথি মারিলেন। সাহেব বাঙ্গালীর মেয়ের কাছে এমন অভ্যর্থনা লাভের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু

ইহাতে তাহার চৈতন্ত হইল, এবং যতক্ষণ সে গাড়িতে ছিল ততক্ষণ আর উঁহাদিগকে বিরক্ত করে নাই।

মোস্থল সমস্যা—

মোস্থলের খণিজ তৈল সম্পদ অপরিমেয়। খণিজ তৈলের গুরুত্ব বর্ত্তমান সময়ে যত অধিক, অপর কোন সময়েই তত ছিল না। বহুদিন হইতেই মোস্থলের উপর ইংরাজের নজর আছে, এবং এই তৈল সম্পদ আয়ত্ত করিবার জন্ত যথেষ্ট অর্থও সে ব্যয় করিয়াছে। এখানেই মোস্থল সমস্যার গূঢ় রহস্য। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই পরোপকারী. জগতের হিতের জন্ত সে বহু অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিয়াছে, তাই এবিষয়ের আলোচনায় আর তেলের কথা স্থান পায় নাই। কেবল নাবালক ইরাকের অভিভাবক স্বরূপেই উহারা ইহার জন্ত লড়িতেছেন, এইরূপই প্রকাশ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

✓ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর দুরবস্থা মহামান্ত বড়লাট বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিবার জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি এদেশে আসিয়াছেন, পাঠকবর্গ একথা অবশ্যই অবগত আছেন। ভারতবন্ধু সি, এফ্, এণ্ড্রুজের একটী প্রবন্ধ অন্তত্র সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল, পাঠক উহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যার প্রকৃতি ও ইতিহাসের মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

মরোক্কো ও সিরিয়া

গত পূর্ব্ব সংখ্যায় সিরিয়া ও মরোক্কো সমস্যার কিছু আভাস আমরা পাঠকগণকে দিয়াছি। মরোক্কোয় আবদুল করিম এখনও পূর্ব্ববৎ অজেয়ই আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল আবদুল করিম সকল দিকেই ফরাসীকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অতি বৃষ্টির জন্ত ফরাসীরা পশ্চাদ্ গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পরে কিছুদিন হইতে সংবাদ বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। কূটনীতির (diplomacy'র) সহিত সামান্ত পরিচয় ও যাহাদের আছে তাহারাই বুঝিতে পারিবেন এর ভিতরে কোন রহস্য আছে। বলা বাহুল্য মরোক্কোর অবস্থা যদি ফরাসীর অনুকূল হইত তাহা হইলে সে সংবাদ এতদিনে ঢক্কানিনাদে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইত। পাঠকবর্গ ফরাসী সেনাপতির একথাও মনে রাখিবেন যে "মরোক্কোয় সৈনিকের কাজ শেষ হইয়াছে, বাকীটা আমি দেওয়ানী কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি।"

সিরিয়ায় কি ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠক অন্তত্র পাইবেন। পত্রান্তরে প্রকাশ সিরিয়ার জনৈক আমীর ফরাসী সেনাপতি সরাইলকে (Sarrail) একটা আপোষ মীমাংসা করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উহার কি উত্তর দিলেন পাঠক তাহা শুনুন, তিনি বলিলেন—'আমার এখনও গোলাগুলির অভাব ঘটে নাই, আমি গোলার জোরে উহাদিগকে দমন করিব।' ফ্রান্সে ফিরিয়া গিয়া উনি বলিয়াছিলেন—

'সিরিয়াকে আমি এমন দাবাইয়া আসিয়াছি যে উহারা আর মাথা তুলিতে পারিবে না, অথচ এখনও শুনিতেছি সিরিয়াকে দমন করিতে আরও ৫০,০০০ সৈনিকের প্রয়োজন। ড্রুসেরা দামাস্কাস অবরোধের ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়াও শোনা যাইতেছে। মোটের উপর সিরিয়ায়ও ফরাসীর অবস্থা খুব সুবিধাজনক নহে। যুদ্ধজয়জনিত ঔদ্ধত্যের ফলে ফ্রান্সকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে। এখনও উহার চৈতন্যোদয় হয় নাই সুতরাং উহাকে আরও ভুগিতে হইবে। এই ঔদ্ধত্যের ফলেই ফরাসী জাতির আজ দেউলিয়া হইবার অবস্থা, আর হয়ত এই অর্থসঙ্কটেই উহাকে বাধ্য হইয়া একটা আপোষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতিসংঘ ও গ্রীকবুলগার বিরোধ

গত পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা গ্রীকবুলগার বিরোধের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই বিরোধের দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে কমিশন বা পঞ্চায়েত বসিয়াছিল, উহারা বিরোধের দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, কিন্তু বুলগেরিয়া আক্রমনের জন্য গ্রীককে দায়ী করিয়া উহাকে বুলগেরিয়াকে সাড়ে চারিলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রীস ও বুলগেরিয়া উভয়েই ক্ষুদ্র শক্তি বলিয়াই শুধু ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। যেদিন আন্তর্জ্জাতিক জনমত এত প্রবল হইবে যে জাতি সংঘ দুর্ব্বলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষে এরূপ নিরপেক্ষভাবে আত্মমত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, সেদিনই উহার অস্তিত্ব সার্থক হইবে। মোসুল সমস্যার যে সমাধান উহারা করিয়াছেন তাহাতে এখনও আশান্বিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। সিরিয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ ফ্রান্সের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, এখানেই উহার প্রভাব ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

হিন্দু মহাসভায় লালা লাজপৎ রায়।

গত ডিসেম্বর মাসে বম্বে নগরীতে হিন্দু মহাসভার যে এক অধিবেশন হয়, তাহাতে লালা লাজপৎ রায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং মিঃ ডি, এম, আর জয়াকর ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির মুখপাত্র। ইতিপূর্ব্বেই এই মহাসভার নির্দ্দেশ অনুসারে 'হিন্দু' নামটী এক অভিনব এবং ব্যাপক সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ইহাদ্বারা যে সকল ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষে সমুদ্ভূত হইয়াছে তৎসমুদয়ই 'হিন্দু' পদ বাচ্য হইবে। কেবল তথা-কথিত সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নহে—বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম্ম ইহার অন্তর্নিবিষ্ট; এবং ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ ও ইহার বহির্ভূত নহে। বেনারসে এই মহাসভার অধিবেশনে সংস্কৃতজ্ঞ পার্শি পণ্ডিত মিঃ নারিমান সভার কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন এবং মিসেস বেসান্ত সভাকর্ত্তৃক সাদরে আহুত হইয়া এবার বম্বে গিয়াছিলেন। যে কেহ ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনাকে ভারতের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করেন, অপিচ যে কেহ আপনাকে 'হিন্দু' বলিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই 'হিন্দু' হইবেন।

শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সভ্যারা

সংস্কারের যতই বিরোধী হউন না কেন, তাঁহারা নিজেদের আচরণ দ্বারাই ধীরে ধীরে জাতি ভেদ প্রথা উচ্ছেদ করিতেছেন। তাঁহারা এই আসন্ন-মৃত্যু প্রথার রক্ষার জন্য বৃথা সংগ্রাম করিতেছেন, কারণ যুগশক্তি ইহার প্রতিপক্ষে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে মাত্র চারি বর্ণের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে অসংখ্য বর্ণবিভাগ সুতরাং ইহা অশাস্ত্রীয়। বর্ত্তমানের আচার পদ্ধতি সকল প্রাচীন শাস্ত্রের অভিপ্রায় রক্ষা করিতেছে না, তাহাই নহে, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও যে বিধান প্রচলিত ছিল তাহার সহিত ও ইহাদের মিল নাই। পানাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ প্রতিপালিত হইতেছেনা, শাস্ত্রে যাহা অপেয় ও অখাদ্য সমাজের অগ্রণী গোঁড়া সনাতনীগণ, বিলাত প্রত্যাগত রাজ-মহারাজাগণ এবং অন্যান্য বহুলোক তাহা পান ভোজন করিয়া বা ইংরাজের সহিত একত্র খানা খাইয়া বিনা প্রায়শ্চিত্তে হিন্দু সমাজে রহিয়া গিয়াছেন: ইঁহারা স্বীয় আচরণে কোথায় জাতিভেদ মানিয়া চলিতেছেন?—তারপর আশ্রম ধর্ম্ম। এখানেই বা কোথায় শাস্ত্র রক্ষিত হইতেছে? দ্বিজগণের বাল্য বিবাহের বিধান নাই। বাল্য বিবাহ দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুগণ আশ্রম ধর্ম্মের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আশ্রম ধর্ম্মের নিয়মানুসারে কয়জন লোক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন? যাহারা দ্বাদশ বৎসর অথবা তাহার ও পূর্ব্বে সন্তানের বিবাহ দিয়া থাকে, যাহাদের সন্তানদের সংস্কৃতে বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয়না, যাহাদের সন্তানেরা অ-হিন্দু পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, যাহারা নিজেরা যাট বৎসর বয়সের পরও গৃহাশ্রমে আসক্ত থাকে—কেবল তাহাই নহে—সেই বয়সে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারাই যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক, তখন ইহা নিতান্ত ভণ্ডামি বই আর কিছুই না। এখন আমাদের কল্যাণও কর্ত্তব্য—বিচার পূর্ব্বক সমাজ নীতির পরিবর্ত্তন সাধন। একার্য্যে প্রাচীন শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুমোদন পাওয়া যায়। সমাজ ধর্ম্ম চিরদিন দেশ ও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হিন্দুরা যুগে যুগে অবস্থার পরিবর্ত্তন ও প্রয়োজন অনুসারে সমাজ বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই হিন্দুত্বকে দৃঢ় ও স্থায়ি করিয়াছে। অবস্থার উপযোগী হইবার ক্ষমতা ও বর্দ্ধনশীলতাই সজীবতার পরিচয়। হিন্দুধর্ম্ম একটি সজীব দেহ। চিরকালই তাই ছিল। ইহার সামাজিক নীতি চিরকালই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গিয়াছে, যাইতেছে, এবং যাইবে—দেশকালেরই প্রয়োজন অনুসারে।

প্রাপ্তিস্বীকার

স্বাস্থ্যসমাচার—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ। স্বাস্থ্য—পৌষ। শরীর—আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

বাঙ্গালায় আজকাল অনেকগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহাদের সকল গুলিতেই সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে। আলোচ্য পত্রিকা তিনখানির মধ্যে, স্বাস্থ্যসমাচার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার আলোচ্য বিষয় স্বাস্থ্য, কিন্তু এই স্বাস্থ্যেরও পরোক্ষ উদ্দেশ্য জাতির উন্নতি। এই উদ্দেশ্য যে অপর সকল প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, ইহার পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিন সংখ্যাই

বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, কোনটা ছাড়িয়া কোনটার উল্লেখ করিব জানিনা। কার্ত্তিকের সংখ্যায় 'শিশুর আত্মকথা' প্রত্যেক মাতা পিতা এবং নবদম্পতির—যাহাদের সংসার যাত্রা সবে আরম্ভ হইয়াছে—পাঠ করা উচিত। 'রৌদ্র চিকিৎসা', 'চরিত্র গঠন', 'দাঁতের কদর', 'খাদ্য নির্ব্বাচন ও দন্ত রক্ষা', 'স্বাস্থ্য শিখানর কথা', 'শিশুর কৃত্রিম খাদ্য', 'স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা' প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ সন্দর্ভ। 'সামাজিক প্রহসন'-এ লেখক যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন উহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইবেন, কিন্তু উহার সমাধান নিতান্ত সহজ নহে আর উহার একান্ত সমাধান যে কখন হইবে তাহাও সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে সমাজে যে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য-রূপে আসিতেছে তাহাতে এই সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত 'বাংলার মাটী'র বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতেছিনা, কিন্তু প্রবন্ধটী যে সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। 'দুর্গে-দুর্গতিনাশিনী' একটী করুণ রসাত্মক ছোট গল্প, জাতিভেদের অত্যাচারকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত। স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত ইহারও কোন সম্পর্ক নাই। আদর্শ দেশসেবীকে নিজের অহঙ্কার কতদূর বিসর্জ্জন দিয়া চলিতে হয় গল্পের শেষের দিকে তাহার সুন্দর একটী চিত্র আছে। মাঝে মাঝে টুক্‌রা টুকুরা উপদেশ যাহা আছে তাহাও মূল্যবান। একটী নমুনা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম—

"শিশুকে অযত্ন করিওনা

কারণ

সে তোমার বার্দ্ধক্যের ভরসা, জাতির আশা, সংগ্রামের শক্তি।

স্তনদুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য। রুগ্না মাতার দুধ দিওনা, বার্লি ও জল মিশাইয়া গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইও। দুধ খুব বেশী জ্বাল দিওনা, নচেৎ কমলালেবু প্রভৃতি ফলের রস কিছু মিশ্রিত করিয়া লইও। পেটেণ্ট ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার সর্ব্বনাশ করে।

শিশুর খাদ্য যেন টাট্‌কা ও প্রতিবারে অল্প হয়। দিনে চারিবার ও রাত্রে দুইবারের বেশী দুধ দিওনা। রাত্রি বারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কাঁদিলেই মাই খাওয়াইওনা। একবৎসরের পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়। আঠার মাস বয়স হইতে একবেলা ভাত খাওয়ান অভ্যাস করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃদু সূর্য্যাতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা।"

স্বাস্থ্য—১০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। এই পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত। আমরা ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি। প্রবন্ধের নিম্নে যে সকল ছোট ছোট টিপ্পনী আছে সেগুলি কালোপযোগী এবং 'Suggestive'—

"মনে রাখিবেন

বাংলা দেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, একটু চেষ্টা করিলে এই মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইতে পারে"

অথবা

"মনে রাখিবেন

এক ম্যালেরিয়ায় প্রতি দিন একহাজার বাঙ্গালীর মৃত্যু হয় অথচ অতি সহজেই এই মড়ক নিবারণ করা যাইতে পারে"

—এগুলি মনে রাখিবার মতই কথা। 'সম্পাদকীয়' এবং 'পুস্তক পরিচয়' ও সুলিখিত। মাঝে মাঝে দুই একটী বর্ণাশুদ্ধি আছে—অবশ্য আমরাও এই দোষ হইতে একান্ত মুক্ত নই—যেমন 'nuclear' সকল জায়গায়ই 'muclear', 'aldehyde'—'adehyde', 'formaldehyde'—'fiormuldehyde' এবং 'opaque'—'opagne' হইয়াছে।

'শরীর'—নবপ্রকাশিত পত্রিকা। দেখিয়া মনে হয় পল্লী চিকিৎসকদিগের ব্যবহারের জন্যই ইহার প্রকাশ। এইরূপ কাগজে শারীর ও স্বাস্থ্য তত্ব অথবা নানাবিধ রোগের নিদান—যাহা যে কোন প্রামাণ্য অথবা প্রচলিত পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে—তাহা না দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের নানাপ্রকার সমস্যা ও আধুনিক গবেষণা সম্বন্ধীয় আলোচনা সহজ বোধ্য ভাষায় করিলেই উহার উদ্দেশ্য অধিকতর সার্থক হইবে মনে হয়। ইহার পরিভাষা সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার আছে।

ভারতের দাবী—শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ প্রণীত। ৯৭।১, হ্যারিসন রোড, ক্যালকাটা পাবলিশার্স হইতে প্রকাশিত। পুরু আণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

নব্যভারতের গ্রাহকগণকে নলিনী বাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। 'মনুষ্যত্ব' ও 'বঙ্গে বিপ্লববাদ' লিখিয়া নলিনীবাবু যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন 'ভারতের দাবী'তে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে। নলিনী বাবুর রচনার বিশেষত্ব তাঁহার চিন্তাধারার মৌলিকতা ও মতামতের নির্ভীকতায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক সকল বিষয়ে লেখকের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু বইখানিতে ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট পাইবেন। যাঁহারা সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে যুবকগণকে আমরা বইখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

লড়ায়ের নূতন কায়দা—

চন্দন নগর হইতে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সকল প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। সুন্দর কাগজে পরিপাটী ছাপা। কয়েকটী চিত্র আছে। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

ফরাসী চন্দন নগর হইতে যে সকল বাঙ্গালী স্বেচ্ছা সৈনিকরূপে বিগত মহাযুদ্ধে গমন করেন শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী মহাশয় উহাদের অন্যতম। ইহাঁর অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র· ইনি ট্রেঞ্চে থাকিয়া লড়াই করিয়াছেন, সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া সামরিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এবং কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কিছুদিন বাবুর্চির কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। একাধারে এতগুলি গুণ বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখনী পরিচালনায় ও যে হারাধন বাবু সিদ্ধহস্ত তাহা আমরা জানিতাম না। বইখানিতে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে প্রাচীন ও আধুনিক-সমর-নীতির সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে। এত অল্প আয়তনের মধ্যে এমন সরস ও সুন্দরভাবে এমন একটী জটিল ও নূতন বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা যে হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। আধুনিক সমরনীতির একটা মোটামুটি ধারণা যাঁহারা পাইতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি অবশ্যই পড়িবেন।

নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

দ্বিতীয় খণ্ড] পৌষ ১৩৩২ [৯ম সংখ্যা

শক্তিহীনতা †

মো: ক. গান্ধী.

হাকিম সাহেব আজমল খান ও ডাক্তার আন্সারী ইউরোপ ও সিরিয়ায় সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে নিম্নলিখিতরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন——

"দক্ষিণ সিরিয়া ড্রুস দিগের বাসভূমি। 'অভিভাবক' ফরাসীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি সেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে ফরাসীর নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায়। পালেস্তাইনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী সমিতি 'লাজনাতুব তান্‌ফিজিয়া'র সম্পাদক সৈয়দ জামালুদ্দিন-অল্-হাসাইনি মহোদয়ের নিকট হইতে দিন দুই পূর্ব্বে একটী তার পাইয়াছি, উহাতে সংবাদ পাইলাম দামাস্কাস্ ফরাসীর গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং বহু লোক হতাহত হইয়াছে। সিরিয়ার ব্যবস্থায় যে যথেষ্ট ক্রুটী রহিয়াছে ইংরাজী কাগজে প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহা কতক বোঝা যাইত, কিন্তু ফরাসরা ড্রুসদের ও দামাস্কাসের অধিবাসীগণের উপর কিরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেছে এই তার ও পরে কাইরো হইতে রয়টারের তারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সিরিয়া ভ্রমনকালেও আমরা এমন অনেক বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যাহাতে ফরাসীর হৃদয়-হীনতা ও অধীনস্থ জনবৃন্দের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা ভারতীয় সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু 'হামদর্দ'এ উর্দ্দু-ভাষায় প্রকাশিত বিবরণী পাঠে আপনার অসুবিধা হইবে বলিয়া সেখানকার অবস্থা এখানে মোটামুটি বলিতেছি।

"জাতিসংঘ যখন ফরাসীকে সিরিয়ার 'অভিভাবক'ত্ব দান করিলেন তখন ফরাসী সরকার ও ফরাসী হাই কমিশনার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে সিরিয়ার অধিবাসীগণকে আভ্যন্তরীণ শাসনবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। সিরিয়াকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে জনসাধারণ নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তা ও

† Our Impotence, Young India. 12. 11. 25.

মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার কথাও হইয়াছিল। ডামাস্কাস্ ও লিবানন প্রদেশে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তুত: এবং অংশত: প্রতিপালিত হইল বটে, কিন্তু ড্রুসদিগের বাসভূমি 'হায়ান' প্রদেশে স্বায়ত্বশাসনাধিকার অথবা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সভাপতি অথবা ব্যবস্থাপক সভা, কিছুই দেওয়া হইলনা ; উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্বিয়োলে (Carbiollet) নামক একজন ফরাসী কাপ্তানকে উহাদের শাসনের ভার দেওয়া হইল, এবং উহারা প্রকাশ্যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলে উহাদের প্রতিনিধিগণ অবমানিত হইলেন, উহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে প্রহৃত হইলেন ও কারারুদ্ধ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকেরা লাঞ্ছিতা হইলেন।

"কাপ্তেন কার্বিয়োলে, ফরাসী কোঙ্গো হইতে আসিয়াছিলেন। ফরাসীর হাতে ফরাসী কোঙ্গোর নিঃসহায় অধিবাসীগণের যে লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল ড্রুসদেরও তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। ড্রুজরা প্রাচীন এবং আত্মগৌরবসম্পন্ন সামরিক জাতি ; উহারা এই সকল অত্যাচারে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, এবং ক্রমে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইল। উহারা ফরাসী সৈন্যকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত ফরাসীর আক্রমন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডামাস্কাস্ এবং আলেপ্পোর ফরাসীর আচরণে এই সকল স্থানেও বিদ্রোহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। উপরে উল্লিখিত তারের খবরে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বর্ব্বরতার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

"ফরাসীরা অন্যায় এবং অসাধু উপায়ের অনুসরণেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন, এবং কাগজের টাকা চালাইয়া দেশের সমুদয় সোণা বাহির করিয়া দেশের ধনক্ষয় করিতেছেন। দেশের সকলপ্রকার সম্পদের মূলোচ্ছেদে দারিদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। শাস্তিবিধান ও জরিমানা হিসাবেও গ্রাম ও নগরের অধিবাসীগণের নিকট হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া দারিদ্রের ভার বৃদ্ধি করিতেছে।

"এসিয়াবাসী এই ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আপনার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা এই পত্র লিখিতেছি। জাতিসঙ্ঘ ফরাসীকে সিরিয়ার অভিভাবকত্ব দিয়াছেন, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আপনি জাতিসঙ্ঘের নিকট এ বিষয়ে তার করুন এবং অন্যান্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও তাহা করিতে বলুন। আমরা জানি যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার অনুকূল নয়, তাহা সত্বেও আমাদের মনে হয় ভারতবাসী হিসাবে, মুসলমান হিসাবে, এবং এশিয়াবাসী হিসাবে এসিয়ার নিপীড়িত সমুদয় জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা উভয় পক্ষেরই মঙ্গলজনক।"

কংগ্রেসের নামে জাতিসঙ্ঘের নিকট তার করিবার জন্য উহাদের অনুরোধ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, সুতরাং ডাক্তার সাহেবকে আমি এই উত্তর দিয়াছি—

"আপনার এবং হাকিম সাহেবের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়াছি। কংগ্রেসের সভাপতির জাতিসঙ্ঘে তার প্রেরণের সার্থকতা কি? আমার মনোভাব পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত, পার্থক্য শুধু এই আমি আমার অক্ষমতার বিষয় অবগত আছি, তাই উহার মত বৃথা তর্জ্জনগর্জ্জন করিনা। আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকিত আমি কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্তাবিত তার পাঠাইতাম। 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' স্তম্ভে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিনা আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে উহারা নিহিত থাকে। উহাদের গুরুত্ব ও অধিক, এবং বাহিরে প্রকাশ না করিলেও ভগবানের নিকট উহা প্রত্যহ নিবেদন করিতে আমি ভুলিনা। চারিদিকের অবস্থার কথা যখন ভাবি আমার মন তখন দমিয়া যায়। ভিতরের ক্ষীণ বাণী যখন শুনি তখন চারিদিকের এই অশান্তির মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। আমাদের অক্ষমতা ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন।"

ডাক্তার সাহেব এবং হাকিমজীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া উহাদের পত্র ও আমার উত্তর দুইই প্রকাশ করিলাম। যেখানে অনুরোধের পশ্চাতে কোন নৈতিক বা বস্তুগত (material) শক্তি নাই

সেখানে অনুরোধের যে কোন মূল্য আছে তা আমি বিশ্বাস করিনা। প্রার্থনা কার্য্যকরী করিবার সঙ্কল্প হইতে নৈতিক বল আসে। এই প্রাথমিক নিয়ম শিশুরাও জানে, এবং মা উহাদের অভিলাষ পূর্ণ না করিলে উহারা কাঁদে, খাইতে অসম্মত হয়, এবং দুরন্ত হইলে মাকে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই মূলনীতি স্বীকার না করিলে এবং এতদনুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত না থাকিলে আমরা কংগ্রেসকে উপহাস্যাস্পদ করিয়া তুলিব মাত্র।

ইচ্ছা থাকিলেও দুরন্তপনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করা (suffer) আমাদের আয়ত্তাধীন। সিরিয়ার নির্য্যাতনকে বর্ব্বরতা, ডায়ারী নীতি, অবমাননা যাই বলা যাউক, ইহার প্রতিকারে যে আমরা অক্ষম, ভারতবাসী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা পার্শী, অথবা এসিয়াবাসী হিসাবে সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের উচিত। আমাদের অক্ষমতা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে যদি উহা যে সকল ইতর প্রাণী ঝড় বাদলের দিনে পরস্পরের সাহচর্য্যে উত্তাপ ও উৎসাহ লাভের জন্য ঘেঁসাঘেসি হইয়া থাকে উহাদের ঐ দৃষ্টান্তের কেবল অনুসরণেই আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে, তাহাই বা মন্দ কি? উহারা বরুণ দেবের নিকট বৃথা প্রার্থনা জানায় না, নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে মাত্র।

আমরা করিতেছি কি? হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে লড়িতেছি, এবং উভয় সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। চরখার তাৎপর্য্য আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই। যাহারা ধরিয়াছেন তাহারাও নানা অজুহাতে খদ্দর পরায় ও সূতাকাটায় অবহেলা করিতেছেন। আমাদের চারিদিকে ঝটিকা বহিতেছে, কিন্তু আমরা পরস্পর সাহচর্য্যে উত্তাপ লাভের চেষ্টা না করিয়া শীতে কাঁপিতেছি অথবা ঝটিকাদেবতারই কৃপাভিক্ষা করিতেছি। হিন্দুমুসলমানে ঐক্য স্থাপনের অথবা জনসাধারণের মধ্যে চরখা প্রচলনের ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, অন্ততঃ কৃপাভিক্ষার আবেদনে স্বাক্ষর না করিবার মত সুবুদ্ধি আমার আছে।

এই জাতিসঙ্ঘ কি? জাতিসংঘ বলিতে কি কেবল ইংলণ্ড ও ফরাসীকেই বুঝায় না? অপরশক্তি সমূহের কোন মূল্য আছে কি? যে ফরাসীজাতি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নীতি (motto) পদদলিত করিতেছে উহার নিকট নিবেদনের কোন মূল্য আছে কি? আর ইংলণ্ডের নিকট যদি কিছু নিবেদন করিতে হয়, তজ্জন্য জাতিসংঘের নিকট যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। সংক্ষিপ্ত দিল্লীবাস ব্যতীত অপর সময়ে সে শিমলা শিখরেই অবস্থান করে। ইংলণ্ডের কাছে ঐ বিষয়ে নিবেদন করা সীজারের নিকট অগষ্টাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারই তুল্য।

অতএব আসুন, আমরা এই নগ্ন সত্য (naked truth) উপলব্ধি করিয়া জাতিকে উহার কর্ত্তব্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই। ভারতের ভিতর দিয়াই সিরিয়ার সহায়তা হইতে পারে। আমাদের মহত্ত্ব (greatness) যদি আমরা উপলব্ধি না করিতে পারি আসুন আমরা নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া চুপ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অক্ষম থাকিবারও কোন প্রয়োজন নাই। আসুন আমরা অন্ততঃ একটা কাজ ভাল করিয়া করি;—হয় আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম চতুষ্পদ জন্তুরা অনেক সময়ে যেমন শেষ পর্য্যন্ত লড়ে তেমনি করিয়া লড়ি, না হয় বৃহত্তম আয়তনে সহযোগের ভিতর দিয়া দুর্ব্বলতর জাতিকে লুণ্ঠনের (exploitation) ব্যর্থতা ও পাপ নিজে শিক্ষা করি ও অপরকে শিক্ষা দিই। এইরূপ কোটী কোটী লোকের সহযোগ কেবল চরকার ভিতর দিয়াই হইতে পারে।

২ জার্ম্মাণার আর্ত্তনাদ

[মো. ক. গান্ধী]

বড় দাদা + জার্ম্মাণী হইতে একটী পত্র পাইয়াছেন, নিম্নে উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নীতি হীনতা (corruption) এখানে চরম সীমায় পৌছিয়াছে। মন্দলোক ঐশ্বর্য্যে গড়াগড়ি যাইতেছে অথচ ভাল লোকের জীবিকা নির্ব্বাহই দায়। আমাদের মত সহুরে কেরাণীকুলের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের মাসহারা ৩৫ ডলার (১০৫ টাকা) মাত্র, সুতরাং আমরা এক রকম চির অনশনে দিন যাপন করিতেছি।

"আমি অনেক সময় ভারতে আসিতে এবং মহাত্মাজীর পদতলে বসিতে একান্তভাবেই ইচ্ছা করি। আমি একবারে একা। আমার স্ত্রী-পুত্র কেহই নাই। আপনার বলিতে রোগক্লিষ্টা একটী ভাইঝি, সেই আমার সংসার চালায়। সে না থাকিলে আমি পৌরহিত্য অবলম্বন করিতে পারিতাম। উহাকে নিরাশ্রয় করিয়া আমি যাইতে পারিতেছিনা। যাহাই হউক, আমি একজন জ্ঞানান্বেষী। আমি প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ অথবা মাসহারা, কোনটাই আমি এখানে আশা করিতে পারিনা। আধুনিক জার্ম্মাণীর অবস্থাই এই।

গত মহাসমরের পূর্ব্বে পনেরো বৎসর আগে আমি স্বাধীনজীবি তত্ত্বানুসন্ধায়ী (investigator) ছিলাম। কিন্তু আমাদের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে অন্যান্য সহস্র সহস্র শিক্ষিত লোকের মত আমিও পথের ভিখারী হইয়াছি। আমার বয়ক্রম এখন ৫৫ বৎসর। আমি যে কতদূর হতাশ এবং মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি ইউ-রোপের প্রতি আমার কিরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে তাহা আপনারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। এখানকার লোকেরা হৃদয়হীন পশু, একে অপরকে গ্রাস করিতে ব্যস্ত। আমি কি ভারতে আসিতে পারি? আমি কি ভারতীয় জ্ঞানীদিগের মত হইতে পারি? ভারতের উপর আমার আস্থা আছে, এবং আমি আশা করি ভারত আমাকে রক্ষা (save) করিবে।"

এই পত্রের প্রথম কয় লাইন যে কোন ভারতীয় কেরাণীর পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। জার্ম্মাণ কেরাণীর অবস্থা হইতে তাহার অবস্থা কিছু ভাল নয়। ভারতেও 'মন্দ লোক সম্পদে গড়াগড়ি যায় আর সৎলোকের আহার জুটে না'। এও 'দূরের জিনিষ সুন্দর দেখায়'—এর মত। এই জার্ম্মান লেখক মহোদয়ের মত বন্ধুরা যদি মনে করেন ভারতবর্ষ জার্ম্মাণী অথবা অপর কোন দেশ হইতে ভাল উহাদের সেই ভ্রম দূর করা কর্ত্তব্য। ধন মহত্বের পরিমাপ নহে, একথা যেন উনি বোঝেন। অনেক সময় দারিদ্রেই মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সৎলোক স্বেচ্ছায় দারিদ্র অবলম্বন করেন। লেখকের অবস্থা যে সময়ে স্বচ্ছল ছিল জার্ম্মেণী সে সময়ে অপর দেশ লুণ্ঠনে নিরত ছিল। ইহার প্রতিকার প্রত্যেক দেশেই ব্যক্তিবিশেষের নিজের হাতে। সকলকেই নিজের অন্তর হইতে শান্তি আহরণ করিতে হয়। প্রকৃত শান্তি বাহিরের অবস্থা বিপর্য্যয়ে প্রভাবিত হয় না। ভাইঝি'টী না থাকিলে যে লেখক পৌরহিত্য অবলম্বন করিতে পারিতেন এই ধারণা আমার কাছে ভ্রমাত্মক মনে হয়।

* A Cry from Germany.

+ বড়দাদা—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কল্পনায় তিনি পুরোহিতের যে মূর্ত্তি আঁকিতেছেন উহার বর্ত্তমান অবস্থা ত তার চাইতে ভাল বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমানে তাঁহাকে মাত্র একটী নিরাশ্রয় বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইতেছে, আর পৌরহিত্যের সনদ লাভ করিয়া তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন! পৌরহিত্য পদ বরণ করিলে তাঁহাকে কার্য্যতঃ শত শত ভাইপো ভাইঝির তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। পুরোহিত রূপে তাঁহার দায়িত্ব বিশ্ব জোড়া হইবে। এখন তাঁহাকে কেবল নিজের একটীমাত্র ভাইঝির জন্য খাটিতে হইতেছে, তখন তাঁহাকে সমগ্র নিপীড়িত মানবের জন্য খাটিতে হইবে।

এই বন্ধুটী এবং তাঁহার মত অপরেরা যদি ইহাতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে উহাদিগকে পুরোহিতের 'ভেক' গ্রহণ ব্যতিরেকে দুঃস্থ জনগণের সহিত একাত্ম হইতে উপদেশ দিব। তাহা হইলে উহারা পুরোহিতের প্রবল প্রলোভনের বিষয়ীভূত না হইয়াও পৌরহিত্যের সমুদয় সুবিধা ভোগ করিবেন।

জার্ম্মাণীর বন্ধুটী ভারতীয় জ্ঞানীর মত হইতে চাহেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশকালের কোন পার্থক্য নাই। ভারতের ও পাশ্চাত্য জ্ঞানী, ভালমন্দ বিষয়ে উভয়েই তুল্য।

এক বিষয়ে লেখকের অনুমান প্রকৃত। হৃদয়হীন দ্বিপদ জন্তুর অভাব ভারতে যদিও নাই তথাপি ভারতের মনের গতি মোটের উপর এই পাশবিকতা পরিহার করিবার দিকে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাচিত পথে যদি সে অবিচলিত থাকে তাহা হইলে ইউরোপের ভারতের নিকট হইতে যথেষ্ট আশা করিবার কারণ থাকিবে। ভারত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই সত্য ও শান্তির পথ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং চরখা ও অসহযোগ গ্রহণে উহাকে মূর্ত্তি দিয়াছিল। ভারতকে আমি যতদূর জানি সে এখনও ঐ পথ পরিত্যাগ করে নাই এবং করিবে ও না।

শ্রেষ্ঠতার বিষ †

ময়মনসিংহ জেলার বৈশ্যসাহা সমিতি হইতে প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিবরণী সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই—

"১। এই সমিতির উদ্দেশ্য আমাদের সমাজের উন্নতিবিধান।

"২। আপনার বার্ত্তা ত্রিবিধ বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছি:—

(ক) চরকা ও খদ্দরের প্রচলন ও প্রসার।

(খ) হিন্দু মোস্লেম একতা।

(গ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

"৩। বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে মোটামুটি 'জল আচরণীয়' ও 'অনাচরনীয়'—এই দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

"ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ—ইহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; আর বৈশ্যসাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, যোগী, শুঁড়ী, জেলে, ভুঁইমালি, ধোপা, মুচি ও ঋষি, কাপালিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

† The Canker of Superiority. 5. 12. 25.

"প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—ইহারা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের চালক,—অন্যান্য বর্ণের উপর ইহারা যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ইহারা যে অন্যান্য বর্ণকে (বিশেষতঃ অনাচরনীয় জাতিদিগকে) যথেষ্ট তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন, শুধু তাই নয়, উহাদিগকে যথেষ্ট উৎপীড়নও করিয়া থাকেন। সাধারণ মন্দিরে (public temples) প্রবেশ অথবা পূজা করিবার অধিকার উহাদের নাই, ছাত্রগণের ছাত্রাবাসে স্থান পাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, এবং সাধারণ ভোজনাগারে ও খাবারের দোকানে উহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

"বাঙ্গালায় অস্পৃশ্যতা নিবারণে যাহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাহারা সঠিক পথ নির্ব্বাচন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়না, এবং কার্য্যক্ষেত্রেও উহারা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

"১৯২১সালের মাথাগুনতি অনুসারে বাঙ্গালার মোট লোক সংখ্যা ২,০৯,৪০,০০০এর মধ্যে ব্রাহ্মণ (১৩,০৯,০০০, অর্থাৎ ১৭ ০/০), কায়স্থ (১২,৫৭.০০০, অর্থাৎ ১৬ ০/০), এবং বৈদ্য (১,০৩,০০০ অর্থাৎ ১০ ০/০) মোট ২৬,৬৯,০০০ মাত্র।

"বৈশ্যসাহা সম্প্রদায় বাঙ্গালার ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। ময়মনসিং, পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী, ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, টিপারা, ও শ্রীহট্টেই ইহারা প্রধানতঃ বাস করিয়া থাকেন। ইহারা সংখ্যায় ৩,৬১,০০০ বা সমগ্র বঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৩৸০ ভাগ। এই সম্প্রদায়ে হাজার করা ৩৪২ জন লিখিতে পড়িতে পারেন। অন্যান্য বর্ণের শিক্ষিতের হার যথাক্রমে—বৈদ্য—৬৬২, ব্রাহ্মণ—৪৮৫, কায়স্থ—৪১৩, সুবর্ণবণিক - ৩৮৩, গন্ধবণিক—৩৪৪।

"অনাচরনীয় ত দূরের কথা, অন্যান্য আচরনীয় জাতির মধ্যেও শিক্ষিতের অনুপাত অনেক কম।

"শিক্ষাসম্বন্ধীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও এই সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। কলেজ, উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নানাবিধ দাতব্য এবং শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানেও ইহারা যথেষ্ট দান করিয়া থাকেন।

"আচারব্যবহার, রীতিনীতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি বিষয়েও এই সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। স্ত্রীশিক্ষায়ও উহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমকক্ষ।

"এই সকল সত্বেও আমরা যেন হিন্দু সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, এইরূপই ব্যবহার পাইয়া থাকি। এপর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে আমাদের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশের কোন যথার্থ (sincere) প্রয়াস হয় নাই, যদিও আমরা সকল প্রকার জাতীয় আন্দোলনেই যোগদান করিয়া থাকি। সামাজিক অধিকারচ্যুতিপ্রসূত অসুবিধা না থাকিলে আমরা আরও কাজে লাগিতে পারিতাম।

"আমাদের সম্প্রদায় শৌণ্ডিক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শৌণ্ডিকেরাও সাহা নামের ব্যবহার করেন এই সুযোগে আমাদের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষাপরায়ণ সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দুগণ হিংসা পূর্ব্বক এবং অযথা আমাদিগকে শৌণ্ডিক (মদ্য ব্যবসায়ী) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে বৈশ্যবর্ণের লোকেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় অন্যান্য বর্ণের মত সহজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই বলিয়া হিন্দু সমাজে যথাযোগ্য স্থান না পাইয়া পতিত হইয়াছেন—ইতিহাস হইতে ইহা প্রমান করিয়া আমরা এই সকল ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

"আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন ও সমাজে যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশের জন্য আমরা সমিতি গঠন করিয়াছি, এবং এই সকল সমিতি অনেক কাজ করিতেছে।

"আমাদের মতে অস্পৃশ্যতার একান্ত নিরাকরণ হিন্দু সমাজের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য, [illegible] হিন্দু

মুসলমানের একতার জন্য প্রয়োজন। অতএব মহাত্মাজীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয় প্রকাশ্য উক্তিতে আপনি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের যে চিত্র আমরা আপনাকে দিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা ভুলিবেন না। পদদলিত জাতির হিতসাধন এবং তজ্জন্য সংগ্রাম আপনার জীবনের ব্রত, অতএব হিন্দুসমাজের যথেচ্ছাচারের সহিত সংগ্রামে আমরা আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

উপরের বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে উহা উদ্ধার করার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতার বিষ হিন্দুসমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে কিরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা। তথাকথিত উচ্চবর্ণের চক্ষে অবজ্ঞাত হইয়াও লেখকেরা অধিকতর অবজ্ঞাত জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেছেন। অবজ্ঞাত 'অনাচারনীয়ে'র মধ্যেও উৎকর্ষ নিকর্ষের একই ধারণা বর্ত্তমান। কচ্ছদেশ ভ্রমন কালে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি 'অস্পৃশ্য'দিগের মধ্যেও জাতির উচ্চনীচ আছে, এবং 'উচ্চ' বর্ণের অন্ত্যজ হীনবর্ণের অন্ত্যজকে স্পর্শ করেনা, এবং উহাদের শিশুদের সহিত নীচবর্ণের শিশুদের মেলামেশা করিতে স্পষ্টই নিষেধ করে। উহাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ও অন্তর্ভোজনের সম্ভাবনা ও স্বপ্নেরও অতীত। বর্ণভেদের চরম অনস্বাবিত। এই খানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক বর্ণের উপর অপর বর্ণের শ্রেষ্ঠতার এই যে দাবী, ইহার প্রতিবাদ স্বরূপেই আমি নিজেকে 'ভাঙ্গী' (মেথর) বলিতে আনন্দ অনুভব করি, যেহেতু আমার জ্ঞাতসারে এখানেই অন্ত্যজের সীমা। সামাজিক কুষ্ঠের মতই সে পরিত্যাজ্য, অথচ স্বাস্থ্যের জন্য, এমন কি আমাদের দেহ ধারণের জন্যও সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যাহাদের তরফ হইতে এই বর্ণনা আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে উহাদের প্রতি আমার সহানুভূতি রহিয়াছে, কিন্তু যাহাদের অবস্থা উহাদের অপেক্ষাও শোচনীয় তাহাদের উপরে শ্রেষ্ঠতার দাবী যেন উহারা না করেন, সে বিষয়ে সাবধান থাকিবেন। ইহাদিগকে সাথী করিবার গৌরব উহাদের হউক, এবং যে সুযোগ অপরে পায়না সে সুযোগ উহারা লইতে অস্বীকার করুন। হিন্দুসমাজকে এই অস্বাভাবিক অক্ষমতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে জন কয়েককে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে হইবে। যে শ্রেষ্ঠতার দাবী করে, এই দাবীর প্রকৃতি বশেই সে উহা হইতে ভ্রষ্ট হয়। যথার্থ স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা দাবীর অপেক্ষা রাখেনা। লোকে স্বতঃই উহা স্বীকার করিয়া লয়, অথচ সর্ব্বত্রই উহা প্রত্যাখ্যাত হয় (refused)—আড়ম্বরের সহিত অথবা মিথ্যা দীনতার (modesty) ধারণা হইতে নহে, অন্তরে শ্রেষ্ঠতার অনুভূতি নাই বলিয়া, নিজের ও অন্ত্যজের অন্তরাত্মায় কোন পার্থক্য নাই এই জ্ঞান হইতে। জীবন কর্ত্তব্যময়—অধিকার এবং সুযোগ সমষ্টি মাত্র নহে। উচ্চনীচ ভেদের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা সেই ধর্ম্মের ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ণাশ্রমের অর্থ আমার কাছে এইরূপ নয়। বর্ণাশ্রম জীবিকার পার্থক্যানুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে মনে হয় বলিয়াই আমি উহাতে শ্রদ্ধাবান। তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সকলেরই—এমনকি শূদ্র এবং অস্পৃশ্যেরও সেবক। তিনি এই কার্য্যেই সর্ব্বস্ব নিয়োগ করেন এবং অপরের দান ও অনুগ্রহের উপর জীবন ধারণ করেন। ক্ষমতা, অধিকার, অথবা আভিজাত্যের দাবীতেই ক্ষত্রিয় হয়না, সমাজের রক্ষণ ও প্রতিপত্তির জন্য যিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন তিনিই ক্ষত্রিয়। যে বৈশ্য কেবল নিজের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করে, কেবল অর্থসঞ্চয়ই যাহার লক্ষ্য সে তস্করবৃত্ত। সমাজের তরফ হইতে অর্থের বিনিময়ে কাজ করে বলিয়া যে শূদ্র অপর তিনবর্ণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট, তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মকে আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে ইহার মধ্যে পঞ্চম বর্ণের স্থান নাই। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সমূহও শূদ্রের ন্যায়ই সমাজের সেবক। বর্ণাশ্রমকে আমি আদর্শ প্রথা বলিয়াই মনে করি, সমাজের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যই উহার সৃষ্টি এই আমার ধারণা। আমরা যা দেখি তাহা মূলের ব্যভিচার, উপহাস মাত্র। বর্ণাশ্রম যদি রাখিতে হয় হিন্দুকে এই বিপর্য্যয় দূর করিয়া বর্ণাশ্রমের আদি গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আহমদাবাদের স্বাস্থ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতি গৃহের বাহিরেই ভাঙ্গা পাত্র, ছেঁড়া জুতা, অব্যবহার্য্য তেলের পাম্প, ভাঙ্গা চুলা, লণ্ঠন, বোতল, চুল, ন্যাকড়া, নল, ভাঙ্গা মাটীর ও টীনের বাসন, পচা চটের থলী প্রভৃতি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল সম্পদ (treasures) পরিত্যাগ করিতেও আবার কষ্ট হয়! বাসস্থানের অভাবে যদি উহারা বিনষ্ট হয় তাই ছোট ছোট পোকার নিরাপদ বাসের নিমিত্ত দেয়াল ও বারাণ্ডার কাছে ইট ও টালির টুকরা স্তুপীকৃত রহিয়াছে, ইহাও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তুপ সরাইলে উহার নীচে অসংখ্য কীট এবং 'শতপদী' (centepedes) দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতি মোড়ে এবং প্রতি ক্ষুদ্র গলিতেই উচ্ছিষ্টের আধার আছে। এই আধার হইতে খাদ্যাদি আহরণের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান গরু, ষাঁড় এবং কুকুর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ষাঁড় ও গরুতে সময় সময় ছোট ছোট শিশুদের তাড়া করে, এবং কুকুর হয় সারাদিন ঘেউ ঘেউ করিয়া কাণ ঝালাপালা করে, নয়ত পাগল হইয়া বিষম বিপদ ঘটায়।

গোরু লোকে পাড়ায়ই রাখে, এবং উচ্ছিষ্টাধার হইতে প্রচুর খাদ্য পাইবে এই সম্ভাবনায় উহাদিগকে ঘাস ভিন্ন কিছুই খাইতে দেয়না। এই অবস্থায় সুস্থ গরু এবং নির্দ্দোষ (uncontaminated) দুধ পাইবার আশা কিরূপে করিতে পারা যায়? সর্ব্বত্রই এই সকল জন্তুর মল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই আধারগুলি অপসৃত হইলে উহার নিম্নদেশ অসংখ্য কীটে পূর্ণ দেখা যায়। জৈনদের বাসস্থানেই প্রায় ইহা দেখা যায় বেশী। আমরা এই আধারগুলি পরিষ্কার করিবার ও অধিকতর পরিষ্কার স্থানে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

এখানে সকল যায়গাই মূত্র ত্যাগের উপযুক্ত বিবেচিত হয়। স্বরাজ লাভের পর এই চিরন্তন অধিকারের বিলোপ সাধন করিতে গেলে হয়ত বা বিদ্রোহই ঘটিবে। জননীরা ছেলেদের যথেচ্ছ মলমূত্র ত্যাগ করাইবার 'সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত' করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। পরিষ্কার করিয়া করিয়া উহাদিগকে সাবধান করা একান্তই অসম্ভব। পরিষ্কার করিবার অব্যবহিত পরে যেন প্রতিবাদ স্বরূপেই আবার পরিষ্কৃত স্থানে শিশুকে মলত্যাগ করান হয়। শ্রোতাগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতেই সভার সম্মুখভাগে মূত্রত্যাগ করিতে বসিয়া যান! দুই এক যায়গায় দেখিয়াছি একটা পল্লী পরিষ্কার করিয়া আসিতে না আসিতেই আবার উচ্ছিষ্ট পড়িতে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস——২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নব্যভারত

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড] মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩২ [১০ম ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

বরণ।

ভেবেছিলেম আস্‌বে বুঝি
তোমার স্বর্ণ রথে,
তারি আশায় আজকে আমি
বাহির হলেম পথে।
নিত্য আমার সকল কাজে
বক্ষ বীণায় যে সুর বাজে
সেই সুরেতে পাগল আমি,
হে মোর পরাণ প্রিয়,
সে বীণাতে তোমার হাতের
পুণ্য পরশ দিয়ো।
আজকে আমি করিনি তো
কোনোই আয়োজন
দেবার মত হৃদয় মাঝে
আছে একটী ধন ;
যে মালাটী সঙ্গোপনে
গেঁথেছিলেম হৃদয় কোণে
সেই মালাতে পূজব তোমায়
হে মোর মহারাজ,
সঙ্গোপনে হৃদয় মাঝে
ব'রবো তোমায় আজ।

শ্রীমতী কুমুদরাণী সিংহ।

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি।

শ্রদ্ধাস্পদ অশ্বিনীবাবুর সহিত যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর লইয়া, পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তি এবং লোকহিত কামনা যাঁহার নিত্যব্রত ছিল, তিনি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, জীবনের অপরাহ্নে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সময়ে অল্পাধিক দুইবৎসর কাল তাঁহার কলেজের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিবার ও বুঝিবার খানিকটা সুযোগ ঘটিয়াছিল।

১৯০৮ সনের জুলাইমাসের মধ্যভাগে, এক সন্ধ্যাকালে অশ্বিনীবাবুর কলেজ হষ্টেলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। রাস্তার অপর পার্শ্বেই অশ্বিনীবাবুর বাসগৃহ। ভক্তিযোগ পাঠ করিয়া যাঁহাকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, প্রভাতেই তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইব, এই আশায় অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরণে রজনীর অবসান হইল। অশ্বিনীবাবু আপনার বাসবাটীর নীচের একটি কক্ষ বসিবার ঘর করিয়াছিলেন। এই প্রকোষ্ঠের সাজ সরঞ্জামের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এখানে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ যাহার যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত দেখা করিতে পাইত। এই গৃহের সামান্য শয্যায় কোনও গ্রন্থকে উপাধান করিয়া, কোনও গ্রন্থ পার্শ্বে রাখিয়া, তিনি কত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছেন। সন্তর্পণে গৃহে ঢুকিতেই বহুদিনের পরিচিতের মত কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আপনার নাম দেখেই আপনাকে আমার কলেজে নিযুক্ত করেছি।"

আমার নামের উপর বন্ধু বান্ধবেরা এ পর্য্যন্ত অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার গুণে চাকরী পাওয়া যাইবে এ কথা কেহ বলেন নাই। আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনার নামটি দেখেই বুঝেছি যাঁরা এই নাম রেখেছেন তাঁদের কিঞ্চিৎ উৎকেন্দ্রীয়তা (Eccentricity) আছে;—আর এই উৎকেন্দ্রীয়তা যাঁদের নাই, তাঁরা সংসারে কোন কাজ ক'রতে পারেন না। আমাদের বংশেও এই ছিট্ কিঞ্চিৎ আছে। আমাকেও তাই লোকে যা' তা' মনেকরে—সব কথা বুঝতে পারে না, আমিও বোঝাতে পারি না।" অশ্বিনী বাবুর জীবনও যে উৎকেন্দ্রীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ কি? ধনীর সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন;—যখন অর্থাগম হইতে লাগিল, অম্লান বদনে ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া দরিদ্র শিক্ষকদের দলে আসিয়া মিশিলেন। বিষয় লালসা অনায়াসে বর্জ্জন করিয়া নর-নারায়ণের সেবা ব্রত উদ্‌যাপনে দেহ মন ঢালিয়া দিলেন। আবার আমাকে বলিতে লাগিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অনেক পণ্ডিত আছেন, অনেক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে কৃতিত্বও দেখিয়েছেন, কিন্তু গরীব দুঃখীদের

জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে, আমি তাঁদেরকেই প্রকৃত শিক্ষিত মনে করি। যখন দেখব, আবশ্যক হ'লে শিক্ষিতেরা পাজীপুঁথি দূরে সরিয়ে, দুঃখীর দুঃখকে আপনার করে নিয়েছেন—তখন মনে ক'রব, আমার স্কুল কলেজ স্থাপন করা সার্থক হয়েছে। আমি নিজে উৎকেন্দ্রীয়, আমি ঐরকম একটী দল এখানে প্রস্তুত ক'রতে চেষ্টা ক'রছি—নিতান্ত সভ্য ভব্য লোক আমার দলে থাকতে পারে না।"

এইখানে অশ্বিনী বাবুর দলটীর কথা একটু বলি। দলে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনাকেই শিক্ষকের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। যাহাতে ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টাই করিতেন। জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে, দৈহিক ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এক চিন্তাশীল লেখক বলেন, "Education is the transmission of life, from the living, to the living, through the living". ইহাঁরাও পবিত্র জীবনের স্পর্শ দিয়া কতকগুলি তাজা মানুষ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অশ্বিনী বাবুর এই দলের ভিতর বাবু জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্তিযোগ-প্রকাশক জগদীশ বাবু অশ্বিনীকুমারের আবাল্য বন্ধু। ইনি একজন বহুশাস্ত্রবিশারদ, অনিন্দ্যচরিত্র সাধু ব্যক্তি। ইনি চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ধ্যান-নিরত তাপসের মত একাগ্রমনে জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। ইহাঁর আশ্রম বরিশালের এক পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে নানা ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া জগদীশ বাবু প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শ মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতেছেন। প্রতি রবিবার প্রাতে এখানে যে কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হয় তাহাতে বহু ধর্ম্মপ্রাণ লোক সমবেত হন। অশ্বিনীকুমার যখন এখানে আসিয়া যোগ দিতেন, তখন এখানে ভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইত।

পরদুঃখকাতর পণ্ডিত কালীশচন্দ্র অসামান্য প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্বল্প আয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে, হাস্যমুখে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার গুরুভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে The Little Brothers of the Poor, নামে একদল সেবক সহরের জরামৃত্যু ব্যাধির সহিত প্রবল সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র সেনাদলের কথা Messrs James Cunningham প্রভৃতি বিদেশীয় পরিদর্শকেরা বারংবার প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কখনও এরূপ দেখা গিয়াছে, কালীশ পণ্ডিত মহাশয় স্কুল ছুটীর পর, কাহারও অসুখের সংবাদ পাইয়া, গৃহে না ফিরিয়া আপনার দলবলসহ সেখানে গিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে তাহাকে হরি নাম শুনাইয়াছেন এবং মৃত্যুর পর সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়া শ্মশানে শেষ কার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কালীশ পণ্ডিত মহাশয়ের দেহাবসানকালে বরিশালের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"যদি মরিতে হয়, তবে যেন বরিশালেই মৃত্যু হয়।" গুরুতর পরিশ্রমে কালীশ

চন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি অকালে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, আজ বরিশালে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার কেহ নাই।

একজন ইংরেজ লেখক খাঁটি ধর্ম্মের দ্বিবিধ প্রকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, পবিত্রতার বৃদ্ধি (growth of holiness) এবং দ্বিতীয়, ফলপ্রদ সমাজ সেবা (Effective Social Service). অশ্বিনীকুমারের জীবনের পবিত্রতা সমাজ সেবার নানা প্রতিষ্ঠানকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। তাঁহার জীবনের পবিত্রতা শুধু ভাবে পর্য্যবসিত হয় নাই, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মবাহুল্য তাঁহার জীবনকে নীরস করিতে পারে নাই। তিনি শিক্ষিত সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বৃহত্তর জনসাধারণকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। ইহার কারণ তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ না করিয়া উহাকে অতিমাত্র প্রসারিত করিয়াছিল; ফলে জনসাধারণের উপর অশ্বিনীকুমারের যেরূপ প্রভাব ছিল, বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে কোন দেশ-নায়কের সেরূপ দেখা যায় না। অশিক্ষিত লোকদের উপর তাঁহার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল, সামান্য একটী ঘটনায় তাহা কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। একবার এক দরিদ্র কৃষক মাথায় একটা কাঁঠাল লইয়া বহুদূর হইতে তাঁহার নিকট আসিল। ফলটী অশ্বিনীকুমারের নিকট রাখিয়া বলিল—"কর্ত্তা, অনেক দূর হইতে এটা আপনার জন্য লইয়া আস্‌ছি।" অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? এত কষ্ট ক'রে এটা আনবার কি প্রয়োজন ছিল?"

কৃষক বলিল—"অনেক দিন একটা গাছে কোন ফল হইতেছে না দেখ্যা মানত ক'র্‌ছিলাম, যদি গাছে ফল হয় পেরথম ফলটী কর্ত্তারে দিমু; অনেকদিনের পর আমার সেই গাছে ফল হইছে, তাই পেরথম ফলটী আপনার জন্য লইয়া আস্‌ছি।" বহু অশিক্ষিত সরলচিত্ত ব্যক্তির তাঁহার প্রতি এমনি অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি ছাত্রদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন—ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অভিভাবকের ও শিক্ষকের গুরু শাসনে যে ছাত্রের জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, দুচার দিন অশ্বিনীবাবুর সহিত থাকিয়া, তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি ছাত্রদের শুধু শিক্ষক ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাদের সহাধ্যায়ী, সমদুঃখভাগী, অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে সান্ধ্যভ্রমণ কখনও একাকী করিতে দেখি নাই; তিনি যখনই ভ্রমনে বাহির হইতেন একাধিক ছাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। একদিন তাঁহার সঙ্গে ঐরূপে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ওরে তোরা একটা খবর শুন্‌বি?" সকলে ঔৎসুক্য জানাইলে বলিলেন—"দ্যাখ্, বম্বের এক mill-owner আমার ফোটোগ্রাফ্ চেয়েছে। কেন জানিস্? কাপড়ে আমার ছবির ছাপ দেবে।" কেহ বলিলেন, "বেশতো, এতো খুব ভালকথা, আপনি ফোটো পাঠিয়ে দিন না।"

"তুই ক্ষেপেছিস্? যা না, ঐ আমাদের ভোলা কুকুরটার একটা ফোটো নিয়ে, তাদের পাঠিয়ে দে। খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, আমার চেহারা দেশ বিদেশে পাঠাব! এরি করেই তো সর্ব্ব মাথা বিগ্‌ড়িয়ে দ্যায়—ও সবে আমার কাজ নেই।" আত্মপ্রচারের স্পৃহা তাঁহার ছিল না।

প্রাদেশিকতা (Provincialism) আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের বিশেষ অন্তরায়

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্যর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্য এম, এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাতে এম, এ পাস করিতে হইলে এক সঙ্গে দুটী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। স্যর আশুতোষ মনে করিতেন, কোন এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে, পরস্পরের সাহিত্যও ভাবের আদান প্রদানে ক্রমশঃ এক ভারতীয় মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিবে। বহু পূর্ব্ব হইতেই অশ্বিনীকুমারেরে এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বহু প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দি উড়িয়া, মারাঠী গুরমুখী প্রভৃতি বেশ জানিতেন। ইহা ছাড়া ইংরাজি সংস্কৃত ও ফার্শী ভাষায় তাঁহার গভীর অভিনিবেশ ছিল। যখন যে প্রদেশে যাইতেন, সেই প্রদেশের ভাষা অতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করিয়া, সেই দেশের সাহিত্য ও সাধনাকে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য নানাদেশে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সকল জুটিয়াছিল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আমাদের এই প্রাদেশিকতা দুষ্ট দেশে তিনি খাঁটি Inter-provincial ব্যাক্তিছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি নরমপন্থী বা অত্যধিক চরমপন্থী ছিলেন না। যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ—রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। আবেদন নিবেদনে তাঁহার বিশ্বাস বেশী ছিল মনে হয় না। তিনি সত্য প্রেম পবিত্রতার দ্বারা তাঁহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া, তাহারই উপর জাতীয়জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। এবিষয়ে একমাত্র মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে। তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু ভগবদ্কৃপাতে ততোধিক আস্থাবান্ ছিলেন। একবার বলিলেন—"দ্যাখ্ আমি সুরেন বাবুকে (বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়) একথা বলেছিলাম, দেখুন মহাশয়, শুধু আমাদের চীৎকারে বা agitation-এ কিছু হবে না ;—ভগবানকে ভুললে চল্‌বে না ; তাঁর চরণেও দেশের দুর্দ্দিনে বিশেষ ক'রে প্রার্থনা করা উচিত, তাও ক'রবেন। সুরেন বাবু ব'ললেন "হ্যাঁ ঠিক বলেছেন—করা উচিত, আর আমিও তা করি"।

অশ্বিনীকুমার একাধারে শিক্ষক, সাহিত্যিক, দেশ সেবক ও দেশনায়ক ছিলেন ; কিন্তু একমাত্র ভগবদ্‌-ভক্তিই তাঁহার সকল কর্ম্মের উৎস ছিল। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সনাতনী হিন্দুই ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্টত্বে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল। তিনি বসু মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি ব'লতেন যত বড় প্রকাণ্ড সাহেবই আসুক না, আমাদের রান্নাঘরের বাইরে তাকে থাক্‌তে হবে। আমরা পরাধীনই হই, আর যাই হই, ধর্ম্মেতে আমরা কারও নীচে নই।" আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহার জীবন চিরদিন ভক্তিতে সরস ছিল। সমাজ সংস্কার বিষয়ে লর্ড সিংহের ভাষায় the rude manipulation of hallowed tradition তিনি ভাল বাসিতেন না। সমাজ-দেহ

মাতৃদেহ, সমাজ দেহের ব্যাধির চিকিৎসা অতি সাবধানতার সহিত করিতে হইবে। ইহাকে অযথা আঘাত করিলে ব্যাধির প্রতিকার না হইয়া অশুভ ফলই হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয় আজকাল সমাজসংস্কারক অত্যাগ্রহের দল এবং চিন্তাপরায়ণ রক্ষণশীল দলের মতের অনৈক্য খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়েই স্বীকার করেন, সমাজদেহ একটী অচেতন যন্ত্র নহে, যাহার অংশগুলি যথেচ্ছ বিভিন্ন করিয়া আবার জোড়া লাগান যাইতে পারে। সমাজ দেহ অন্যান্য জীবদেহের মত, ইহা আপনার ভিতরকার শক্তিতেই গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করেন, যে, জীবদেহেও কখনও কখনও এমন ব্যাধি উপস্থিত হয়, যখন অস্ত্রচিকিৎসক ডাকাইয়া অবিলম্বে major operation না করিলে দেহ বিনষ্ট হয়। তবে ব্যক্তিগত দেহে কখন major operation করা উচিত, ইহা লইয়া যেমন ডাক্তারদের মতভেদ হয়, সমাজ সংস্কারেও রক্ষণশীল দলের ভিতর সেইরূপ সমাজ দেহের ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে মত ভেদ হইলে, তাহাতে কোন পক্ষেরই অসহিষ্ণু না হইয়া বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহাকে দেখিতে চেষ্টাকরা উচিত। এবিষয় আমাদিগকে সনাতন দেশাচার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব মিলাইয়া দেখিতে হইবে। একাজ অতি কঠিন, ইহাতে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সহিত হৃদয়ের প্রসারতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন।

অশ্বিনী বাবু আনন্দবাদী ছিলেন। তিনি পাপবোধ, অনুতাপ, ক্রন্দন এসব লইয়া বিশেষ বাড়াবাড়ি ভালবাসিতেন না। বলিতেন,—"এত দুঃখ কিসের? তোরা এমন কি পাপ করেছিস্, যে তাই নিয়ে কান্না জুড়ে দিবি? এ আনন্দময়ের রাজ্য, তোরা আনন্দ কর।" এ বিষয়ে বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি আনন্দবদীদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদয়ের যোগছিল। হরিনাম গানে, হরি-রস-পানে ইহাঁরা বিভোর হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। ইহাঁরা মুখ গম্ভীর করিয়া, ভস্মমাখিয়া, মৌনী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। আনন্দ ময়ের রাজ্যে এত দুঃখ কষ্ট কোথা হইতে আসে, আনন্দ ময়ের হৃদয়ে দুঃখ কষ্টের স্থান আছে কিনা, ইহা লইয়া তো অনেক বাদ বিতণ্ডা চলিয়াছে। যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনিই দুঃখময় ভগবান্ কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে?

মানুষের অবয়ব ঈশ্বরে আরোপ করিলে তাহাকে বলা হয় anthropomorphism —এই anthro pomorphism যথা সম্ভব পরিত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু মানব জীবনে ধর্ম্মের স্থান স্বীকার করিতে হইলে, anthro pomorphism ত একেবারেই বর্জ্জন করা যায় না। ঈশ্বরের মনকে যদি মানব মনের অনুরূপ খানিকটা ভাবা না যায়, তবেতো অজ্ঞেয়বাদ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমরা যাহাকে প্রেম, পবিত্রতা, করুণা প্রভৃতি বলিয়া জানি, ঈশ্বরের ভিতর যদি ঐরূপ কিছু না থাকে, তবে উচ্চ ধর্ম্মের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই প্রেম ও করুণার ভিতর, শুধু আনন্দই নহে, দুঃখের ভাবও আছে। মাতা আপনার একমাত্র সন্তানকে বিপথগামী দেখিয়া হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করেন, ভগবদ্ হৃদয়ে সেরূপ দুঃখের স্থানে আছে কি? প্রেম এবং করুণার অর্থ একেবারে বদলাইয়া দিলে, এগুলিকে দুঃখ বিরহিত মনে করা যায়, কিন্তু মানবের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী

ভগবৎ অভিজ্ঞতা কল্পনা করিলে, যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনিই দুঃখময় ভগবান্, Suffering God, ইহাই বলিতে হয়। তাই যুগে যুগে ধার্ম্মিকের মুখে হাসি, চক্ষে অশ্রুজল"। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে, এ ক্ষেত্রে মানবের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাষা অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার শিশুর প্রয়াস মাত্র।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে অশ্বিনী কুমারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অশ্বিনীবাবুর নিকটই শুনিয়াছি, রাজনারায়ণ বসুর কতকগুলি প্রিয়ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, সেগুলি তিনি এক জায়গায় রাখিতেন এবং শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নামানুসারে তিনি পুস্তকগুলিকে 'গ্রন্থ সাহেব' বলিতেন। অশ্বিনী বাবুকে দেখিয়াছি, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি আপনার প্রিয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে এক জায়গায় বান্ধিয়া রাখিতেন। এক রবিবার প্রভাতে ঐ গ্রন্থগুলি বগলে করিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিতে বলিতে, ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, অজ্ঞাত কারাবাসে চলিয়া গেলেন। বিধাতার কৃপায় কয়েক মাস পর যখন লক্ষ্ণৌ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সঙ্গে রাশীকৃত পুস্তক লইয়া আসিলেন। তখন 'জ্ঞানযোগ' নামক গ্রন্থ লিখিবার জন্য তিনি বিশেষ অধ্যয়নে এবং চিন্তনে নিযুক্ত ছিলেন। পুস্তকগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, জেলে অধিকাংশ পুস্তক অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। এগুলির বেশীর ভাগ নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। তিনি কয়েক মাস কারাবাসে থাকিয়া যত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, গৃহে বসিয়া সেই সময়ে তাহার অর্দ্ধেক পুস্তক অধ্যয়ন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কারাবাসে কিরূপ দিন কাটাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে হাসিয়া বলিতেন—"সেখানে ভালই ছিলাম, লেখা পড়ার একটু সুবিধা হয়েছিল, আর যে সব কয়েদী আমার সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের সঙ্গে হরিনাম করেও সুখী হয়েছি। আমি জেল থেকে বাহির হবার সময় দেখলাম বেচারীদের আমার সঙ্গ ছাড়তে বড় কষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ অশ্রুজল সম্বরণ ক'রতে পারলে না: কেউ বা জিজ্ঞাসা ক'রলে, বাবু আপনি আবার কবে ফিরে আসবেন? তাদের কথা মনে হ'লে এখনও বড় কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় আর একবার লক্ষ্ণৌ জেলে গিয়ে তাদের দেখে আসি।"

কি স্বগৃহে, কি কারাগারে, সুখে, কি দুঃখে এই প্রেমই অশ্বিনী কুমারের মূলমন্ত্র ছিল। প্রেমেতেই যে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি, এ দেহের অবসানে আজ আনন্দ লোকে তাহার পুনরুত্থান হইয়াছে।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ

অশ্বিনীকুমার দত্তের বিশিষ্টতা *

আগেই একটু ভূমিকা ক'রতে হ'ল। কারণ বড় কোন সভায় উঠে কিছু বলা আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ। এসেছি নিজের শ্রদ্ধার প্রেরণায়, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে হচ্চে নিতান্তই অনুরোধে পড়ে'। ব'লবার কথা আমার মাত্র দুইটি। সংক্ষেপে তাই বলে কর্ত্তব্য শেষ ক'রব।

প্রথম কথা, আজ যাঁর মৃত্যু দিনের স্মৃতি রক্ষা ক'রতে সকলে এখানে সম্মিলিত হয়েছি, তিনি আমার স্বদেশী সাধু, দেশভক্ত পুরুষ। কেবল বঙ্গের বা ভারতের বলে' নয়, আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে, নিকটতর ভাবে, তিনি আমার স্বদেশী ছিলেন। কারণ তাঁহার মত আমিও বাখরগঞ্জের লোক। তিনি যে জেলায় জন্মে ছিলেন আমিও সেইখানেই জন্মে ছিলাম, সেই সেখানকার মাটী জল হাওয়ায় যদি আত্মীয়তা-সাধক কোন গুণ থাকে, তবে তাদের ভিতর দিয়ে আমরা নিকট আত্মীয়। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীত ছিল। আমি আমার কিশোর বয়সে আমার পিতার বৈঠকখানাতেই দূর হ'তে তাঁকে দেখ্‌তাম; কথাবার্ত্তা ব'লবার উপলক্ষ তখন ঘটেনি। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক তাঁর হ'ত। তাঁর দুই এক বিষয়ে একটু বিশিষ্টতা ছিল, তখন সেটা একটু অদ্ভুতত্ব বলেই মনে হ'ত। সে কথা আর একটু পরে বল্‌ব।

তিনি যখন ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন, বরিশালের ছেলেদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে তাদের অনেকের জীবনে আপনার প্রীতি পবিত্রতা ও শুভ ইচ্ছার ধারা যেন ঢেলে দিতে লাগলেন, তাঁর তখনকার সেই আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা অনেক শুনেছি, তাঁর প্রতি কোন কোন ছাত্রের ভক্তির মধ্যে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু বরিশালে থেকে তা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। তিনি যখন বৃদ্ধ এবং আমি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত, তখন একবার তাঁর একখানি আশীর্ব্বাদ পত্র পেয়েছিলাম। এটা একটা সৌভাগ্যের কথা মনে করি।

আজ এখানে এসেছি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিতে, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে, আর তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে কল্যাণ ফুলে ফলে শোভা পেয়েছিল, তারই বীজ সংগ্রহ ক'রতে। স্মৃতির ভিতর দিয়ে বর্ষে বর্ষে নূতন বক্তা শ্রোতা ও সম্মিলিত নবীন প্রবীণ সকলের চিত্ত ভূমিতে এই বীজ উপ্ত হয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করুক। আমাদের শ্রদ্ধা যেন কেবল বাগ্‌বহুলা ও নিষ্ফলা না হয়। চরিত্রে এবং কর্ম্মেই যেন আমরা তাঁর প্রতি এবং দেশের অপর সাধু পুরুষদের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি।

দুই বৎসর হ'ল তাঁর জীবনের কথা ব'লতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় বলেছেন—"অশ্বিনীকুমার বাল্য হইতেই সত্য প্রেম ও পবিত্রতা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন"। ইতিপূর্ব্বে যে বিশিষ্টতার কথা একটু উল্লেখ করেছি, সেই এই সত্য

* গত ৭ই নবেম্বর রামমোহন লাইব্রেরী অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি সভায় বিবৃত।

পরায়ণতা সম্বন্ধে। তিনি শিক্ষিত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হয়েও কতগুলি আচার মানতেন। কোন কোন জিনিষ খেতেন না, এবং সকলের বাড়ীতে খেতেন না; এই জন্য আমার পিতৃদেব তাঁকে অনেক সময় ঠাট্টা করতেন। তিনি তখন ব'লতেন—"খেয়ে যে বাড়ী গিয়ে বল্‌তে হবে খাইনি, সেই জন্যই খাইনা।" সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আজকালকার নীতি যেন একটু শিথিল—কেউ কেউ ব'লবেন—উদার। মুখ দিয়ে একটা কথা বা'র হলেই যে সেটা অলঙ্ঘনীয়, সম্যক্ বিচার না করে যা কিছু বলে ফেলেছি তা রক্ষা করতেই হবে, একথা সকলে মানেন না। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন, নিজের সত্য পালন করতে গিয়ে সীতাকে নির্ব্বাসন দিলেন; পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই মায়ের কথাটা অব্যর্থ ও পালনীয় বলে এক পত্নী বিবাহ করলেন—এসব যেমন এক দিকে আতিশয্য, তেমনি না ভেবে সহস্র কথা বলা, অঙ্গীকার ভাঙ্গবো ব'লে অঙ্গীকার করা, কথা থাকবে না জেনেও সে কথা বলা, আর একদিকের আতিশয্য। সে যুগের বিচার এ যুগে না করলেও চলে, কিন্তু সকল যুগেই দেখ্‌তে হয় যে, সত্য কথা বলতে গিয়ে, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা স্বীকার করতে গিয়ে, যাহা ন্যায়সঙ্গত বলে জানি তা কাজে করতে গিয়ে, নিজের লাভ ক্ষতিই হিসাব কচ্ছি, না সত্যের মর্য্যাদা রাখবার জন্য আর সব গণনা দূরে রাখ্‌ছি। এইখানেই সাধুতার ও মহত্ত্বের পরীক্ষা। ক্ষতি স্বীকার করে' সত্য পালন ক'রতে যে পারবে সে-ই সত্যপরায়ণ।

তরুণদের কাছে তাই এই দ্বিতীয় কথাটা বলতে চাই, যে, এই দেশভক্ত ধার্ম্মিকের প্রতি যদি সত্য শ্রদ্ধা থাকে, তাঁর মত সত্যপরায়ণতা ও সত্যবাদিতা, চরিত্রের পবিত্রতা ও প্রেম যদি আয়ত্ত হয়, নিজেদেরও বড় করতে পারবে, দেশকেও বড় ক'রবে।

অনেকের বিশ্বাস রাজনীতির চর্চ্চা ক'রতে গেলে মিথ্যাবাদিতা প্রতারণা একটু না একটু আসবেই। মহাত্মাজী কিন্তু একথা বলেন না, অশ্বিনী বাবুও এমন কথা মনে স্থান দেন নাই। বর্ত্তমান কালের দেশ-সেবকেরা যদি সত্যবাদী না হ'ন, বিপক্ষকে নিগৃহীত ও পরাস্ত করবার জন্য যদি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা জানবেন লোকে তাঁদের শ্রদ্ধা করবেনা, দেশের শুভকামী হয়েও তাঁরা দেশের অমঙ্গল করবেন। তারপর চরিত্র। শুদ্ধচরিত্র না হলে তাঁরা দেশের প্রকৃত নেতা, উপযুক্ত চালকও হ'তে পারবেন না। যে নিজের কুপ্রবৃত্তির দাস তার মুখে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বার্ত্তা কেমন শোনাবে? আর প্রেমের কথা বেশী কি ব'লব? যার প্রেম নাই, সে কি ক'রে দেশের কাজ ক'রবে? তার দেশচর্য্যা ফাঁকি, কেবল স্বার্থ সাধনের একটা কৌশল। তাই তরুণদের, প্রৌঢ়দের, আমাদের সকলেরই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী জপের মত প্রত্যহ জপের মন্ত্র হোক্ সত্য পবিত্রতা ও প্রেম, তবেই দেশের প্রকৃত সেবা হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাই যেন হয়।

শ্রীকামিনী রায়।

নারীবিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ

হায় ধর্ম্ম তোমারই বা একি অধর্ম্ম! তুমি কি কেবল পদদলিত হতভাগাদের সম্পত্তি হইয়া তাহাদেরই কবলে পড়িয়া থাকিবে? কোথাও যাহাদের স্থান নাই, তাহারাই ত বাঁচিতেই হউক, মরিতেই হউক, তোমার দুয়ারে আসিয়া থাকে। তোমাকে কি কেবল চিরটা কাল অধমতারণ হইয়াই রহিতে হইবে, আর জগতের জ্ঞানী, গুণী, ধনী মানীরা তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াই চলিবেন? ' উপনিষদে আছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", কিন্তু সংসারের ব্যবস্থায় যাহাকে পঙ্গু, রিক্ত, বঞ্চিত করা হয়, তাহাকেই সব পথ বন্ধ করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া শাসন ও উপদেশ চলে—"অধম, তোর কি হিতসাধন করা হইল চাহিয়া দেখ্ ও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর্। তুচ্ছ পার্থিব জিনিষের বালাই ঘুচাইয়া সকলের সার পদার্থই তোকে দেওয়া হইল।" সে হতভাগা এক দিকে তোমার হিমাচল ও পার্শ্বেই গভীর খাদ দেখিয়া বলে, "কর্ত্তার দয়া অপার!"

সর্ব্বদাই এই এক তামাসা দেখিতে পাওয়া যায়, যে আপনার জন্য মানুষ দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতার দাবী করিয়া থাকে সেটা স্বভাবতঃ মানুষের কাছে যতটা প্রত্যাশা করা যায়, তদপেক্ষা কমের কোঠাতেই গিয়া পড়ে। কিন্তু অপরের কাছে করে বড় বড় আদর্শ ও পরাকাষ্ঠার দাবী। এই ন্যায়বোধের অভাবেই অনেক ক্ষেত্রে মনের আদান প্রদান ও পরস্পরকে ঠিক রকম বোঝা অসম্ভব হয়। আরও এক কথা আছে, মানুষ যাহা ভালবাসে না, তাহা বুঝিতেও চায় না। অন্যায় করার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দুর্ব্বলতাবশতঃ না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া আমরা কতটা অন্যায় করিয়া থাকি? অন্যায়কে তেমন অন্যায় বলিয়া মনে বিশ্বাস না থাকার জন্যই কি বেশীর ভাগ অন্যায় ও পাপ ঘটিয়া থাকে না?

হায়! হায়! মেয়েরা এতকাল ধরিয়া পাথর ভাঙ্গিয়া, মাটি, ইট বহিয়া, কলে কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে কাহারও মনে নারীত্বের কমনীয়তার আদর্শে আঁচড়টী লাগিল না। ধানভানা, জলতোলা, বাসনমাজা, মলমূত্রমার্জ্জনাদি সহস্রপ্রকারের কাজগুলি ত গৃহকর্ম্ম-সংজ্ঞা লাভ করিয়া মেয়েদের দেহ, আত্মা বলিয়াই গণিত, কাজেই উহার সৌকুমার্য্য, ও পেলবতা সম্বন্ধেও কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু মনশ্চর্য্যায় নারীর অধিকার চাহিবা-মাত্র সকলে উহার সহিত "নারীত্বে"রই বিলোপাতঙ্কে হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া উঠেন!

স্বামী একটী আইডিয়া বটে। কিন্তু সেই আইডিয়াটির পিছনে শাসনের বিষম বস্তুতন্ত্র-মূলক অতলস্পর্শও হাঁ করিয়া আছে। গলার ফাঁসই হউক, ছিঁড়িয়া জটা পাকাইয়া

থাকুক, বা তাহা শূন্যই হউক, ঐ আইডিয়ার দড়ি না ধরিয়া মেয়েদের ভবনদী পার হইবার জো নাই। চক্ষু মেলিয়া চাহিতে গেলেও ঐ অতলস্পর্শে জীবন্ত সমাধিলাভেরই ঘোরতর সম্ভাবনা। কাজেই ঐ idea নিছক idea মাত্রই নন্। idea হইলেই বা কি? দুইটী মানুষকে এক সম্বন্ধে বাঁধিয়া একজনের গলায় শিকল দিয়া idealএর পর্ব্বত চাপান হইল। অপরের পক্ষে সেটা খোস্‌খেয়াল মাত্রই থাকিয়া গেল। ইহা কেমন ideal? ন্যায় ও সত্যের বিরোধী idealএর মূল্যই বা কি?

একজনের idealএর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া দেখেন বলিয়া স্বামীর মনেও স্ত্রীর সম্বন্ধে যে ভালবাসা আসিতে পারে তাহাই কি যথেষ্ট? ঐ ভাব হইতে আত্মম্ভরিতার বৃদ্ধি হইয়া নিজে দেবদানব যাহাই হউক, পদানত ভক্তের আত্ম-বিলোপ ও পরিচর্য্যাই আপনার সম্পূর্ণ ন্যায্যপ্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া, তাহা তুষ্ট বা রুষ্টভাবে গ্রহণ করিতেই যে সাধারণতঃ দেখা যায় তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল।

নিস্তার নারীর কিছুতেই নাই। জন্মাবধি তাহাকে শরীরে মনে কোনদিকেই বাড়িতে না দিয়া, পাখী পড়াইয়া, খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়। তাহার বাহিরেও চারিদিকে এমনি করিয়াই পাতাল প্রস্তুত থাকে, যে একটু পাখা ঝট্‌পট্ করিলেও ঐ পাতালেই গতিলাভ ঘটে। যুগযুগান্ত এই ভাবে থাকিয়াও যখন সে তাহার মধ্যেই সহজ হইয়া যায়, তখন আবার উহাই নারীর পরম স্বাভাবিক ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মাতৃত্বের চাপ ছাড়াও তাহার স্নেহ-প্রবণতার জন্যও হয়ত নারীকে এত বাঁধা গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে বন্ধনের বন্ধনত্ব ত আর একটুকুও কমে না। তারপর নারীর মধ্যে প্রেম থাকিলেও দাসত্বের দুঃসহ অপমানে ধর্ম্ম ও প্রেমই মাত্র যে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষার অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি স্বাভাবিক না সঙ্গত? স্বাভাবিক নয় বলিয়াই তাহা আটকাইবার জন্য এত অসহজ বিধি, নিষেধ, শাসন, অনুষ্ঠানের বিপুলতা।

নরনারীর সম্বন্ধই হউক, আর ব্রাহ্মণ শূদ্রের ব্যবস্থাই হউক, সবের মধ্যেই অনেক সদ্ভাব ত পাওয়া যাইবেই। মানুষের জ্ঞান যখন যে পর্য্যন্ত খুলিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যাহা ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিল, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্মের মধ্যেও তাহাই স্থান পাইয়াছিল। তারপর কালের আভিজাত্য লাভে, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্মভাব সকলের মধ্য দিয়াই এতদিনের এতকালের শ্রদ্ধাপ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া উহা কত বিচিত্র সদ্ভাবের আধার হইয়া উঠিয়াছে। তবুও তাহার মূল দূষিত। এবং যত সদ্ভাবের মধ্যেই সৃষ্টি, পুষ্টি হইয়া থাকুক না, প্রণেতা ও পরিচাল-কেরা যদি ব্রাহ্মণ বা পুরুষ না হইতেন তাহাহইলে উহা জন্মলাভ করিতেই পারিত না। যতই জ্ঞানী, গুণী হউন না কেন, এক শ্রেণীর প্রবল পক্ষ মূক ও দুর্ব্বলের অখণ্ড কর্ত্তৃত্বের ভার লইলে যাহা হইয়া থাকে, এসব স্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে। কেবল একপক্ষই সর্ব্বময় হইলে ন্যায়ের

তুলাদণ্ডের ভারসাম্য যে থাকিতেই পারে না, তাহা এখন মানুষ বুঝিতেছে। নিজের দিকটাই লোকে দেখিতে পায়। অপরদিকে সমান ভাবে আলো আসিবার সুযোগ না থাকিলে সে দিকটি কমবেশী অন্ধকার ও অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবেই যাইবে। তারপর শুভকাজ করিবারও অনেক উপায় আছে। অনেক শুভকাজ আমরা অন্যদিকে বা অন্যের প্রতি অন্যায় হইতে পারে বলিয়া করিতে পারি না। আর অন্য পক্ষের দিক যদি নাই দেখি, কাজ শুভ হইলেও তাহার শুভত্বই বা থাকে কতটুকু? আদর্শের মোহে বস্তুগতবিষয়ে ন্যায়দৃষ্টি সজাগ না রাখিতে পারিলে তাহা সত্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষের মন যে ঘরে স্বস্তি পায় না, তাহার কারণ ঘরে সে সর্ব্বময় প্রভুত্ব করিতে পারে, সর্ব্বত্র হস্তক্ষেপ ও দৌরাত্ম্য করিতে পারে কিন্তু সেখানে তাহার কাজ ও কর্ত্তব্য নাই। গৃহ ও নারীসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই এই কর্ত্তব্য ও মহত্ত্বাবের প্রেরণার অভাবেই পুরুষের পক্ষে উহা এত অবহেলার বস্তু ও অবনতিকর হইয়াছে। এই জন্যই ঘরও তাহার পক্ষে বন্ধন! আর নারীরও বন্ধন—ইহাতেই তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া। কিন্তু ঘর ও বাহির নরনারী উভয়েরই। স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ও তাহার প্রয়োগের আবশ্যকতাও উভয়েরই আছে। পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের প্রয়োজনীয়তাও কাহারও এতটুকু কম নয়। তাই পুরুষেরও এখন ঘরের ও প্রেমের দায়িত্ব গ্রহণ এবং নারীরও জ্ঞানকর্ম্মজগতে স্থানগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন দুই দিকের আতিশয্যের ঠেলায় যে ভারসাম্য অগত্যা রহিয়া যাইতেছিল, বিচারবুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্যেই এখন তাহা সাধিত করিবার প্রয়াস হইতেছে।

বঙ্গনারী

আনন্দ।

আনন্দ গোতম বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য এবং অনুচর ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে ইঁহার স্থান অতি উচ্চ। আমরা অদ্য এই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

শুদ্ধোদনের এক ভ্রাতার নাম শুক্লোদন; আনন্দ এই শুক্লোদনের পুত্র। সুতরাং আনন্দ গোতমের পিতৃব্যপুত্র। ইনি গৌতমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর গোতম ৪৫ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম ২০ বৎসর ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট অনুচর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষু ইঁহার পরিচর্য্যা করিত।

যখন গোতমের বয়স ৫৫ বৎসর, তখন তিনি একদিন ভিক্ষুগণকে বলিলেন—"এতদিন নানা ভিক্ষু আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে। এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে। ভিক্ষুগণের

মধ্যে কি এমন কেহ নাই যে নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারে ? ”

সারিপুত্র বলিলেন “আমি ভগবানের অনুচর হইতে ইচ্ছা করি।” গোতম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইহার পরে প্রধান প্রধান শিষ্য সকলেই ঐ প্রকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। আনন্দ ঐ সময়ে নীরবে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, ‘আনন্দ, যাও, ভগবানের নিকট যাও, অনুচর হইবার জন্য প্রার্থনা কর। গৌতম বলিলেন, “না, না, ও ভাবে তোমরা আনন্দকে উত্তেজিত করিও না ; আনন্দ কি করিতে চাহে, তাহা আনন্দই ভাল জানে।’ তবুও ভিক্ষুগণ আনন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন আনন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—“ভগবান্ যদি আমার ৮টী প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবে আমি ভগবানের অনুচর হইব।

(১) ভগবান্ আমাকে সুন্দর বস্ত্র অর্পণ করিবেন না।

(২) লোকে ভগবান্‌কে যে খাদ্য অর্পণ করিবে, তাহার অংশ আমি গ্রহণ করিব না।

(৩) আমার জন্য স্বতন্ত্র কুটীর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

(৪) ভগবান্‌কে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সে নিমন্ত্রণে ভোজন করিব না।

(৫) আমি যে স্থলে নিমন্ত্রিত হইব, ভগবানও সেই স্থলে গমন করিবেন।

(৬) যাঁহারা ভগবানের দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইতে পারিব।

(৭) আমার যখন মন চঞ্চল হইবে, বা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিবে, তখন আমি ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব।

(৮) ভগবান পূর্ব্বে একবার যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তাহার পুনরুক্তি করিবেন।”

ভগবান বলিলেন—“আনন্দ, আমি তোমার এই আটটী প্রার্থনাই পূর্ণ করিব।” এই সময় হইতে আনন্দ ২৫ বৎসর ছায়ার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত অনুচরই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আনন্দ ছিলেন নিরীহ, নিঃস্বার্থ, কর্ম্মদক্ষ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতি মধুর।

কোমল প্রকৃতি।

মহাপরিনির্ব্বাণের কিছু দিন পূর্ব্বে আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া ‘কপি-শীর্ষ’ অবলম্বন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন—

“আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার অনেক করণীয় আছে, যিনি আমাকে অনুকম্পা করেন, যিনি আমার শিক্ষক, তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।”

আনন্দকে না দেখিয়া ভগবান্ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আনন্দ কোথায় ?’ তখন তাঁহারা সমুদায় ঘটনা বলিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ একজন ভিক্ষুকে আনন্দের নিকট

পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দ যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

বুদ্ধের প্রশংসাবাণী।

এই সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

হে আনন্দ, বহুকাল তুমি মৈত্রীপরিপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, অদ্বয় এবং অপরিমিত কার্য্য, বাক্য এবং চিন্তা দ্বারা তথাগতের সমীপে বাস করিয়াছ। তুমি কৃতপুণ্য হইয়াছ" মহাপরিঃ ৫।১৩।১৪।

ইহার পরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং মেধাবী। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য কখন ভিক্ষুগণের উপযুক্ত সময়, কখন ভিক্ষুনীগণের, এবং কখন উপাসক বা উপাসিকা, বা রাজা, বা রাজার প্রধান অমাত্য, বা অপর সম্প্রদায়ের নেতৃগণের, অপর সম্প্রদায়ের শ্রাবকগণের উপযুক্ত সময়, আনন্দ তাহা জানে।

হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটী আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণ। কোন্ চারিটী?

যদি ভিক্ষুগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়, যখন আনন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাহারা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হয়; আর যদি আনন্দ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তবে তাহারা অতৃপ্ত হয়।

এইরূপ যদি ভিক্ষুণীগণ.........উপাসকগণ.........উপাসিকাগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা আনন্দকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, আনন্দ যখন ধর্ম্মব্যাখ্যা করে, তাহা তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়, আর আনন্দ যখন তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! রাজচক্রবর্ত্তীর চারিটী আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ। যখন (১) ক্ষত্রিয়গণ (২) ব্রাহ্মণগণ (৩) গৃহপতিগণ বা (৪) শ্রমণগণ রাজচক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, তিনি যখন কথা বলেন, তখন তাহারা সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, এবং তিনি যখন তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! আনন্দেরও এই প্রকার চারিটী গুণ। মহাপঃ ৫।১৬

ভিক্ষুণী সম্প্রদায়।

আনন্দের কথা বলিতে হইলেই ভিক্ষুণী সম্প্রদায় সংগঠনের কথা বলিতে হয়। মহাপ্রজাবতী গোতমী গোতমের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন 'নারীগণকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দেওয়া হউক'। গৌতম তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। ইহার পরে একদিন মহাপ্রজাবতী কেশ ছিন্ন করাইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, বহু শাক্যনারীসহ গৌতমের বিশ্রামকাননে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদ স্ফীত

হইয়াছিল, গাত্র ধূলিপূর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল, এইভাবে তিনি বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন।

আয়ুষ্মান্ আনন্দ তাঁহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে গোতমি, তুমি কেন এই অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ?"

গোতমী বলিলেন—

"নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, ইহাতে ভগবান অনুমতি দেন নাই।"

আনন্দ বলিলেন—

'গোতমি! তুমি মুহূর্ত্তকাল এই স্থলে অপেক্ষা কর, আমি ভগবানকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর ভগবানকে বলিলেন—

মহাপ্রজাবতী গোতমী স্ফীতপদে ধূলিপূর্ণগাত্রে দুঃখিত, দুর্ম্মনা ও অশ্রুমুখী হইয়া বহির্ভাগে দ্বারকোষ্ঠপ্রান্তে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, কারণ ভগবান নারীগণকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেন নাই। এবিষয়ে ভগবান্ যদি অনুমতি দেন ভাল হয়।"

ভগবান্ বলিলেন—

"আনন্দ, এবিষয়ে তোমার অভিরুচি না হউক"।

আনন্দ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার ঐ প্রকার বলিলেন; কিন্তু ভগবান ঐ একই উত্তর দিলেন।

তখন আনন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন—"ভগবান্ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইহাদিগকে অনুমতি দিলেন না, আমি অন্য কারণে অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন—

"নারীগণ যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তবে তাঁহারা কি স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃতাগামি-ফল, অনাগামি ফল এবং অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিতে সমর্থ হন্ না?"

আনন্দ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার একটুকু ব্যাখ্যা অবশ্যক। বুদ্ধ সাধনমার্গকে স্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যিনি এই স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতাপন্ন; তাঁহার অবস্থার নাম "স্রোতাপত্তি"। সাধনের ইহাই প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থার সাধকের নাম "সকৃতাগামী"; সকৃতাগামী সাধককে পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থার সাধকের নাম 'অনাগামী'; ইঁহাকে আর পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না। যিনি চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার নাম অর্হৎ'। ইনিই নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে তাঁহারা এই চারিটী অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন কি না, এবং এই চারি অবস্থার ফলপ্রাপ্ত হইবেন কিনা—ইহাই আনন্দের প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন—"আনন্দ, ইহারা এই সমুদায় ফল লাভ করিতে সমর্থ।"

তখন আনন্দ বলিলেন, "মাতৃজাতি যখন এই প্রকার ফললাভে সমর্থ, এবং মহাপ্রজাবতী গোতমী যখন ভগবানের মাতৃস্বসা এবং জননীর মৃত্যুর পরে যখন তিনি ভগবান্‌কে পালন করিয়াছিলেন এবং স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া ছিলেন; তখন মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দিলে ভাল হয়।"

আনন্দের অনুরোধ যে কেবল যুক্তিপূর্ণ তাহা নহে, ইহা হৃদয়স্পর্শী। ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—"আনন্দ! মহাপ্রজাবতী গোতমী যদি আটটী 'গুরুধর্ম্ম' প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে উপসম্পদা (অর্থাৎ দীক্ষা) দিতে পারি।"

ইহার পরে আনন্দ মহাপ্রজাবতীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"এই আটটী প্রধান নিয়ম প্রতিপালন করিতে আমি প্রস্তুত।" ইহার পর তাঁহাকে ভিক্ষুণীরূপে গ্রহণ করা হইল। মহাপ্রজাবতীই প্রথম ভিক্ষুণী। এইরূপে ভিক্ষুণী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। (বিনয় পিটক, চুল্লবগ্গ ১০, অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-২৭৯)

নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন প্রকৃষ্ট উপায় কিনা এবং নারীগণের এই প্রব্রজ্যা অবলম্বন উচিত কিনা আমরা এসমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইতেছি না। তবে আনন্দ মনে করিতেন, 'প্রব্রজ্যা' আবশ্যক এবং প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলে নারীগণ যখন 'অর্হত্ব' লাভ করিতে পারে, তখন তাহাদিগকেও ঐ অধিকার দেওয়া আবশ্যক। আনন্দ সাহায্য না করিলে, মাতৃজাতি এই অধিকার পাইতেন কি না সন্দেহ।

আনন্দ ও উদেন

এক সময়ে আনন্দকে কৌশাম্বী নগরীতে গমন করিতে হইয়াছিল। সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উদেন রাজার অন্তঃপুরস্থ নারীগণ সেই স্থলে গমন করিলেন এবং আনন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহারা আনন্দকে ৫০০ খানা বস্ত্র প্রদান করিলেন।

রাজা এই বস্ত্র দানের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন "শ্রমণ আনন্দ এত বস্ত্র লইয়া কি করিবে? বস্ত্র লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইবে, না, বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিবে?"

ইহার পরে তিনি নিজেই আনন্দের নিকটে গমন করিয়া নারীগণের আগমনের কথা উত্থাপন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহারা কি কিছু উপহার দিয়াছেন?" আনন্দ বলিলেন, তাঁহারা ৫০০ বহির্ব্বাস দান করিয়াছেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি ৫০০ বহির্ব্বাস দ্বারা কি করিবেন?" আনন্দ বলিলেন—"মহারাজ, যে সমুদায় ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব?"

রাজা। পুরাতন জীর্ণ চীবর দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। এ সমুদয় দ্বারা উত্তরাস্তরণ (সম্ভবতঃ বালিশের ওয়াড়) করিব।

রাজা! পুরাতন উত্তরাস্তরণ দ্বারা কি করিবেন ?

আনন্দ। বালিশের খোল করিব।

রাজা। পুরাতন বালিশের খোল দ্বারা কি করিবেন ?

আনন্দ। ভূমির আস্তরণ করিব।

রাজা। পুরাতন ভূমির আস্তরণ দ্বারা কি করিবেন ?

আনন্দ। পাদপুঞ্ছনী (অর্থাৎ পা পুছিবার কাপড়) করিব।

রাজা। পুরাতন পাদপুঞ্ছনী দ্বারা কি করিবেন ?

আনন্দ। রজোহরণ (অর্থাৎ ঝাড়ন) করিব।

রাজা। পুরাতন রজোহরণ দ্বারা কি করিবেন ?

আনন্দ। পুরাতন রজোহরণ কর্ত্তন করিয়া সেই সমুদায়কে মৃত্তিকার সহিত মর্দ্দন করিব এবং তাহা দ্বারা প্রাঙ্গন লেপন করিব।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সমুদয় বস্তুরই সদ্ব্যবহার করেন, কোন বস্তুরই অপচয় করেন না"।

ইহার পরে তিনি আনন্দকে আরও ৫০০ খানা বস্ত্র প্রদান করিলেন।

আনন্দ ও ভিক্ষুসঙ্ঘ।

বুদ্ধ মহাকশ্যপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে ভিক্ষুগণ তাঁহাকেই নেতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তাঁহার উপদেশসমূহ মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পরে সকলেরই মনে হইল যে তাঁহার উপদেশসমূহ সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং সংগ্রহ করিয়া সম্মিলিত ভাবে সেই সমুদয় কীর্ত্তন করাও আবশ্যক। ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে এই কার্য্যের জন্য ভিক্ষু নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ৪৯৯ জন নির্ব্বাচিত হইল। কিন্তু তিনি আনন্দকে নির্ব্বাচন করিলেন না। ইহা দেখিয়া ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে বলিলেন :—

"আয়ুষ্মান্ আনন্দ এখনও অর্হত্ব লাভ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি আসক্তি দ্বেষ মোহ, বা ভয় বশতঃ বিপথে গমন করিতে পারেন না এবং তিনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্ম ও বিনয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আয়ুষ্মান্ আনন্দকেও নির্ব্বাচন করা হউক"।

তখন মহাকশ্যপ আনন্দকেও নির্ব্বাচন করিলেন।

এই সময়ে বুদ্ধের উপদেশকে দুইভাগে ভাগ করা হইত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীর বিশেষ আচার ব্যবহারের জন্য যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম, তাহাকেই 'বিনয়' নাম দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতামত এবং ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার জন্য যে উপদেশ, তাহার নাম "ধর্ম্ম"।

উপালি 'বিনয়' বিষয়ে এবং আনন্দ 'ধর্ম্ম' বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ

ছিলেন। এই জন্য ইহাদিগকেই প্রশ্ন করিয়া ঐ ঐ বিষয়ে বুদ্ধের মতামত স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

আনন্দকে নিগ্রহ।

এই সময়ে মহাকশ্যপপ্রমুখ ভিক্ষুগণ আনন্দকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। যে যে বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহা এই—

মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন—সঙ্ঘ যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র নিয়মসমূহ বর্জ্জন করিতে পারিবে। কোন্ কোন্ বিধি ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র আনন্দ তাহা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। এখন মহাকশ্যপপ্রমুখ ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন—

"আবুষ আনন্দ! তুমি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা কর নাই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধি কি—। তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ—তুমি অপরাধ স্বীকার কর"।

ইহাতে আনন্দ বলিলেন, ভুলক্রমে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে—আমি ইহা মনে করি না। তবে আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি, এইজন্য আপনাদিগের কথাতেই বলিতেছি আমার অপরাধ হইয়াছে।

অপরাপর অভিযোগ এই :—

এক সময়ে আনন্দ বুদ্ধের জন্য বর্ষাকালের বস্ত্র সেলাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সেলাই করিবার সময় কাপড়ের এক ধার পায়ের নীচে রাখিয়া সেলাই করিতে হইয়াছিল। এই তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ।

বুদ্ধের মৃত্যুর পরে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের দেহ দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই তৃতীয় অপরাধ।

এক সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন যে সিদ্ধপুরুষগণ এবং তথাগত যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এক কল্প এই পৃথিবীতেই থাকিতে পারেন। এ সময়ে আনন্দ প্রার্থনা করেন নাই যে "ভগবান্ দেব-মানবের হিতাকাঙ্খায় এককল্প জীবন ধারণ করুন।" কিন্তু মৃত্যুর তিনমাস পূর্ব্বে আনন্দ তিনবার তাঁহার নিকট ঐ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অবশ্যই এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। প্রত্যুত বলিয়াছিলেন—"প্রথমে আমি যখন ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম তখন যদি প্রার্থনা করিতে, তথাগত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন—যথা সময়ে ঐ প্রকার প্রার্থনা করা উচিত ছিল, তুমি তাহা কর নাই। ইহা আনন্দের চতুর্থ অপরাধ।

আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধদেব মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের মতে আনন্দের পক্ষে এইপ্রকার অনুরোধ করা অন্যায় হইয়াছিল। ইহা আনন্দের পঞ্চম অপরাধ।

এই সমুদায় ঘটনা এক একটী করিয়া উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিয়াছিলেন "তুমি অপরাধ করিয়াছ, অপরাধ স্বীকার কর"।

প্রত্যেক ঘটনার বিষয়েই আনন্দ এক একটী কারণ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি

ইহাতে কোন অপরাধ দেখিতেছি না। তবে আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি, এই জন্য আপনাদিগের কথাতে অপরাধ স্বীকার করিতেছি।"

আনন্দ ও মহাকশ্যপ।

গৌতমের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে মহাকশ্যপ ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অবশ্যই অনেক গুণ ছিল, গৌতম নিজেও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি আনন্দের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রীতিকর নহে। নিম্নে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১)

এক সময়ে মহাকশ্যপ জেওইনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্নে আনন্দ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত কশ্যপ! আসুন, ভিক্ষুদিগের এক আশ্রমে গমন করা যাউক।'

কশ্যপ বলিলেন—'আবুষ আনন্দ! তুমিই যাও, তোমার বহু কার্য্য, তোমার বহু করনীয়"।

আনন্দ দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন, তাহাতেও কশ্যপ ঐ উত্তরই দিলেন।

তৃতীয়বার অনুরোধ করিবার পর কশ্যপ আর আপত্তি করিলেন না। কশ্যপ অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দ তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কশ্যপ তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং তাহার পরে উভয়ই প্রস্থান করিলেন।

'থুল্লতিস্সা' নামিকা একজন ভিক্ষুনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কশ্যপ বিষয়ে এইপ্রকার সমালোচনা করিয়াছিলেন—"আর্য্য আনন্দ 'পণ্ডিত-মুনি'; তাঁহার সম্মুখে আর্য্য কশ্যপ ধর্ম্মোপদেশ দেন! সূচীবণিক সূচী বিক্রয় করেন সূচীকারকে!"

এই কথা কশ্যপের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আবুষ আনন্দ! আমি সূচীবণিক, তুমি সূচীকার; না, তুমি সূচীবণিক, আমি সূচীকার?"

আনন্দ বলিলেন—"ভদন্ত কশ্যপ! মাতৃজাতি অবোধ, ক্ষমা করুন"।

কিন্তু কশ্যপ ইহাতে শান্ত হইলেন না; বরং আনন্দের চরিত্র বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, আবুষ আনন্দ! সঙ্ঘ যেন তোমাকে লইয়া আর আলোচনা না করে।"

এস্থলে বলা যাইতে পারে আনন্দের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর কিংবা তদূর্দ্ধ।

ইহার পরে কশ্যপ নিজের গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিলেন—"আমার যে ছয়টী 'অভিজ্ঞা,' তাহা কি কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? হস্তীকে এক তালপত্র দ্বারা লুকান যায় না" (সংযুক্ত নিকায়, ১৬।১০, কশ্যপ সং)।

কশ্যপ যখন নেতা, তখন নিম্নলিখিত ঘটনাও ঘটিয়াছিল।

এক সময়ে আয়ুষ্মান্ আনন্দ মহা ভিক্ষু সঙ্ঘসহ দক্ষিণাগিরিতে বিচরণ করিতেছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার ৩০ জন অল্পবয়স্ক শিষ্য বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংসার পথে চলিয়া যায়। ইহার পরে আনন্দ একদিন মহাকশ্যপের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দকে দেখিয়া কশ্যপ বলিলেন—তুমি কেন এই নূতন ভিক্ষুদিগকে লইয়া বিচরণ কর? ইহারা জিতেন্দ্রিয় নহে, ইহাদের জীবন উদ্যমশীল নহে। আমার মনে হয়, তুমি শস্য-ঘাতী, তুমি কুলের উপহন্তা। তোমার নূতন শিষ্যগণ চলিয়া যাইতেছে, খসিয়া পড়িতেছে"।

ইহার পরে আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ বালকটা নিজের মাত্রা জানে না।"

ইহা শুনিয়া আনন্দ বলিলেন "ভদন্ত কশ্যপ। আমার মস্তক পলিত কেশ হইয়াছে; এ বয়সেও আয়ুষ্মান্ মহা কশ্যপ আমাকে 'বালক' বলিলেন। তবে ইহাতে আমার মনে ক্রোধ হইল না।"

ইহার পরে কশ্যপ আবার বলিলেন—"এ বালকটা নিজের মাত্রা জানে না।

কিন্তু 'থুল্ল-নন্দা' নামিকা এক ভিক্ষুনী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল—এবং এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিল—"আর্য্য মহা কশ্যপ ছিলেন পূর্ব্বে বিধর্ম্মী, আর আর্য্য আনন্দ "পণ্ডিত-মুনি'; ইহাকে তিনি বলেন বালক!"

এইকথা কশ্যপের শ্রুতিগোচর হইল। তখন তিনি আনন্দের নিকট থুল্ল-নন্দার সমালোচনা করিলেন এবং অতি বিস্তৃত ভাবে আত্মমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন—"আমার যে ছয় অভিজ্ঞা, তাহা কি কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? এক তালপত্র দ্বারা হস্তীকে লুকান যায় না" (সংযুক্ত নিকায়, ১৬।১১ কশ্যপ সং)।

আনন্দের উক্তি

থের গাথার একটী অধ্যায় আনন্দ-রচিত। আমরা নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

যে ব্যক্তি অল্পশ্রুত, সে বলীবর্দ্দের ন্যায় বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহার মাংস বর্দ্ধিত হয়, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হয় না। ১০২৫।

যে বহুশ্রুত ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অল্পশ্রুত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে,—আমার মনে সে প্রদীপধারী অন্ধের ন্যায়। ১০২৬।

২৫ বৎসর আমি শিক্ষার্থী রূপে রহিয়াছি, আমার প্রাণে কামনার উৎপত্তি হয় নাই। ধর্ম্মের সুধর্ম্মতা দেখ।১০৩৯।

২৫ বৎসর আমি শিক্ষার্থী রূপে রহিয়াছি, আমার প্রাণে দ্বেষের উৎপত্তি হয় নাই। ধর্ম্মের সুধর্ম্মতা দেখ।১০৪০।

২৫ বৎসর মৈত্রীপরিপূর্ণ কার্য্যসহ নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি। ১০৪১।

২৫ বৎসর মৈত্রীপরিপূর্ণ বাক্যসহ নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি। ১০৪২।

২৫ বৎসর মৈত্রীপূর্ণ মনের সহিত নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি। ১০৪৩।

বুদ্ধ যখন ইতস্ততঃ পাদচরণ করিতেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতাম। তিনি যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইত। ১০৪৪।

আমার এখনও অনেক করনীয় আছে, আমি এখনও শিক্ষার্থী ও অপ্রাপ্ত-মানস। যিনি আমাকে অনুকম্পা করিতেন, সেই শিক্ষক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। ১০৪৫।

মৃত্যুর পূর্ব্বে আনন্দ বলিতেছিল "শাস্ত্রীর (শিক্ষকের) পরিচর্য্যা করা হইয়াছে, বুদ্ধের শাসন প্রতিপালিত হইয়াছে, গুরুভার অবহিত হইয়াছে (অর্থাৎ কর্ত্তব্যভার সমান হইয়াছে), পুনর্ভব উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ১০৫০।

আনন্দের মৃত্যুর পর থের-গাথাতে 'আনন্দ' প্রকরণে এই অংশ সংযোজিত হইয়াছিল :—

"যিনি বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, মহর্ষির (অর্থাৎ বুদ্ধের) কোষরক্ষক, যিনি সমুদায় লোকের চক্ষু, সেই আনন্দ পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন"। ১০৪৭।

যিনি অন্ধকারে তমোনুদ, যিনি গতিমান্ (সাধুতার দিকে যাঁহার গতি), স্মৃতিমান্, ধৃতিমান্, সদ্ধর্ম্মধারক, যিনি রত্নাকর ঋষি, সেই থের আনন্দ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ১০৪৮, ১০৪৯।

ইহা অপেক্ষা মানুষ অধিক আর কি বলিতে পারে ?

এই ঋষির চরণে বার বার নমস্কার।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ঘোষ।

বেকার-সমস্যা

বাঙ্গলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, বিশেষ কিছুই আজ পর্য্যন্ত হয় নি। এইরূপ আলোচনা আমার সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ধনবৈজ্ঞানিক এইদিকে মনোযোগ দেবেন এইরূপ আশা রাখা বোধ হয় অন্যায় হবে না। কিন্তু এই বিষয়ে সাধারণের মধ্যে, এমন কি পণ্ডিত মহলেও, কতকগুলি বিশ্বাসের প্রচলন দেখা যায়। আমার উদ্দেশ্য এই সমস্ত বিশ্বাসের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করা।

এই সম্পর্কে প্রথম যে কথাটা মনে আসে, তা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। বেশীর ভাগ লোকের মত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সস্তায় লেখাপড়া শিখিয়ে ও বছরে

বিশহাজার ছেলেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়ে, আমাদের এই সর্ব্বনাশ সাধিত করেছে। আমাদের মনে আছে, আচার্য্য রায় একবার বেকার সমস্যায় ব্যথিতচিত্ত হয়ে বলেছিলেন, যে, তিনি একদিনের তরে রাজা হলেও দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংকে একেবারে চুরমার করে দেবেন। দিলে কার কি লাভ হ'ত তা জানি না, তবে বেকার সমস্যা যে মিটত না, একথা খুব নিঃসংশয়ে বলা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুপূর্ব্বে, লর্ড ক্লাইভের জন্মাবার আগেও, বাঙ্গলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনও কায়িকশ্রম বা ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করত না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য এরাই বোধ হয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এরা শত শত বৎসর লেখাপড়া, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য এই সব কাজ করেই নিজেদের পেট চালিয়ে আসছে। এই সব কাজের সুবিধা হবে বলেই এরা হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু আমরা ভাবি বিশ্ববিদ্যালয় এদের ভুলিয়ে এনে লেখাপড়া শিখিয়ে অমানুষ করে' দিচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্য এই, যখনই সংবাদ আসে কতকগুলি ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে, তখনই বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চীৎকার ও অভিযোগের আর অন্ত থাকে না। লেখাপড়ার দ্বারা অন্নসংস্থান করা আমাদের চিরাগত অভ্যাস। বৃটীশ শাসন বা বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য দায়ী নয়। এইটে পরিষ্কার করে মনে রাখা উচিত। এইটে মনে রাখিনা বলেই আমরা মতের ও কাজের মধ্যে এমন অদ্ভুত অসঙ্গতির পরিচয় দিই।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনই আমাদের মন ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যাঁরা ছোটবেলা থেকে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সবাইকে লেখাপড়ার দ্বারা অন্ন সংস্থান ক'রতে দেখে এসেছেন, তাঁরা বড় হয়ে নিজেদের সন্তানদেরও যে ওই পথই অবলম্বন করতে শেখাবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিক নয়, একরকম অবশ্যম্ভাবী বলাও চলে। প্রথা প্রবাদ ও অভ্যাস এইগুলিই বাস্তব জীবনকে চালিয়ে নেয়। এখানে যুক্তিবিচারের বড় একটা স্থান নাই। যাঁরা শিক্ষিত যুবকদের মাড়োয়ারীদের পথ অনুসরণ করতে দিব্য সুন্দরভাবে বক্তৃতা দেন, তাঁরা ভুলে যান যে সামাজিক ঐতিহ্য (social tradition) কি বিপুল প্রভাবশালী। আমি বলছি না যে তাঁরা উপদেশ দিয়ে অন্যায় করেন। কিন্তু একটা সমস্যাকে কৃত্রিম উপায়ে সরল করে' ফেললে বক্তৃতার পরীক্ষায় অনেক নম্বর মিলতে পারে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে শূন্য ছাড়া আর কিছুই অদৃষ্টে জুটবে না।

এইবার আর একটা ভুল বিশ্বাসের একটু আলোচনা করা যাক্। শোনা যায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিলাসিতা, 'বাবুয়ানাই' নাকি বেকার আগুনের অন্যতম ইন্ধন; কিন্তু বাবুয়ানার অর্থ কি, তা নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল দেখা যায়। বর্ত্তমান বৎসরে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার নব্যভারতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন—petty bourgeois mentality! সোশ্যালিজম্ আজকালকার ফ্যাশন; কাজেই এই প্রকাণ্ড কথাটিতে আমাদের একেবারে অভিভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সোশ্যা-লিজ্‌মসত্ত্বেও আমার বিশ্বাস, কায়িক শ্রমবিমুখতার সহিত বেকার সমস্যার সম্বন্ধ নিতান্ত

ক্ষীণ; আর একটু সাহস থাকলে হয়ত বলে ফেলতাম, কিছুমাত্র নেই। যে সব কাজে বহুল আয়ের সম্ভাবনা আছে, সেখানে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে ত মধ্যবিত্ত যুবককে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ দেখি না। কয়লার ও অন্যান্য খনিতে, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ও কারখানায়, জামশেদপুরে ও জামালপুরে শিক্ষানবিশ হওয়ার জন্য বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবকই সব চেয়ে অগ্রণী। গত দশবৎসরে যে কয়জন মাইন ম্যানেজারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী। মণিহারীর দোকান ও কাপড়ের দোকান খুলে জিনিষ বিক্রী করতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় একটুও কুণ্ঠিত নয়। এমন কি, ট্রামের কণ্ডাক্টার হওয়ার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্যও এখন বিরল নয়। এর পরেও যদি তাকে petty bourgeois mentality পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিই তা হলে একটু নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাকি? অবশ্য আমি জানি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লাঙ্গল ঠেলে না, বা মোট মাথায় করে বেড়ায় না। কিন্তু তার আসল কারণ শ্রমবিমুখতা নয়। কারণ প্রথমতঃ তার শারীরিক দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়তঃ এই সব কাজে যে আয় হবে তার চেয়ে স্কুলমাষ্টারি বা কেরাণীগিরির দ্বারা সে বেশী রোজগারের আশা রাখে। আজ যদি একজন সদাশয় সোশ্যালিষ্ট হঠাৎ রাজা হয়ে সমস্ত কুলিগিরির মাহিনা একশ টাকা করে নির্দ্দিষ্ট করে দিতেন, তা হ'লে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির কেরাণীরা যে সবচেয়ে আগে তাঁর নিকট আবেদনপত্র পাঠাত, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

বাবুয়ানার দ্বিতীয় অর্থ গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ (standard of living) কমিয়ে দেওয়া। সাধারণের বিশ্বাস গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ কমিয়ে দিলেই স্বল্প মাহিনায় জীবনযাত্রা অনেকটা সুখকর হয়ে উঠবে এবং বেকার সমস্যাও দূরীভূত হ'বে। প্রথম বিশ্বাসটি কতকটা ঠিক; সেই জন্য এর ভুলটা অবৈজ্ঞানিকের চোখে ধরা পড়ে না। একটু ভাল করে, এই কথাটার বিশ্লেষণ করা যাক্। ধনবিজ্ঞানে বলে প্রত্যেক আর্থিক শক্তির দুই রকম ফল আছে—আকস্মিক ও আবশৈষিক (immediate and long period)। standard of livingকে কমিয়ে দেওয়ার আকস্মিক ফল অর্থসচ্ছলতা এবং হয়ত অর্থ-সঞ্চয় একথা ঠিকই। কিন্তু এই সচ্ছলতার দরুণ বিবাহের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কাজের সংখ্যা যদি সমান থাকে এবং কাজের লোকের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তবে মাহিনার হার কমে যাবে। সুতরাং, ইহার শেষ বা আবশৈষিক ফল কম মাহিনা এবং হ্রাসপ্রাপ্ত standard of livingএর উপর আর একটা প্রবল চাপ। সুতরাং মঙ্গল কোথায়? আমাদের চাষীদের অবস্থার চিরস্থায়ী উন্নতির জন্য ধনবৈজ্ঞানিকেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন যে তাদের standard of living বাড়া দরকার; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমরা ঠিক উল্টো কথাই বলছি। এটা কি অযৌক্তিক নয়? দেশের কৃষিশ্রমজীবীরা কোনো উপায়ে বেঁচে থাকার মতও খেতে পাচ্ছে না। এতই শোচনীয় তাদের অবস্থা। তবুও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি বেশ রীতিমতই চলেছে। ফলে স্বল্প আয় স্বল্পতর হচ্ছে এবং মৃত্যুর হার ভয়ঙ্কর বেড়ে যাচ্ছে। বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আর একটু প্রীতি থাকলে এবং একটা অনমনীয়

standard of living থাকলে এরকম কখনই হতে পারত না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কি আমরা এই অবস্থায় দেখতে চাই? অবশ্য আমি এমন বলছি না যে অমিতব্যয়ী হয়ে খুব বেশী খরচ করলেই আমাদের আর্থিক উন্নতি হু হু করে বেড়ে যাবে। মিতব্যয়িতা সব সময়ে এবং সকলের পক্ষেই ভাল। কিন্তু জুতা জামা, টেবিল চেয়ার এবং পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের প্রতি প্রীতিই যদি বাবুয়ানা নামে অভিহিত হয়, তবে আমার বিশ্বাস মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি বাঁচে তবে এই বাবুয়ানাই তাকে বাঁচাবে।

এই ত গেল স্বল্প আয়ের সঙ্গে বাবুয়ানার সম্পর্ক। কিন্তু standard of living কমিয়ে দিলে বেকার সমস্যা যে কেমন করে দূর হবে তা বোঝা আরও শক্ত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি খালি গায়ে, খালি পায়ে, পাঁচ হাত কৌপীন প'রে, মাসিক সাত টাকা মাহিনার জন্য কৃষিজীবীদের সহিত প্রতিযোগিতা ক'রবে? কোনো উপায়ে বেঁচে থেকে সন্তান উৎপাদন করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের বর্ত্তমান আয়ের নীচের সীমা লঙ্ঘন ক'রে যেদিন অন্য শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা করতে যাবে, সেদিন তাদের অধঃপতনের সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন রকম সন্দেহ থাকবে না।

বেকার সমস্যার প্রতিকার হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে যে বাণিজ্যের আশ্রয় নিতে বলা হয়, এ যুক্তি অবশ্যই খুব সমীচীন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত সেই স্বাচ্ছন্দ্যের অনুরূপ অর্থ বাণিজ্য ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তিটা সত্য হলেও তা সাধারণতঃ এত অযুক্তি ও গালাগালিকে সঙ্গে নিয়ে আসে, যে শক্তি ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে নিজেদের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাই বেড়ে যাচ্ছে। যাকে তুলতে হবে অনবরত তার আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া, এ ধরণের হিতৈষিতা খুব বড় বড় লোকের মধ্যেও দেখা যায়। আমার দুর্ভাগ্য আমি এটা ঠিক বুঝতে পারি না। স্পষ্ট কথা বলার লোভ সামলান বড় শক্ত ব্যাপার—এর প্রমাণ আমাদের বাঙ্গলাদেশে খুবই সুলভ।

বাণিজ্যের আশ্রয় নিতে হবে, এ ত সোজা কথা, সবাই জানে। কিন্তু কেন পারছি না? কেমন করে পারব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, রেগে না উঠে আমাদের সমস্ত আভ্যন্তরিক ও পারিপার্শ্বিক বাধা ও দুর্ব্বলতাকে ধীরভাবে, সমবেদনার সহিত বিচার করতে হবে। এখন বাধা এই যে বাণিজ্যের আইডিয়াটাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক মনে স্থান পায় না। যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা সংস্কারবশতঃ (instinctively) ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে যান; তাঁদের একথা মনেই আসে না যে ছেলেদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে হবে। কাজেই বয়স হয়ে যখন কাজের সময় আসে অথচ কাজ পাই না, তখন রামমোহন লাইব্রেরীতে বা 'কলেজ স্কোয়ারে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা শুনলে আমাদের নিতান্ত ম্যাজিকের মত ঠেকে এবং বাড়ীতে এসে ভাবি যে আমরা বড়ই বোকা, আমাদের আর আশা নেই। অনিচ্ছা বা বুদ্ধির অভাবই এখানে বড় নয়; বড় আমাদের অজ্ঞতা ও অপরিচিত পথে পদার্পণ করার ভয়! নিঃসম্বল হয়ে কেমন ক'রে ব্যবসায় আরম্ভ করতে হয় এই আর্টটা মাড়োয়ারী অতি সহজে তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবার কাছ থেকে শেখে। আমরা যে আর্টটা শিখি তা হল ধরাধরি ক'রে কেমন ক'রে চাকরী যোগাড়

করতে হয়। মাড়োয়ারী যদি এখানে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসে ত কখনই পারবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে দরকার, রাষ্ট্র বা কোন প্রতিভাশালী লোকের নেতৃত্ব। শুধু ব্যবসা কর, ব্যবসা কর, এই কথারই পুনরুক্তি না ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ঠিক কেমন করে মূলধন যোগাড় করতে হবে, কোথায় ব'সে ঠিক কি কাজে হাত দিতে হবে, ঠিক কি উপায়ে ব্যবসায় আরম্ভ ক'রতে হবে, এই সমস্ত। নেতৃত্ব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ ও খবর না পেলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী হওয়া, নিতান্ত দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রথম শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রতিভা থাকলে যে কোন ব্যক্তিই ব্যবসায় জগতে অগ্রণী হতে পারে। কিন্তু এগুলি দুর্লভ জিনিষ। সাধারণের পক্ষে মূলধন ও ব্যবসায় জগতে আত্মীয়তা (Capital and connection) এই দুইটিই সাফল্যের প্রধান উপাদান। মাড়োয়ারীদের তা আছে বলেই তারা সফল হয়; আমাদের নেই বলেই আমরা হই না।

কলিকাতা সহরে খুচরা মণিহারী দোকান এবং কাপড়ের দোকান, পেট্রলের দোকান, চায়ের দোকান এবং ডাক্তারখানা গত দুই তিন বৎসরে প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে। নূতন ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ঘরভাড়া অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার দরুণ এবং গলাকাটা প্রতিযোগিতার জন্য এই সব ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক কেরাণীগিরি বা স্কুল মাষ্টারির মাহিনার চেয়েও ক'মে গেছে। এমনও দেখা যায় যে যে জায়গা থেকে একই ধরণের দুই তিন খানা দোকান উঠে গেছে, সেই জায়গায় আবার সেই ধরণেরই দোকান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যৎসামান্য মূলধন যে এমনি করে অপব্যয়িত হচ্ছে তা দেখলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এর একমাত্র কারণ অজ্ঞতা। তারা জানে না, বুঝতে পারে না যে কেমন করে কি ব্যবসা করলে লাভ হতে পারে। এর প্রতিকার তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, তাদের চালিয়ে নেওয়া। এ রকম কোন চেষ্টা হচ্ছে কি?

বাঙ্গলা দেশে শস্যের ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের চালানী ব্যবসায় এখন মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া। ধরা যাক এই ব্যবসাটীকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে আনতে হবে। তা হলে প্রথমে কি দরকার? দরকার এই ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনাদের অজ্ঞতা দূর করা। প্রত্যেক ব্যবসায়েরই অনেক মারপ্যাঁচ এবং নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। মাড়োয়ারীরা এ সমস্ত আয়ত্ত করেছে; এখানে হঠাৎ রাগের মাথায় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গেলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যে সময়টা আমরা মাড়োয়ারীদের গুণগানে অপব্যয় করি, সেই সময়টা যদি তাদের ব্যবসায়ের রীতিনীতি এবং ইতিহাসের বিস্তৃত অনুসন্ধানে নিযুক্ত করি, তা হলে সত্যকারের অনেক কাজ হতে পারে। দেশে অনেক বুদ্ধিমান্ ও বিশেষজ্ঞ ধনবৈজ্ঞানিক রয়েছেন; তাঁরা মাড়োয়ারী বাণিজ্যের প্রণালী ও ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করুন। তাতে যে আলো দেখতে পাব সেই আলোই আমাদের সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যাবে। অজ্ঞতা ও চিন্তাহীনতাই সব দিকে আমাদের পথ আগলিয়ে রয়েছে; অথচ আমরা জ্ঞানকে অপাংক্তেয় করে চতুর্দ্দিকে শুধু উত্তেজনারই সৃষ্টি করছি।

মনের গোলমেলে ভাব এবং অভিজ্ঞতার ও কার্য্যকরী দৃষ্টান্তের অভাবই আমাদের

বাণিজ্যের পথে সব চেয়ে অন্তরায়, এইটি আমি যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে বলতে চাই। রোগ এইখানে; যদি প্রতিকার ক'রতে হয় এরই প্রতিকার করতে হবে। সাহিত্য শিক্ষাকে গালাগালি দিয়ে কি হবে? শিল্পমূলক শিক্ষার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে মারামারি করে ফিরে আসে। বাবুয়ানার কথায় লাভ কি? টুইল শার্ট ও কলগজি ধুতির দাম এমন কিছু বেশী নয়। মাড়োয়ারী যদি হাঁটুর উপর কাপড় পরে ত বাঙ্গালীকে তার অনুসরণ করতে না বলে, তাকেই শেখান দরকার যে মানুষের মনুষ্যত্ব শুধু ব্যাণ্ডব্যালান্সেই প্রকাশ পায় না; তার একটা পরিচয় আকৃতি প্রকৃতির শোভনতায়। এদিকে একজন যুবক যখন হাজার দুই টাকা জোগাড় ক'রে সত্যসত্যই বাণিজ্যে ঢোকার জন্য আকুল হয়ে বেড়ায়, তখন মুনিরা সব মৌন হয়ে থাকেন। সে বেচারী হয়ত ডাইং ক্লিনিং'এর দোকান খুলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়। একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাকামীর অবস্থা কল্পনা ক'রলেই পার্থক্যটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সে তার পরিচিত বন্ধু ও স্বজনদের কাছ থেকে বাস্তব ব্যবসায় জগতের অজস্র নির্দ্দেশ পায়; ঠিক বুঝতে পারবে কোথায় গিয়ে কি ব্যবসায় আরম্ভ করতে হবে। সুতরাং তাকে পাগলের মত ডাইং ক্লিনিংএর দোকান খুলতে হয় না। এখানে দুর্ব্বলতা কি বাঙ্গালী যুবকের ধুতি চাদরে, না তার প্রাথমিক অজ্ঞতায়?

অবশ্য একথা ঠিক, ব্যবসায়ে পরিচালকের (enterpreneur) কাজ ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও সাহসের উপরই নির্ভর করে। এর এমন কিছু বাঁধাধরা নিয়ম নেই যে কারুর কাছ থেকে শিখে নিলেই হল। মিতব্যয়িতা, ধৈর্য্য, সদাজাগ্রত দৃষ্টি, এসমস্ত চরিত্রগত গুণ; শুধু শুনে শুনে আয়ত্ত করা যায় না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে এই সমস্ত গুণের অধিকারী নন, তাঁরা যে বাঁধা মাহিনার বাঁধা কাজেই থাকতে চান, তা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এখানে দুটি বিবেচনার বিষয় আছে। পরিচালকের যে সমস্ত গুণের কথা ধনবিজ্ঞানে লেখে, তার প্রভাব প্রধানতঃ বড় বড় ব্যবসায়েই পরিলক্ষিত হয়। এই সব ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনাও যেমন অসীম, ক্ষতির সম্ভাবনাও তেমনই অতল। কিন্তু আমরা যে সব ব্যবসায়ের কথা ভাবি তা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী বা ওয়েষ্টফ্যালিয়ান কোল ট্রাষ্টের মত নয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত ব্যবসায় দেখি, আমদানি রপ্তানি ও চালানী ব্যবসায়, মাড়োয়ারী দিল্লিওয়ালা যা করে, তাতে জুয়াখেলার প্রবৃত্তি না থাকলে লাভের অঙ্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যের নীচে নামে না। একটু প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই, স্থানের ও কালের একটু আন্দাজ থাকলেই এই সব ব্যবসায় বেশ চালান যায়। এই প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তব ব্যবসায় জগতের বিস্তৃত সংবাদ দেওয়ার জন্য যদি একটা সংঘ স্থাপিত হয় তবে চরিত্রজাত দোষ সত্ত্বেও অনেক কাজ হতে পারে।

এতক্ষণ আমি মূলধনের অভাবের কথা কিছু বলিনি এবং ধরে নিয়েছি যে যারা ব্যবসায়ে অগ্রসর হবে তারা একলা একলা ব্যক্তিগত ভাবেই যাবে। কিন্তু মূলধন আসবে কোথা থেকে? সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে খাওয়া পরার পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তা ত কন্যার বিবাহ দিতেই কুলায় না। নিতান্ত অল্প মূলধনে যে সমস্ত ব্যবসা চলে তা আর আমাদের প্রলুব্ধ করতে পারে না। আবার বেশী মূলধন জোগাড় করা কঠিন। এক্ষেত্রে একটা উপায়ের

কথা বলা হয়; তা হচ্ছে সমবায় ঋণসমিতি (Co-operative Credit Society) কিন্তু ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে পরস্পর অপরিচিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে সমবায় সমিতি চলে কিনা, তা খুব সন্দেহের বিষয়। প্রথম কথা এদের প্রত্যেকের ঋণবাধকতা (liability) নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তাতে টাকার বাজারে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। অসীম ও যৌথ ঋণবাধকতা না থাকলে ব্যবসায়ের মত অনিশ্চিত লাভের ক্ষেত্রে টাকা ধার দিতে বড় কেউ অগ্রসর হবে না। তার উপর উপযুক্ত জামিন বা বন্ধকী মালের অভাব, তারই বা প্রতিকার কি? সমবায় সমিতির মূল কথা হ'ল চরিত্রের সততাকে বাঁধা রেখে মূলধন জোগাড় করা। কিন্তু ব্যবসায়ে সততাই ত একমাত্র উপাদান নয়; বুদ্ধির তারতম্য ও আকস্মিকতা এ দুটিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। মূলধনের সঙ্গে এদের মৈত্রী স্থাপন করা যে কেমন করে চলতে পারে তা ভাববার বিষয়। যাই হোক্ আসল কথা, সমবায় কথাটা উচ্চারণ করা ছাড়া আর বড় কিছুই এক্ষেত্রে হয় নি। সমবায় সমিতির দ্বারা কেমন ক'রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলধন জোগাড় হ'তে পারে, তার একটা রীতিমত প্ল্যান আজ পর্য্যন্ত কেউ দেন নি। কবে তা আমরা পাব?

"গ্রামের দিকে ফের" এই ধরণের একটা কথাও বেকার সমস্যার সম্পর্কে খুবই শোনা যায়, কিন্তু ফিরে করব কি? চাষ করব? তবে চাষীরা খেতে পাচ্ছে না কেন? তার উত্তর সাধারণতঃ এই রকম দেওয়া হয় যে, তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ; তারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর কিছুই জানে না। শিক্ষিত যুবকেরা উন্নত প্রণালী অবলম্বন ক'রে চাষ করতে আরম্ভ করলে অনেক বেশী আয় করতে পারবেন; সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও অনেক শিক্ষা হবে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করতে গেলে যতটা জমী দরকার এবং মূলধন দরকার তা বেকারদের মধ্যে শতকরা একজনও জোগাড় করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক কৃষি বেশ একটু ভারিক্কি ব্যাপার। তার সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকলে আর সেটা এত সহজে কেউ ব্যবস্থা দিতেন না। আমার বিশ্বাস, গ্রামের দিকে ফের এই নীতিকথার মধ্যে অর্দ্ধেক হচ্চে বাবুভায়াদের বাবুয়ানার প্রতি আক্রমণ, আর অর্দ্ধেক হচ্চে চাষীদের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধার একটা পরোক্ষ পরিচয়। এর মধ্যে আর কিছু আছে কি না, তা আমার জানা নাই।

গ্রামে গিয়ে আর একটা কাজ করার কথা বলা হয়; তা হ'ল হস্তচালিত যন্ত্র বা কুটীরশিল্পের চর্চ্চা করা। এই দিকে অবশ্যই কিছু কাজ হ'তে পারে। কিন্তু এখানেও অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞতা একটা প্রকাণ্ড বাধা হয়ে রয়েছে। কোন্ যন্ত্রে বা কোন্ শিল্পে কতটা খরচ পড়ে এবং কতটা লাভ হতে পারে, বাস্তবিক কোথাও কেউ লাভ করেছে কি না, এই সমস্ত বিষয়ে খবর যদি ছড়ান হয় তবে অনেক উন্নতি হ'তে পারে। স্পষ্ট আক্রমণ ও অস্পষ্ট উপদেশ, শুধু এই দুটির দ্বারা আর কিছুই হবে না।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে খুব বিরাট একটা চেষ্টা না করলে, ব্যবসায়, কৃষি বা কুটীরশিল্পের দ্বারা বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না; এগুলির প্রভাব লেখালেখির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বেকার সমস্যার এগুলি

ছাড়া যে আর কোন প্রতিকার নেই তা আমি মনে করি না। দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন যদি প্রচলিত হয়, তবে শুধু শিক্ষকের কাজই এত বেড়ে যাবে, যে আমাদের বেশীর ভাগ কর্ম্মহীন লোকই কাজ পেতে পারে। তার উপর কারখানা শিল্পের প্রসার যদি খুব বৃদ্ধি পায় তবে সেখানেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকের অন্ন সংস্থান হতে পারে। শিক্ষামূলক কাজের সংখ্যা যে আর বাড়তে পারে না, বা বাড়া মঙ্গলের বিষয় নয়, এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। এই সংখ্যা যাতে বাড়ে সেদিকেও একটু দৃষ্টি রাখার কথা আজকাল উত্থাপন ক'রতেও ভয় হয়। কিন্তু এটা অন্যান্য প্রতিকারের চেয়ে যে বেশী অসম্ভব নয়, তা স্বীকার করতে কোন লজ্জা দেখি না।

শিক্ষামূলক কাজ বাড়া যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে বিবাহ বন্ধ বা স্থগিত রেখে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়ে ফেলতে হবে। কাজ অল্প অথচ প্রার্থীর সংখ্যা বেশী, মোটামুটি এইটেই হল বেকার সমস্যা। গত পঞ্চাশ বৎসরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত এবং কি হারে বেড়েছে তার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া কঠিন। কিন্তু বহু দেখে মনে হয় খুবই বেড়েছে। তা না হ'লে কর্ম্মহীনতার কোন কারণ পাওয়া মুস্কিল। কাজের সংখ্যা ত আর কমে নি; সুতরাং বিবাহ কমাতেই হবে। আর এইজন্য standard of living অটুট রাখা দরকার। একটু আধটু বাবুয়ানীর স্বপক্ষে এটাও একটা চলনসই রকমের যুক্তি।

বিবাহ বন্ধ রাখা এবং বাস্তব ব্যবসায় জগতের সম্বন্ধে নির্ভুল সংবাদের বহুল প্রচার এই দুইটি ছাড়া আর তৃতীয় কোন উপায় আছে কি না সে বিষয়ে, বিশেষজ্ঞতার অভাবে, আমার খুবই সন্দেহ আছে। যদি থাকে, সেটা অন্ততঃ গালাগালি দেওয়া নয়, এটা খুব নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর যে কয় প্রকার বিভিন্ন রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল এখানে তাহাদের সকলগুলিকেই পাইলাম:—(১) বর্ব্বর রাজতন্ত্র, (২) সম্রাটতন্ত্র, এবং (৩) উদীয়মান ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্র। তাহাদের মূলনীতিতে যেরূপ বৈচিত্র্য, তাহাদের পরিণতিও সেইরূপ বিচিত্র।

ফ্রান্সে প্রথম রাজবংশের আমলে বর্ব্বর রাজনীতিরই প্রাদুর্ভাব ছিল। যাজক সম্প্রদায় ইহাকে সম্রাটতন্ত্র বা ধর্ম্মতন্ত্রের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন

বটে; কিন্তু রাজপরিবারের মধ্য হইতে রাজনির্ব্বাচন, এই নীতিরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। যাজকদিগের প্রভাবে এই নীতির সহিত উত্তরাধিকারনীতি ও ধর্ম্মনীতির কথঞ্চিৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল মাত্র। ইটালীতে অষ্ট্রোগথদিগের মধ্যে সম্রাটতন্ত্র বর্ব্বর রাজনীতির স্থান অধিকার করিয়া বসিল। থিওডোরিক নিজকে রোমীয় সম্রাটদিগের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেবলমাত্র কাসিওডোরসের গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহার শাসনতন্ত্রের এই বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাইবেন।

স্পেনে রাজতন্ত্র অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যদিও টোলেডোর ধর্ম্মসংসদ দেশের সর্ব্বময় প্রভু ছিল না, তথাপি বিসীগথ রাজবৃন্দের শাসনতন্ত্রে না হউক, তাঁহাদিগের যাজক প্রণোদিত বিধিবিধানে, তাঁহাদের যাজকপ্রবর্ত্তিত ভাষায়, ধর্ম্মতন্ত্রের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডে স্যাক্সনদিগের মধ্যে বর্ব্বর রাজনীতি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। হেপ্টার্কি বা সপ্তরাজ্যের এক একটি রাজ্য এক একটি দলের অধিকৃত ভূখণ্ড, প্রত্যেক দলের একটি করিয়া দলপতি ছিল। অন্যত্রাপেক্ষা এখানে সামরিক নির্ব্বাচন প্রথার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপে অবস্থাভেদে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের নানা বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠিল। এযুগে এত বিশৃঙ্খলা যে কোন সার্ব্বজনীন বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নানা পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্য দিয়া অবশেষে আমরা অষ্টম শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হই, তখনও পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র কোথাও একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে দ্বিতীয় ফ্রাঙ্করাজবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলী অনেকটা সংহত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতিহাসের ঘটনাবলী এখন ব্যাপক আকারে সম্পন্ন হইতে লাগিল, সুতরাং সেগুলি বুঝিবার পক্ষেও সুবিধা হইল, তাহাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পাইল। এখন শীঘ্রই দেখিবেন বিভিন্ন রাজতন্ত্র কেমন করিয়া পরস্পরের স্থান অধিকার করিতেছে ও পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

যখন কার্লোবিঙ্গীয় রাজগণ মেরোবিঙ্গীয়দিগের স্থান গ্রহণ করিল, তখন বর্ব্বররাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায়; পুনরায় নির্ব্বাচননীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পেপিন সোয়াসোঁনগরে নিজকে নির্ব্বাচিত করাইয়া লইলেন। প্রথম কার্লোবিঙ্গীয়গণ যখন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, তখন তাঁহারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মতি লইতে যত্নবান্ হইতেন। যখন তাঁহারা রাজ্য ভাগ করা আবশ্যক মনে করিতেন, তখন জাতীয় মহাসমিতির অনুমতি গ্রহণ করিতেন। এক কথায় নির্ব্বাচননীতি সম্মতিগ্রহণ আকারে পুনরায় কিয়ৎ পরিমাণে বাস্তবতা লাভ করিল। আপনারা মনে রাখিবেন এই রাজবংশ পরিবর্ত্তনের অর্থ পশ্চিম ইউরোপে একটা নূতন জার্ম্মান আক্রমণ, সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জার্ম্মান রীতিনীতির কতকটা ছায়া নূতন করিয়া আবির্ভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মনীতি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রবেশ লাভ করিল এবং তাহার প্রভাব ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পেপিন পোপ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও অভিষিক্ত হইলেন। ধর্ম্মতন্ত্রের অনুমোদন

ও সহায়তা তাঁহার আবশ্যক ছিল; ধর্ম্মতন্ত্র তৎপূর্ব্বেই প্রভূত পরাক্রম লাভ করিয়াছে, পেপিন কাজে কাজেই তাহার নিকট উপযাচক হইলেন। শার্লমেনও সেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন; ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি শার্লমেনের সময়ে রাজতন্ত্রের এই নূতন লক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; তিনি যে রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা রোমীয় সম্রাট্তন্ত্র। যদিও তিনি যাজক সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বকার্য্য সাধনের সহায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনই তাঁহাদিগের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়েন নাই। একটা বিশাল রাজ্যের কল্পনা, একটা বিরাট রাষ্ট্রীয় ঐক্য, এক কথায় রোমীয় সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন, ইহাই ছিল শার্লমেনের স্বপ্ন ও লক্ষ্য। তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার সিংহাসনে লুই ল্য ত্ববনেয়ার আরূঢ় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র যে কি প্রকৃতি ধারণ করিল তাহা সকলেই জানেন। রাজা এখন যাজকবৃন্দের হাতে পড়িলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, রাজ্যচ্যুত করিলেন, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-রাজতন্ত্র পূর্ব্বে সামান্য আকারে দেখা গিয়াছিল, এখন তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জোগাড়

এইরূপে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ত্রিবিধ রাজতন্ত্রের বৈচিত্র্য কতকগুলি বড় বড় সুসম্বদ্ধ সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল।

লুই ল্য দ্যবনেয়ারের মৃত্যুর পর ইউরোপ পুনরায় যে প্রলয়াবর্ত্তে নিমজ্জিত হইল তাহার মধ্যে ত্রিবিধ রাজতন্ত্র একসঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সমস্তই তখন বিশৃঙ্খল। কিয়ৎকাল পরে যখন ফিউড্যাল ভূস্বামীতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইল তখন ফিউড্যাল রাজতন্ত্ররূপ এক চতুর্থ প্রকারের রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান হইল। এ রাজতন্ত্রের প্রকৃতি বড় জটিল, সহজে ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না। বলা হইয়া থাকে যে ফিউড্যাল পদ্ধতিতে রাজা হইতেছেন রাজগণের রাজা, ভূস্বামীবৃন্দের ভূস্বামী; শ্রেণীপরম্পরাক্রমে তিনি সমগ্র সমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া সমগ্র জাতিকেই তিনি তলব দিতে পারেন এবং এইরূপে দেখাইতে পারেন যে তিনি যথার্থই রাজা। আমি স্বীকার করি যে ইহাই ছিল ফিউড্যাল রাজতন্ত্রের পুঁথিগত তত্ত্ব; কিন্তু ইহা তত্ত্বমাত্র। বাস্তবরাজ্যে এ তত্ত্ব কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। একটা শ্রেণীপরম্পরাবিন্যস্ত শৃঙ্খলার দ্বারা সাধারণ সমাজের উপর রাজার প্রভাব বিস্তার, সমগ্র ফিউড্যাল সমাজের সহিত রাজার নানা বিচিত্র সম্বন্ধবন্ধন, এ সমস্ত তত্ত্ববিদগণের স্বপ্নমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে অধিকাংশ ফিউড্যাল ভূস্বামী এ সময়ে সম্পূর্ণরূপে রাজশাসনের বাহিরে ছিলেন; অনেকে রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এবং রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। সমস্ত শাসনতন্ত্রই তখন নিজ নিজ সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ছিল। ভূস্বামীদিগের মধ্যে এক একজন হয় ত রাজোপাধি

ধারণ করিতেন, কিন্তু এ উপাধি কেবল অতীতের স্মৃতি মাত্র, ইহাতে কোন বাস্তবতা ছিল না।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের অবস্থা এইরূপ ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে লুই ল্যা গ্রোস্‌এর রাজত্বকালে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। এখন রাজার নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়; তাঁহার প্রভাব এখন এমন অনেক স্থানে প্রবেশ করিয়াছে যেখানে সে পূর্ব্বে কখনও প্রবেশপথ পায় নাই; সমাজে রাজার সক্রিয়তা এখন অনেক বাড়িয়াছে। কোন্ অধিকারের বলে রাজার প্রভাব এতটা বাড়িয়া গেল ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব পূর্ব্বে যে সকল অধিকার রাজা দাবী করিতেন তাহার কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। রাজা এখন রোমক সম্রাটের উত্তরাধিকারী রূপে বা রোমক সম্রাটতন্ত্রের অধিকারবলে রাজতন্ত্রের প্রভাববৃদ্ধি বা সংহতি সাধন করিতেছেন না। সেইরূপ নির্ব্বাচনের বলেও নহে, ভগবচ্ছক্তির অবতার স্বরূপেও নহে। নির্ব্বাচনপদ্ধতির সমস্ত চিহ্ন এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উত্তরাধিকার পদ্ধতি এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এবং যদিও এখন রাজার অভিষেকে ধর্ম্মতন্ত্রের অনুমোদন থাকে, তথাপি লুই ল্যা গ্রোস্‌এর রাজতন্ত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে কি না আছে তাহা লইয়া লোকে আর মস্তিষ্ক চালনা করে না। রাজতন্ত্রের মধ্যে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হইল; এক নূতন রাজতন্ত্রের সূচনা হইল।

একথার পুনরুক্তির আবশ্যক নাই যে সমাজে এখন একটা বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, সমাজ এখন অবিরত নানা উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত। এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য স্থাপনের জন্য, সমাজের নিজের কোন সামর্থ্য বা উপায় নাই। ভূস্বামীদিগের পার্লিয়ামেণ্ট, তাঁহাদিগের বিচারসভা,—অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দরুণ এখন আমরা মনে করি যে ফিউড্যালতন্ত্র বেশ একটা সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থ শাসনতন্ত্র ছিল—সে সমস্তই তখন শক্তিহীন, বাস্তবতারহিত। তাহার মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা যাহাতে শৃঙ্খলা বা ন্যায়ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুতরাং এই সামাজিক প্রলয়ের মধ্যে ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিকারার্থ, ঘোরতর অমঙ্গলের নিবারণকল্পে, যথার্থ রাষ্ট্রশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে লোকে যে কাহার নিকট যাইবে খুঁজিয়া পাইল না। রাজার নামমাত্র তখন অবশিষ্ট আছে, একজন ভূস্বামী সেই নাম অধিকার করিয়া আছেন; কেহ কেহ সেই রাজার নিকট শরণার্থী হইল। রাজশক্তি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিভিন্ন অধিকারের দাবী করিয়া আসিয়াছে, সে সমস্ত অধিকারের এখন কোন প্রভাব ছিল না সত্য, তথাপি অনেকের মনে তাহার স্মৃতি জাগিয়াছিল এবং সময়ে সময়ে এই সকল অধিকার স্বীকৃতও হইত। কখনও কখনও লোকে কোন অকথ্য উপদ্রব দমন করিবার জন্য বা রাজার আবাস গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য, অথবা কোন দীর্ঘকালব্যাপী কলহের মীমাংসা করিবার জন্য, রাজার নিকট উপস্থিত হইত। কখনও কখনও বা রাজার অধিকারবহির্ভূত ব্যাপারেও তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হইত।

তিনি সাধারণ শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে, অন্যায়প্রতিকারী ও মধ্যস্থরূপে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজার উপাধির সঙ্গে যে নৈতিক কর্ত্তৃত্বশক্তি জড়িত ছিল, তাহারই বলে ক্রমশঃ তিনি ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন ।

Gros লুই লা গ্রোশের রাজত্বকালে ও সুগেরের শাসনে রাজতন্ত্র এই প্রকৃতি ধারণ করিল। সমাজের উপরে যে একটি ব্যাপক সার্ব্বজনীন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি পূর্ব্বকালের খণ্ড খণ্ড শাসন শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যে শক্তি দুর্ব্বল অক্ষমকে ন্যায়বিচার দান করিবে, যে শক্তি সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপনে সমর্থ, শান্তিরক্ষাই যাহার প্রধান কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলকে রক্ষাকরা ও বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দেওয়াই যাহার প্রধান ধর্ম্ম—এইরূপ একটা ধারণা আংশিকভাবে, ক্ষীণভাবে, অসংলগ্নভাবে লোকের মনে এই প্রথম দেখা দিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইয়ুরোপে এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে রাজতন্ত্র এই সম্পূর্ণরূপে নূতন আকার ধারণ করিল। রাজতন্ত্র এখন আর বর্ব্বর রাজতন্ত্র নহে, ধর্ম্মরাজতন্ত্র নহে, সম্রাটতন্ত্র নহে ; ইহার ক্ষমতা এখন সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ।

ইহাই আধুনিক রাজতন্ত্রের যথার্থ মূল, ইহাই তাহার প্রাণতত্ত্ব ; ইহার জীবনেতিহাসে এই তত্ত্বই বিকশিত হইয়াছে, এবং ইহারই বলে সে সফলতা লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের বিভিন্নযুগে, রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি পুনরাবির্ভূত হইয়াছে ; যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির রাজতন্ত্র লইয়া আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহারা একে একে পুনরায় প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছে। যাজকসম্প্রদায় সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজনীতিই প্রচার করিয়াছে ; ব্যবহারবিদ্‌গণ বরাবর সম্রাটতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনকল্পে উদ্যম করিয়াছেন ; এবং অভিজাতসম্প্রদায় কখনও কখনও নির্ব্বাচন মূলক অথবা ফিউডাল রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। শুধু যে যাজকবর্গ, ব্যবহারবিদ্‌বর্গ ও অভিজাতবর্গ রাজতন্ত্রের উপর নিজ নিজ ছাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, রাজতন্ত্রও এই সকল সম্প্রদায়কে নিজের প্রভাব পরাক্রম বৃদ্ধির সহায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে। রাজা সাময়িক প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনের বশে কখনও নিজকে ভগবানের প্রতিনিধি, কখনও বা রোমক সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি অনধিকারসত্ত্বেও এই সকল উপাধি দাবী করিতেন বটে, কিন্তু এসমস্ত উপাধিতে আধুনিক রাজতন্ত্রের মূল শক্তি নিহিত নাই। তাই পুনরায় বলি, সার্ব্বজনীন শান্তি শৃঙ্খলা, সার্ব্বজনীন ন্যায়ধর্ম্ম, এবং সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের রক্ষক হিসাবেই রাজা লোকসমাজের অনুরাগ ও বশ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, ও লোকসমাজের সম্মিলিত শক্তির অধিকারী হইয়াছেন। যত অগ্রসর হইবেন ততই দেখিবেন দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক রাজতন্ত্রের এই বিশিষ্ট প্রকৃতি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, বললাভ করিতেছে ও ইউরোপের বিশিষ্ট রাজনৈতিক স্বরূপ গঠন করিয়া চলিতেছে। এই প্রকৃতির বলেই রাজতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই দুইটি মাত্র অঙ্গে পরিণত করিয়াছে।

অতএব, ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান কালে ইউরোপ যে পথে চলিতে আরম্ভ করে সেই পথ অনুসরণ করিয়াই সে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং এই রূপান্তরে রাজতন্ত্র যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপন

জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টা হইয়াছিল আগামী অধ্যায়ে তাহা আলোচনা করিব। ফিউড্যাল তন্ত্র, যাজকতন্ত্র ও পৌরতন্ত্র চতুর্দ্দিকের রূপান্তর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ প্রাচীন নীতি অনুসারে সমাজ পুনর্গঠন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা আলোচনা করিব।

দশম অধ্যায়।

প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আলোচনাকালে আপনারা সর্ব্বাগ্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাহাদের বৈচিত্র্য, তাহাদের পরস্পরনিরপেক্ষতা, তাহাদের স্বাতন্ত্র্যই তাহাদের বিশেষ লক্ষণ। ভূস্বামীতন্ত্রমূলক অভিজাতসম্প্রদায়, যাজক-সম্প্রদায়, পৌরসম্প্রদায়, সকলেরই অবস্থা স্বতন্ত্র, বিধিবিধান স্বতন্ত্র, রীতিনীতি স্বতন্ত্র। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ-গঠন করিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্ব স্ব শক্তিবলে স্ব স্ব নিয়ম অনুসারে আত্মশাসন করিত। তাহারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ছিল ও পরস্পরের সংস্পর্শে থাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথার্থ একতাবন্ধন ছিল না, তাহারা সকলে মিলিয়া যথার্থপক্ষে একটা ষ্টেট বা রাষ্ট্র, একটা নেশন বা মহাজাতি গঠন করে নাই।

এই সমস্ত স্বতন্ত্র সমাজ মিলিয়া মিশিয়া এখন এক একটা জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে; আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এখন দুইটিতে দাঁড়াইয়াছে—রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রজাবর্গ,—অর্থাৎ বৈচিত্র্যের তিরোধান ঘটিয়াছে, এবং সাদৃশ্যের ফলে একীকরণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পরিণতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন সমাজের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে তাহারা একত্র সম্মিলিত ভাবে অবস্থান ও কার্য্য করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাদের বিশেষ অবস্থান, বিশেষ অধিকার বা বিশিষ্ট প্রকৃতিতে আঘাত না দিয়াও যাহাতে তাহাদিগকে একটি রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে সম্মিলিত করা যায়, যাহাতে তাহাদিগকে লইয়া একটি জাতীয় সমাজ গঠন করা যায়, যাহাতে তাহাদিগকে একমাত্র শাসনের অধীন করা যায়, এই উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল।

এ সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। আধুনিক সমাজে যে পরিণতির কথা, ঐক্যের কথা এখনই বলিলাম, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে ঐ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ইউরোপের কোন কোন দেশে এখনও সেই প্রাচীন বৈচিত্র্যের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট আছে; যথা জার্ম্মাণীতে একটা সত্যকার ফিউড্যাল্ অভিজাতসমাজ ও পৌরসমাজ বর্ত্তমান আছে; ইংলণ্ডে এখনও জাতীয় চর্চ বা যাজকসংঘ নির্দ্দিষ্ট কর ও নির্দ্দিষ্ট শাসনাধিকার ভোগ করিতেছে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে এ সকল ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাণ মাত্র আছে; কারণ এই সকল বিশিষ্ট খণ্ড সমাজ এখন সাধারণ সমাজের সহিত মিশিয়া

গিয়াছে, রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধারণ জাতীয় জীবনের সহিত একই চিন্তা চেষ্টা, একই রীতিনীতির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাই পুনরায় বলি যে যেখানে প্রাচীন খণ্ড সমাজগুলির স্বতন্ত্র বাহ্যরূপও বর্ত্তমান আছে, সেখানেও তাহাদের বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য একেবারেই নাই।

তথাপি তাহাদিগকে রূপান্তরিত না করিয়াও একমুখী করিবার জন্য, তাহাদের বৈচিত্র্য বিলোপ না করিয়াও তাহাদিগকে একটা জাতীয় ঐক্যের সহিত জুড়িয়া দিবার জন্য এই যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তাহারা একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমরা এখন যে যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে যুগ আদিম ইউরোপকে আধুনিক ইউরোপ হইতে পৃথক করিয়া দেয়, যে যুগে ইউরোপীয় সমাজের রূপান্তর সাধিত হয়, সেই যুগের ইতিহাসে এই সকল চেষ্টা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শুধু তাহাই নহে, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর উপরও এই সকল চেষ্টার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে; ইউরোপীয় সমাজের বিচিত্র উপাদান যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শাসনতন্ত্র ও জনসাধারণ এই দুইটিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাও এই সকল চেষ্টার প্রভাবে ঘটিয়াছে। অতএব দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, খণ্ড সমাজগুলির বৈচিত্র্য নষ্ট না করিয়াও জাতিগঠন ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছিল, সেগুলিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু এ আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টকর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের এই সকল চেষ্টা সব সময়ে সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় নাই; অনেক সময় ইহাদের পশ্চাতে স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছপরায়ণতা ভিন্ন অন্য কোন প্রেরণা শক্তি ছিল না। তবে ইহা নিশ্চয়ই মানিতে হইবে যে ইহার মধ্যে একাধিক চেষ্টা বাস্তবিক পক্ষেই নিঃস্বার্থভাবে অকলুষভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; একাধিক ক্ষেত্রে মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন এই সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সমাজ তখন বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব উৎপাত ও অন্যায় অনাচার দ্বারা বিপর্যস্ত হইতেছিল। অনেক উন্নতচেতা সদাশয় ব্যক্তি তাহাতে ব্যথিত হইয়া এ অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নানা উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। তথাপি এই সকল মহৎ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল; এবং এতটা সাহস ও সততা এতটা আত্মত্যাগ ও উদ্যম একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা কি একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য নহে? কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি কষ্টকর ব্যাপার আছে, তাহাতে হৃদয় আরও বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সমাজের উন্নতির জন্য এই সকল উদ্যম শুধু যে নিষ্ফল হইল তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে অসত্য ও অকল্যাণ মিশ্রিত হইয়া গেল। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও অধিকাংশ চেষ্টার মধ্যেই বাতুলতা, বিচার বুদ্ধির অসদ্ভাব এবং ন্যায় ধর্ম্ম, মানব জাতির ন্যায্য অধিকার ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং মানুষের চেষ্টা যে শুধু অকৃতকার্য্য হইল তাহা নহে, মানুষ সফলতার যোগ্যতাও দেখাইতে পারে নাই। শুধু যে ইহাতে মানুষের কঠিন ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল তাহা নহে, মানুষের দুর্ব্বলতারও পরিচয় পাওয়া গেল দেখা গেল যে সত্যের একাংশমাত্র মহত্তমলোকের মনও এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসে যে তাঁহারা আর সব ভুলিয়া যান, যাহা কিছু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ চিন্তাপথের

বাহিরে পড়ে সে সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়েন, যদি কোন দিকে তাঁহারা ন্যায় ধর্ম্মের সামান্য ছায়ামাত্র দেখিতে পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা তৎসম্পর্কিত সমস্ত অন্যায় অবিচার উপেক্ষা করেন। মানুষের দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা ভাবিতে গেলে বিষাদগ্রস্ত হইতে হয় সত্য, কিন্তু আমার মতে মানুষের দোষ ত্রুটির কথা ভাবিতে গেলে গভীরতর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে হয়; মানুষের কষ্ট অপেক্ষা মানুষের দোষই আমার পক্ষে অধিকতর দুর্ব্বহ। আমি যে সমস্ত উদ্যমের বর্ণনা করিব তাহাতে এই উভয়বিধ দৃশ্যই উদ্ঘাটিত হইবে। এ ইতিহাস আমাদের আদ্যোপান্ত আলোচনা করা আবশ্যক, এবং যে সমস্ত যুগ, যে সমস্ত মানুষ বার বার পথভ্রষ্ট হওয়া সত্বেও বার বার অকৃতকার্য্য হওয়া সত্বেও বহু মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছে, প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছে, খ্যাতি গৌরবের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি অবিচার করিলে চলিবে না।

দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দ্বিবিধ চেষ্টা হইয়াছিল। এক শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র সামাজিক উপাদানের প্রাধান্য স্থাপন করা, তাহা সে যাজকতন্ত্রই হউক, বা অভিজাত তন্ত্রই হউক বা পৌরতন্ত্রই হউক। সমাজকে এই একমাত্র খণ্ড সমাজের অধীনে আনিতে হইবে এবং এইরূপে সমাজে ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য বিভিন্ন খণ্ড সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ... স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া এবং প্রত্যেকের যথাযোগ্য ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করান। দ্বিতীয় অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর চেষ্টার মধ্যেই স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছাপরায়ণতার অস্তিত্ব কল্পনা করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদিগের ইতিহাস এই দুই দোষে অধিকতর পরিমাণে কলঙ্কিত; তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী স্বভাবতঃই অত্যাচারদুষ্ট। তবে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন উদ্যম যে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম চেষ্টা হইল যাজকতন্ত্রের সাহায্যে সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে যাজক সম্প্রদায়ের নীতি ও শাসনের অধীনে আনিবার চেষ্টা। আমি চর্চ্চ বা যাজকতন্ত্রের ইতিহাসসম্পর্কে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করুন। চর্চ্চের মধ্যে কোন্ কোন্ নীতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ নীতি কি পরিমাণে ন্যায়সঙ্গত, ঘটনাস্রোতের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহারা কি কি কল্যাণ সাধন করিয়াছে এবং কি কি অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, এ সমস্ত আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চ যে সব বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে আমি সে গুলির বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি; আমি রোমীয় সাম্রাজ্যের চর্চ্চ, বর্ব্বর যুগের চর্চ্চ, ফিউড্যাল যুগের চর্চ্চ এবং সর্ব্বশেষে যাজকতন্ত্র চর্চ্চের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যাজকবর্গ ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্যলাভ করিবার কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা অকৃতকার্য্য হইল।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই রোমের পোপসভার ও সাধারণ যাজকবর্গের কার্য

কলাপের মধ্যে যাজকতন্ত্রসাহায্যে সমাজব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। চর্চ্চের ধর্ম্মনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উৎকর্ষের ইহা স্বাভাবিক ফল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথম হইতেই চর্চ্চ এমন কতকগুলি বাধা প্রাপ্ত হইল যাহা সে তাহার প্রবলতম পরাক্রমের সময়ও দূরীভূত করিতে পারে নাই।

প্রথম বাধা খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রবর্ত্তন প্ররোচনার দ্বারা নৈতিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অধিকাংশ ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত এই বিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভেদ। জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সে কখনও বাহুবল বা শাস্ত্রবল সমন্বিত ছিল না। প্রথম যুগে সে কেবল ভগবাণীর সাহায্যেই জয়লাভ করিয়াছিল, সে কেবল মানুষের চিত্তই জয় করিয়াছিল। সুতরাং যখন চর্চ্চ বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইয়া প্রভূত সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভ করিল, তখনও সে প্রত্যক্ষভাবে সমাজ শাসনের অধিকার পায় নাই। চর্চের নৈতিক প্রভাব সামান্য ছিল না, কিন্তু শাসন-দণ্ড পরিচালনের উপযোগী তাহার কোন বাহ্যশক্তি ছিল না। সে গৌণ ভাবে পের শাসনতন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, সম্রাট ও সম্রাটপ্রতিনিধিদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ সে কখনও শাসনদণ্ড পরিচালন করে নাই। যাজকতন্ত্রমূলকই হউক বা অন্য যে কোন প্রকারেরই হউক, কেবলমাত্র গৌণ নৈতিক প্রভাবের বলে কোন শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র চালাইতে হইলে [illegible] হইবে, কর গ্রহণ করিতে হইবে, শাসন করিতে হইবে, এক কথায় [illegible] অধিকার করিয়া বসিতে হইবে। প্ররোচনার দ্বারা নৈতিক প্রভাবের সাহায্যে একটা জাতি বা রাষ্ট্রের উপর এক প্রকার আধিপত্য স্থাপন করা যায় সত্য, এবং তাহাতে অনেক ফলও ফলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠে না, একটা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপিত হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষার কোন উপায় হয় না। জন্মকাল হইতে খৃষ্টীয় চর্চের এই অবস্থা; সে বরাবর শাসনতন্ত্রের পাশাপাশি রহিয়াছে, কিন্তু নিজে কখনও তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে নাই। যাজক-তন্ত্রনীতি অনুসারে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যখন চেষ্টা হইল তখন ইহাই একটি প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে চর্চের সম্মুখে আর একটি দ্বিতীয় বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন চতুর্দ্দিকে বর্ব্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, চর্চ তখন বিজিত শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন এই অবস্থা হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাওয়াই [illegible]র পক্ষে প্রথম আবশ্যক হইল। বিজেতৃবর্গকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজেকে বিজেতৃবর্গের সমান পদবীতে উত্তোলন করাই চর্চ্চের প্রথম কার্য্য হইল। এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চর্চ্চ যখ আধিপত্য লাভের আকাজ্ঞা পোষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার সম্মুখে ফিউড্যাল অভিজাতবর্গের প্রতিকূলতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

ফিউড্যাল সমাজ এইরূপে ইউরোপের একটা মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সমগ্র জাতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে চর্চ্চের অধীনতা গ্রহণ করিয়াছিল, রাজগণের তখন আত্মরক্ষার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না বলিলেই হয়; কেবল মা ফিউড্যাল অভিজাতবর্গ কখনও চর্চ্চের দাসত্ব শৃঙ্খল স্বীকার করে নাই বা চর্চ্চের নিকা

মস্তকও অবনত করে নাই। মধ্যযুগের ইতিহাস সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই দেখিবেন চর্চ্চের সহিত ভূস্বামীগণের সম্পর্ক কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাহার মধ্যে ঔদ্ধত্য ও বশ্যতার, অন্ধ বিশ্বাস ও স্বাধীনচিত্ততার কি অদ্ভুত সম্মিলন। ফিউড্যাল ভূস্বামী-তন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস পূর্ব্বে কিরূপে বর্ণনা করিয়াছি স্মরণ করিবেন। ভূস্বামীর আবাসদুর্গ ঘিরিয়া কিরূপে একটা আদিম ফিউড্যাল সমাজ গড়িয়া উঠিল তাহা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, যে এই আদিম ফিউড্যাল সমাজে যাজকের পদবী ছিল ভূস্বামীর নিম্নে। ফিউড্যাল অভিজাতবর্গের চিত্তে বরাবরই এই পদবৈষম্যের স্মৃতি জাগরূক ছিল। তাঁহারা শুধু যে চর্চ্চের বশ্যতা স্বীকার করিতেন না তাঁহা নহে, তাঁহারা চর্চ্চ অপেক্ষা অভিজাত সমাজকে বড় ভাবিতেন; তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহাদেরই কেবল দেশ শাসন করিবার, দেশের সমস্ত ক্ষমতা দখল করিবার একমাত্র অধিকার। তাঁহারা যাজক সমাজের সহিত নির্ব্বিবাদে থাকিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বার্থ কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বহু শতাব্দী ধরিয়া যখন রাজা ও জনসমাজ চর্চ্চের করতলগত তখন এই অভিজাতবর্গই চর্চ্চের কবল হইতে সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যখন যাজকতন্ত্রের সাহায্যে সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল তখন সর্ব্বাগ্রে অভিজাতবর্গই তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ যে যে কারণে এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রধান কারণ।

এইরূপ আর একটি তৃতীয় বাধাও উপস্থিত হইয়াছিল। এ বাধাটির গুরুত্ব যথাযথ ভাবে উপলব্ধ হয় নাই, এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে।

যেখানেই যাজকসম্প্রদায় সমাজের অধিকার বিস্তার করিয়া সমাজকে যাজকতন্ত্রমূলক শাসনশৃঙ্খলায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে বিবাহিত গৃহী যাজকসমাজ আধিপত্য করিয়াছে দেখা যায়। যাজক সমাজ সেখানে আপনার মধ্য হইতেই দল পুষ্টি করিয়াছে, তাহারা স্বীয় সন্তানগণকে আজন্মকাল হইতেই যাজকবৃত্তি ও যাজকাধিকারের জন্য শিক্ষিত ও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করুন; এসিয়ার দিকে, মিশরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে যেখানে বড় বড় যাজকতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা, সর্ব্বত্রই যাজকসমাজ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ, সে নিজের মধ্য হইতেই নিজের সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে, বাহির হইতে তাহাকে কিছুই ধার করিতে হয় না।

খ্রীষ্টীয় চর্চ্চে যাজকগণ অবিবাহিত থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা একেবারে ভিন্নরূপ দাঁড়াইল। যাজকসমাজের ধারা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনবরত বাহিরের সমাজ হইতে, নানা শ্রেণী নানা বৃত্তি হইতে লোক সংগ্রহ করিতে হইত। এ সমস্ত বাহিরের উপাদান পরিপাক করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইতে চর্চ্চ অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিত, কিন্তু নবাগতদিগের জাতিকুলবৃত্তির প্রভাব কিছু না কিছু থাকিয়া যাইত; তাঁহারা পৌরসমাজ হইতেই আসুন বা অভিজাতসমাজ হইতেই আসুন তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন মনোভাব বা পূর্ব্বতন অবস্থার কতকটা নিদর্শন তাঁহারা

রক্ষা করিতেন। অবশ্য অবিবাহিত থাকার দরুণ ক্যাথলিক যাজকবৃন্দের অবস্থার সঙ্গে সাধারণ সমাজের অবস্থার পার্থক্য ঘটিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা একরূপ সাধারণ সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই একই কারণে তাঁহাদিগকে অনবরত লোক সংগ্রহ ও দলপুষ্টির জন্য বহিঃসমাজের সম্পর্কে আসিতে বাধ্য হইতে হইল, এবং তাহার ফলে বহিঃসমাজের মধ্যে যখন যে নৈতিক পরিণতি ও বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকেও কতক পরিমাণে তাহার প্রভাব অনুভব করিতে হইয়াছে। আমি দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি যে যাজকতন্ত্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকল্পে যাজক সমাজের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ যতটুকু সহায়তা করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই নিত্য প্রয়োজনের তাড়না ইহার পক্ষে হানিজনক হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে চর্চের গণ্ডীর মধ্যেই এমন কতকগুলি পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল যাহারা চর্চের একাধিপত্য স্থাপনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল।

চর্চের ঐক্যবন্ধন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; এবং ইহা সত্য যে চর্চ বরাবর এই ঐক্যস্থাপন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন বড় বড় কথার আড়ম্বরে, বা আংশিক তথ্যের পরিচয়ে প্রবঞ্চিত না হই। যাজক সমাজের মত আর কোন্ সমাজে এত অন্তর্বিবাদ দেখা দিয়াছে, কোন্ সমাজ এত খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছে? আর কোন্ সমাজে এত দলাদলি, এত স্থিরতার অভাব? ইউরোপের অধিকাংশ দেশের জাতীয় চর্চ অনবরত রোমের পোপসভার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে; ধর্ম্মসঙ্গীতিগুলি পোপের সহিত সর্ব্বদাই লড়াই করিয়াছে; পাষণ্ডীসম্প্রদায়ের সংখ্যা করা যায় না, নূতন নূতন সম্প্রদায় পৃথক হইবার জন্য উন্মুখ; এত মতবৈচিত্র্য, এত প্রচণ্ড বিবাদবিতর্ক, কর্ত্তৃত্বশক্তিকে এমন করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেওয়া—ইহা আর কোথাও দেখা যায় নাই। চর্চ সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য যে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সফলতার প্রধান বিঘ্ন ছিল চর্চের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসম্বাদ ও বিপ্লব আন্দোলন।

চর্চের এই চেষ্টার আরম্ভ কাল হইতেই এই সমস্ত বাধাগুলিই দেখা দিয়াছিল। তথাপি এই সমস্ত বাধাসত্বেও এই চেষ্টার গতিরোধ হয় নাই, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই চেষ্টা অগ্রসর হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আধিপত্যকালে এই চেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আপনারা পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে সমস্ত সংসারকে যাজকবর্গের অধীনে আনা, সমগ্র যাজকসঙ্ঘকে পোপের অধীন করা এবং সমস্ত ইউরোপকে একটি বিশাল যাজকতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা, ইহাই ছিল সপ্তম গ্রেগরীর প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দুইটি মহৎ দোষ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, প্রথম দোষ তাত্বিকসুলভ, দ্বিতীয় দোষ বিপ্লববাদীসুলভ। একদিকে তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারের সমগ্র প্রতিমূর্ত্তি, লোক সমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন, ধর্ম্মমূলক শাসনশক্তির প্রকৃতি ও অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ রীতিমত ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সেই সেই মতবাদ হইতে কঠোর নৈয়ায়িকের ন্যায় শুদ্ধমাত্র বস্তুসম্পর্কশূন্য ন্যায় যুক্তির সাহায্যে সুদূরতম সিদ্ধান্তসকল টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজের শক্তি বা সফলতার উপায় বিচার না করিয়াই তিনি ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তিকেই আক্রমণ বা ভয়

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মানব ব্যাপারে শুদ্ধমাত্র দার্শনিক যুক্তির দোহাই দিয়া একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিপ্লববাদীর ন্যায় সপ্তম গ্রেগরী একটি বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন ; তাঁহার যাহা সাধ্য ছিল তাহার অধিক তিনি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তিনি সম্ভবের গণ্ডীর মধ্যে নিজের চেষ্টা সীমাবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার মতবাদকে শীঘ্র শীঘ্র প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাদান করিবার জন্য তিনি সম্রাটের সঙ্গে, ইউরোপের সমস্ত রাজগণের সঙ্গে, এমন কি যাজকবৃন্দের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, তিনি কাহারও কোন স্বার্থ বা অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না, পরন্তু সদম্ভে ঘোষণা করিলেন—"আমি সমস্ত রাজ্য শাসন করিব, সমস্ত চিত্ত শাসন করিব।" এইরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে একদিকে সমস্ত পার্থিব রাজশক্তি আসন্ন বিপদাশঙ্কায় উদ্যত হইয়া উঠিল, অন্যদিকে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা ধরিয়া উন্মুক্তচিত্ত মনীষীগণ মানবচিত্তের স্বাধীনতারক্ষার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। মোটের উপর গ্রেগরী যাজক তন্ত্রের উন্নতি না করিয়া হানিই করিয়া গেলেন।

তথাপি সমগ্র দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যাজকতন্ত্র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া চলিল। যদিচ এ সময়ের মধ্যে চর্চ বেশী কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এই যুগেই চর্চের শক্তি ও মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তৃতীয় ইনোসেন্টের শাসনকাল পর্য্যন্ত চর্চ পূর্ব্বার্জিত গৌরব ও ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে মাত্র, নূতন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে নাই। আপাতদৃষ্টিতে চর্চের যে সময় চরম সার্থকতার যুগ, সেই সময়েই ইউরোপের অনেকাংশ জুড়িয়া চর্চের বিরুদ্ধে জনসমাজের পক্ষ হইতে একটা বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। ফ্রান্সের দক্ষিণে আল্‌বিজেন্সদিগের পাষণ্ডী মত মস্তক উত্তোলন করিল এবং একটা সমগ্র বিশাল পরাক্রান্ত জনসমাজ অধিকার করিয়া বসিল। কিয়ৎকাল পরে ইংলণ্ডে উইক্লিফ প্রতিভাসহকারে চর্চকে আক্রমণ করিলেন, এবং তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা অমর হইয়া রহিল। লোকসমাজ যে পথ অবলম্বন করিল রাজগণও সেই পথ আশ্রয় করিতে অধিক বিলম্ব করিলেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালেই ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালীও পরাক্রান্ত রাজবংশ অর্থাৎ হোহেনষ্টাউফেন বংশীয় সম্রাটগণ পোপ-তন্ত্রের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীর মধ্যেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি স্যাঁ লুই ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য প্রাকৃতরাজশক্তির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা ফিলিপ্ ল্য বেল ও পোপ অষ্টম বোনিফাসের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল ; ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ডও রোমের প্রতি ইহাপেক্ষা অধিক বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। এযুগে স্পষ্টই দেখা গেল যে যাজকতন্ত্র শাসনে সমাজকে বাধিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল ; ইহার পর হইতে চর্চকে কেবল আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে ; আর সে ইউরোপের উপর স্বকীয় শাসনতন্ত্র চাপাইতে চেষ্টা করিবে না ; তাহার একমাত্র চিন্তা হইবে কেমন করিয়া পূর্ব্বার্জিত অধিকার রক্ষা করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইউরোপের প্রাকৃত জনসমাজ চর্চের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল ; সেই সময় হইতে চর্চ সমাজশাসনাধিকারের দাবী ছাড়িয়া দিল।

যে ক্ষেত্রে তাহার কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই ইটালীয় সমাজের মধ্যেই চর্চ বহুপূর্ব্বে এ দাবী ছাড়িয়া দিয়াছিল। বহুকালপূর্ব্বে

চর্চের দ্বারপ্রান্তেই, তাহার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ইটালীর মধ্যেই রাজতন্ত্র একেবারে অকৃতকার্য্য হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির এক শাসনতন্ত্র তাহার স্থান অধিকার করে। তাহা আর কিছু নহে, পৌরতন্ত্র। ইটালীর গণতন্ত্র গুলিই এই পৌরতন্ত্রের আদর্শ। এই পৌরতন্ত্রই একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

পৌরসংঘগুলির উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ রাখিবেন। ইটালীতে তাহারা যত অল্পকালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল ও যত পরাক্রমশালী হইয়াছিল তেমন আর কোথাও হয় নাই। সেখানে গল, বৃটেন বা স্পেন অপেক্ষা নগরের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি অনেক অধিক ছিল; সেখানে রোমীয় পৌরতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সজীব ও সুনিয়মিতভাবে বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপের অন্যান্য অংশাপেক্ষা ইটালীর পল্লীজনপদ বিজেতৃসম্প্রদায়ের বাসের পক্ষেও অনুপযোগী ছিল। সেখানে সমস্ত জনপদ পূর্ব্ব হইতেই জলাজঙ্গলাদিমুক্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল: সেখানে এমন বনজঙ্গল ছিল না যেখানে বর্ব্বর বিজেতৃগণ মৃগয়াদি অনুসরণ করিতে পাবে বা তাহাদের আদিম আবাস জার্ম্মানীর অনুরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহা ছাড়া এই জনপদের একাংশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইটালীর দক্ষিণাংশ, কাম্পানিয়া দি রোমা ও রাবেন্না গ্রীক সম্রাটদিগের শাসনভুক্ত ছিল। দেশের এই অংশে রাজধানী হইতে দূরত্ব নিবন্ধন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের উপদ্রব হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাওয়াতে অতি প্রাচীনকালেই গণতন্ত্র পদ্ধতি শক্তি ও পুষ্টিলাভ করিল। শুধু যে সমগ্র ইটালী বর্ব্বরদিগের শাসনভুক্ত হয় নাই তাহা নহে, যেখানে তাহাদিগের অধিকার সেখানেও তাহারা সুপ্রতিষ্ঠভাবে নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে নাই। অষ্ট্রোগথগণ বেলিসারিয়স ও নার্সেস কর্তৃক বিপর্য্যস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। লম্বার্ডদিগের রাজ্যও অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। লম্বার্ড রাজ্য ফ্রাঙ্ক কর্তৃক বিনষ্ট হইল; পেপিন ও শার্লমেন লম্বার্ড জনসমাজকে নির্ম্মূল করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা অধুনাবিজিত লম্বার্ডদিগের সহিত যুঝিবার জন্য প্রাচীন ইটালীয় জনসমাজের সহিত সান্ধবন্ধন আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। অতএব অন্যত্র যেরূপ বর্ব্বরবিজেতৃগণ দেশ ও সমাজের উপর অখণ্ড প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইটালীতে সেরূপ পারেন নাই। এই জন্যই আল্পস্ গিরিমালার পরপারে ফিউডাল ভূস্বামীতন্ত্র অত্যন্ত ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গলে যেমন পল্লীজনপদের অধিবাসীগণের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল, ইটালীতে তাহা না হইয়া পৌরসমাজেরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। এই ব্যাপার যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন অধিকাংশ ফিউড্যাল ভূস্বামী স্বেচ্ছাবশতঃই হউক বা প্রয়োজনের তাড়নাতেই হউক, পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ব্বর ভূস্বামী ও অভিজাতবর্গ পৌরপ্রধান হইতে লাগিলেন। শুধু এই ঘটনাদ্বারা ইউরোপের অন্যান্য দেশের পৌরসমাজের তুলনায় ইটালীর পৌরসমাজের যে শক্তি ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি ঘটিল তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। অন্যান্য দেশের নগরে লোকসমাজের ভীরুতা ও মর্য্যাদাহীনতাই লক্ষ্য করা যায়। পৌরপ্রধানগণ যেন বন্ধমুক্ত ক্রীতদাস, বহুকষ্টে সাহসে ভর করিয়া যেন তাঁহারা বারম্ভ প্রভুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া

যাইতেছেন। ইটালীর পৌরপ্রধানগণ মোটেই এরূপ ছিলেন না; সেখানে বিজেতৃ ও বিজিত সমাজ একই প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; পৌর সমাজকে সেখানে প্রতিবেশী প্রভুর নিকট আত্মরক্ষা করিতে হইত না; নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই সেখানে চিরকাল হইতে পৌরাধিকারসম্পন্ন স্বাধীন পুরুষ; তাহারা কখনও বা ফ্রাঙ্করাজ, কখনও বা জার্ম্মান সম্রাট এইরূপ দূরাগত বিদেশী রাজগণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিত। এইজন্যই এত প্রাচীন কাল হইতে ইটালী নগরগুলির এত প্রাধান্য ও পদগৌরব। অন্যত্র যখন সামান্য একটি পৌরতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে অসীম ক্লেশ পাইতে হয়, এখানে তখন বড় বড় গণতন্ত্র, বড় বড় পৌররাষ্ট্রের অভ্যুত্থান।

ইউরোপের এই অংশে গণতন্ত্রনীতি অনুসারে সমাজবন্ধনের চেষ্টা কেমন করিয়া কৃতকার্য্য হইল তাহা সহজে বোধগম্য হইল। এখানে ইহা অতি প্রাচীন কালেই ফিউড্যাল ভূস্বামীতন্ত্রকে পরাজয় করিয়া প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু ইহা এমন ভাবে গঠিত হয় নাই যাহাতে ইহা বিস্তৃতি বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে; ইহার মধ্যে উন্নতির বীজ অতি অল্পই ছিল, যাহা না থাকিলে বিস্তৃতিও সম্ভব হয় না, স্থায়িত্বও সম্ভব হয় না।

একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইটালীর পৌরগণতন্ত্রগুলির ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় দুইটি পরস্পরবিরোধী অথচ অবিসম্বাদিত তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেখি সাহস, উদ্যম ও প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ এবং তৎসঙ্গে প্রভূত ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি; সেখানে এমন একটা সচলতা ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তি যাহা ইউরোপে অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করুন, পৌরগণের বাস্তবিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাদের জীবন কিরূপে কাটিত, তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে কতটুকু করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য পড়িত? এইখানেই আর এক দৃশ্যপটের আবির্ভাব; কোন ইতিহাস ইহা অপেক্ষা অন্ধকার ও বিষাদজনক হইতে পারে না। বোধ হয়, কোন যুগে কোন দেশে মানুষের অবস্থা এত অশান্তিপূর্ণ, দুর্ভাগ্য দুর্য্যোগলাঞ্ছিত হয় নাই; আর কোথাও বোধ হয় এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত দুষ্কর্ম্ম, এত ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; অধিকাংশ গণতন্ত্রের শাসন পদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনতার ভাগ ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শান্তিশৃঙ্খলার এতই অভাব ছিল যে বিভিন্ন দল শান্তির আকাঙ্খায় গণতন্ত্রনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অন্য এক নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, জেনোয়া, মিলান ও পিসার ইতিহাস আলোচনা করুন; সর্ব্বত্রই দেখিবেন ঘটনাবলীর সাধারণ স্রোতে স্বাধীনতার পুষ্টি ও বিস্তৃতি না ঘটিয়া, সঙ্কোচই ঘটিতে লাগিল, ক্রমশঃ অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হস্তে সমস্ত শাসন শক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। এক কথায় এই সকল উদ্যমশীল, প্রতিভাসমুজ্জ্বল, সমৃদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রের মধ্যে দুইটি বস্তুর অভাব ছিল:—ধনপ্রাণের নিঃশঙ্কতা, যাহা না থাকিলে সমাজই থাকিতে পারে না, এবং শাসন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিস্তৃতি।

তাহার পরে আর এক নূতন বিপদ আসিয়া জুটিল, যাহাতে গণতন্ত্রনীতিঅনুসারে সমাজ বন্ধনের চেষ্টা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিল না। ইটালীর সর্ব্বাপেক্ষা বিষম বিপদ আসিল বাহির হইতে, বিদেশীরাজগণের আক্রমণ হইতে। অথচ এ বিপদের সম্মুখে ইটালীর গণতন্ত্রগুলি

অন্তর্বিরোধ মিটাইয়া একত্র সম্মিলিত হইতে পারিল না, তাহারা কিছুতেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। সেই জন্যই বর্ত্তমানকালের অনেক মনীষাসম্পন্ন স্বদেশভক্ত ইটালীয়ান্ দুঃখ করেন যে মধ্যযুগের ইটালীর পৌরতন্ত্রই ইটালীতে এ পর্য্যন্ত একটা জাতি গঠন করিতে দেয় নাই। তাঁহারা বলেন ইটালী তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; তাহারা এতই ক্রোধ হিংসাদির বশীভূত ছিল, যে তাহারা কিছুতেই সম্মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্র বা জাতি গঠন করিতে পারিল না। তাঁহারা দুঃখ করেন যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইটালী একবার কেন্দ্রীভূত একতন্ত্র শাসনের অধীনে আসিল না; তাহা হইলে সেই শাসনের চাপে একটা জাতি গঠিত হইতে পারিত, ইটালী তাহা হইলে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত থাকিতে পারিত। সুতরাং মনে হয় যে এই যুগে গণতন্ত্রপদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার মধ্যেও উন্নতি, স্থায়িত্ব বা বিস্তৃতির বীজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই—অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যৎ তখন শূন্য ছিল। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মধ্যযুগের ইটালীর শাসন ব্যবস্থার সহিত প্রাচীন গ্রীসের সমাজব্যবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীসেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্রের সমাবেশ; পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রতিযোগিতা, এবং প্রায়ই শত্রুতা; কখনও কখনও বা একটা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলে সম্মিলিত হইত। এ তুলনায় গ্রীসেরই উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয়। যদিও ইতিহাসে এথেন্স, স্পার্টা এবং থীবস্ নগরীর অনেক অনাচার দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায় তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে ঐ সকল নগরে ইটালীর গণতন্ত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের শাসন ছিল। অথচ গ্রীসের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা কত অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল! ঐ শক্তিবিভাগ ও রাষ্ট্রবিভাগের মধ্যে না জানি কি বলক্ষয়কর নীতিই অনুস্যূত ছিল! যখনই গ্রীস্ মাসিডনিয়া ও রোমের ন্যায় পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর সম্পর্কে আসিল, তখনই তাহার পরাজয় ঘটিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র এত প্রতিভাগৌরব ও ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি সত্বেও আত্মরক্ষার জন্য একটা সম্মিলিত শক্তি গঠন করিতে পারিল না। ইটালীতে সেই একই কারণের একই পরিণাম হইবার সম্ভাবনা আরও কত অধিক ছিল! কারণ গ্রীসের তুলনায় সেখানে মানবসমাজ ও চিত্তের বিকাশ অতি অল্পই ঘটিয়াছিল।

যেখানে গণতন্ত্রপদ্ধতি বিজয়ী হইয়াছিল, যেখানে ফিউড্যাল ভূস্বামীতন্ত্র তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া গিয়াছিল, সেই ইটালীতেই যখন গণতন্ত্রমূলক সমাজ বন্ধনের চেষ্টা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না, তখন ইউরোপের অন্যান্য অংশে যে সে চেষ্টা আরও শীঘ্র পরাভূত হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

আমি সংক্ষেপে সেই ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করিব। ইউরোপের আর এক অংশের সহিত ইটালীর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল; তাহা ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্পেনের কয়েকটি প্রদেশ যথা কাটালোনিয়া, নাভার্ ও বিস্কে। সেখানেও নগরগুলি অনেক পরিমাণে পুষ্টি, মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে অনেকেই পৌর প্রধানদিগের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন; যাজকসম্প্রদায়ের এক অংশ তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এক কথায় দেশের অবস্থা অনেকটা ইটালীর মত হইয়াছিল। সুতরাং একাদশ

শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোভেন্স, লাংডক ও আকিতানের নগরগুলি রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি আকাঙ্খা করিয়া আল্পসের পরপারবর্ত্তী নগরগুলির মত স্বাধীন গণতন্ত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্শ্বেই উত্তর ফ্রান্সের পরাক্রান্ত ফিউডাল সমাজ ছিল। এই সময়েই আল্‌বিজেন্সদিগের পাষণ্ডী-ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থান হইল, এবং ভূস্বামীতন্ত্র উত্তর ফ্রান্সের সহিত পৌরতন্ত্র দক্ষিণ ফ্রান্সের সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সিমন ডি মণ্টফোর্টের নেতৃত্বে আলবিজেন্সদিগের বিরুদ্ধে যে ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধাভিযান হয় তাহার ইতিহাস আপনারা জানেন। ইহা দক্ষিণ ফ্রান্সের গণতন্ত্রমূলক সমাজবন্ধন চেষ্টার বিরুদ্ধে উত্তর ফ্রান্সের ভূস্বামীতন্ত্রের সংগ্রাম। দক্ষিণ ফরাসিদিগের স্বদেশপরায়ণতা সত্বেও উত্তর ফ্রান্সই জয়ী হইল; দক্ষিণে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য ছিল না, এবং সভ্যতার সেখানে এতদূর উন্নতি হয় নাই যে সন্ধিবন্ধনের দ্বারা সেই ঐক্যের স্থান তাহারা পূরণ করিতে পারে। গণতন্ত্র সমাজবন্ধনের চেষ্টা পরাভূত হইল, এবং এই ক্রুসেডের ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সের ফিউডাল ভূস্বামীতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরবর্ত্তী কালে সুইজারলাণ্ডের পর্ব্বতমালার মধ্যে গণতন্ত্রের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করিল। সেখানে কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল; তাহাদিগকে কেবল একজন বিদেশী রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; তিনি যদিও সুইসদিগের অপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন, তথাপি তিনি ইউরোপের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। সুইসরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত সংগ্রাম চালাইলেন। সুইজারলাণ্ডের ফিউডাল অভিজাতবর্গ অনেক পরিমাণে নগরগুলির পক্ষই অবলম্বন করিলেন; তাঁহারা গণতন্ত্রের প্রবল সহায় হইলেন বটে কিন্তু এই সহায়তার ফলে সুইসগণতন্ত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার উপর একটা আভিজাত্যের ছাপ পড়িয়া গেল।

এখন উত্তরফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্সের পৌরসংঘ, রাইননদীর তীর ও হানসেয়াটিক লীগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। সেখানে গণতন্ত্রনীতি নগরগুলির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; অথচ আরম্ভ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এ নীতি বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবেনা, সমগ্র সমাজের শাসন ভার অধিকার করিতে পারিবে না। উত্তরের নগরগুলি চারিদিকে ফিউডাল সমাজ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ছিল, ফিউড্যাল ভূস্বামী ও ফিউড্যাল রাজশক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইহা সুস্পষ্ট যে তাহারা কেবল আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিল, অধিকার বিস্তৃতির কোন চেষ্টা করে নাই। তাহারা নিজেদের বিশিষ্ট অধিকারগুলি বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু নগরপ্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যেই তাহারা আবদ্ধ ছিল। গণতন্ত্রসমাজবন্ধন প্রাচীর-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, আর অগ্রসর হইল না; নগরের বাহিরে পল্লীপ্রদেশে গিয়া পড়িলেই গণতন্ত্রের আর কোন সন্ধান পাই না।

গণতন্ত্রের পক্ষ হইতে সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার পরিণতি এখন দেখিতে পাইলেন; ইটালীতে সে চেষ্টা জয়যুক্ত হইল, কিন্তু তাহার উন্নতি বা স্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না; দক্ষিণদিকে সে চেষ্টা পরাভূত হইল; সুইজারলাণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহা ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিল; উত্তরে ফ্লাণ্ডার্সের পৌরতন্ত্রে, রাইনতীরে, হান্সেয়াটিক লীগে ইহা

পুরপ্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। এই অবস্থায় যদিও সমাজের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা হীনবল ছিল, তথাপি ফিউডাল অভিজাতবর্গ ইহাকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। ভূস্বামীগণ পুরীগুলির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিতেন এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেন; গ্রাম্য জনপদের মধ্যে এই গণতন্ত্রের ভাব প্রবেশ করিতে লাগিল; গ্রাম্য কৃষকগণ বারম্বার দৃঢ়তার সহিত বিদ্রোহ করিতে লাগিল। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া ফিউডাল অভিজাতবর্গ পৌরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দল বাঁধিয়া ফেলিল। দুই অসমান শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, কারণ পুরীগুলি ছিল পরস্পরস্বতন্ত্র, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া ছিল না, চিন্তা বিনিময় ছিল না, তাহাদের সমস্ত চিন্তাচেষ্টাই স্ব স্ব সীমায় আবদ্ধ ছিল। অবশ্য বিভিন্ন দেশের পৌর-প্রধানদিগের মধ্যে কতকটা সহানুভূতি ছিল; বর্গণ্ডীর ডিউকদিগের সহিত সংগ্রামে ফ্লাণ্ডার্সের পৌরসমাজের জয়পরাজয়ের বার্ত্তায় ফরাসী পৌরসমাজের চিত্ত আলোড়িত হইত সত্য; কিন্তু এ আলোড়ন ক্ষণস্থায়ী ও নিস্ফল; ইহার ফলে কোন যথার্থ ঐক্যবন্ধন বা সন্ধিবন্ধন হয় নাই; পুরীগুলি পরস্পরকে শক্তিদান করিতে পারে নাই। সুতরাং পৌরসমাজ অপেক্ষা ফিউড্যাল সমাজের অনেক বেশী সুবিধা হইল। কিন্তু ফিউড্যাল সমাজের নিজের মধ্যেই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, সুতরাং সে পৌরসমাজগুলিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল এই সংঘর্ষ চলিবার পর, যখন তাহাদের প্রতীতি হইল যে সম্পূর্ণ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ সকল গণতন্ত্রবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরপ্রধানদিগকে মানিয়া লওয়া আবশ্যক হইল, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা ও তাহাদিগকে রাষ্ট্রের অঙ্গ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক হইল। তখন এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ হইল, একটা মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন চেষ্টা হইল। এ চেষ্টার লক্ষ্য ছিল ফিউড্যাল ভূস্বামী, পৌরবর্গ, যাজকবর্গ ও রাজন্যবর্গ, সমাজের এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের বিরোধ মিটাইয়া, পরস্পর বিদ্বেষসত্বেও সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করান।

ফ্রান্সের ষ্টেট্স্ জেনারাল, স্পেন ও পর্টুগালের কর্টেস্, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট, জার্ম্মানীর ডীট্, এগুলি যে কি তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এই সকল বিভিন্ন সম্মিলনীর উপাদান কি কি ছিল তাহাও আপনারা জানেন। ফিউড্যাল অভিজাতগণ, যাজকগণ ও পৌরগণ এক শাসনাধীন একটি সম্মিলিত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সমস্ত সম্মিলনীতে একত্র হইতেন। বিভিন্ননামধারী এই সকল সম্মিলনীর একই লক্ষ্য, একই চেষ্টা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের ষ্টেটস্ জেনারেলটিকে ধরা যাউক। এই সম্মিলনী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। ইহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী কি ছিল না ছিল, ইহার সভাসংখ্যা কত ছিল, কি কি বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত, কতদিন পরে পরে ইহা আহূত হইত, এক একটী অধিবেশনের স্থায়িত্ব কতটুকু ছিল—এসকল বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ইতিহাস হইতে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট, সাধারণ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই সকল সম্মিলনীর প্রকৃতিসম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এগুলি যেন আকস্মিক ব্যাপার, প্রজার হাতেই হউক বা রাজার হাতেই হউক এ গুলি যেন শেষ অস্ত্র; রাজার অর্থ চাই, অর্থাভাব মোচনের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, তখন

তিনি ষ্টেট্‌স্ জেনারল ডাকিলেন। প্রজাগণ অন্যায় অকল্যাণ প্রতিবিধানের অন্য কোন উপায় পাইলনা, তখন তাহারা ষ্টেট্‌স্ জেনারালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ সম্মিলনীতে অভিজাতবর্গ উপস্থিত হইতেন, যাজকবর্গও যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহারা উদাসীন ভাবে আসিতেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের যথার্থ কার্য্য এ উপায়ে সম্পন্ন হইবে না, সমাজ শাসনে তাঁহারা যথার্থ যে অংশগ্রহণ করেন এ সম্মিলনীর দ্বারা তাহাতে কোন সহায়তা হইবে না। পৌরগণের উৎসাহও ইহাপেক্ষা অধিক ছিল না, ইহা এমন একটা অধিকার নহে যাহা পরিচালন করিতে তাঁহারা ব্যগ্র, কেবল প্রয়োজনের তাড়নাতেই তাঁহারা ইহা মানিয়া যাইতেন মাত্র। এই সকল সম্মিলনীর রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠানের ইহাই যথার্থ পরিচয়। ইহারা কখনও বা একেবারে নগণ্য, কখনও বা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। রাজার পরাক্রম যখন অধিক, তখন ইহাদের নম্রতা ও বশ্যতা একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইত। রাজার অবস্থা যখন দুর্ভাগ্য লাঞ্ছিত, সম্মিলনীর উপর যখন তাঁহার একান্ত নির্ভর, তখন সভ্যগণের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইত এবং সম্মিলনী তখন কোন অভিজাত ষড়যন্ত্র বা দুরাকাঙ্খ নেতার হস্তে অস্ত্র স্বরূপ পরিণত হইত। সুতরাং তাহাদের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইত; তাহাদের আশ্বাস ও উদ্যম অল্প ছিল না, কিন্তু তাহারা কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই। যে সমস্ত বড় বড় অনুষ্ঠান বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী সমাজের উপর কাজ করিয়াছে, শাসনতন্ত্রগঠন, ব্যবস্থা প্রণয়ন বা শাসন ব্যাপারে যে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিই ষ্টেট্‌স্ জেনারাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাই বলিয়া যে তাহাদের কোনই কার্য্যকারিতা বা প্রভাব ছিল না তাহা মনে করিলে চলিবে না। তাহাদের একটা নৈতিক প্রভাব হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ এই নৈতিক প্রভাবের বড় একটা হিসাব লওয়া হয় না। তাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, দেশের লোকের যে কর বসাইবার অধিকার আছে, স্বকীয় শাসন ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে, শাসকবৃন্দের উপর একটা দায়িত্ব আরোপ করিবার অধিকার আছে এইরূপ কতকগুলি মূল রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব তাহারা প্রবলভাবে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে।

এই সমস্ত তত্ত্ব যে ফ্রান্সে কখনই লুপ্ত হয় নাই, সে ষ্টেট্‌স্ জেনারালের জন্য। দেশের লোকের চিন্তা ও ব্যবহারে এইরূপে স্বাধীনতার স্মৃতি উজ্জীবিত করিয়া রাখা একটা সামান্য উপকার নহে। ষ্টেট্‌স্ জেনারালের ইহাতেই কৃতিত্ব; কিন্তু তথাপি সে কখনও দেশশাসনের প্রধান যন্ত্র হইতে পারে নাই; সে কখনও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির অঙ্গ স্বরূপ পরিণত হয় নাই। দেশের জনসমাজ যে কয়েকটি বিভিন্ন খণ্ড সমাজে বিভক্ত তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ জাতীয় সমাজ গঠন করার জন্য ষ্টেট্‌স্ জেনারালের সৃষ্টি; কিন্তু এ উদ্দেশ্য সে সাধন করিতে পারে নাই।

স্পেন ও পর্ত্তুগালের কর্টেসেরও সেই এক পরিণাম। তবে সহস্র বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এ পরিণাম নানারূপ ধারণ করিয়াছে। স্থান কাল বিশেষে কর্টেসের মর্য্যাদারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আরাগন ও বিস্কে প্রদেশে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, অথবা মুরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং সেখানে

কর্ত্তেসের অধিবেশনও ঘন ঘন হইত, পরাক্রমও বেশী ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে যথা ১৩৭০ ও ১৩৭১ খৃষ্টাব্দের কাস্তিল্ কর্ত্তেসে অভিজাতবর্গ ও যাজকবর্গ আহূতই হইত না। ঘটনাবলী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ রাশি রাশি বিশেষ তথ্যের হিসাব লইতে হইবে। কিন্তু আমাকে এখানে সাধারণ ভাবেই আলোচনা করিতে হইবে; সেই সাধারণ হিসাবে ফ্রান্সের ষ্টেট্‌স্ জেনারালের মত কর্ত্তেস্ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে তাহারা ইতিহাসে আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, তাহারা কখনও একটা পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা বা রীতিমত শাসনপ্রণালী গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের ভাগ্য অন্যরূপ। এ বিষয়ে আমি এখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবন লইয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিব। ইংলণ্ডের ইতিহাসের গতি কি কি কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পৃথক হইল কেন, এখানে কেবল সেই সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিব।

প্রথম দেখিতে হইবে ইংলণ্ডে কোন ভূস্বামী ছিল না, এমন কোন পরাক্রান্ত প্রজা ছিল না যে ব্যক্তিগত ভাবে রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে। ইংলণ্ডের বেরন্ ও বড় বড় ভূস্বামীকে রাজশক্তিকে বাধা দিবার জন্য একত্র দল বাঁধিতে হইয়াছিল। এইরূপে অভিজাত সমাজে সংঘনীতি ও যথার্থ রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহাছাড়া ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণকে ক্রমশঃ নানা ঘটনাবলীর তাড়নায় পৌরবর্গের সহিত সম্মিলিত হইতে হইয়াছিল, তাহাদিগের সহিত একত্রে পার্লিয়ামেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সে অর্থাৎ সাধারণ জনসভায় বসিতে হইয়াছিল। এইরূপে সাধারণ জনসভা সেখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনসম্মিলনী অপেক্ষা প্রভাবশালী হইয়া উঠিল, দেশের শাসনব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিবার যথার্থ সামর্থ্য লাভ করিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংরেজ পার্লিয়ামেণ্টের কিরূপ অবস্থা ছিল দেখা যাউক। হাউস্ অব্ লর্ড‌স্ অর্থাৎ অভিজাতসভা রাজার মন্ত্রিসভার মত ছিল, শাসনব্যাপারে তাহারা মুখ্যভাবে সংযুক্ত ছিল। সাধারণ জনসভা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও পৌরবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। শাসন কার্য্যে তাহাদিগের কোন যোগ ছিলনা, কিন্তু তাহারা প্রজার নানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করিত, এবং একান্ত উদ্যমের সহিত প্রজাদিগের ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বার্থ রক্ষা করিত। সমগ্রভাবে পার্লিয়ামেণ্ট এখনও শাসনভার গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এখনই ইহা একটি রীতিমত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, শাসন ব্যাপারের অপরিহার্য্য যন্ত্র স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপ সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্মিলিত করিয়া একটি রীতিমত রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের চেষ্টা ইংলণ্ডে সফলতালাভ করিল, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমি জার্ম্মানী সম্বন্ধে কেবল দুই এক কথা বলিব। জার্ম্মাণ ইতিহাসের প্রধান লক্ষণটি নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। সেখানে এই মিশ্রণ ও একীকরণের চেষ্টা তেমন উদ্যমের সহিত চলে নাই। সমাজের বিভিন্ন উপাদান ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতেছিল। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, আধুনিক কাল হইতেই একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল জার্ম্মাণীতেই এত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাচীন ফিউড্যাল নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে রাজশক্তি গঠিত হইয়া আসিয়াছে। আমি অন্য পোলাণ্ড বা শ্লাভোনীয়

জাতিদিগের কথা আনিতেছি না, তাহারা ত অনেক বিলম্বে ইউরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া ইউরোপের মধ্যে কেবল জার্ম্মাণীতেই যাজকরাজ্য স্থায়ী হইয়াছে, জার্ম্মানীতেই কেবল রাষ্ট্রীয়সত্ত্বাসম্পন্ন যথার্থ রাজক্ষমতামণ্ডিত স্বাধীন পৌরতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে আদিম ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান একমাত্র জাতীয় সমাজে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা অন্যত্র অপেক্ষা জার্ম্মানীতে নিস্তেজ ও নিস্ফল হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে সমস্ত বড় বড় চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখন আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। আপনারা দেখিলেন যে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। প্রসঙ্গ ক্রমে আমি এই ব্যর্থতার কারণ গুলিও নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল বিভিন্ন কারণ এক মূলকারণের অন্তর্নিহিত। সমাজ তখনও ঐক্য বন্ধনের পক্ষে যথেষ্ট উন্নত হয় নাই; মানুষের চিন্তা ও মানুষের জীবনে সমস্তই ব্যাপারই তখন সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এমন কোন সাধারণ স্বার্থবোধ বা সাধারণ মতের উদ্ভব হয় নাই যাহা দ্বারা বিশেষ স্বার্থ ও বিশেষ মতামত নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। উন্নত ও চিন্তাশীল মনীষিদিগের মনেও তখন শাসন ব্যাপার ও রাষ্ট্রীয় ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সম্যক্ ধারণা জন্মে নাই। বোধ হয় ইহা আবশ্যক ছিল যে একটা সক্রিয় ও সতেজ সভ্যতা আসিয়া আগে সমাজের এই সকল পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলিকে পেষণযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিবে; ইহা আবশ্যক ছিল যে প্রথমে নানা বিচিত্র স্বার্থ বিধি বিধান রীতিনীতি ও চিন্তাকল্পনা একীকৃত ও কেন্দ্রীভূত হইবে; এক কথায় আবশ্যক ছিল যে একটা সাধারণ শক্তি ও সাধারণ মতের উদ্ভব হইবে। যে যুগে এই বিরাট কেন্দ্রীকরণ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল এখন আমরা সেই যুগের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি। এই ব্যাপারের পূর্ব্বলক্ষণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোকের চিন্তা ও রীতিনীতির অবস্থা, একটা কেন্দ্র শক্তি ও সাধারণ লোকমত গঠনের দিকে সমাজের গতি, ইহাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। *

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ

বাংলা দেশে শিক্ষার বিস্তার

ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সাহিত্যিক কে? জিজ্ঞাসা করিলেই বাঙালী রবীন্দ্রনাথের নাম করিতে হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেও বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্রের নাম করিতে হয়। বাংলা দেশে যত কলেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তত নাই। কলেজের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সম্প্রতি কাগজে দেখিলাম, করটিয়াতে একটি এবং কাঁথিতে একটি, দুটি নূতন কলেজ হইয়াছে। এই সব তথ্য বিবেচনা করিয়া বাঙালীদের এই ধারণা দৃঢ়তর হয়, যে,

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালীরা শিক্ষায় ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সাধারণ কলেজে, বৃত্তি শিক্ষার কলেজে এবং উচ্চবিদ্যালয় সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রসংখ্যার তুলনা করিলেও এই রূপ ধারণা হয়। ১৯২৪ সালে ছাত্রসংখ্যা প্রধান প্রধান প্রদেশে এই রূপ ছিল :—

প্রদেশ।	সাধারণ কলেজ।	বৃত্তিশিক্ষার কলেজ।	উচ্চস্কুল।
মান্দ্রাজ	৯১৭৭	২২৭৯	১৩০১০৯
বোম্বাই	৫৮৯৬	২৭১২	৫৪২৩৮
বঙ্গ	২২৬৪১	৫৯১৮	২১০৭৪৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৯৫৬	২২৪৮	৫২৭৮১
পঞ্জাব	৫৫২৭	১১৪১	৯৫৮১১
ব্রহ্মদেশ	৮৭১	১৫৫	২৮৫৪৩
বিহার ওড়িষা	২৬০০	৫৭৪	৩০০৪৮
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১০২২	৩৪৪	৩৮৬১
আসাম	১০২৭	৮৩	১২৬০৯

মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী ছাত্র পড়ে পঞ্জাবে। সকল প্রদেশের মধ্য বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। পঞ্জাবে তৎসমুদয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৮৫৮৮৫, বঙ্গে ১২৬২৫১। অথচ পঞ্জাবের মোট লোকসংখ্যা বাংলা দেশের অর্দ্ধেকেরও কম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও বাংলা অপেক্ষা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ছাত্রসংখ্যা অধিক ; বাংলায় ১২৫৬২০৯, মান্দ্রাজে ১৫৮০১৯৭। অথচ মান্দ্রাজের মোট লোকসংখ্যা বাংলা অপেক্ষা কম।

কোন প্রদেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা কতজন কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, যে বাংলা দেশ সর্ব্বোচ্চস্থানীয় নহে। ইহার ১৯২৪ সালের তালিকাটি নীচে দিতেছি।

প্রদেশ।	মোট অধিবাসীর শতকরা কতজন শিক্ষালয়ে পড়ে।
মান্দ্রাজ	৪·৯
বোম্বাই	৫·২১
বাংলা	৪·৪০
আগ্রা-অযোধ্যা	২·৫৩
পঞ্জাব	৪·০৭
ব্রহ্মদেশ	৪·২০
বিহার-ওড়িষা	২·৬৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	২·৫৩
আসাম	৩·২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২·৬
কূর্গ	৫·৩৫

প্রদেশ।	মোট অধিবাসীর শতকরা কতজন শিক্ষালয়ে পড়ে।
দিল্লী	৪·৮
আজমের-মেরোআরা	৩·৩
বালুচীস্তান	১·৯
বাঙ্গালোর	১০·৫

এই তালিকাতেই দেখা যাইতেছে, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি ছাড়িয়া দিলেও, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা যতজন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায়, বাংলা দেশে তত পায় না। অতএব বাঙালীরা বিশেষ সাবধান হইয়া শিক্ষার ব্যবস্থায় আরো মন না দিলে যে আরও পিছাইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন্ প্রদেশে ও কোন্ দেশী রাজ্যে লিখনপঠনক্ষম লোক হাজারকরা কতজন আছে, তাহা হইতেও সেইসব অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে ইহার একটি তালিকা দিতেছি।

প্রদেশ।	হাজারকরা লিখনপঠনক্ষম।
আজমের-মেরোআরা	১১৩
আণ্ডামান-নিকোবর	১৯৫
আসাম	৭২
বালুচীস্তান	৪৭
বাংলা	১০৪
বিহার ওড়িষা	৫১
বোম্বাই	৯৫
ব্রহ্মদেশ	৩১৭
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৪৯
কূর্গ	১৪৪
দিল্লী	১১২
মান্দ্রাজ	৯৮
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০
পঞ্জাব	৪৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৪২
দেশীরাজ্য ও এজেন্সী।——	
বড়োদা	১৪৭
মধ্যভারত	৩৬
কোচীন	২১৪
গোয়ালিয়র	৪০
হাইদরাবাদ	৩৩

কাশ্মীর	১৬
রাজপুতানা	৩৯
মহীশূর	৮৪
সিকিম	৪৫
ত্রিবাঙ্কুড়	২৭৯

উপরের তালিকাটিতেও দৃষ্ট হইবে যে, বাংলা দেশ সর্ব্বোচ্চস্থানীয় নহে।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে কতজন লিখিতে পড়িতে পারে, তাহার যে তালিকা নীচে দিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালীদের গর্ব্বিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

প্রদেশ।	হাজারকরা কতস্ত্রীলোক লিখনপঠনক্ষম
আজমের-মেরোআরা	
আণ্ডামান নিকোবর	৩৬
আসাম	১৪
বালুচীস্তান	৭
বাংলা	২১
বিহার ওড়িষ্যা	৬
বোম্বাই	২৭
ব্রহ্মদেশ	১১২
মধ্যপ্রদেশ বেরার	৯
কূর্গ	৫৮
দিল্লী	৪০
মান্দ্রাজ	২৪
উত্তরপশ্চিমসীমান্তপ্রদেশ	১০
পঞ্জাব	৯
আগ্রা অযোধ্যা	৭
দেশীরাজ্য ও এজেন্সী——	০
বড়োদা	৪৭
মধ্যভারত	৬
কোচীন	১৫
গোয়ালীয়র	৭
হইদারাবাদ	৮
কাশ্মীর	৩
মহীশূর	২২
রাজপুতনা	৫
সিকিম	৩
ত্রিবাঙ্কুড়	১৭৩

এই তালিকাতে দৃষ্ট হইবে, যে, বাংলা দেশ স্ত্রীশিক্ষায় বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ ও মান্দ্রাজের নীচে, এবং দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে বড়োদা, কোচীন, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুড়ের নীচে। ইহার একটি প্রধান কারণ অবরোধ প্রথা। যে যে প্রদেশ ও দেশীরাজ্য স্ত্রীশিক্ষায় বাংলাদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে, তথায় বঙ্গের মত অবরোধপ্রথা নাই।

অবশ্য স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের অন্য অনেক বাধা আছে; যেমন বাল্যবিবাহ। কিন্তু তাহা বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং দেশী রাজ্যগুলিতেও বিদ্যমান আছে।

এই জন্য আমি অবরোধ প্রথাকে বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষায় অনগ্রসর অবস্থার একটা প্রধান কারণ বলিয়াছি।

স্ত্রীশিক্ষার অন্য কোন উপকারিতা না থাকিলেও কেবল নারীদের কল্যাণের জন্যই উহাতে মন দেওয়া উচিত। কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ, এবং পুরুষ জাতির কল্যাণ স্ত্রীশিক্ষার উপর নিভর করিতেছে। এই কারণে উহার প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক।

কেবল যে শিক্ষার বিস্তারে বাংলা দেশ ভারতসাম্রাজ্যে প্রথমস্থানীয় নহে, তাহা নয়; বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও খুব উৎকৃষ্ট নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং প্রথম বিভাগে স্থান পাওয়া সহজ হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন ছাত্রদের সংখ্যার তুলনায় অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াও একটি কারণ।

শিক্ষায় অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত আমি বাংলা দেশের তুলনা করিলাম না। তাহা করিলে বুঝা যাইত, আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। প্রাচ্য জাপান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের তুলনাতেও আমরা অত্যন্ত অনগ্রসর।

মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রকৃত অবস্থা মনে রাখিয়া আমাদিগকে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে মন দিতে হইবে।

উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা যতটা মনোযোগী, তৎসমূহের শিক্ষার উন্নতিতে আমরা ততটা মনোযোগী নহি। তাছাড়া, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধিতে এবং তৎসমুদয়ের শিক্ষার উন্নতিতে আমরা যথেষ্ট মন দিই না। বাংলা দেশে অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। উচ্চবিদ্যালয়স্থাপনও কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত অর্থদান অল্পলোকেই করিয়াছেন। অথচ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি উৎকৃষ্ট ও দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উপরই স্থাপন করিতে হইবে।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা আমাদের দেশে এত বেশী যে কেবল বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে না। প্রাপ্তবয়স্কা নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগের শিক্ষার বন্দোবস্তও করিতে হইবে। বাংলা দেশে এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট হইতেছে না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পূরবী

রবীন্দ্রনাথ যে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, বলাকায় তাহার পরিচয় অতি ক্ষীণ, কিন্তু এই বার্দ্ধক্যের কথা ভুলিয়া গেলে পূরবীর সমস্তই অপরিষ্কার থাকিয়া যাইবে। ইহাই পূরবী সম্বন্ধে প্রথম কথা। পূরবীর বেশীর ভাগ কবিতায় আমরা দুইটি সমস্যার অবতারণা দেখিতে পাই—একটি ক্ষণিকতা এবং আর একটি মৃত্যু। জীবনের প্রান্তে আসিয়া কবির মনে স্বভাবতঃ এই দুইটি সমস্যাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের আমরা বারবার সাক্ষাৎ পাই। এই জীবনে যাহাদের এত ভালবাসিলাম তাহারা সব গেল কোথায়? আমার এই এতদিনকার বৈচিত্র্যময় জীবনে—ইহার শেষ ফলটা কি? অমরত্ব ও তাহা লাভ করিবার উপায় কি? পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর।

"সত্যেন্দ্রনাথ" কবিতায় মৃত্যু খুব মর্ম্মস্পর্শীরূপে দেখা দিলেও, তাহার কুৎসিত দিকটার কোনই উল্লেখ নাই। এখানে মৃত্যুকে দেখি মুক্তিপথের সিংহদ্বার। কবি, সত্যেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন—

—"আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিলো অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,

তাঁহার নিজেরও আশা আছে—

তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে—"

কিন্তু "সত্যেন্দ্রনাথের" সহিত যদি "কঙ্কালের" তুলনা করি, তবে তফাৎটা সহজেই বুঝা যাইবে। "কঙ্কালে" মৃত্যু যে শুধু "শূন্য অস্থি দিয়ে" শোধা "আহার-নিদ্রার শেষ ঋণ" এই সম্ভাবনাটা কবির মনে খুবই পরিস্ফুট। কিন্তু এই "শূন্যতার উপহাসকে" তিনি জয় করিতেছেন কিসে? অমর্ত্ত্যলোকে যাইবার সুন্দর ও সরল বিশ্বাসের দ্বারা নয়। জয় করিতেছেন এই বলিয়া :—

"ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে,
ধরেনি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্ত্যে তার কোথা পরিমাণ?"

আমাদের সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাহাদের জন্ম ও মৃত্যু, তাহারা যে শূন্যে বিলীন হইয়া যায় না, এই বিশ্বের গৃহস্থালীতে সঞ্চিত হইয়া কোন না কোন সময়ে নিজেদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যুর উপহাসের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ইহাই সব চেয়ে বড় আশ্বাসবাণী। মৃত্যুর পরপারে গিয়া যে অমরত্ব লাভ করিব তাহা নহে; এইখানে এই মরণ বেড়ার এপারে থাকিয়াই আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেদের অমরত্ব নিজেরাই সৃজন করিতেছি। আমার মনে হয় আত্মার অমরত্বে যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে তাহার চেয়ে এটা একটা মহত্তর আশ্বাস। এই দিক হইতে ব্রাউনিংয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"বৈতরণী"তেও দেখি মৃত্যুর অনিত্যত্বের ...ছনে শাশ্বতের প্রাসাদ রচনা করিয়াছে কারা ?

"সে সুন্দর বসেছিলো মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্ম-বেশে,
যে চির-মধুর
দ্রুতপদে চলে গেলো, নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।"

যে সমস্ত ক্ষণিক আনন্দ তখনই উদয় হইয়া তখনই মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের হাতেই মৃত্যুর প্রকৃত পরাজয়। সুতরাং যদি অমরত্ব লাভ করিতে হয়, তবে এই নশ্বর মুহূর্ত্তগুলিকেই সযত্নে ব্যবহার করিতে হইবে। জীবনের দিকে এই ঝোঁক দেওয়ার দাম যে কতখানি তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মৃত্যু যে কুৎসিত পরিহাসের দ্বারা তাঁহার জীবনকে রিক্ত ও তিক্ত করিতে চাহিয়াছিল, কবি বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষণিক আনন্দই সেই পরিহাসের একমাত্র উত্তর। সেইজন্য পূরবীতে দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতীত জীবনের যত কিছু ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক ভালবাসা সেইগুলিকে সযত্নে সঞ্চয় করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। এইগুলিই মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহার অস্ত্রাগার। কখনও দেখি "পুরাণো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা," তাহার কথাই ভাবিতেছেন।

"আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জ্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এলো আমার অধর পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখীর মতো কম্পিত চুম্বন
সেদিন নির্জ্জন অঙ্গন।"

আবার হয়ত ভুবন ডাঙ্গার মাঠে সেই আকন্দ ফুলটার কথা মনে পড়িয়া গেল।

"মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চ'লেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কি জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ু ভরে পাঠালে আকন্দ।"

এইরূপ অনেক আছে। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া কাজ নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কবিতার কথা উল্লেখ না করা চলে না। কবিতাটির নাম "ক্ষণিকা"। "ক্ষণিকা" যে শ্রেষ্ঠ কবিতা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার কারণ প্রথমতঃ ইহার বিষয়বস্তুই হইল পূরবীর প্রধান আইডিয়া, দ্বিতীয়তঃ ইহার স্তবগানের সুর উদার গম্ভীর অথচ ব্যাকুল ও মর্ম্মস্পর্শী আবেদন। যদি বিশ্লেষণ করি ইহার শিল্পচাতুর্য্য কোথায়, তবে দেখিব শুধু কথার তান সৃষ্টিতে এবং অস্পষ্ট আলোছায়ার রূপনির্ম্মাণে। ইহার মধ্যে স্পষ্ট চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা নাই, মনস্বিতার পরিচয় কোথাও নাই। সমস্তটা একটা সঙ্গীতের মত কতকগুলি ভাব জাগাইয়া দেয়। পূরবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতার পক্ষেই এই একই কথা বলা চলে।

আমরা দেখিয়াছি যে লুপ্ত ও বিস্মৃত ক্ষণিক আনন্দগুলির অনুসন্ধান পূরবীর একটা বিশেষত্ব। জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া অনিত্যত্ব ও চির বিদায়ের ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া এই গুলির মধ্যেই নিত্যতার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কিন্তু পূরবীর সমস্ত কবিতার মধ্যেই যে এই আনন্দ অনুসন্ধান ও আনন্দ আহরণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নয়। পূরবীতে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে সেখানে মৃত্যুর হাতে পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এত সহজে উড়াইয়া দিবার প্রয়াস নাই। এই সমস্ত কবিতায় বিষাদের সুর খুবই সুস্পষ্ট; কবির

কণ্ঠস্বর যেন জলভারাক্রান্ত। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, মৃত্যুর হাতে সুন্দরের পরাজয়কে বুঝি আর ঠেকান যায় না। কিন্তু তাহা হইলে? তবে কি সমস্তই শূন্য? না, তাহা নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে শূন্যতার সন্দেহ কিছুতেই স্থান পায় না। কিন্তু এই যে এমন সুন্দর কাশের মঞ্জরী, ওই যে হাস্যোৎফুল্ল কেতকী ফুল, ওই যে বাহুবদ্ধ কিশোর কিশোরী, ইহারা কি মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না? ইহার সমাধান কি? রবীন্দ্রনাথ যে সমাধান করিয়াছেন তাহা এই যে, সুন্দরের সহিত মরণের যে বিরোধ আমরা দেখিতে পাই, সেটা বিরোধই নয়, বরং ঠিক উল্টা জিনিষ। সুন্দর অসংখ্য উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করিয়াও কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না; তাই মাঝে মাঝে তাহার নেশা চাপিয়া উঠে যে নিজের সমস্ত সৃষ্টি ভাঙিয়া চূরিয়া, সমস্ত কাজ হইতে অবসর লইয়া সে কিছুদিন মরণের মাঝে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে। মরণ কি? না রুদ্র। সুতরাং বিশ্বটা আর কিছুই নয়, শুধু রুদ্র ও সুন্দরের সঙ্কোচন ও প্রসারণ। এই রুদ্র ও সুন্দরের বিচ্ছেদ অথচ মিলন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ভাবে পাইয়াছেন মহাদেবের মধ্যে। তিনিই হইলেন এই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। তাই মৃত্যুচ্ছায়ায় রচিত এই পূরবীতে আমরা মহাদেবের বারে বারে ও নানা রকমে সাক্ষাৎ পাই।

উপরে যে কথা কয়টি বলিলাম, পূরবীর কবিতাগুলি হইতে তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমে ধরা যাউক "যাত্রা"।

"আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে 'চলো চলো'।

মরণের রুদ্র নেশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। তাই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বলে—

"—বৃন্ত-বন্ধহারা
যাবো উদ্দামের পথে; যাবো আনন্দিত সর্ব্বনাশে
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাবো, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,"

সেইখানেই তাহাদের সার্থকতা। তাই তাহারা কবিকেও তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। কবিও প্রস্তুত। তিনি বলিতেছেন—

"আমি তব সাথী
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির-সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সঙ্গীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে
সমর্পিব নির্ব্বাকের নির্ব্বাণ বাণীর হোমানলে।"

সুন্দর ও রুদ্রের মহাদেবের মধ্যে মিলন, ইহার চরম প্রকাশ হইয়াছে "তপোভঙ্গ" কবিতায়, যদিও সুপ্রভাতের মধ্যে ইহার কতকটা ইঙ্গিত আছে। কাহারও কাহারও মতে তপোভঙ্গই পূরবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা। সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও "তপোভঙ্গে"র মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ জীবনমরণসমস্যার তাঁহার শেষ সমাধানটা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। এই দিক হইতে "তপোভঙ্গ"কে পূরবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা বলা যাইতেও পারে, কেননা ওই সমস্যাটাই পূরবীর নিজস্ব জিনিষ। তপোভঙ্গ একটা রূপক। মহাদেব হইলেন কালের প্রতিমূর্ত্তি। সেই কাল যখন প্রসারিত হইয়া সৌন্দর্য্যের জন্য প্রকাশের জন্য উদ্দাম হইয়া দিকে দিকে ছুটিয়া যায়, মহাদেবের তখন তপস্বী বেশ ঘুচিয়া যায়।

"সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেলো ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান-মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি দিলো অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।"

কিন্তু আবার সঙ্কোচনের যুগ আরম্ভ হয়, আবার মহাদেবের তপস্যার দিন আসে। তখন

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জ্জন প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে।"

কিন্তু সেই সমস্ত আনন্দের দিনগুলি কোথায় গেল। তাহারা কি শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে ?

"নহে নহে, আছে তা'রা ; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।"

যেদিন মহাদেবের পুনরায় তপস্যা ভাঙ্গিবে সেদিন—

"বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।"

সুতরাং কিছুই ব্যর্থ হয় না, শুধু কিছুদিনের জন্য চাপা থাকে মাত্র। কেবল মহাদেবের তপস্যা ভাঙ্গিলেই হইল। কবির গর্ব্ব তিনি সেই তপোভঙ্গের দূত।

"তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।"

মৃত্যুর রাজত্বে এই তপোবনের মধ্যে আনন্দ কুড়াইতে গিয়া তিনি লঘুতার পরিচয় দিতেছেন না, অসম্মান করিতেছেন না। রুদ্র যে তাহাই চান। রুদ্র চান যে তাঁহার তপস্যা ভাঙ্গুক।

"হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে

আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।"

সুতরাং আনন্দ আনন্দ আনন্দ ইহাই হইল শেষ কথা।

মৃত্যু, ক্ষণিকতা এবং রুদ্র ও সুন্দরের একত্ব এইগুলিই পূরবীর বিশেষত্ব হইলেও, পূরবীতে যে আর কিছুই নাই ইহা বলা চলে না। রবীন্দ্র কাব্যের যাহা চিরন্তন জিনিষ, প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের অনুসন্ধান, বিশ্ব প্রকৃতির মানবিকতা পূরবীতে ইহাদের পরিচয় যথেষ্ট আছে। সুতরাং পূরবীতে বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কিন্তু পূরবীর আগাগোড়া পড়িয়া গেলে একটা একত্বের পরিচয় খুবই পাওয়া যায়। সেই একত্বকে বিশ্লেষণ করিলে দেখি তাহা কতকটা লিপিকৌশলের একত্ব এবং কতকটা মেজাজের একত্ব। এই দুইটির মধ্যে অবশ্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পূরবীতে যে মেজাজের পরিচয় পাই তাহা সর্ব্বদাই শান্ত সমাহিত ও গম্ভীর; অথচ উদাসীন নহে, তাহা উন্মুখ ও তেজোময়। এই মেজাজটাই পূরবীর কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটা সুন্দর ঐক্য আনিয়া দিয়াছে।

এই সম্পর্কে পূরবীর দুইটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। একটি "সাবিত্রী" এবং আর একটি "অন্ধকার"। "সাবিত্রীর" মত এরূপ গম্ভীর অভ্রভেদী ও উদ্বুদ্ধ স্তবগান রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আর কখনও আমরা পাই নাই। আমার বিশ্বাস যে এক ঋগেদ ছাড়া আর অন্য কোথাও ইহার তুলনা হয় কি না সন্দেহ। সাবিত্রী আটও আমাদের ঋগেদের কথাই মনে পড়াইয়া দেয়। ইহার প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছে :—

ঘন অশ্রু বাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মপানি
দেখা দিক ফুটি।

এরূপ শান্ত অথচ তেজোময় গাম্ভীর্য্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটু নূতন জিনিষ। প্রকৃতির সহিত প্রেমালাপের সুর আমরা তাঁহার নিকট অনেক পাইয়াছি। কিন্তু স্তব গানের সুর আমরা সাবিত্রীর মধ্যেই প্রথম পরিপূর্ণভাবে পাইলাম। আর পাই 'অন্ধকারের' মধ্যে। যদি পূরবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ও অভিনব কবিতা আমায় বাছিয়া দিতে হয় তবে আমি নিশ্চয় সাবিত্রীকেই বাছিয়া দিব।

সাবিত্রী ও অন্ধকার দুইটিকেই আমি স্তবগান বলিয়াছি; কিন্তু এই দুইটির সুরের অনেক তফাৎ আছে। সাবিত্রীর গাম্ভীর্য্য ও স্তবগান যেন গগনচুম্বী; কিন্তু অন্ধকারের সুর একটু নরম, যেন গান্ধার কোমলেই আটকাইয়া আছে। এই দুইটা কবিতার মধ্যে অন্ধকারই অধিকতর রাবীন্দ্রিক ও পূরবীর অন্যান্য কবিতার সহিত সমঞ্জস। রাবীন্দ্রিক এই জন্য বলিলাম যে অন্ধকারের মধ্যেই সমস্ত আলোকের চরম চরিতার্থতা, ইহা রবীন্দ্রনাথের এক নিজস্ব কল্পনা। এই কল্পনাটাই "অন্ধকার" কবিতার প্রাণ।

হে গম্ভীর আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে,
সেখানে দিনান্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে,
তোমার চরণে নত হলো।
সেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণ বেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণ তলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"!

তাঁহার প্রাণের পরিতৃপ্তি যে কর্ম্মের মধ্যে নয়, আনন্দের মধ্যে ইহাও রবীন্দ্রনাথ অসংখ্যবার বলিয়াছে। অন্ধকারেও দেখি, এই পৃথিবীতে কত শ্রেষ্ঠির হাতে কত কীর্ত্তির পুরস্কার পাইয়াছেন কিন্তু ক্রমে অন্ধকারের সিংহদ্বারে আসিয়া দেখিতে পাইতেছেন, যে সেই

সমস্ত সোনার অলঙ্কার সমস্তই ম্লান হইয়া গিয়াছে। তবে তিনি কি লইয়া যাইবেন? কিছুই কি নাই?

কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রা সহচরী
অকারণে দিয়েছিলো মোর হাতে মাধবী মঞ্জরী
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেবো তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে॥

এইখানেই পূরবীর অন্যান্য কবিতার সহিত "অন্ধকারের" সাদৃশ্য। এই যে আনন্দের কণিকাগুলি ইহাদের জয়গান করাই পূরবীর উদ্দেশ্য।

অন্ধকারের সহিত গীতাঞ্জলির যাত্রাশেষের তুলনা করিয়া পড়া উচিত। উভয় কবিতার আইডিয়াটি একই। কিন্তু শুধু আইডিয়ার দ্বারাই একটা ভাল কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে না। আসল জিনিষ হইল শিল্প কৌশল। এই দিক দিয়া দেখিলে যাত্রাশেষের চেয়ে অন্ধকার অনেক শ্রেষ্ঠতর কবিতা। ইহার প্রথম কারণ,কথা,ধ্বনি ও ছন্দের পার্থক্য। যাত্রাশেষের কথাগুলি শেষের দিকে অত্যন্ত দৈনন্দিন ও লঘু হইয়া আসিয়াছে; বিষয়বস্তুর মহত্বের সহিত এটা অসমঞ্জস। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কোথাও এ দোষ নাই। শব্দগুলি বরাবরই গম্ভীর, ভরাট ও স্বপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত: অন্ধকারের যতিবাহুল্য ও দীর্ঘস্বরের প্রাচুর্য্য যে গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাত্রাশেষের মধ্যে কোথাও তাহা নাই। তৃতীয়তঃ রূপকল্পনার পার্থক্য। চতুর্থতঃ অন্ধকারের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের একটা ছাপ দেখিতে পাই।

কত না শ্রেষ্ঠির হাতে পেয়েছি কীর্ত্তির পুরস্কার,
সযত্নে এনেছি বহে সেই-সব রত্ন অলঙ্কার,
ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।

এই ছত্রকয়টিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের বারবার ইয়ুরোপযাত্রা ও সেখানে বহু সম্মান লাভের একটা উল্লেখ পাই না কি?

পূরবীর অন্যান্য কবিতার পরিচয় দিবার আগে এইবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রথমে ধরা যাউক বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্র নাথের মনোভাব। এই মনোভাবকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে ইহার পিছনে বেশ সুস্পষ্ট একটা তত্ত্ববিজ্ঞান আছে। এই যে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি,এই যে ফল, জল,আকাশ, বাতাস,আলোক ও অন্ধকার, ইহারা সব বিচ্ছিন্ন নহে; ইহাদের মধ্যে একটা প্রাণের একত্ব আছে। সেই প্রাণের অধীশ্বর এক অনন্ত পুরুষ। এই পুরুষ যে শুধু প্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে; মানবের মধ্যেও সেই একই পুরুষের পরিচয়। সুতরাং মানব ও প্রকৃতির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই; সমস্ত এক; এই যে আমি মানব ও এই ধূলিকণা ইহারা একই জিনিষ। অবশ্য এই "সমস্ত এক" কথাটা খুবই পুরাতন। তবে যদি শুধু অদ্বৈতবাদই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বস্তু হইত, তবে ভারতবর্ষে আমরা তেত্রিশকোটি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

এই একত্বে আসিয়া থামেন নাই। তিনি আর একটা প্রশ্ন করিয়াছেন যে এই অখণ্ড আত্মা এত অসংখ্যরূপের মধ্য দিয়া এত বিচিত্র ভাবে নিজকে প্রকাশ করেন কেন? তাহার উদ্দেশ্য কি? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন, আনন্দ। সুতরাং সেই অসীম ও অনন্ত পুরুষ যে উদ্দেশ্য লইয় আমাদের মধ্যে নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে আমাদের আনন্দানুভূতিকে যতদূর সম্ভব বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজের এই কাজ ঠিক করিয়া লইয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রভুর জন্য যত বেশী পারেন আনন্দের মুহূর্ত্ত সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইবেন। এই আনন্দের সন্ধান তিনি সবচেয়ে পূর্ণভাবে পাইয়াছেন প্রকৃতির মধ্যে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি বলা যাইতে পারে। তাহার পর পাইয়াছেন শিশু, যুবক ও নারীর মধ্যে। সুতরাং প্রকৃতি এবং শিশু, যুবা ও নারী, এই চারিটিই হইল রবীন্দ্র নাথের প্রধানতম কাব্যবস্তু।

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ নহে। এই খানেই শেলি, কীট্‌স্ ও টেনিসনের সহিত তাঁহার পার্থক্য ও ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থ উভয়েই প্রকৃতির সহিত নিবিড় মিলনের বাসনা চরিতার্থ করিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের তফাত এই যে ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থের মধ্যে আমরা প্রকৃতির ও মানবত্বের মধ্যে বেশ একটা সীমারেখা দেখিতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে সেই সীমারেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি মানবিকতায় পরিপূর্ণ। জলে, স্থলে, আকাশে, ও বাতাসে, ফলে, ও ফুলে, সর্ব্বত্রই আমরা মানবমনের হাসি কান্নার ছোঁয়াচ পাই। সেই জন্য বিশ্ব প্রকৃতির মানবিকতাকে আমি রবীন্দ্র কাব্যের এক চিরন্তন জিনিস বলিয়াছি।

ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের আর একটা তফাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য লইয়া। ওয়ার্ড্‌স্ ওয়ার্থ প্রকৃতির নিকট গিয়াছেন জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তিলাভের জন্য। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নিকট গিয়াছেন, প্রকৃতির মধ্যে সেই অনন্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সেই অসীম ক্ষমতা নানাভাবে নিজকে প্রকাশ করিতেছেন, অথচ কোথাও তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ নাই। পূর্ণ প্রকাশের জন্য একটা ব্যাকুল আবেদন তাঁহার কাব্যে প্রভাত সঙ্গীত হইতে পূরবী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই আবেদন কখনও বা কবির নিজের, কখনও বা প্রকৃতির। খেয়া, নৈবেদ্য বা সোনার তরীতে যে রহস্যাভাস, যে প্রশ্নোন্মুখতা দেখি, তাহার মূলে এই তত্ত্ব-বিজ্ঞানটা খুব পরিস্ফুট নয় কি?

ব্যক্ত ও অব্যক্তের যে বিচ্ছিন্নতা তাহার জন্য আগেকার কবিতাগুলিতে একটা অশান্তি ও ক্ষোভ দেখিতে পাই। গীতাঞ্জলিতে এই অশান্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। সেখানে দেখি সসীম ও অসীমের সর্ব্বত্রই পরস্পরের মধ্য দিয়া সার্থকতা। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে কবির মন ভরপুর হইয়া কেবলই এই সার্থকতাকে উপভোগ করিয়াছে; কোথাও তাহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করে নাই। বলাকাতে এবং বিশেষ করিয়া পূরবীতে এই ব্যাখ্যা দিবার এবং তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা খুবই পরিস্ফুট। সেইজন্য পূরবীতে তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সুন্দর ও রুদ্রের লীলা, ইহাই বিশ্বের মর্ম্মকথা; তাহারা আর কিছুই নহে, সসীম ও

অসীমের প্রতীক মাত্র। আর পূরবীতে মরণের যে সমাধানটা আমরা দেখিতে পাই, সেই সমাধানটাও রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ববিজ্ঞানের সহিত খাপ খাইয়া যায়।

তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা এত বেশী করিয়া বলার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলব্ধি তাঁহার দাশনিক-আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা কঠোর ভাবে সীমাবদ্ধ। সেই জন্য তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই বিষয়বস্তু ও প্রেরণার দিক হইতে একটা একত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যে যে বৈচিত্র্য নাই এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্যে নয়। তিনি যে "উর্ব্বশী" "মেঘদূত" "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" এবং "পুরাতন ভৃত্য" লিখিয়াছেন তাহা আমি ভুলি নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, বৈষ্ণব কবিদের মত তাঁহার কাব্য গ্রন্থেরও বেশীর ভাগ অংশে আমরা একই বিষয়ের সহস্রবার পুনরাবির্ভাব দেখিতে পাই। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদের অসন্তোষ আসে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতারিত করিতেছেন। তিনি বারবার আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেই একই জিনিসের আস্বাদ দিতেছেন কেন? অবশ্য বলাকার সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কিন্তু পূরবীতে আবার সেই সব পুরাতন কথা, পুরাতন প্রশ্ন, পুরাতন অনুসন্ধান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একটু মুখ ফিরাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে এই ইচ্ছাটা অসঙ্গত। বিষয়বস্তুর ও প্রেরণার একত্ব সত্ত্বেও পূরবীর কোন কোন কবিতা ও (ধরা যাউক্) সোনার তরীর কোন কোন কবিতা মোটেই এক জিনিষ নহে। রবীন্দ্রনাথের অল্প কয়েকটি বিষয়বস্তুর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততার যে অভিযোগ করার কিছুই নাই তাহা নয়। কিন্তু শুধু এই বিশ্বস্ততার জন্যই তাঁহার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা যেন উপভোগ করিতে ভুলিয়া না যাই। এই উপভোগের জন্য মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান জিনিস হইল তাঁহার সঙ্গীত। সঙ্গীতের উপাদান গুলি সর্ব্বত্রই এক; কিন্তু এই গুলির বিভিন্ন পরিমাণে ও বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের ফলে বিভিন্ন সঙ্গীতে আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া যায়। তবে এই বিভিন্নতাগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তাহা বুঝিতে গেলে শ্রোতার পক্ষে একাগ্রচিত্ত হওয়া ও মনকে ঢালিয়া দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে। শুধু শব্দরচনার কৌশলের দ্বারা যে কত বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি করা যায়, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে রকম পাই, সে রকম আর কোথাও পাই না।

আর একটা কথা এই যে বিষয়বস্তুই কোন কবিতার আসল জিনিস নয়। আসল জিনিস হইল তাহার কাব্য কৌশল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকুশলতার বিশেষত্ব হইল তাঁহার নানা অস্পষ্ট ও বিচিত্র রূপকল্পনায়। এইখানে শেলির সঙ্গে তাঁহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। শেলির কবিতায় দেখি আলো ও ছায়ার বিচিত্র খেলা। কত রকমের, কত ভাবের ছবি যে শেলি তাঁহার কবিতায় মুক্ত হস্তে বিলাইয়া যান, তাহা অবর্ণনীয়। শেলির কবিতা যদি উপভোগ করিতে হয়, তবে তাঁহার নাস্তিকতা, তাঁহার সমাজ বিজ্ঞান, তাঁহার বিষয় বস্তুর তুচ্ছতা ইত্যাদি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া এই ছবিগুলিকে একটির পর একটি উপভোগ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে : তাঁহার কাব্যকৌশল ও রূপসৃষ্টি, এই দুইটিই সব চেয়ে উপভোগ করিবার জিনিস : এই দুইটির বিচিত্রতাই তাঁহার কাব্যে সত্যকারের বিচিত্রতা আনিয়া দিয়াছে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা পূরবীর কবিতায় যথেষ্ট নূতনত্বের আস্বাদ পাইব। প্রথমে ধরা যাউক তাঁহার জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা, "পঁচিশে বৈশাখ"। আইডিয়ার দিক হইতে কবিতাটির মধ্যে নূতন কিছুই নাই। সেই পুরাতন আইডিয়া। কিন্তু রূপসৃষ্টির দিক হইতে কবিতাটি অতুলনীয় বলিলেও চলে।

"মনে রেখো, হে নবীন
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন :—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;

শেষ ছত্রটির মধ্যে কি সুন্দর বাস্তবতার পরিচয় পাই। আর একটা যায়গা উদ্ধৃত করি—

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ফিরে ধরণীর পরে,—
তাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে,
কাল বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।

এখানেও দেখি কবি বাস্তব প্রকৃতির একটা ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এটা কতকটা নূতন জিনিস। তাঁহার আগেকার কাব্যে ইহার পরিচয় খুব বেশী নাই। তারপর সমস্ত কবিতাটিতে শব্দচয়নের সংযম ও কৌশল একটা আশ্চর্য্য আলোক ও আশীর্ব্বাদের ভাব আনিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত কারণে পঁচিশে বৈশাখ সৌন্দর্য্যে ও অভিনবত্বে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

"আহ্বান" কবিতার বিষয় সেই পুরাতন জিনিষ—নিরুদ্দেশের ডাক। ইহার মধ্যে নূতন জিনিষ ইহার অপ্রচ্ছন্ন রূপক ও দার্শনিকতা আর নূতন জিনিষ ইহার কয়েকটি ছবি ও শব্দ। যেমন :—

"তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে"॥

আর একটি জায়গা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্ব্বশেষ লাভ,
সর্ব্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥"

"ছবি" কবিতাটিও প্রত্যক্ষভাবে সেই পুরাতন তত্ত্বকথায় ভরা। কিন্তু কি সুন্দর ইহার প্রকাশ। কবিতাটির মধ্যে স্থান কালেরও একটা পরিচয় পাই। জাহাজ চলিতেছে। তখন সূর্য্যাস্তের শেষ সমারোহ। চতুর্দ্দিকে নানা রঙের বিচিত্র খেলা। কিন্তু একটু পরেই সন্ধ্যা আসিয়া এই সমস্ত বিচিত্রতা হরণ করিয়া লইবে। কবি ইহার সহিত মানব জীবনের তুলনা করিতেছেন।

"এমনি রঙের খেলা, নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন অম্বর তলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তারপরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি :
যুগে যুগে মুছে যায়, লক্ষ লক্ষ রাগ-রক্ত ছবি।"

অবশ্য তুলনা ব্যাপারটি কিছুই নহে। শুধু এইটুকুর মধ্যেই সৌন্দর্য্য বা মহত্ব কিছুই নাই। কিন্তু ঐ যে "চিহ্নহীন পদচারী কালের" আমরা সাক্ষাৎ পাইলাম, ইহাতেই আমাদের রসলিপ্সার পরিতৃপ্তি হইল।

এইবার "লিপি" কবিতাটির আলোচনা করা যাউক। কবিতাটির বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিলে ইহার উত্তরটি গদ্যময় হইতে বাধ্য। কিন্তু "লিপির" প্রত্যেক কথাটি যদি উপভোগ করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া রাখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রবীন্দ্রকাব্যের যাহা বিশিষ্ট সুর ও বিষয়, তাহা অতি পুরাতন জিনিষ হইলেও পূরবীতে তাহার এক নূতন অভিব্যক্তি হইয়াছে। আমরা সেই সব পুরাতন শব্দ, পুরাতন ছবি, পুরাতন ধরণ কিছুই পাই না। পাই অনেক নূতন জিনিষ। প্রথমেই দেখি ধরিত্রী একখানা চিঠি পড়িতেছে। তাহাতে আছে কি ? প্রভাতের মর্ম্মবাণী। সৃষ্টির প্রথম দিবসে যে অমর জ্যোতির মূর্ত্তি হঠাৎ দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহারই উদ্দেশে লেখা। সেই ক্ষণেকের জন্য দেখা ; কিন্তু তাহাতেই যে অসীম বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল।

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি

উর্দ্ধে চেয়ে কয়—
জয় জয় জয়।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জ্জি উঠি কয়—
জয় জয় জয় ॥

তাই প্রত্যহ প্রভাত হইলেই সেই মূর্ত্তির কথা মনে পড়িয়া যায়। সেই মূর্ত্তির স্মৃতি ধরণীর প্রত্যেক সৌন্দর্য্য ও প্রত্যেক চাঞ্চল্যের মধ্যেই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। সেই স্মৃতিকে,

"পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,
মধুবিন্দু হয়ে থাক নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তারে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখো তারে ভরি ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পল্লবে মর্ম্মরি
সে বাণী ধ্বনিতে থাক তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জ্জন নির্ঝরে"

কিন্তু তবু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। তাই মাঝে মাঝে আত্ম-বিদ্রোহের অসন্তোষে আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। পুরাতন চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রিয়তমের প্রতি নূতন একখানা চিঠি লেখা চলিতে থাকে।

এখন যদি প্রশ্ন করা যায় "লিপির" সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব কোথায় তাহার উত্তর এই যে ব্যক্ত ও অব্যক্তের সমস্যাটা প্রধান নয়; কিন্তু এই যে ধরণী বিরহিনী রমণীর মত চিঠি পড়িতেছে এবং এই যে কয়টি ছবি পাইলাম এই গুলির মধ্যেই "লিপির" সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব।

পূরবীর সমস্ত কবিতার পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। আমি শুধু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি পূরবীর বিশেষত্বগুলি কি এবং কাব্য হিসাবে পূরবীর সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব কোথায়। আমরা দেখিয়াছি যে পূরবীর প্রধানতম সমস্যা মরণ ও ক্ষণিকত্ব। কিন্তু এই সমস্যা দুইটি এখানে খুব বড় হইয়া দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনটিই নূতন জিনিষ নহে। অনন্ত ও সান্তের যে আপাতবিরোধ, তাহার পরিচয় রবীন্দ্র নাথের সমস্ত কাব্যের মধ্যেই পাই। এই আপাতবিরোধের মধ্যেই এই দুইটি সমস্যা লুক্কায়িত রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমাধান পাইয়াছেন আনন্দের মধ্যে। সুতরাং পূরবীর আনন্দ কুড়ানোর ভাবও নূতন জিনিষ

নহে। তারপর, এই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত প্রকাশের মধ্যে সেই অসীমের অনুসন্ধান করা এবং তাহাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করা ইহাও পূরবীর নিজস্ব জিনিষ নহে; রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে ইহা অত্যন্ত পুরাতন। সুতরাং বিষয়বস্তু ও তত্ত্বের দিক হইতে প্রভাত সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের সহিত পূরবীর একটা নাড়ীর সম্পর্ক দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার সুর, ইহার মেজাজ, ইহার শব্দ রচনার কৌশল, ইহার রূপ কল্পনা, ইহার সুস্পষ্ট দার্শনিকতা এইগুলি পুরাতন জিনিষ নহে। পূরবীকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে এইগুলির দিকেই চোখ রাখিতে হইবে।

এইবার পূরবীর আর কয়েকটি পরিচয় দিব। সমুদ্র কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যতটা স্পষ্টভাবে তত্ত্বকথায় অবতার করিয়াছেন ততটা এই পূরবীতেও আর কোথাও করেন নাই।

কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেলো স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ উৎসব দিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এলো তার,
ডুবে গেলো অলক্ষ্যে অতলে।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত আমাদের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। কিন্তু ইহার পরের ছত্র কয়টীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনাটা পাই।

রূপনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু, ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

পড়িলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে যেন উহারা পাগল করিয়া দিয়াছে। তপোভঙ্গ কবিতায় যে আশ্বস্ততা দেখিয়াছিলাম, এখানে তাহা আর নাই। 'সমুদ্রের' আর এক জায়গায় দেখি।

"ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত্ত আঁধারে ফিরে, অকারণ জাগায় স্পন্দন
বক্ষোতলে

এই যে রূপনিঃস্ব বস্তুগুলি মূর্ত্তি পাওয়ার জন্য প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ায় এই কথাটা প্রথম পাই বলাকায়। সেই জন্য 'সমুদ্র' কবিতাটির সহিত বলাকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

"পদধ্বনি" কবিতার প্রথম কয়েকটি ছন্দে রবীন্দ্রনাথ মনের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে যেরূপ আশ্চর্য্যরূপ সফল হইয়াছেন ততটা সাফল্য প্রায় কেহই লাভ করিতে পারেন না।

"আঁধার প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—

সেই মতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি?
মোর জন্ম-নক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্ত্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে?"

ইহার মধ্যে যে আশঙ্কা ও বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। সব চেয়ে ফল হইয়াছে ওই "হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড" কথাটার ব্যবহারে।

"পথ" কবিতাটি পূরবীর মধ্যে একক। কবিতাটি পথের আত্মচরিত ও তত্ত্বকথা দুইই। কিন্তু তত্ত্বকথা সত্বেও, কবিতাটির গুণ এই যে ইহার মধ্যে বাস্তব জীবনের আবহাওয়া খুব সুন্দরভাবে বজায় আছে। যেমন

"উৎসব সভায় যেতে, যে পায় আহ্বান পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধূলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়িয়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বন্ধ বিস্মৃতির॥"

কিংবা আর এক জায়গায়

"বসিতে চাহে না কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরী,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্ত্তমান আঁকড়িয়া রয়
আমি সর্ব্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে
ভবিষ্যের পানে॥"

এইবার আর একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ করিব। কবিতাটির নাম "প্রভাত"। রবীন্দ্রনাথ যে মন লইয়া কবিতা লেখেন সেই মনের ভঙ্গী ও চরিত্র ইহাতে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ লইয়াছে যে কবিতাটি যেন একটা আলোকচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

"স্বর্ণ-সুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পথের মাঝে একান্ত একেলা ব'সে আছি।

যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্ত্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।"

আগাগোড়া কোথাও বাহুল্য, কোথাও বাচালতা নাই ; ক্রিয়াশব্দের আড়ম্বর নাই। একটা না একটা বস্তুচিত্র সর্ব্বদাই আমাদের চোখে ভাসিতে থাকে। সেইজন্য "প্রভাত" আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য।

পূরবীর মধ্যে সুন্দর বা উল্লেখযোগ্য কবিতা যে আর নাই এমন নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিরই সামান্য একটু পরিচয় দিয়াছি ; এবং পূরবীতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দানগুলি কি তাহারও একটু আভাস দিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই রবীন্দ্রকাব্যে পূরবীর স্থান কোথায় ? ইহার উত্তর দিতে গেলে অনেকের সঙ্গে মতের ভয়ঙ্কর অমিল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হওয়ার একটা কারণ ব্যক্তিগত পছন্দের পার্থক্য। সুতরাং যিনি যে উত্তর দিন না কেন, তাহার মধ্যে গোঁড়ামীর পরিচয় থাকিবেই। আমার নিজের মত, পূরবীতে রবীন্দ্রনাথ বলাকাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। বলাকার প্রধান গুণ কবির মনস্বিতা, সংযম ও আর্ট। আর একটা কথা পূরবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিও বহুজনের জন্য নয়। ইহাতে এমন একটা কবিতাও নাই যাহা "উর্ব্বশী" বা "বর্ষশেষের" মত লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইবে ; কথা ও কাহিনীর কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রকাব্যের যাহা রাবীন্দ্রিকতা তাহার চরম প্রকাশ এই পূরবীর মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। পূরবীর কোন কবিতাই হয়ত আকাশস্পর্শী নয়, কিন্তু কোনটাই নিতান্ত খাটো নয়। আর কাব্য কৌশলের দিক হইতে পূরবীতে যে সমস্ত উপাদানের সাক্ষাৎ পাই অনেকের কাছে তাহার দাম খুবই বেশী বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহারা হয়ত পূরবীকে বলাকার নীচেই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে করিতে পারেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে, যখন নূতনত্বের মোহ আমাদের মনকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল, সেই যুগের সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন ইংরাজী সাহিত্যের মোহ এতই তীব্র ছিল যে, আমাদের দেশীয় সাহিত্য আলোচনার সময় আমাদের সমালোচনাপ্রবৃত্তি বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকের একটা ইংরাজী নামকরণ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইত না। এই প্রবৃত্তি সময় সময় অতিরঞ্জিত হইয়া সামান্য সাদৃশ্যকে বড় করিয়া দেখাইয়াছে ও মৌলিক প্রভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে; কিন্তু ইহার মূলে যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরেজী ভাবে অনুপ্রাণিত কবি, ইংরেজীশিক্ষিত পাঠকের মনে স্বতঃই ইংরেজী সাদৃশ্য ও তুলনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; দেশীয় সাহিত্যে তাহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই, বৈদেশিকের সহিত তুলনার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্ব্বপ্রথম এই সমালোচনা প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা, নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তনে, ভাষা ও ভাবের নূতনত্বে ও একটা গভীর অর্থগৌরবে স্বভাবতঃই আমাদিগকে মিলটন ও হোমারের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। মাইকেলের পর এই ধারার অনুসরণ করিয়াই আমরা পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি; নবীনচন্দ্র সেন বাঙ্গলার বাইরণ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইহার কার্লাইল, ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ইহার বার্ক বা মেকলে—এইরূপে প্রত্যেকের এক একটী ইংরেজী নামকরণ করিয়াই তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলার শেলী নামে অভিহিত করাই বোধ হয় এই প্রবৃত্তির শেষ অভিব্যক্তি।

কিন্তু প্রথম প্রথম এই নামকরণের মধ্যে যে একটা সার্থকতা ও প্রকৃত রসবোধ ছিল, আজ কাল তাহা আর সে পরিমাণে বিদ্যমান নাই। এখন আমাদের চিন্তাধারা যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, ও সমালোচনার ক্ষমতা যতদূর পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক সাহিত্যিক সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই প্রকারের সমালোচনার মধ্যে যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা আমাদের জড়তা ও আলস্যকে প্রশ্রয় ও আমাদিগকে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছে। এই একান্ত সহজ নামকরণের অন্তরালে আমাদের লেখকদের আসল স্বরূপটী ও বিশেষত্বগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান্ ও নবোন্মেষসম্পন্ন কবির পক্ষে এইরূপ সমালোচনা নিতান্তই অবিচারের হেতু হইয়াছে। যদিও তাঁহার প্রতিভার সাধারণ প্রকৃতি শেলীর অনুরূপ, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই এই সাধারণ ঐক্যের মধ্যেও গভীরতর প্রভেদের লক্ষণ ও উভয়ের সুরের বিশেষত্বগুলি সহজেই ধরা পড়ে। শেলীর সহিত তাঁহার

সাদৃশ্যের সীমানির্দ্দেশ ও প্রকৃতিগত ঐক্যের মধ্যে বিকাশের প্রভেদগুলি লক্ষ্য করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ এক বয়সের দিক দিয়াই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। শেলী ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। শেলীর চিন্তাধারার মধ্যে যৌবনসুলভ অপরিণতি ও সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। যৌবনের এই স্বপ্ন-কুহেলিকা-জড়িত ভাবকে তিনি আশ্চর্য্য কবিতার সুরে প্রকাশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার চিন্তা-কল্পনাগুলির মধ্যে তখনও পরিণতির রং ধরে নাই; তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর সময় তিনি নূতন নূতন চিন্তারাজ্যের দ্বার খুলিতেছিলেন মাত্র। যৌবনের প্রচণ্ড আবেগ ও অসংযত উচ্ছ্বাস তখনও একটা প্রশান্ত, আত্ম-সমাহিত শক্তির মধ্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য-জীবনের শেষ দিকে তিনি জীবনের বাস্তব-সমস্যার সহিত ঘনিষ্টতর পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার ভাষা ও ভাবের মধ্যে অস্পষ্টতার ঘোর কাটিয়া একটা তীব্র, গভীরভাবে অনুভূত সত্যের জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছিল। শেলীর প্রথম দিকের কবিতা 'Alastor'এর সহিত মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে রচিত 'Adonais' ও 'Triumph Of Life' এর তুলনা করিলেই এই পরিবর্ত্তন ও পরিণতির প্রকৃতিটী পরিষ্কার হইবে। শেষ দুইটী কবিতার মধ্যেও অস্পষ্টতা ও রহস্যময় দুর্ব্বোধ্যতার অভাব নাই; কিন্তু এই সমস্ত পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য রকম সত্যের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কবির অন্তরের বাণীটী স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-কাল বেশী বলিয়া তাঁহার কবিতার পরিসর অনেক বৃহত্তর; এবং তাঁহার কাব্যে পরিণতির অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করার চিহ্ন বর্ত্তমান।

শেলীর শেষ কবিতা 'Triumph Of Life'এর মত তাঁহার জীবনেরও এক বিরাট উত্তরহীন প্রশ্নের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। জীবন কি, তাহার রহস্য কি করিয়া ভেদ করা যায় এই প্রশ্ন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে, এই প্রশ্নের রহস্য তাঁহার সমস্ত মনকে দুনিবার ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার জীবনের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিলাসের ন্যায় স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোন সন্তোষজনক সমাধান তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে এই সমাপ্তি ও সমাধানের সুরটী বাজিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জীবন-ব্যাপী অনুসন্ধান যে একটা প্রশান্ত, অক্ষুব্ধ সফলতার মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে, তাঁহার সমস্ত চাওয়া যে পাওয়ার মধ্যে পূর্ণকাম হইয়াছে, তাহা তিনি প্রতি পদেই আমাদিগকে অনুভব করিতে দেন। অবশ্য যে অফুরন্ত নবোন্মেষ প্রতিভার প্রধান সম্পদ তাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এখনও নিঃশেষিত হয় নাই; এই বয়সেও তিনি তাঁহার যৌবনের অসামান্য সৌন্দর্য্য-বোধ ও সুর-প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ও গভীরতর চিন্তার সহিত তাহাদের সম্মিলন সাধন করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলেন। তাহা হইলেও মোটের উপর তাঁহার সৃজন কার্য্য শেষ হইয়াছে ও একটা বিরাট কার্য্যের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ আছে, তাহা অনুভব করিবার তিনি অধিকারী হইয়াছেন ইহা আমাদিগকে স্বীকার

করিতে হইবে ; এবং তাঁহার নিকট হইতে আর নূতনত্বের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার সমস্ত রচনার ব্যাপকভাবে রসোপলব্ধি করা ও আমাদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মতামত গুলিকে সংহত ও একীভূত করিয়া তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আমাদের শেষ ধারণাটী স্পষ্টতর করিবার প্রয়াস বোধ হয় সমালোচকের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। যে তরুণ বয়সে শেলীর জীবন শেষ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পান নাই ; তখনও তিনি ঘন অন্ধকার, অস্ফুট, ছায়াময়,কল্পনা রাশির ও এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর sentimental বিষাদের অপর্য্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর শেলির the Night অথবা Hymn to the Spirit of Delight প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতার যে একটা নূতন, মানুষের অপরিচিত ও অপার্থিব (elfin) সুরটী পাই, তাহা রবীন্দ্রনাথে নাই। শেলির প্রকৃতিটী সময় সময় মানুষের রক্তমাংস ও নীতিজ্ঞানের বোঝা ফেলিয়া দিয়া একটী অস্বাভাবিক লঘুতা লাভ করিয়াছে ; যেন তিনি মানবের জটিল ও বিচিত্র প্রকৃতিটী পরিহার করিয়া একটী মাত্র সরল সুর ও অবিমিশ্র আবেগের সহিত নিজকে একাত্ম করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি যেন মানব জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বর্জ্জন করিয়া বিরুদ্ধ ভাবের ঘাত প্রতিঘাত ও জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বিবিক্ত করিয়া, একমাত্র প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের বা প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছেন, একটী সুরকে আশ্চর্য্য তন্ময়তার সহিত ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যেও এই জীবনের পূর্ণতা কখনও হারান নাই, জীবনের বিচিত্র রাগিণীকে একমাত্র সুরে পর্য্যবসিত করেন নাই। এই বিষয়ে শেলীর সহিত রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কবিতাতেই একটী ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উভয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতিটী ভিন্নরূপ। শেলীর আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্যের জন্য ; ইহা তাঁহার কবিতাকে একটী করুণ বিষাদের দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ করিয়াছে। আবার তাঁহার মনে একটা প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না বলিয়া এই বিষাদের ছায়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা বিদ্যমান তাহা তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হইতে আনন্দের সুরের মত উত্থিত হইয়াছে। শেলির কবিতার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্মভাব বলি তাহা বিশেষ মিলে না ; যে ভগবানের সহিত আমাদের ভক্তি ও পূজার মধ্য দিয়া সম্মিলন, তাঁহার স্থান শেলীর কবিতাতে নাই। সেই জন্য বিখ্যাত সমালোচক Bagehot শেলীসম্বন্ধে বলেন যে শেলী সৌন্দর্য্য বোধকে তাঁহার কবিতার মধ্যে একটী জীবন্ত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন ; ও ইহাকে মানুষের প্রবল ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার সহিত প্রকৃত ধর্ম্মভাব, হৃদয়ের প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির কোন সংযোগ সাধন করেন নাই।

পক্ষান্তরে গভীর ধর্ম্মভাব রবীন্দ্রনাথের মনের প্রবলতম শক্তি ; তাঁহার প্রত্যেক চিন্তাধারা স্বতঃই ধর্ম্মাভিমুখী ; বহির্জগতের সহিত তুচ্ছতম সংস্পর্শও তাঁহার মনের ভগবদ্ভক্তি জাগাইয়া তোলে ও ভগবানের সহিত গভীর মিলনের সূত্রপাত করে। ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনার

মধ্যে বর্দ্ধিত বলিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আশ্চর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ, ও তাঁহার অনুভূতি প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল। এখানেই শেলির সহিত তাঁহার প্রধান প্রভেদ। শেলীর মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের বাণী বার বার সন্দেহ ও অনুযোগের বাষ্পে বদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা যে শক্তির নিকট ভক্তিপ্রণত হইবার উপক্রম করেন তাহা নিজেই অনিশ্চিত ও সন্দেহসঙ্কুল।

আবার পৃথিবীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধন করা ও স্বাধীনতার উন্মাদনাকে জাগাইয়া তোলা শেলীর কবিতার দুইটী মুখ্য উদ্দেশ্য; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ দুইটীর প্রকাশ বিভিন্ন প্রকৃতির। এই স্বাধীনতাস্পৃহা ও সংস্কারপ্রয়াস তিনি কেবল নৈতিক জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, শেলীর মত তাহাকে একটা রুদ্র ধ্বংসনীতি প্রচারে রূপান্তরিত হইতে দেন নাই। অবশ্য একদিক দিয়া তিনি বিদ্রোহীপদবাচ্য হইয়াছেন, তাঁহার কবিতা আমাদিগকে পরিচিতের সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশাল অপরিচিত জগতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে সর্ব্বদা উত্তেজিত করে; কিন্তু তাঁহার এই দুঃসাহসিকত্বের সমর্থনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ও সাঙ্কেতিকতা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার কবিতাগুলি শেলীর সমজাতীয় কবিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়।

ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা-রচনায় শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু এখানেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদটা স্পষ্ট দেখা যায়। বোধ হয় শেলীর গীতি-কবিতাগুলির মধ্যেই একটা অবিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক প্রবাহ বেশী আছে বলিয়া মনে হয়; রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতায় মাঝে মাঝে যে একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় শেলীতে তাহা নাই। এই আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্যের জন্য সময় সময় রবীন্দ্রনাথের গানের সুরটী যেন চাপা পড়িয়া যায়। অবশ্য প্রসার ও বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের স্থান শেলীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে; এবং উভয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষের বিচার করিতে হইলে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্ত্তমান যুগে, যখন মানুষের প্রকৃতি আরও বিচিত্র ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, তখন কবিদের পক্ষে সেই পুরাতন, সহজ সরল গানের সুরটী ফিরিয়া পাওয়া নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য নহে। বর্ত্তমান যুগের মানুষের মনে একপ্রকার নূতন, মিশ্র ভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে এবং পুরাতনের যে ভাবগুলি এতদিন গীতিকাব্যে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত তাহাদিগকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতেছে। এখন এই নূতন ভাবগুলিই গীতিকবিতায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছে, কিন্তু ইহাদের একটী অসুবিধা এই যে এই আদর্শ পরিবর্ত্তনের সময় ইহারা এখনও মানবের মনে খুব প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হয় নাই। অনিশ্চয় ও সন্দেহের ধূমাবরণ ত্যাগ করিয়া ধ্রুব সত্যের জ্যোতিতে এখনও ভাস্বর হইয়া উঠে নাই, মানবের সাধারণ হৃদয়ের বাণীতে পরিণত হয় নাই। একটা নূতন ভাব মানুষের মনে প্রথম আবির্ভাব মাত্রেই রস-রচনা বা গীতি কাব্যের জন্য উপযোগিতা লাভ করে না; প্রাথমিক অবস্থায় অনিশ্চয় ও বাষ্পময় অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া যখন ইহা মানব হৃদয়ের সহিত একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে, যখন মানব

হৃদয়ের গভীর আবেগ ও অনুভূতিগুলির সহিত একই আসন অধিকার করে, তখনই ইহা গীতি কবিতার সুরের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিবার অধিকারী হয়। তৎপূর্ব্বে তাহাদিগকে গানে প্রকাশ করিতে গেলে, গানের সুরটী খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; বীণার তারটী উচ্চ গ্রাম হইতে বারবার নামিয়া পড়ে ও গীতি কবিতার যে প্রধান সম্পদ সেই একান্ত সরল অভিব্যক্তিটী, সেই ঝরণাধারার মত উৎসাহপ্রাচুর্য্যটী নষ্ট হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতি কবিতায় এই অর্দ্ধোত্থিত অবরুদ্ধ গানের সুরটী আমাদিগকে পীড়িত করিয়া তোলে। /

সাহিত্য সমালোচনার দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের স্থান শেলী অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। শেলী তাঁহার Defence of Poetryতে কেবল কবিতার কতকগুলি মূলসূত্র ও কবিপ্রতিভার রহস্য প্রভৃতি কতকগুলি প্রাথমিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার মধ্যে আশ্চর্য্যরকম রসোপলব্ধি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলিকে নূতন সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য উভয়ের মধ্যে তুলনা করিবার সময় একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে শেলীর সাহিত্যিক জীবন নিতান্ত স্বল্পকালস্থায়ী ছিল, এবং তিনি সমালোচনা ক্ষেত্রের কেবল দ্বারদেশ অতিক্রম করা ছাড়া আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

উভয়ের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্যও যথেষ্ট; তবে তাঁহাদের প্রথম কাব্যজীবনে ও প্রতিভার বিশিষ্টতা লাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটী বিশেষ ঐক্য অনুভব করা যায়। কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা একই চিন্তারাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তারপর আপন আপন প্রতিভার রুচি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে একই রকম সুর পাওয়া যায়। বিশাল কল্পনাসমূহের ক্ষীণ, অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরিপক্ক আলোচনা, একটা অস্বাস্থ্যকর বিষাদ ও অস্ফুট, অপরিণত, ছায়াময় ভাব ও চিন্তাসমূহের প্রাদুর্ভাব, এইগুলি যেন উভয়ের কবিতার সাধারণ গুণ। এই সমস্ত লক্ষণ শেলীর সর্ব্বপ্রথম কাব্য Queen Mab ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম অবস্থার গীতি কবিতার মধ্যে তুল্যভাবেই সুপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির নামেই তাহাদের বিষয় বস্তু ও কবির মানসিক ভাবের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে—তারকার আত্মহত্যা (সন্ধ্যা সঙ্গীত) সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় (প্রভাত সঙ্গীত), মহা স্বপ্ন (ঐ), নিশীথ চেতনা (ছবি ও গান)। এই নামগুলিই কবির তদানীন্তন মানসিক বিকারের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও প্রতিভার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। শেলীর স্বপ্নময় অবাস্তবতা তাঁহার Prometheus Unbound এ ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাঁহার প্রণয় কবিতার উচ্ছ্বসিত বাণীতে পরিণত হইয়াছে; পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তার মধ্যে একটা গভীরতর বাস্তবতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার প্রথম কবিতাগুলির ক্ষীণ বাষ্পময়তার মধ্যে একটা প্রবলতর আবেগ, স্পষ্টতর চিন্তাধারা, মানব হৃদয় সম্বন্ধে গভীরতর অভিজ্ঞতার সঞ্চার করিয়াছেন এবং উচ্চতর কল্পনার প্রভাবে তাঁহার নূতন কবিতাগুলির আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তর

সাধন করিয়াছেন। তাহার পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম কাব্যজীবনের কুহেলিকা জড়িত অবাস্তবতা বিসর্জ্জন দিয়া, মনের গভীরস্তরশায়ী অস্পষ্ট অন্ধকারাবৃত ভাবরাজির বিশ্লেষণ বর্জ্জন করিয়া এই সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত বিচিত্ররূপশালিনী পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ও মানবমনের উপর তাহার গূঢ় প্রভাবের রসটা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই খানেই শেলীর সহিত তাঁহার প্রভেদ বিশেষ প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। শেলীর প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও রসজ্ঞতার পরিচয় আছে—পৃথিবীর অফুরন্ত ও বিচিত্র সৌন্দর্য্যরস পানে তিনিও কোন কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির চিত্রের উপর একটা অপার্থিব চঞ্চল সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে; তাঁহার অতৃপ্ত দৃষ্টির নিকট পৃথিবীর সৌন্দর্য্যগুলিও যেন একটা অপ্রকাশিত নূতনরূপ প্রকাশ করিয়াছে, পরিচিত বস্তুগুলিও যেন হঠাৎ অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। শেলী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনার উপর যেন একটা দূর সীমান্তবদ্ধ উদাস মনের রংটা মাখাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরও পরবর্ত্তী যুগের প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে প্রায় এই রকম বিশেষত্বই লক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁহার মধ্যবর্ত্তীযুগের মানসী ও সোনারতরী নামক কবিতা গুলিতে এই বৈরাগ্যবর্জ্জিত স্বাভাবিক সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কবিতার মধ্যে একটা অনবদ্য প্রকাশক্ষমতা, স্পষ্ট রেখাঙ্কিত চিত্রসৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যোপভোগের প্রতি একটা তীব্র ইচ্ছা ও প্রবণতা দেখা যায়। শেলীর কবিতার প্রকৃতি বর্ণনা হইতে ইহা সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা কীট্‌সের সহিত অধিকতর সাদৃশ্য অনুভূত হয়—কবির সৌন্দর্য্যপিপাসা কীট্‌সেরই মত তীব্র বলিয়া আমরা বোধকরি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তার প্রভাব কীট্‌স অপেক্ষা প্রবলতর, এবং প্রকৃতির সহিত মানবমনের বিচিত্র ও রহস্যময় সম্পর্কটা উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁহার অনেক বেশী। নতুবা কেবল সৌন্দর্য্যবোধের দিক্ দিয়া তাঁহাকে কীট্‌সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনা করিলে বোধ হয় বিশেষ কোন অবিচার করা হইত না।

আবার জীবনের এই বিচিত্র রহস্যময়তা, প্রকৃতির এই চঞ্চল অস্থির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অতৃপ্ত বেদনা শেলী যেরূপ উচ্চসুরে ঝঙ্কৃত করিয়াছেন, যেরূপ প্রবল আবেগের সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ এতটা পারেন নাই—Epipsychidion ও Adonais এর শেষ কয়েকটী stanzaর অনুরূপ কিছু রবীন্দ্রনাথে খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শেলীর মত অতিদূর নক্ষত্রলোকেও পক্ষাবিস্তার করে নাই বা সাময়িক অক্ষমতার জন্য খুব নিম্ন প্রদেশেও অবতরণ করে নাই! একটা সমান অক্লান্ত শক্তি লইয়া মধ্যদেশে বিবরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তাঁহার বিষয়ের প্রসার ও পরিধি শেলী অপেক্ষা অনেক বেশী; এবং তাঁহার সমস্ত কবিতাতেই প্রতিভার এমন একটা সমতা (equality) দৃষ্টি হয় যাহা তাঁহার কবিতার পরিমাণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রধান ঐক্য তাহা এই যে উভয়েই, জীবনের এই আপাত

দৃষ্টিতে স্থির ও তুচ্ছ আবরণের অন্তরালে যে চির-চঞ্চল প্রাণ শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাদের কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই এই জীবনের বহিরাবরণের মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রজালিক সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত তাহার অভ্যন্তরস্থ গূঢ় ভাবসমূহ, অস্পষ্ট, অপরিণত আশাআকাঙ্ক্ষাগুলিকে মূর্ত্তি দিতে চাহিয়াছেন—মোট কথা যে গূঢ় শক্তির প্রভাবে আমাদের জীবন এত বৈচিত্র্যময় ও রহস্যমণ্ডিত, যাহা জীবনকে এক অফুরন্ত গতি বেগের দ্বারা নব নব উন্মেষের দিকে পরিচালিত করিয়াছে, উভয়ের কবিতাতেই সেই শক্তির মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। এই অর্থে উভয়কেই দার্শনিক কবি বলা যাইতে পারে—তাঁহাদের কবিতা হইতে যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট দার্শনিক মতামত সঙ্কলিত করা যায় সে জন্য নহে, পরন্তু উভয়েই জীবনের মধ্যে এক অনন্ত শক্তির প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন, জীবনকে অতীন্দ্রিয়শক্তিনিয়ন্ত্রিত ও অধ্যাত্মজগতের প্রতিবেশবেষ্টিত করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা দার্শনিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন। জীবনের মধ্যে যে রহস্যময় অধ্যাত্মচেতনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ও রহিয়া রহিয়া তাহার উপরি ভাগে ভাসিয়া উঠিতেছে, উভয় কবিই সেই অপরিচিত রহস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাসইঙ্গিতগুলির, তাহার মৃদু নিঃশ্বাস-স্পর্শগুলির প্রতি একেবারে উৎকর্ণ হইয়া আছেন ও অনন্তের এই চকিত প্রকাশ, এই অস্পষ্ট গুঞ্জরণ ধ্বনিকে তাঁহাদের কাব্যজগতের ছন্দের মধ্যে গাঁথিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। শেলীর কাব্যজীবন প্রকৃতই একটা অজ্ঞাত রহস্যের অনুসরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, জীবনের চরম অর্থ শেলীর চক্ষে প্রকৃতই একটা অনিশ্চয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল। তাঁহার জীবন যাত্রার পথে, অন্ধকারের ভিতর দিয়া অপরিচিত আদর্শের দুঃসাহসিক অনুসরণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার চতুষ্পার্শ্বে আলোক বিন্দু জ্বলিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি একটা রেখাতে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গন্তব্য স্থলের উপর অচঞ্চল আলোকপাত করে নাই বলিয়া তাঁহার সংশয়কে বাড়াইয়া তুলিয়াছে মাত্র। শেলী প্রাণপণ শক্তিতে যাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহা বার বার তাঁহার দৃঢ় মুষ্টির মধ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; যে আলোক স্বভাবচঞ্চল ও যাহা মুহুর্মুহু অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িতে চাহে, শেলী তাঁহার সমস্ত ব্যাকুল আগ্রহের সহিত সেই আলোককে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্থির ও চিরন্তন করিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে অসম্ভব কার্য্যে আত্মনিয়োগের যে একটা ব্যর্থতা তাহারই করুণ বেদনা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই এই পরম সত্যের দিকে স্থির অচঞ্চল ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে—তাঁহার নিকট সত্যের রূপ সর্ব্বদাই পরিষ্কার ও অনাবৃত, তাঁহার গভীর বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির জন্য তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়াপাত মাত্র হয় নাই, সুতরাং প্রকৃত অবিশ্বাসীর যে তীব্র বেদনা ও নির্ম্মম আত্ম বিশ্লেষণ, তাহা তাঁহার কবিতাতে একেবারেই নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ বিশ্বাসের নিকট পৃথিবীর কোথাও কোন সন্দেহের মেঘাবরণ নাই—অবশ্য জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে দীর্ঘ যোগসূত্র আছে, তাহার মাঝামাঝি দুই এক স্থানে দুই একটা জটীল গ্রন্থি, থাকিলেও, এই স্বল্প বাধাতে তাঁহার বিশ্বাসের পথ অবরুদ্ধ হয় নাই। সেইজন্য জীবনের মধ্যে এই

রহস্যময় অধ্যাত্ম শক্তির নিগূঢ় ক্রিয়ার আলোচনায় শেলীর মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এই অধ্যাত্ম শক্তির লীলা জীবনের মধ্যে যে নাটক রচনা করিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট নিতান্তই স্বচ্ছ ও সুগোচর। একদিকে মানুষ ও প্রকৃতি, ও অপরদিকে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে নিগূঢ় লীলাখেলা, আভাস-ইঙ্গিতের অর্থপূর্ণ বিনিময় চলিতেছে, তাহাদের শুভকারিতা ও চরম অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই, সেইজন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে শেলীর ন্যায় একটী অতৃপ্ত খেদের বা অপ্রাপ্যের অনুসরণজনিত অবশ্যম্ভাবী বিষাদের সুর সেরূপ প্রবল নহে; তাঁহার প্রথম বয়সের কতকগুলি কবিতাতে মাত্র মানুষের প্রতি প্রকৃতির নির্ম্মম ঔদাসীন্য বা প্রবল বিরুদ্ধতাচরণের জন্য বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। যেমন 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'প্রকৃতির প্রতি' (মানসী)। আবার 'মানসীর' আরও কয়েকটি কবিতায় যথা 'সিন্ধুতরঙ্গ' ও 'শূন্যগৃহে' প্রকৃতির এই অজ্ঞেয়তা ও পরিবর্ত্তনশীলতাই তাহার প্রতি মানব মনের আকর্ষণের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শেলীর Alastor নামক কবিতা রবীন্দ্রনাথ কখনও লিখিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না—তাহার মধ্যে যে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসার সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যে রহস্যময় চঞ্চল সৌন্দর্য্যরাণীর অনুসরণের কাহিনী একটী আশ্চর্য্যরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিবৎ বিবৃত হইয়াছে, যে অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্মস্থলে বারবার আঘাত করিয়া প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মনে তাহার অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। তাঁহার সোনার তরীতে 'আকাশের চাঁদ' নামক একটী কবিতা আমাদিগকে শেলীর সহিত তাঁহার পার্থক্যের প্রকৃতিটি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়—শেলীর Alastorএ কবি আলেয়ার আলোর মতই দূর পর্ব্বত ও গভীর অরণ্যের বিজনতার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং এই অশ্রান্ত ভ্রমণের শেষে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের নায়ক এই অপ্রাপণীয়ের অনুসরণের মধ্যে কেবলই মানব জীবনের পরিচিত স্নিগ্ধশান্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি বার বার ব্যাকুল দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে প্রাণপণ শক্তিতে ইহাদিগকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। মোট কথা শেলীর আকর্ষণ অজ্ঞাত রাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রার দিকে; রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ আমাদের পরিচিত গৃহী জীবনের দিকে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাতে সিন্ধুপারে নামক একটি কবিতা আছে, ইহা নিশীথ রাত্রে স্বপ্ন-বিচরণের কাহিনী এবং শেলীর অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণের সহিত ইহার অনেকটা ঐক্য আছে। কিন্তু শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁহার রহস্যময়ী প্রেমিকার যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হইল, তখন তাঁহার চিরপরিচিত জীবন দেবতারই হাসিমুখ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শেলীর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী চিরকালই রহস্যময়ী রহিয়া গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরের অন্তঃপুরে আনিয়া গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা অধিকতর মানবসুলভ সহৃদয়তা ও প্রেমের উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ আছে। শেলীর নিতান্ত

অন্তরঙ্গ প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেও এক প্রকার তুষারশীতল স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার Epipsychidionএ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের নিগূঢ় ইতিহাসের মধ্যেও তাঁহার গভীর প্রেমানুভূতির উপরে যেন এক প্রকার ভাস্বর যবনিকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। অবশ্য ইহাতে শেলীকে কবি-হিসাবে খর্ব্ব করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে—প্রেমের কবিতায় এই যে একটা শীতল স্পর্শ, এই যে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ-নিরপেক্ষ যৌন-সম্পর্কের অতীত একটা ভাব, ইহা শেলী ছাড়া অন্য কোন কবির মধ্যে নিতান্ত বিরল—রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাঁহার প্রতিভার পার্থক্যটী নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অশরীরী কল্পনার মধ্যে কিরূপ গভীর প্রণয়াবেগ ও আনন্দোচ্ছ্বাস সংক্রমিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'সোনার তরীর' অন্তর্ভুক্ত 'মানস-সুন্দরী' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটীতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটীতে কবির আত্মার সহিত বহিঃপ্রকৃতির মিলন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছে—মানবের মনের প্রতি প্রকৃতির যে অসংখ্য প্রকারের আবাহন ও নিবেদন আছে, কবি তাহার সমস্ত গুলিকেই এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত করিয়া একটী ব্যাপক প্রণয়-গীতির মধ্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। মানব ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে সনাতন প্রীতি-সম্পর্কটী যুগ-যুগান্তর হইতে বর্ত্তমান আছে, তাহা আর কোন কবিই এরূপ ব্যাকুল ও উচ্ছ্বসিত প্রণয়ের ভাষাতে ফুটাইয়া তোলেন নাই; এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রহস্যটী আর কেহই এরূপ অন্তরঙ্গস্পর্শলোলুপ নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে ডুবাইয়া দেন নাই। যে প্রেম অধীর ব্যাকুলতার বেগে প্রেমাস্পদের সহিত সমস্ত ব্যবধান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াও কেবল নিজের প্রখর নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারাই উভয়ের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম যবনিকার সৃষ্টি করে, যাহা বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় প্রেমাস্পদকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াও নিজ হৃৎ-স্পন্দনের জন্যই একটী কাল্পনিক অথচ অনতিক্রম্য ব্যবধানের অস্তিত্ব অনুভব করে, প্রকৃতিসুন্দরীর প্রতি কবির প্রেম অনেকটা সেই জাতীয়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটী যেন শেলীর Hymn to Intellectual Beauty ও Prometheus Unboundএর 'Hymn to Asia'র একটী নূতন সংস্করণ। শেলীর শেষোক্ত কবিতাটী, যে সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের রূপটী পৃথিবীর বহিঃপ্রকাশের উপর একটী ভাস্বর ও কম্পমান অবগুণ্ঠনের মত বিরাজমান, তাহার প্রতি কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন; এই কবিতার সমস্ত উত্তাপ, উত্তেজনা ও আবেগকম্পিত বাণীর মধ্যে একটা শীতল অশরীরি স্পর্শ অনুভব করা যায়; শেলী যে উগ্রোজ্জ্বল অপার্থিব সৌন্দর্য্যের চরণে নিজ প্রণয় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা যেন নিজ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ মানবধর্ম্মবিশিষ্ট নহে ও মানবসুন্দরীর বেশে ধরা দিতে চাহে না। সেইরূপ তাঁহার Hymn to Intellectual Beautyতে আমরা একটা গভীর খেদের আর্ত্তনাদ, একটা ব্যর্থতার করুণ বিলাপ শুনিতে পাই—যে আলোক-রেখা পৃথিবীর জড়পিণ্ডগুলির মধ্যে জীবনীশক্তির ন্যায় গূঢ় ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, যাহাকে বাঁধিতে পারিলে চরম সিদ্ধি করতলগত হইয়া পড়ে, তাহা কবির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া পুনঃপুনঃ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে; কবি এই চঞ্চল মায়াবিনীর ব্যর্থ অনুসরণে নিজ জীবনের সুখ-শান্তি

বিসর্জ্জন করিতেছেন। এই জাতীয় বিষয়কে কোন একটু পৌরাণিক উপাখ্যানের সাহায্য লইয়া, রবীন্দ্রনাথ কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে রূপান্তরিত করিতে পারেন ও সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহার উর্ব্বশীই তাহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল—এখানে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে কোন খেদের সুর নাই, কোন ব্যর্থতার ছায়াপাত হয় নাই। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতাটী স্বর্ণ-প্লাবিত পশ্চিম-দিগন্তের দিকে এক প্রেমিক-হৃদয়ের অভিসার-যাত্রা; ইহাতে যে রহস্যের ভাবটী আছে তাহা প্রেমের নিবিড় আনন্দে ডুবিয়া প্রেমকে আরও বিচিত্র ও দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে মাত্র—Wordsworth এর 'Stepping Westward' নামক কবিতার আধ্যাত্মিক সংযম ও ঔদাসীন্যের সহিত ইহার প্রভেদ কত গভীর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শেলীর সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন তাহা নহে। অন্ততঃ একটী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে শেলীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে—তাঁহার 'বর্ষশেষ' (কল্পনা) কবিতাটীর সহিত শেলীর প্রসিদ্ধ 'Ode to the West Wind' এর বেশ সুস্পষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। শেলীর কবিতাটীতে তাঁহার কল্পনার যথেচ্ছ প্রসারের মধ্যেও একটী আশ্চর্য্য ঐক্যের সুর, ভাবগত পরিণতির এক অচ্ছেদ্য বন্ধন লক্ষ্য করা যায়; কেন্দ্রগত ভাবটীর উপর তাঁহার অধিকার এক মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় নাই—এক অখণ্ড চিন্তাধারা বিভিন্ন শ্লোকগুলির মধ্যে চমৎকার ভাবে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, এবং অবশেষে এক আশ্চর্য্য চরম পরিণতিতে নীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটীতে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া কবির উচ্ছ্বসিত ভাবটী প্রকাশ পাইয়াছে, সে গুলি এক দুঃসাহসিক প্রবল কল্পনার দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার মধ্যে শেলীর ন্যায় একটী অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয় নাই। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঝটিকার ভাবগত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই, এবং ইহাকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার শ্লোকগুলিকে স্থানে স্থানে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আবার দুই একটী কবিতায় রবীন্দ্রনাথেরই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়—তাঁহার 'রাত্রি' (কল্পনা) শেলীর 'To the Night' নামক কবিতাটীর সহিত তুলনায় আরও উচ্চাঙ্গের কল্পনা ও গভীরতর চিন্তার পরিচয় দেয়।

অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্ম, ছায়াময় অনুভূতিগুলিকে সুস্পষ্ট আকার দেওয়ার ও তাহাদিগকে একটী গভীর অন্তরঙ্গ প্রেমের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করার, রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহা সময় সময় তাঁহার বৈদেশিক সমালোচকগণের পক্ষে ভ্রান্তিবিমূঢ়তার হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার জীবনদেবতা শীর্ষক কবিতাগুলির আলোচনা করিতে গিয়া এই বৈদেশিক সমালোচকেরা কতকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সমালোচক টমসন সাহেব অনুযোগ করেন যে পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রভাব যে এখন কতকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার এই 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলির অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্যতা—তিনি পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ মুখবন্ধ না করিয়া ইউরোপীয় শ্রোতৃবর্গের

নিকট তাঁহার কবি-জীবনসম্বন্ধীয় যে সমস্ত নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে যদি তাহারা কেবল মাত্র নিছক কল্পনার খেয়াল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধী করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় সমালোচকের পক্ষে টমসন সাহেবের সহিত এক মত হওয়া সুকঠিন। যিনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক কবির কল্পনার স্বাভাবিক গতিটী লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যাখ্যা বা মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কবিপ্রতিভায় নিগূঢ় রহস্য—যে অজ্ঞেয় প্রেরণা প্রবল বন্যার ন্যায় কবির ইচ্ছা-শক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, যাহার তরঙ্গ মধ্যে কবি একান্ত অসহায় ভাবে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন—সেই শক্তির উপলব্ধি কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই যে একা করিয়াছেন, তাহা নহে। শেলীও তাঁহার 'Defence of Poetry' নামধেয় প্রবন্ধে কবিপ্রতিভার এই অজ্ঞেয় রহস্যময়তার বিষয় স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, কবিতা রচনা কবির ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে। খুব প্রতিভাবান্ কবিও পূর্ব্ব হইতে সময় নির্দ্দেশ করিয়া, বাঁধা ধরা নিয়মানুসারে কবিতা রচনা করিতে পারেন না; কবির বহির্ভূত এক শক্তি, যাহা বায়ুর মত স্বচ্ছন্দবিহারী, যাহার আবির্ভাব তিরোভাবের উপর কবির কোন অধিকার নাই, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং এই বিষয়টী যে ইউরোপীয় পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাহা নহে। তবে কবি যে ইহাকে গভীর প্রেমের রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার কবিপ্রতিভাকে রহস্যময়ী প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ইয়োরোপীয় সমালোচকদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটী চিরন্তন লক্ষণ; তাঁহার মানস সুন্দরীতে যে প্রণালী প্রকৃতি ও কবিকল্পনার সম্বন্ধে অবলম্বিত হইয়াছিল, 'জীবন দেবতাতে' কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে তাহারই একটা স্বাভাবিক প্রসার মাত্র হইয়াছে—উভয় ক্ষেত্রেই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছে, আবার নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলিতে কবি আর একপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া, ভগবানের প্রতি সেই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা জ্বলন্ত ও উচ্ছসিত প্রেম, ক্রমান্বয়ে বহিঃপ্রকৃতির, কবিপ্রতিভার, সর্ব্বশেষে ভগবানের সহিত তাঁহার সম্পর্কটীকে নিবিড় ও মধুর ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই মূল সূত্রটি ধরিতে পারিলে বৈদেশিকের পক্ষে তাঁহার রচনার মধ্যে অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য বিশেষ কিছু থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও উহার সহিত মানব হৃদয়ের সম্পর্ক-স্থাপনে প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এক Wordsworth ছাড়া অন্য সমস্ত কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতিবর্ণনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে কবিকে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হইবে—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোন কবিই মানুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ স্থাপনে এতাদৃশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। দুই একটী সামান্য স্পর্শের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যেন নিতান্ত অনায়াসেই প্রকৃতিকে

মানবের বক্ষলগ্ন এবং তাহার নিতান্ত সাধারণ প্রকাশগুলিকেও মানবের সাময়িক মনোভাবের সহিত একাত্মীভূত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে কোন কবিতা যদৃচ্ছাক্রমে খুলিলেই তাঁহার এই অসাধারণ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এত অধিক সংখ্যক প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন, যে তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে আমরা স্বভাবতঃই একই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই প্রকৃতি একটী সুন্দর বিচিত্র বেশে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে, কোথায়ও কষ্ট কল্পনা, অস্বাভাবিকত্ব বা পুরাতনের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি আমাদিগকে পীড়িত করে না। এই গুণটী তাঁহার কবিতার মধ্যে এত ব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান যে বিশেষ উদাহরণ নির্ব্বাচন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সমস্ত চিত্রগুলিই এক প্রগাঢ় শান্তির রসে অভিষিক্ত; এবং কবি কত সহজে ও কিরূপ স্বল্প চেষ্টায় এই শান্তির ভাবটী আমাদের নিকট মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার কবিতায় দিবা রাত্রির প্রত্যেক দণ্ড আমাদের হৃদয়ের নিকট একটী বিশেষ রকমের আবেদন জ্ঞাপন, আমাদের মনের প্রতি একটী বিশেষ রকমের আকর্ষন বহন করে, ও মানবের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত একটী সুন্দর সামঞ্জস্য বন্ধনে গ্রথিত হয়। প্রকৃতির সহিত এই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রথম সূত্র পাত আমরা পাই মানসীতে। এই মানসীই নানা দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যোৎকর্ষের প্রথম পরিচয়স্থল। মানসীর প্রথম কবিতা উপহারেই এই গভীরতর সুরটী প্রথম শোনা যায়; অপেক্ষা নামক কবিতাটীতে দীর্ঘ দিবসটীকে প্রিয়ামিলনোৎসুক অধীর প্রেমিকের মনোভাবের মধ্য দিয়া আরও দীর্ঘতর ও মন্থরতর করিয়া দেখান হইয়াছে; সুরদাস নামক কবিতাটীতে Wordsworth এর Ruth নামক কবিতার ন্যায় প্রকৃতির মোহিনী শক্তি কিরূপে কবিকে বিহ্বল করিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রলোভনের বশীভূত করিয়াছিল তাহার একটী সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ কবিতাটীতে কিরূপ আশ্চর্য্য কুশলতার সহিত নীরব নক্ষত্ররাজিকে কুতূহলী শিশু সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা করিয়া আকাশকে তপোবনের আকাশ বাতাসের সহিত একাত্মীভূত করা হইয়াছে। এই সমস্ত কবিতাই কবির প্রকৃত সিদ্ধ হস্তের সুন্দর উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনার আর একটী বিশেষত্ব আছে, যাহা তাঁহাকে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশীয় প্রকৃতিকবিদের হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। তাঁহার অনেক কবিতাতে এই মাটির পৃথিবীর মূক মৌন জীবনস্পন্দনের সহিত কবিহৃদয়ের এক গভীর সহানুভূতি ও নিবিড় মিলনের বিবরণ পাওয়া যায়—পৃথিবীর এই জীবন মানব জীবনের ন্যায় পূর্ণ পরিণতি ও স্পষ্ট প্রকাশক্ষমতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু ইহা একপ্রকার অস্ফুট গুঞ্জরণ শিহরণের ন্যায় মানবের স্পষ্টতর বাণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে এক আশ্চর্য্য অরূঢ় সুরে ও ব্যঞ্জনা শক্তিতে ভরপুর করিয়া দেয়। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতিপ্রেমে মাতোয়ারা বটেন, কিন্তু তাঁহাদেরও পৃথিবীর এই নগ্ন অসংস্কৃত জীবনকে বরণ করিয়া লইবার সাহস নাই। তাঁহারা প্রকৃতিকে

শোধিত ও আধ্যাত্মিকভাবমণ্ডিত করিয়া তবে তাহার নিগূঢ় স্পর্শলাভ করিতে চাহেন। প্রকৃতির আসল জীবনটাকে তাঁহারা অনেকটা সন্দেহের চক্ষে দেখেন; তাহার খরতর বিকাশগুলি, যাহাদিগকে সহজে আধ্যাত্মিকরূপ দেওয়া যায় না বা মানব মনের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায় না, তাহাদিগকে ইঁহারা বিশেষ আমল দেন না, তাহাদিগকে কল্পনা সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া, তাহাদের দেহ হইতে আত্মাটাকে বাহির করিয়া, তবেই তাহাদিগকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই নগ্ন অশোধিত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত হইতে চাহিয়াছেন; জীবনের যে আদিম স্পন্দন একটি ঘাসের পাতা হইতে এই বিশাল সৌর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রাণকে আত্মীয়তার নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছে; তিনি প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই যে প্রকৃতির প্রতি কবি হৃদয়ের ভাবান্তর, তাহা অনেকটা আধুনিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদের মর্ম্মকথাটী কল্পনার সাহায্যে নিগূঢ়ভাবে প্রণিধান করার জন্য সংঘটিত হইয়াছে—আমরা আজকাল স্বভাবতঃই জীবনের অন্যান্য বিকাশ তৃণ-লতা-পশু-পক্ষীর সহিত একটা সহজ আত্মীয়তা, রক্তের নিগূঢ় ঐক্য অনুভব করিতেছি এবং এই সহজ আত্মীয়তার জন্যই আর আমাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবপ্রসূত আত্মীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর অন্তর্ভুক্ত বসুন্ধরা নামক কবিতাটী এই নূতন ভাবের আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল; আমাদের বাঙ্গালী কবি সাধারণতঃ যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনটা নিতান্ত নিরুদ্বেগে কাটাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আপনার উচ্ছ্বসিত প্রাণবেগে সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনের লক্ষ উৎস হইতে পূর্ণ পানপাত্রটী আস্বাদন করিয়াছেন, ও সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে প্রকৃতির আদিম জীবনস্পন্দনের সহিত নিজ বক্ষোস্পন্দন মিলাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য প্রকৃতির যে জীবনের সহিত কবি আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা মানুষের প্রতি উদাসীন বা সহানুভূতিলেশশূন্য নহে; প্রকৃতির সেই অপরিণত জীবন অনাদি কাল হইতে মানব জীবনের সুখদুঃখধারায় সিক্ত হইয়া আসিতেছে। নদীর নীলজলপ্রবাহের সহিত মানবচিত্তের সুখদুঃখপ্রবাহ মিশ্রিত হইয়া তাহার বেগকে বাড়াইয়া দিয়াছে ও তাহার কলকলধ্বনির সহিত এক অব্যক্ত অনুভূতি ও অর্থগৌরব মাখাইয়া দিয়াছে, হরিৎপত্রমণ্ডিত অরণ্যানী যে আনন্দহিল্লোলে কম্পবান তাহার অনেকটা আনন্দবিভোর মনুষ্যহৃদয়ের দান। প্রকৃতির চারিদিকে মানুষের সুখদুঃখমণ্ডিত আশা আকাঙ্খা গ্রথিত একটা ঘন ভাবময় প্রতিবেশ রচিত হইয়া গিয়াছে, যুগ যুগান্তর হইতে মানব মনের সহিত প্রকৃতির যে নিগূঢ় লীলা ও ভাববিনিময় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির জীবন নূতন অর্থ গৌরব ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই বর্ত্তমান যুগের কবির পক্ষে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা এত সহজ হইয়াছে; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদক্ষেপে পৃথিবী মাধুর্য্যময়ী ও ভাবসমৃদ্ধা হইয়াছে। মানবের সহিত তাহার একটা

সহজ হৃদয়ের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজেরও আশা যে তাঁহার কবিতা প্রকৃতির মুখের উপর একটী ঘনতর সৌন্দর্য্য দিয়া যাইতে পারিবে। এবং আজ হইতে এক শতাব্দী পরে ভবিষ্যৎ যুগের পাঠক, প্রকৃতির প্রতি তিনি যে নূতন সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়াছেন তাহা পৃথক করিয়া লইতে ও তাহার বিচার করিবে পারিবে। প্রকৃতির প্রতি ঠিক এই প্রকারের মনোভাব ইংরাজ কবিদের মধ্যে বিরল—Meredith ও Hardyর কোন কোন গীতি কবিতায় মাত্র ইহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের আর একশ্রেণীর কবিতায় আমাদের পৌরাণিক গল্প উপাখ্যানগুলি তাঁহার কল্পনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পুরাতন কাহিনীগুলিকে নূতন ভাবে রচনা করা ও তাহাদের মধ্যে নূতন আলোক ও সৌন্দর্য্য সঞ্চারের চেষ্টা ইংরাজ কবি শেলী ও কীটসের মধ্যেও বিশেষ প্রকট। কিন্তু এই বিষয়ে ইংরাজ কবিদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাজ যে আরও অনেক কঠিন তাহা নিঃসন্দেহ। শেলী ও কীট্সের কবিতায় যে সমস্ত গ্রীক দেশীয় পুরাণ-কাহিনী নূতন ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের কলা সৌন্দর্য্য খুব পরিস্ফুট এবং তাহারা খুব সহজেই কবি প্রতিভার নিকট আপনাদের মর্ম্মস্থিত সৌন্দর্য্যরহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। সেইজন্য ইংরাজ কবিদের কাজটী নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল না—তাঁহারা পুরাতন কাহিনীগুলির সহজ ধারাটী অনুসরণ করিয়াই তাহাদের হৃৎ-পদ্ম-নিহিত সৌন্দর্য্য-সারে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন; উহাদিগকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই—পুরাতনের হৃদয়ের চারিদিকে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের পাপড়ি খুলিতেই তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এরূপ কোন সাহায্য পায় নাই—আমাদের ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি নৈতিক ভাবের আধিক্যে পীড়িত বলিয়া কবিকল্পনার আলোক রেখার নিকট নিতান্ত দুর্ভেদ্য বলিয়াই মনে হয়। খনিগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় তাহাদের জ্যোতি অর্দ্ধস্তিমিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত গোপন সৌন্দর্য্যের একটী রশ্মিও বাহিরে প্রতিভাত হয় নাই বলিয়া তাহারা এ পর্য্যন্ত কবির চক্ষু সমক্ষে আকৃষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সমস্ত বহিরাবণ ভেদ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু অসঙ্গত বা অনুপযোগী তাহা বর্জ্জন করিয়া, তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যটী বাহিরে ফুটাইয়াছেন ও নূতন ভাব ও রসের সঞ্চার করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'মদন ভস্মের পূর্ব্বে' ও 'মদন ভস্মের পরে এই দুই কবিতাই রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি মদন দেবতাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া পৃথিবীতে মানবজীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যুবকের মত্ত মুখর উৎসব ও তরুণীর গোপন নীরব অনুরাগ এই প্রণয় দেবতাকে ঘিরিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। মানব জীবনের প্রত্যেক আনন্দ উৎসবে, প্রতিদিনের বিলাস বিভ্রমে ও ক্রীড়া কৌতুকে দেবতা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছেন। আবার মদন ভস্মের পরে নামক কবিতাতে মহাদেবের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীর অণু পরমাণুর মধ্যে কিরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন,

চারিদিকে প্রকৃতির সাধারণ কার্য্যকলাপের মধ্যে কিরূপে নিজের প্রচ্ছন্ন প্রভাবটী বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত দেবতার সেই একাত্মীকরণের কাহিনীটী বিবৃত হইয়াছে। কেবল সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে Keatsএর 'Ode to Psyche' রবীন্দ্রনাথের এই দুইটী কবিতার সমকক্ষ হইতে পারে; কিন্তু কল্পনার মৌলিকতায় ও সৃষ্টিকৌশলের নবীনতায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

এই পুরাতন উপাদানকে নূতন করিয়া গড়িবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' (মানসী) ও বৈষ্ণব কবিতা (সোণার তরী) প্রভৃতি আরও কতকগুলি কবিতায় দেখা যায়। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনীর কুৎসিত অংশটী সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া প্রকৃতির জীবনের সহিত একাত্ম হইবার তাঁহার নিজের যে একটা তীব্র আকাঙ্খা ছিল, তাহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। পাষাণ-রূপিণী অহল্যা আদিম প্রকৃতির চিরন্তন হৃৎ-স্পন্দনটী নিজের বক্ষে অনুভব করিয়াছে, যে অগণ্য প্রকারের জীব ধরিত্রী-মাতার বক্ষ লগ্ন হইয়া তাঁহার স্তন্যরস পান করে, তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত এক সূক্ষ্ম সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, এবং তাহার জড় পিণ্ডবৎ দেহের উপর দিয়া যে নূতন চেতনা-রস প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে স্নাত হইয়া এক অকলুষ, নির্ম্মল আত্মার জ্যোতিতে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনুষ্য-সমাজের মধ্যে আবার নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 'মেঘদূত' ও 'বৈষ্ণব-কবিতা' এই দুইটী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রভাব ছাড়াইয়া প্রেমের চিরন্তন রূপটী আশ্চর্য্য ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এবং এই দুই প্রকারের কাব্যের ভাবগত আবেষ্টনটী অতিশয় সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত পুনর্গঠন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রূপক কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার অবসর হইল না। এই রূপক কবিতার প্রতি প্রবণতা তাঁহার কাব্য-জীবনের শেষ অভিব্যক্তি; এবং তাঁহার কবিতার এই ধারা এখনও শুষ্ক হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই—সুতরাং এ সময় ইহাদের সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা একটু দুরূহ। কবিতার সহিত আধ্যাত্মিক রূপকের সম্মিলন উভয়ের পক্ষেই একটু বিপজ্জনক; ইহাদের মধ্যে সম্মিলন দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, কবিতা শুষ্ক-নীরস ও রূপক অস্পষ্ট হইয়া পড়ে; এবং অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও অনেকটা এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অনেক কবিতা একটী স্বচ্ছ আভাস ও গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে প্রাণস্পর্শী তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহাদের ছোট খাট সরল সুরগুলির মধ্যে একটী অপ্রত্যাশিত গভীর রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দেয়। কিন্তু আবার অনেকগুলি কবিতাতে সুরটী আচ্ছন্ন ও ভাবটী কুহেলিকা-মণ্ডিত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক তাঁহার এই রূপক কবিতাগুলি ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মনে এক আশ্চর্য্য রকমের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে তাহাদের শেষ মূল্যটী নির্দ্ধারণ করিয়া না দেয়, সে পর্য্যন্ত ইহাই তাহাদের প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এই রূপকপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে নাটকেও সংক্রামিত হইয়াছে, এবং

নাটকে তাহার ফল মোটের উপর আরও চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। 'বলাকা' নামক কবিতা সমষ্টিতেই তাঁহার এই গুণটী বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহাতে কবি একটী দার্শনিকোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রহস্যসমাধানের শক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং এই দুরূহ ভাব প্রকাশের জন্য আশ্চর্য্যরূপ স্বচ্ছ ও প্রকাশক্ষম ভাষার উপর অধিকারও দেখাইয়াছেন—দার্শনিক তত্ত্বান্বেষণের সহিত কাব্যরসসৃজনের সুন্দর সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহার ছন্দটীও তাহার স্বচ্ছন্দ লীলায় ও অনিয়মিত গতি ভঙ্গিতে কবির চিন্তাধারার স্বাভাবিক অনুবর্ত্তন করিয়াছে।

কবির মধ্যে যৌবনের রসধারা এখনও যে প্রচুর ভাবে প্রবাহিত, সেই শুভলক্ষণ তাঁহার সর্ব্বশেষ কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পাঠকবর্গ ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত ও আগ্রহপূর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তির উৎস হইতে নূতন নূতন ধারার প্রবাহের জন্য সকলেই সসম্ভ্রমে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবার্ট ব্রাউনিং

প্রায়ই দেখা যায়, যে কোনো উন্নত বা আদর্শ জীবন, যথাসময়ে সমাদর লাভ করে না—করিলেও ঠিক উচিত সম্মান পায় না। সক্রেটিস্, জোয়ান অফ্ আর্ক ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতটা অনাদৃত না হইলেও, ব্রাউনিং কিছু কিছু ইঁহাদেরই দলভুক্ত। তাঁহার কবিত্বের আদর তাঁহার যুগে হয় নাই। রাজকবি টেনিসন বহুমান্যে ভূষিত হইয়া কাব্যগগন উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন। ব্রাউনিং তাঁহার মত আদর লাভ করেন নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে দেখি, ব্রাউনিংএর সমাদরের প্রচেষ্টা হইতেছে। তাঁহার যুগে, তাঁহাকে চিনিয়াছিল, এমন লোক কম ছিল—ছিল না তাহা নহে। তাহার কারণ বোধ হয়, ব্রাউনিং একটু বেশী আধুনিক, (modern) কয়েক বৎসর পরে তাঁহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল বোধ হয়। তাই বর্ত্তমান যুগে তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার পরিলক্ষিত মানবজীবনের সমালোচনা এমন ভাবে গৃহীত হইতে পারিতেছে। ব্রাউনিং সম্বন্ধে প্রচুর গ্রন্থাবলী এই চেষ্টার সাক্ষ্য দেয়।

অনেকে বলেন, ব্রাউনিংএর কাব্যে সৌন্দর্য্যরসের অভাব; উহা শ্রুতিকটু ইত্যাদি। শেলীর মত সুমধুর ললিত পদবিন্যাস তাঁহার কাব্যে সত্যই অতবেশী নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যপিপাসুর তৃপ্তিকর ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিতে দেখি পদলালিত্যের গুণে, অর্থ না বুঝিলেও পাঠকের অভাব হয়

না। অনেকস্থলে পাঠক ইচ্ছামত অর্থ বাহির করেন। রবিবাবুর অনেক ধর্ম্মসঙ্গীত প্রেমসঙ্গীতরূপে গীত হইতে শুনিয়াছি, আবার অনেক কেবলমাত্র সরস গীতিকাব্যগুণে আদরণীয় কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে শুনিয়াছি। যে কোনো প্রকারেই হউক রসগ্রহণে বাধা পড়ে নাই। কিন্তু মনে হয় ব্রাউনিংএর ভাবসম্পদ গ্রহণ না করিতে পারিলে তাঁহার কাব্যের বহিঃসৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। একবার তাঁহার চিন্তাধারা, গ্রহণ করিয়া, তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে অনেক আপাত শ্রুতিকটু কাব্যের মধ্যে রসধারা মূর্ত্ত হইয়া উঠে দেখা যায়। তাই মনে হয় তাঁহার কাব্যের অন্তঃসৌন্দর্য্য ও বহিঃসৌন্দর্য্য পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে ব্রাউনিংজায়ার সমালোচনাই প্রকৃষ্ট। কবির Bells and the Pomegranates শীর্ষক কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি বলিয়াছেন সত্যই এ যেন দাড়িম্ব। উপরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া যাহা পাই, তাহা শুধু সুন্দর, শুধু মধুর নহে, তাহা জীবনের মূলরস স্বরূপ। আমরা বলি তখন বাহিরের কাঠিন্য আর চোখে ঠেকে না।

ব্রাউনিং সর্ব্বসাধারণের প্রিয় কখনও হইবেন না। তাহার প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক কবি। সাধারণের পক্ষে একটু অধিক গুরুগম্ভীর। তাঁহার কাব্যে সৌন্দর্য্য ও শক্তি পাশাপাশি নাই। শক্তিমান কবির লেখনীতে রূপমূর্চ্ছাতুর শব্দঝঙ্কৃত মধুর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাতের ঝঙ্কার পাই। কিন্তু চিন্তাশীল ভাবুকমাত্রেরই নিকট ব্রাউনিং প্রিয় হইবেন, যদিও তিনি অবসর বিনোদনের কবি নহেন।

ব্রাউনিংএর কাব্যে আমরা পাই তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া পরিলক্ষিত জীবনের সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা। সফলতা বিফলতা, সুখদুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গলের, শ্রেয় প্রেয়ের এই যে নিত্য দ্বন্দ্বে মানবের জীবন আপাত চক্ষে অনিশ্চিত দেখায়, ইহার মধ্যে শাশ্বত সত্য কোথায় বা কি? তিনি সকল দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার ইচ্ছামত জীবনের কিছু গ্রহণ করিয়া, কিছু বর্জ্জন করিয়া compromiseএর ধর্ম্ম নহে;—তিনি জীবনের সব কিছু গ্রহণ করিয়া, তাঁহার মধ্যে শাশ্বত সত্যের রূপটী ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে আমরা যে শক্তির সঞ্চার হৃদয়ে অনুভব করি তাহা হইতেই বোধগম্য। তিনি অযথা সুখবাদী নহেন—দুঃখবাদী ত নহেনই। বর্জ্জনের তিনি পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, যাহা কিছু জীবনে আমরা পাই, তাহা পরমেশ্বরের দান বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত লইতে হইবে। অন্ধ বিশ্বাস বা অন্ধভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রহণ করা নহে। এই সকল দ্বন্দ্বের মাঝে যে এক পরম সত্য আছে তাহা ভগবান আমাদের বুদ্ধির বা হৃদয়ের অনধিগম্য করিয়া দেন নাই। আমরা অবহিত চিত্তে জীবনসমস্যার আলোচনা করিলেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান দেখিতে পাই। তাই জীবনের সকলক্ষেত্রে সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, মঙ্গলে অমঙ্গলে কোথাও দ্বন্দ্ব নাই—সবই আনন্দের কার্য। যে ভাবে তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। মানুষের হৃদয়ে যে

শক্তিমান্ দিব্য পুরুষ সুপ্ত আছেন—তাঁহার উদ্বোধনের জন্য ব্রাউনিংএর চেষ্টা। জীবনের বিফলতা সম্বন্ধে কবির বিশ্বাস।

Tis but so keep the nerves at strain,
To dry one's eyes and laugh at a fall,
And baffled get up and begin again,
So the chance takes up one's life, that's all.

এই ব্যর্থতার উদ্দেশ্য শুধু জীবনের শক্তিকেন্দ্রকে নিত্য উদ্বুদ্ধ রাখিবার জন্য—আমরা যাহাতে পদস্খলনের পর, চক্ষু মুছিয়া হাসি মুখে উঠিয়া নূতন করিয়া পথ চলিতে শক্তি পাই। এই চেষ্টাই জীবন।"

Abt Voglerএ এই কথাই কবি বলিয়াছেন—

The high that proved to high, the heroic for earth too hard,
The passion that left the ground to lose itself in the sky,
Are music sent up to God by the lover and the bard,
Enough that he heard it once, we shall hear it by and by

কে বলে আমাদের সব হারায়? যাহা আমাদের স্পর্শের বহু দূরে, নশ্বর মনুষ্যের পক্ষে যে বীর্য্য অনধিগম্য, হৃদয়ের যে উচ্ছাস ধরার হৃদয় ভেদ করিয়া নীলিমায় মিশায়, সেকি সত্যই শিশুর চন্দ্র ধরিবার মত দুরাশা? না, তাহা ত নয়। এ সকলি কবির, প্রেমিকের হৃদয়ের ধূপের গন্ধ পরমেশ্বরের বন্দনার সঙ্গীতে উঠিতে থাকে। তিনি ত শুনিয়াছেন একবার, তাহা হইলেই সার্থক। একদিন না একদিন আমরাও শুনিতে পাইব।"

Rabbi ben Ezraতে পরিণত বা বৃদ্ধ বয়সের সার্থকতা দেখাইয়া কবি এই একই কথা বলিয়াছেন—

All that I aspired to be,
And was not, comforts me,

(আমি যাহা কিছু হইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই, আমার সেই স্বপ্নই আমার শান্তি।) তাঁহার বিশ্বাস জীবনের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা এসব নষ্ট হইবার নহে। মানব জীবনের সার্থকতা উহারই মধ্যে—কতটা করিয়াছি, done and finished কাজের মধ্যে নহে। মনে পড়ে রবি বাবুর—

"আমারি অনাগত, আমারি অনাহত,
তোমারি বীণাতারে বাজিছে তা'রা।"

এই অনাগত, অনাহত হৃদয়সঙ্গীতেই জীবনের শাশ্বত শান্তি।

এই সার্থকতা আসিবে, নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক জ্ঞানবাদে নহে, নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিবাদেও নহে। জ্ঞান ও প্রেমের পূর্ণ মিলনেই সুন্দরের উদ্ভব। Paracelsusএ নাট্যাকারে কবি জ্ঞানবাদের শুষ্কতা ও অন্ধ ভক্তি'র মদবিহ্বলতার ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন। দুইই চাই—পরিপূর্ণ ভাবে—ভক্তি যেন জ্ঞানকে ছাপাইয়া যায় না, জ্ঞান যেন ভক্তিকে শুষ্ক করিয়া দেয় না,—উভয়ে

পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে হৃদয়ে সংহত হইলে তবেই তৃতীয় নেত্র ফুটিয়া উঠে। Paracelsusএর তৃতীয় অঙ্কে আছে :—

From God down to the lowest spirit ministrant,
Intelligence exists which casts our mind
Into immeasurable shade. No, no,
Love, hope, fear, faith, these make humanity.

[ভাবার্থ :—আব্রহ্মজীব সকলেরই মাঝে বুদ্ধির ক্রিয়া দেখিতে পাই। দেখি অন্ধ নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধির ক্রিয়াতে আত্মা কুহেলি সংবৃত হইয়া থাকে। না, না, প্রেম, আশা, আকাঙ্খা, বিশ্বাস হইতেই ত মানবের মনুষ্যত্ব।]

তাহার পরে মরণোন্মুখ Paracelsusএর মুখে কবি বলিতেছেন : জীবনের সার্থকতা তখনই, যখন আমরা বুঝি

To know even hate is but a mask of love's,
To see a good in evil, and a hope
In ill success, to sympathise, be proud
Of their half reasons, faint aspirings, dim,
Struggles for truth, their poorest fallacies
Their prejudice and fears and cares and doubts,
All with a touch of nobleness, despite
Their error, upward tending all though weak,
Like plants in mines which never saw the sun
But dream of him, and guess where he may be
And do their best to climb and get to him.
All this I knew not, and I failed

[ভাবার্থ :— যখন জানি ঘৃণা প্রেমেরই রূপান্তর, যখন অমঙ্গলে মঙ্গল দেখি, ব্যর্থতার মাঝখানে সফলতার আভাস পাই, অর্দ্ধস্ফুট কলিকাসম, অনাগত, অর্দ্ধ বিকশিত চিন্তা, সত্যানুসন্ধানের আকুলতা, জীবনের মহত্তর বিকাশের মূল বুঝিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারি, ছোটখাট ভাবনা, সন্দেহ, দ্বন্দ্বদোলা, ভুলভ্রান্তি, উদার ভাবে গ্রহণ করিয়া সব গুলিকেই জীবনের উর্দ্ধ গতির ক্ষীণ অনুকূল প্রয়াস বুঝি—যেমন খনির অন্ধকারের মধ্যে যে তরুলতা জন্মায়, তাহারা কখনো সূর্য্যকর পায় না, তবু যেন স্বপ্নে সূর্য্যের অস্তিত্ব জানিয়া, সেই গুহার মধ্যেই উর্দ্ধমুখী হইয়া সূর্য্যাভিমুখে উঠিতে চায়। এসব আমি জানি নাই। তাই জীবন আমার ব্যর্থ হইল।]

ব্রাউনিং এইরূপে জীবন সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার এই চিন্তা ধারার মূলে তাঁহার সুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল। অতি দৃঢ় এই ধর্ম্মবিশ্বাস। Paracelsus তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা। তবু এখানেও কবির এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই।

A still voice from without said—"Seest thou not.
Desponding child, whence spring defeat and loss ?
Even from thy strength."
And softer came the voice—There is a way :
'Tis hard for flesh to tread therein, imbued
With frailty—hopeless, if indulgence first
Have ripened inborn germs of sin to strength :
Wilt thou adventure for my sake and man's,
Apart from all reward ? And last it breathed.
"Be happy, my good soldier ; I am by thee,
'Be sure, even to the end !" I answered not,
Knowing him."

[ভাবার্থ :—এক অশরীরি বাণীর মৃদু আশ্বাস শুনিতে পাইলাম, হায়, বৎস, বেদনাহত চিত্তে বুঝিতে পারিতেছ না, ক্ষতিপরাজয়ের মূল কোথায় ?—সে ত তোমারি শক্তির মধ্যে। আরো মৃদুস্বরে সেই বাণী শুনিলাম—এক উপায় আছে—কিন্তু দুর্ব্বল, নশ্বর মানবের পক্ষে বড় কঠিন সে পথ—যদি অলস হইয়া, শক্তির মূলে পাপের উদ্ভব হয়, তবে ত সে পথে চলা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। তুমি কি আমার জন্য, মানবের জন্য নিষ্কাম হইয়া চলিতে পারিবে,"—সবশেষে শুনিলাম "হে আমার বীর। কল্যাণ হউক। শেষ পর্য্যন্ত আমি তোমার সঙ্গেই আছি।"—আমি চিনিলাম এ কাহার বাণী, তাই স্তব্ধ চিত্তে রহিলাম।]"

এই অনুভূতি আমার সঙ্গেই

I was endued with comprehension and a steadfast will,
And when he ceased, my brow was sealed his own".

[ভাবার্থ :—আমার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া চিত্তে আশা জাগিল, দৃঢ় সংকল্প জাগিল। যখন নীরব হইলেন, তখন দেখিলাম, আমি তাঁহারি চরণে নিবেদিত আত্মা।"]

ব্রাউনিংএর এই ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কোনো গোঁড়ামী ছিল না। তাঁহার মত নির্ভীকভাবে, খ্রীষ্টধর্ম্মের দুর্ব্বল শক্তিহীন অংশগুলির আবরণ, শেলী ভিন্ন কেহই খুলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহার Ring and the Bookএ প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের গোঁড়ামী ও অন্যায়ের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবর্ষণ ছত্রে ছত্রে পাই।

অনেকে বলেন, ব্রাউনিংএ কাব্যসৌন্দর্য্যের একান্ত অভাব। নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি হইবে। Ring and the Book, Paracelsus প্রভৃতি বড় বড় কাব্যগুলিতেই শুধু নহে—ক্ষুদ্র কবিতাগুলিতেও সৌন্দর্য্য ও সরসতার অভাব নাই।

For some one truth would dimly beacon me
From mountains rough with pines, and flit and wink,
O'er dazzling wastes of frozen snow, and tremble
Into assured light in some branching mine
Where ripens, swathed in fire, the liquid gold—
And all the beauty, all the wonder fell
On either side the truth, as its me.e robe ;
I see the robe now—then I saw the form."

[ভাবার্থ :—"বৃক্ষকণ্টকিত পর্ব্বতশীর্ষ হইতে একটী সত্যের ক্ষীণ আলোক আমাকে যেন ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়া দিত। পর্ব্বতের উপরের জমাট তুষারের তীব্র ধবলতার উপর ঝিকিমিকি করিতে করিতে খনির অন্ধকারের মধ্যে, যেখানে তরল অগ্নিময়ী স্বর্ণধারা বৃদ্ধি পায়, সেখানে আমাকে লইয়া গিয়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। Paracelsus.

পরে Paracelsus যেখানে তাঁহার অতীত আশা আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি দিয়া গান করিয়া বলিতেছেন :—

"Heap cassia, sandal-buds and stripes
Of labdanum, and aloe-balls,
Smeared with dull nard an Indian wipes
From out her hair ; such balsam falls
Down sea-side mountain pedastals,
From tree-tops where tired winds are fain,
Spent with the vast and howling main,
To treasure half their island-gain.
And strew faint sweetness from some old
Egyptian's fine worm-eaten shroud
Which breaks to dust when once unrolled ;
Or, shredded perfume, like a cloud
From closet long to quiet vowed,
With mothed and dropping arras hung,
Mouldering her lute and books among,
As when a queen, long dead, was young."

ইহার ভাবার্থ নিষ্প্রয়োজন। এরূপ স্থলের সুকুমার কাব্যসৌন্দর্য্য অনুবাদের অক্ষম চেষ্টায় নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সৌন্দর্য্যের অভাব ব্রাউনিংএ কোথাও নাই। দুইটী অংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকা যায় না। একটীতে Ring and the Bookএ Pompiliaর আসন্ন মাতৃত্ব বড় সুমধুর ভঙ্গীতে বর্ণিত :—

"The strange and passionate precipitance
Of maiden startled into motherhood
Which changes body and soul by nature's law,
So when the she dove breeds, strange yearnings come
For the unknown shelter by undreamed-of shores,
And there is born a blood-pulse in her heart
To fight if needs be, though with flap of wing,
For the wool flock or the furtuft, though a hawk
Contest the prize—wherefore she knows not yet."

অজ্ঞাতসারে জননীর প্রাণে মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মঙ্গলের জন্য যে অসীম শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে সেই শক্তিময় অথচ দুর্ব্বল মাতৃজীবনের কথা বলিতেছেন—"সেই আকস্মিক অবস্থান্তর! যে ছিল বালিকা, কখন সে মাতায় পরিণত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের নিয়মে দেহ মন, সবই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! যখন কপোতীর সন্তানসম্ভাবনা হয়, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত সমুদ্রকূলে কোন্ অজানা কুলায়টুকুর জন্য এক অপরিজ্ঞাত অপূর্ব্ব আকুলতা তাহার আসে। সঙ্গে সঙ্গে ভীরু পক্ষীমাতার হৃদয়ে কোথা হইতে এক দুর্দ্দম শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার ফলে এক টুকরা তুলা বা তৃণগুচ্ছের জন্য শ্যেনের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাত শুধু পক্ষ ঝটপট করিয়া প্রতিহত করিবার চেষ্টায় যুদ্ধ করিয়া থাকে—কেন যে করে সে তাহা জানে না।"

দ্বিতীয়টী Ring and the Bookএর দশম পরিচ্ছেদে Pope মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Guidoর এই চরম দণ্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন—পাপের কালিমাতে জীবন যাহার কলঙ্কিত, মানুষের যাহার প্রতি আর কিছু করিবার নাই, ভগবান তাহাকে এইরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত পূর্ব্বের কলঙ্ক রক্তধৌত করিয়া নবজীবন দান করুন।

'I stood at Naples once, a night so dark
I could have scarce conjectured there was earth
Anywhere, sky or sea or world at all;
But the night's black was burst through by a blaze—
Thunder struck blow on blow, earth groaned and bore,
Through her whole length of mountain visible.
There lay the city thick and plain with spires,
And like a ghost disshrouded, white the sea.
So may the truth be flashed out by one blow,
And Guido see, one instant and be saved,

[একরাত্রে আমি নেপল্‌সএর সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঘনমসীময়ী রজনী; আকাশ পৃথিবী সবই লোপ পাইয়াছে। সহসা রাত্রির অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া অগ্নিময়ী রেখা এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত কে যেন টানিয়া দিল। ঘন মেঘ গর্জ্জন, বজ্রপতনে পৃথিবী যেন অর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; দেখিলাম দূরে স্তব্ধ পর্ব্বতশ্রেণী, স্পষ্ট দেখিলাম গৃহচূড়াকণ্টকিত নগরী সেই ঘনান্ধকারের বক্ষে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। এই যে দণ্ডিত অপরাধী; এও যেন, তেমনি, এক নিষ্ঠুর আঘাতে সত্যের রূপ অমনি করিয়া দেখিতে পায়, আর দেখিয়া আপনার আত্মার বিনাশপথের গতিরোধ করিতে পারে।"

লোভ হয়, এইরূপ ছত্রের পর ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিই। ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলিবার যত কিছু আছে তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার নহে। শুধু দুই একটী কথায়, এই শক্তিমান্ মহাকবির বিপুল কাব্যসৌন্দর্য্যের রসবোধের চেষ্টার আভাস করা হইয়াছে মাত্র। সকলে এখনো তাঁহার সম্যক্ আদর করিতে শেখে নাই।

ব্রাউনিং পড়া "ফ্যাসান্" হইয়াছে বলিয়া অনেকে পড়েন, তাহাতে তাঁহার—শুধু তাঁহার কেন—যে কোন কবিরই অপমান করা হয়। আর পড়েন পণ্ডিতেরা যাঁহারা সব কিছু পড়েন তাহারই অঙ্গীভূত করিয়া পড়েন তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষের জন্য। তাহাতে আমাদের মত সাধারণ পাঠকের কোনো লোভ নাই। তবে তাঁহার আদরের চেষ্টা যে হইতেছে সেটুকু বোধ হয় বলা যায়। Paracelsusএ এক জায়গায় বলিয়াছেন—"I shall emerge one day." —সত্যই **He is emerging.**

শ্রীনির্ম্মলা বসু।

পথের চিহ্ন

হারায়ে ফেলেছি তারে জনতার মাঝে,
খুঁজে খুঁজে বেলা হয় শেষ,
আমারে যে যেতে হবে আজিকার সাঁঝে,
মালিকের কাজে দূর দেশ।
জানিনা তো দীর্ঘপথে বিশ্রামের তরে
পান্থশালা আছে, কি না আছে,
সে যদি আমায় খোঁজে এই পথ ধরে
ঠিকানা সে পাবে কার কাছে?
যদি অন্য পথে যায়, তবে হায় হায়!
মিলনের সর্ব্ব আশা শেষ।
দাঁড়াতে পারিনা তবু, বেলা চলে যায়,
যেতে হবে—প্রভুর আদেশ।
হে দোকানী, যদি দেখ যুবক সুন্দর
কারো খোঁজে চাহে চারি দিক,
বলো এক প্রৌঢ়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর,
উত্তরের হয়েছে পথিক।
বলো ঢেলে গেছে অশ্রু পথের দুধারে
লয়ে গেছে বুকেতে বিষাদ
সেই অশ্রু-চিহ্ন পথ দেখাক্ তোমারে
রেখে গেছে এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকামিনী রায়।

হাস্নু হানা

প্রভাত আলোকে ধরণীরাণীরে
সাজাল রঙ্গীন সাজে,
অশোক কাঞ্চন করবী পলাশ
বন্ধুক শিমুল; সিঞ্চিল সুবাস
যূথিকা মল্লিকা চামেলী চম্পক
গোলাপ ও গন্ধরাজে।
এই রঙ্গের মেলায় সৌরভ খেলায়
আমি যে লাগি না কাজে
তাই মরে আছি লাজে।

ফুটেছিল মোর ছোট ছোট ফুল
গন্ধে দশদিক করিয়া আকুল
অন্ধ আঁধার রাতে,
নীরব যখন বিহঙ্গের গান
মানব যখন খোঁজেনা সুঘ্রাণ
মগন রহে নিদ্রাতে।
শুষে লয়ে গেছে তাদের সুবাস
রজনী আপন সাথে,
এবে অরুণের হাসির আঘাতে
ঝরিয়া পড়িল প্রাতে।
কবি কহে ওগো সৌরভময়ি,
দুঃখ কিবা আছে তাহে,
নিশার আঁধারে অনিদ্র যে জাগে
তার প্রাণে তব সৌরভ লাগে
সে তব মঙ্গল গাহে।

শ্রীকামিনী রায়।

মায়ের আশা

যে সুরে মোর উঠেনি গান
সে সুরে গাবে, তুমি সে গাবে,
যে উচ্চ পথে পারিনি যেতে
সে পথে তুমি সহজে যাবে,
যে ফলে শুধু বাড়ানু হাত
তুমি তা পাবে তুমি তা পাবে।
একটি ছোট বীজে যেমন
বনস্পতি জীবন পেয়ে,
লক্ষবীজে অঙ্কুরে আর
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে,
তেমনি তুমি একটা মায়ের
একটা বুকের আশা নিয়ে
লক্ষ বুকে বুনবে আশা
সাধন দিয়ে সিদ্ধি দিয়ে।

শ্রীকামিনী রায়।

পথের চিহ্ন

হারায়ে ফেলেছি তারে জনতার মাঝে,
খুঁজে খুঁজে বেলা হয় শেষ,
আমারে যে যেতে হবে আজিকার সাঁজে,
মালিকের কাজে দূর দেশ।
জানিনা তো দীর্ঘপথে বিশ্রামের তরে
পান্থশালা আছে, কি না আছে,
সে যদি আমায় খোঁজে এই পথ ধরে
ঠিকানা সে পাবে কার কাছে?
যদি অন্য পথে যায়, তবে হায় হায়!
মিলনের সর্ব্ব আশা শেষ।
দাঁড়াতে পারিনা তবু, বেলা চলে যায়,
যেতে হবে—প্রভুর আদেশ।
হে দোকানী, যদি দেখ যুবক সুন্দর
কারো খোঁজে চাহে চারি দিক,
বলো এক প্রৌঢ়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর,
উত্তরের হয়েছে পথিক।
বলো ঢেলে গেছে অশ্রু পথের দুধারে
লয়ে গেছে বুকেতে বিষাদ
সেই অশ্রু-চিহ্ন পথ দেখাক্ তোমারে
রেখে গেছে এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকামিনী রায়।

হাসনু হানা

প্রভাত আলোকে ধরণীরাণীরে
সাজাল রঙ্গীন সাজে,
অশোক কাঞ্চন করবী পলাশ
বন্ধুক শিমুল; সিঞ্চিল সুবাস
যুথিকা মল্লিকা চামেলী চম্পক
গোলাপ ও গন্ধরাজে।
এই রঙ্গের মেলায় সৌরভ খেলায়
আমি যে লাগি না কাজে
তাই মরে আছি লাজে।

ফুটেছিল মোর ছোট ছোট ফুল
গন্ধে দশদিক করিয়া আকুল
অন্ধ আঁধার রাতে,
নীরব যখন বিহঙ্গের গান
মানব যখন খোঁজেনা সুঘ্রাণ
মগন রহে নিদ্রাতে।
শুষে লয়ে গেছে তাদের সুবাস
রজনী আপন সাথে,
এবে অরুণের হাসির আঘাতে
ঝরিয়া পড়িল প্রাতে।
কবি কহে ওগো সৌরভময়ি,
দুঃখ কিবা আছে তাহে,
নিশার আঁধারে অনিদ্র যে জাগে
তার প্রাণে তব সৌরভ লাগে
সে তব মঙ্গল গাহে।

শ্রীকামিনী রায়।

মায়ের আশা

যে সুরে মোর উঠেনি গান
সে সুরে গাবে, তুমি সে গাবে,
যে উচ্চ পথে পারিনি যেতে
সে পথে তুমি সহজে যাবে,
যে ফলে শুধু বাড়ানু হাত
তুমি তা পাবে তুমি তা পাবে।
একটি ছোট্ট বীজে যেমন
বনস্পতি জীবন পেয়ে,
লক্ষবীজে অঙ্কুরে আর
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে,
তেমনি তুমি একটা মায়ের
একটা বুকের আশা নিয়ে
লক্ষ বুকে বুনবে আশা
সাধন দিয়ে সিদ্ধি দিয়ে।

শ্রীকামিনী রায়।